মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

বাঙলা প্রসঙ্গের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ

বাঙলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯১
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

বা/এ ঃ ১৬৩১
মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০
পাণ্ডুলিপি ঃ গবেষণা-উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
সলিমাবাদ প্রেস,
২১/৩, কোর্ট হাউস স্ট্রীট
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ
কাজী হাসান হাবিব

মূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আমার পিতা মোহাম্মদ ওয়াজির আলী সহ
বাঙলাদেশ-স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ
সকল মুক্তিযোদ্ধা স্মরণে—

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

'বাঙলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ' কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য অনুমোদিত গবেষণা-গ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রূপে গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগের বছর খানেক পরেই শুরু হয় বাংলা-দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ডাক এলো মসি ছেড়ে অসি নেয়ার।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রূপে পুনরায় গ্রন্থ রচনায় আত্ম-নিয়োগের সুযোগ লাভ করি ১৯৭৫-এ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মরহুম মুনীর চৌধুরী আমার প্রথম গবেষণা-নির্দেশক। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি শহীদ হলে, পরবর্তী সময়ে সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ডঃ আহমদ শরীফ। এ'রা দু'জনেই আমার শিক্ষক। এ'দের উপদেশ ও উৎসাহ অনুপ্রেরণার কথা আজ আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণা নির্দেশক ছিলেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের কথাও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ ছাড়া ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, ডঃ আবুল হাসান শামসুদ্দিন, ডঃ আবুল কাশেম চৌধুরী ও অধ্যাপিকা জোহরা আনিসও আমাকে উপদেশ এবং বিভিন্নভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বলে আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

কুমিল্লা মহিলা কলেজ লাইব্রেরী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ গ্রন্থাগার, কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন একাডেমী গ্রন্থাগার, রামমালা গ্রন্থাগার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বিশ্বভারতীর পাঠভবন প্রভৃতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতার কথাও আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

বাংলা একাডেমী কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশ লাভ করলো বলে আমি বিশেষ আনন্দিত।

মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

বাঙলা বিভাগ
সরকারী মহিলা কলেজ
কুমিল্লা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ ও তার পটভূমিকা—ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে বাঙালীর নব জীবন—চেতনা ১—৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুর শাস্ত্রীয় ও সামাজিক প্রথা—নৈতিকতার বিপর্যয় ও চারিত্রিক অধঃপতন—সতীদাহ—বহু বিবাহ—বিধবা বিবাহ—বাল্যবিবাহ প্রভৃতি, তার সংস্কার (Reform)-প্রয়াস ও প্রতিক্রিয়া ৪০—৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গদ্যে-পদ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা ও প্রহসন—প্রহসন পরিচিতি ৮৪—১২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৩০—১৭৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৭৪—২০০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীনবন্ধু মিত্র ২০১—২৪১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৪২—২৬৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমৃতলাল বসু প্রভৃতি ২৬৭—৩৪৫

নবম পরিচ্ছেদ

সুস্থ ও স্বস্থ সমাজ গঠনে প্রহসনের প্রভাব ঃ সামাজিক ইতিহাস—প্রহসনের অবদান ৩৪৬—৩৬৯

গ্রন্থপঞ্জী ৩৭০—৩৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে একদিকে মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারিগণ যেভাবে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে অপরিণামদর্শী, দুর্বলতর, হতবুদ্ধি ও নিঃসত্ত্ব হয়ে পড়েছিলেন, এবং অন্যদিকে ভাগ্যান্বেষী ব্রিটিশ-বেনিয়া গোষ্ঠী যে-ভাবে ক্রমান্বয়ে সুসংবর্ধিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্যন্তিক ক্ষমতা-স্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন,[১] সে সময়ে (১৭৫৭ খৃীঃ) সুবে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা ও ব্রিটিশ-বেনিয়া সর্দার সুচতুর ক্লাইভের মুখোমুখি সশস্ত্র সংগ্রাম ও তৎপ্রসূত একটি রাজনীতিক প্রত্যবেক্ষণ স্বভাবতঃই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। চাতুর্য, স্থিরবুদ্ধি ও প্রবল আত্মশক্তিরই জয় হয়—কোনো কিছুর বিনিময়েই হতভম্ব নবাব তাঁর দোদুল্যমান নবাবীর শেষ টুকুন রক্ষা করতে পারলেন না।[২] সেদিন বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের মুসলমানগণ বিস্মিত, ব্যথিত ও স্তম্ভিত হলেও হিন্দুগণ খুব একটা বিচলিত হননি। বরং 'It is a historical fact that a large section of Hindu 'Community welcomed the advent of the English power'.[৩] এবং 'British could winover political authority in Bengal, practically without any opposition from the Hindus'.[৪] ১৭৬০ খৃীস্টাব্দে মীরজাফরের সুলতানী লীলার অবসান ঘটে।

১৭৬৫ খৃীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন এবং এর ফলে সমগ্র দেশের রাজস্ব আদায়ের মালিকানাও ইংরেজরা পেলেন। বলা চলে, তখন থেকেই বাঙলাদেশে নবাবের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনকেন্দ্র কোলকাতায় স্থানান্তরিত হয় ১৭৬৮ খৃীস্টাব্দে। এই কোলকাতা ইংরেজের ভারত রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয় ১৭৭৩ খৃীস্টাব্দ থেকে। গঞ্জ কোলকাতা রূপ নেয় বন্দরে, তারপর শিল্প নগরে এবং পরিশেষে মহানগরে। কোলকাতা জেগে উঠে। কিন্তু 'কাদের নিয়ে জাগল কলকাতা? ইংরেজ, আর্মানি, মারোয়াড়ী, ক্ষেত্রী

www.pathagar.com

প্রভৃতি বণিকদের শুদ্ধ কোলকাতা জেঁকে উঠল তার প্রথম ব্যবসায়ী বণিক বাশিন্দা মল্লিক, শেঠ, বসাক, শীল, বড়াল, আঢ্য প্রভৃতি সুবর্ণবণিক ও তন্তুবায়দের নিয়ে। তারপর ইংরেজ কোম্পানী ও তার সাহেবদের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, মুন্সি প্রভৃতি অনুগ্রহজীবী ভাগ্যান্বেষীদের নিয়ে'।[৫] তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই ডঃ আহমদ শরীফ বলেন—প্রথমে কোলকাতার ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কতগুলো ভাগ্যবিতাড়িত, চরিত্রভ্রষ্ট, ধূর্ত, পলাতক, অল্প শিক্ষিত লোক বানিয়া-মুৎসুদ্দী-গোমস্তা-কেরানী-ফড়িয়া-দালাল রূপে অবাধে অঢেল-অজস্র কাঁচা টাকা অর্জন ও সঞ্চয়ের দেদার সুযোগ পেয়ে ইংরেজের এ দেশে উপস্থিতিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে জানল ও মানল।'[৬]

যে উদ্দেশ্যে স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়, উঠতি পুঁজিপতি ও তাঁদের উত্তর-সূরিরা সেদিন মুসলমান শাসনের অবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন এবং ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েছিলেন বিধাতার আশীর্বাদরূপে, সে উদ্দেশ্য চরিতার্থে তাঁরা ব্যর্থ হননি। 'মহারাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, গোবিন্দ মিত্র, কান্তবাবু, গৌরী সেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, লক্ষ্মীকান্ত ধর, রাজা সুখময় রায়, আমীর চাঁদ, বৈষ্ণব চরণ শেঠ, হাজারী মলদের...........ভাগ্যলাভ হল'।[৭] কিন্তু এছাড়াও এর পেছনে আরো কিছু কারণ ছিলো, 'মধ্যযুগের শেষ পাদে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় অবস্থা কার্ল মার্কস বর্ণিত একটি বাক্যে বলা যায় '**When all were struggling against all**......'তখন শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রায় অনুপস্থিত: মধ্যযুগের শেষ অংকে আকাশ ঘন তমসাবৃত। এই অন্ধকার আকাশে সিংহাসন-লিপ্সু ক্রূরচক্রী ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি, লোভী সামন্ত নেতা এবং লুণ্ঠন-প্রিয় বর্গীরা ও মানুষ পণ্যের ব্যবসায়ী ফিরিঙ্গি ও মগরা ফিরেছে প্রেতাত্মার মতো দেশের জনজীবনকে শিকার করতে।'[৮] সে পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আঠারো-উনিশ শতকের মুসলমান শাসনকালে বাঙালী হিন্দুরা ছিলেন, 'নৈরাজ্য ও নৈরাজ্য পীড়নের স্মৃতিপ্রসূত ক্ষোভ—জেদের শিকার।' এবং সেজন্য তাঁদের কাছে তুর্কী মুঘল হল ঘৃণ্য এবং ইংরেজ হল বন্দ্য। হিন্দুর ব্রিটিশ-প্রীতির মনস্তাত্ত্বিক কারণ এ-ই।[৯] অন্য একজন সমালোচক বলেন, তখন রাষ্ট্র ছিলো, 'প্রজা-সাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন, উপরন্তু স্বৈরাচারী। ফলে সাধারণ প্রজার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও দেশের মাটির প্রতি স্বাদেশিক মমত্ববোধ হ্রাস পাইয়াছিল, রাষ্ট্র কাহার করায়ত্ত হইল সে সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না......।[১০]

মুসলমান-প্রীতির জন্য যে রামমোহন রায় গোঁড়া হিন্দুদের নিকট বিশেষ ভাবে নিন্দনীয় ছিলেন,[১১] সে রামমোহনও এক সময় লিখেছিলেন,

www.pathagar.com

'The greater part of Hindustan having been for several centuries subject to Muhammadan Rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon, ... their property was of ten plundered. their religion insulted, and their blood wantonly shed. Divine providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants, and to receive the oppressed Natives of Bengal under its protection.'[১২] দ্বারকানাথ ঠাকুর লেখেন, 'The Mahamedans introduced in this Country all the vices of an ignorant, intolerant and licentions soldiery.'[১৩] প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তো প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করেছিলেন যে, যে কোন শাসনের পরিবর্তে (এমন কি হিন্দু শাসনেরও) তিনি ইংরেজ শাসনকেই কামনা করেন।[১৪] রামগোপাল ঘোষও 'desired nothing more sincerely than the perpetuity of the British sway in this country.[১৫] ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর Sir Francis Magnaghten সমীপে যে যৌথ আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন, তাতেও এরূপ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।[১৬] পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কথাটি এভাবে বলেছেন, 'মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল'[১৭] 'মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে'[১৮], 'সত্রুকে ? সত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা'[১৯] এবং 'মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল।'[২০]

প্রায় পুরো উনিশ শতকের অনেকগুলো পত্র-পত্রিকাতেও অনুরূপ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, 'এইরূপ মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙালী জনসাধারণ ও উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন।'[২১] মুসলমান শাসনামলের অনিয়ম-অশান্তির সঙ্গে তুলনা করে ইংরেজ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য সেদিন তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ প্রভাকর, সর্ব্বশুভকরী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি প্রত্রিকায় যে সমস্ত লেখা-লেখি হয়, তার সংখ্যাও অনেক।

মুসলমান শাসনের অপকর্ষ ও ইংরেজ শাসনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তৎকালীন হিন্দুদের অধিকাংশ মতামতে যে অসত্য ও অতিরঞ্জন রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[২২] তবে সে সময়ের হিন্দুগণ যে মুসলমান শাসনকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ইংরেজ শাসন যে তাঁদের নিকট কতোটা প্রিয় এবং কাম্য ছিলো

www.pathagar.com

তা আমরা তাঁদের সেসব মতামত থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই ইংরেজ শাসিত ভারতে তৎকালীন হিন্দুদের এই প্রিয় কামনার বিপরীত ফলই ফলেছিলো,[২৩] ইংরেজদের নিকট **'Every native of Hindustan'** হলেন **'Corrupt'**[২৪], হিন্দুরাও বুঝলেন—**'Mohammedans had been more liberal'**[২৫], এবং 'ভিন্নদেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপাজর্নার্থ এদেশে আসিয়া অত্যঅল্পকাল বাস করেন...দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্যদশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমাদের জমীর উপসত্ব নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন'।[২৬] ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ও আনুগত্যশীল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মুখেও শোনা গেলো 'ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বজ্র বর্ষণ'—**'They have taken all which the Natives possessed; their lives, liberty, property and all were held at the mercy of Government.**[২৭]

দুই

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা করেননি। আর 'রাজার জাত' শ্বেতকায় ইংলন্ডবাসীরা ভারতীয় 'নেটিভ'দের জন্য তা করতেই বা যাবেন কেনো? নেটিভরা তো শাসন আর শোষণেরই উপযুক্ত। আর্য হিন্দু ও সেমীয় মুসলমানরা ভারতকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করলেও ইংরেজদের পক্ষে তা কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, এদেশ আর যাই হোক, কোনোমতেই তাঁদের মাতৃভূমি নয়।[২৮] তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো ছলে-বলে-কলে কৌশলে এদেশের মাটি থেকে শুধু সম্পদ আহরণ।[২৯] পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাইভ আওয়াজ তোলেন—"সময় নষ্ট করা চলবে না, টাকা চাই—আরও টাকা।[৩০] ক্ষেত্রতো তৈরী হয়েই ছিলো—মীরজাফর তখন **'Titular Nawab, but had to empty his treasury to satisfy the English demands**।'[৩১] ঐতিহাসিকদের মোটামুটি হিসেব হতে জানা যায়, ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত এই তেইশ বছরে বাঙলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড (১৯০০ খৃীস্টাব্দের মূল্যমানে তিনশো কোটি টাকা)। মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চিখানা থেকে পাওয়া গেল পনের লক্ষ পাউণ্ডের টাকা,.........ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্রিটিশ স্থল-সেনা ও নৌ-সেনা পেলো চার লক্ষ পাউণ্ড;

www.pathagar.com

সিলেক্ট কমিটির ছয়জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউণ্ড, কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউণ্ড, আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউণ্ড, তাছাড়া ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের জমিদারী সহ বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি 'সাবাত জঙ'। অবশ্য পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এতো সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য'।'[৩২] ভারতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়ক ক্লাইভের এই লুণ্ঠনের প্রতি লক্ষ্য করে এ. ইউসুফ আলী যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'**The early British days in Bengal were marked with fabulous fortunes that men like Clive took away from India**.।'[৩৩] অবশ্য পরবর্তী জীবনে ক্লাইভ তাঁর এ জঘন্য লুণ্ঠনের কথা স্মরণ করে চরমতম মর্মান্তিক যাতনার সম্মুখীন না হয়ে পারেননি—যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শেষ পর্যন্ত তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন আত্মহত্যাকে।[৩৪]

ঐ সময়ে কাউন্সিলের সাহায্যের জন্য মীরকাশিমকে দিতে হয়েছিল দু'লক্ষ পাউণ্ড এবং মীরজাফরের পুত্র নজমদ্দৌলা দিয়েছিলেন একলক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাউণ্ড। ১৭৬৪ খৃীঃ থেকে ১৭৭৭ খৃীস্টাব্দের মধ্যে জরীপবিদ জেমস্ রেনেল আত্মসাৎ করেছিলেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড। লর্ড হেস্টিংস বেনারসের চৈৎ সিংহের নিকট থেকে প্রথমে পাঁচ লক্ষ ও পরে দু'লক্ষ টাকা আদায় করে আবার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাবী করে বসেন। কিন্তু চৈৎ সিংহ এ দাবী মিটাতে অক্ষম হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জমিদারী প্রদান করা হয়। এ সব ছাড়াও হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানা উপড়ে নিয়ে রাজা চতুর্থ জর্জকে উপহার দিয়েছিলেন।[৩৫] এছাড়া কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী, সৈনিক, কুঠিয়াল প্রভৃতি যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছিলেন, তার যথার্থ হিসেব প্রদান দুঃসাধ্য। এসব ব্যক্তি অঢেল বিত্তের অধিকারী হয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে ফিরে যেতেন দেশে এবং সেখানে পরিচিত হতেন 'ইণ্ডিয়ান নেবাব্স' রূপে।[৩৬] মেকলে বলেছেন, 'তখন ভারতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের বড় অদ্ভুত ধারণা ছিল। 'তখন কাজের লোকেরাও সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত,—ভারতে কেবলই বহুমূল্য প্রস্তরের প্রাসাদ, স্তূপাকার মণি মুক্তা, কক্ষপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা।...... যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে অর্থোপার্জন করিয়া দেশে ফিরিতেন, তাঁহাদিগকে 'নবাব' বলিত। ......ইহারা প্রায়ই দরিদ্র অনামা বিনামা বংশোদ্ভূত। অল্প বয়সে প্রাচ্যদেশে প্রেরিত হইয়া সেখানে ধনোপার্জন করিয়া দেশে ফিরিত।[৩৭] রমেশ দত্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '**They considered India as a vast estate or plantation the profits of which were to be withdrawn from India and deposited in Europe.**'[৩৮]

www.pathagar.com

শাসনভার প্রাপ্তির পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে শোষণ-পর্বের সূচনা করেন এবং দীর্ঘ একশো বছর ধরে তার যে শোচনীয় মহড়া চালাতে ব্যস্ত থাকেন, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, 'The British nation had spent millions of their own money in acquiring dominions in other parts of the world ; but in India an empire had been acquired, wars had been waged, and the administration had been carried on, at the cost of the Indian people, the British nation had not contributed a shilling.'[৩৯] উপরন্তু, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লুণ্ঠন, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন ও বিদেশী বণিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবাধ ও একচেটিয়া বাণিজ্য প্রহসন, রাজস্ব আদায়ের বহুবিধ প্রক্রিয়া ও ক্রূর চক্রান্ত এবং রাজ্যশাসনে অযোগ্য সিভিলিয়ান নিয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি ও অরাজকতার স্বরাজ কায়েম করে ইংরেজরা শুধু বাঙলা তথা ভারতের অর্থনীতিকেই পঙ্গু করলেন না, এদেশের লক্ষ কোটি মানুষকে ঠেলে দিলেন নিদারুণ মৃত্যুর করাল গ্রাসের সম্মুখে।

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ধ্বংস সাধনসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে অবর্ণনীয় লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ-পুষ্ট জমিদার ইজারাদাররা যেভাবে নিষ্পেষণের পর নিষ্পেষণ চালিয়ে জনজীবনের সচলতাকে পিষ্ট ও পঙ্গু করে তোলেন, তাতে বাঙলাদেশের অনেকাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, এবং পরিণামে একটি বিদ্রোহের রূপও লাভ করতে থাকে।[৪০] গণবিক্ষোভ এড়িয়ে, রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ শোষণের আয়োজনে তাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রবর্তন করা হয়।[৪১] পুরনো রাজস্ব ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে কর্নওয়ালিস চাইলেন দেশে 'order and stability'-র প্রতিষ্ঠা করতে।[৪২] কিন্তু তাঁর এই বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্যটির পেছনে বস্তুতঃপক্ষে কি ছিলো, এদেশের আর্থিক তথা সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন, না অন্য কিছু, তা তাঁর নিজস্ব বক্তব্যেই সুস্পষ্ট 'আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে তাহার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।'[৪৩] স্যার জন স্ট্র্যাচি বলেন, 'The condition of the people of Bengal has been profoundly affected by action taken more than a century ago by the British Government. In 1793 the so-called permanent settlement of the land revenue was introduced....... It was supposed, however, by Lord Cornwallis

www.pathagar.com

and the English rulers of the time, that it would be an excellent thing for Bengal to have a class of landlords something like those of England ; the *Zamindars* were the only people that seemed available for the purpose, and they were declared to be the proprietors of the land.'[৪৪] প্রকৃত জমির মালিক চাষীরা সর্বস্ব হারিয়ে তখন শুধু এই জমিদারদের মুখাপেক্ষীই হয়ে পড়লেন। প্রাচীন জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিলো অনেক। প্রাচীন জমিদাররা অত্যাচারী হলেও, তাঁদের জমিদারী ছিলো পুরুষানুক্রমিক, সেজন্য অনেকটা নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা চাষীদের প্রতি অন্তত: কিছুটা নজর দিতেন। কিন্তু নতুন জমিদারী হোল, যার যতক্ষণ অর্থ—তার ততক্ষণ শর্ত। এতে কৃষকের প্রতি নজর দেয়ার অবকাশ আর থাকলো না। ফলে নির্দিষ্ট কর দিয়েই আর কৃষকরা নিস্তার পেলেন না, বহুবিধ নতুন নতুন করের বোঝাও মরিয়া হয়ে তাঁদের বইতে হোল। এ সমস্ত বেআইনী কর প্রদান করতে গিয়ে কৃষক হলেন অত্যন্ত দরিদ্র ও নিঃস্ব। এর কোন প্রতিকার করার গরজই সেদিন সরকার বোধ করেননি, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারী সাহায্যেই জমিদাররা জনগণের ওপর চালিয়েছিলেন অত্যাচার—নির্যাতনের একটানা 'স্টিম রোলার'।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসার নামে যা চালিয়েছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিলো লুণ্ঠনেরই নামান্তর। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত সমস্ত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে সমগ্রদেশের শহর-বন্দর থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন এবং চাল-চিনি-লবণ-আফিম থেকে শুরু করে বাঁশ-বেত-শন প্রভৃতির ব্যবসা পর্যন্ত একচেটে করে ফেলেন। এতে দেশের ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং দেশের অর্থনীতি ও প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বাঙলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ায় তাঁতীরা হন নিঃস্ব[৪৫] এবং অপরদিকে 'নীলকরদের দৌরাত্ম্য ও দুর্বিনীত আচরণে' চাষীরা হন সর্বহারা।[৪৬] কোম্পানীর এ জঘন্যতম বিশেষ বাণিজ্যনীতির সমালোচনা সেদিনের এবং পরবর্তীকালের অনেক ইংরেজ লেখকের বক্তব্যেও সুস্পষ্ট। উইলিয়ম বোল্ট্স বলেন, 'There is in Bengal no freedom in trade...... All brances of the intererior India commerce are, without exception, entirely monopolies of the most cruel and ruinous nature, and so totally corrupted from every species of abuse, as to be in the last stage toward annihilation.[৪৭] জন ব্রাইট্ একচেটে ব্যবসার মাধ্যমে কোম্পানীর ভারতশাসনের তীব্র সমালোচনা করে হাউজ অব্ কমন্স-এ

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখেন, 'He sounded the warning that such policy would lead to dangerous agitation and that would then be greatfully accepted as a boon would in a few years be wreasted as a right[৪৮] স্ট্রাচিও একবার বলেছিলেন, 'India is a country of unbounded material resources, but her people are a poor people......This is the fact that her connection with England, and the financial results of the connection, compel her to send to Europe every year about £20,000,000 sterling worth of her products without receiving the return any direct commercial equivalent.[৪৯] ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টারে কোম্পানীর বাণিজ্য অধিকার হরণ করা হয়, বাঙলার গবর্নর জেনারেল রূপান্তরিত হন ভারতেরও গবর্নর জেনারেল।[৫০] এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটলো ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু......their policy remains. Their capital was paid of by loans which were made into an Indian Debt, on which interest is paid from Indian taxes. The empire was transferred from the Company to the Crown, but the people of India paid the purchase-money.[৫১]

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা করেননি। বলতে গেলে কোম্পানী-রাজত্বের অবসানের পরও এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার মতো কোন অবকাশ ইংরেজরা খুঁজে পাননি। হেস্টিংসের সময় হতেই বাঙলাদেশ ভারতের বৃটিশ-রাজশক্তির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হলেও, তখন থেকে পরবর্তী ত্রিশ বছর ইংরেজদেরকে শুধু বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং কোথাও বিদ্রোহ দমন ও সন্ধি স্থাপন প্রভৃতির ব্যাপারেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার অনুসারে বাঙলার গবর্নর জেনারেল একই সঙ্গে ভারতেরও গবর্নর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হওয়ায়, ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বলতে গেলে এক অরাজকতা ও নৈরাজ্যেরই সৃষ্টি হয়।[৫২] ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলাদেশের জন্য লেঃ গবর্নরের পদের সৃষ্টি হয়। এর আগে গবর্নর জেনারেল কাউন্সিলের 'উপযুক্ত' সদস্যদের থেকে ডেপুটি গবর্নর নিযুক্তির ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে বছরের পর বছর ধরে শুধু যোগ্য-অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ পর্বের মহড়াই সার হয়েছে—প্রশাসনে প্রকৃত উন্নতি-অগ্রগতির নামে কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

মোট কথা, কোম্পানীর শাসন আমলে. এবং তার পরবর্তী সময়েও বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজগণ একটি সুস্থ ও স্বস্থ রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হননি। ফলে এদেশের শিক্ষা-সম্প্রসারণের ব্যাপারটি হয়েছে সচেতনভাবে উপেক্ষিত--নব নব কৌশল-প্রক্রিয়ার ফাঁদে পড়ে ভারতবাসীরা হয়েছেন অসহায় ও নিঃস্ব। তাঁদের বহুকষ্টে উপার্জিত অর্থে দিনের পর দিন শুধু ভারি হয়েছে ইংরেজের শূন্য তহবিল—যার পরিণামে বাঙলার বুকে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর অপরদিকে ইংলণ্ডে দেখা দেয় গর্বোদীপ্ত শিল্প-বিপ্লব।

তিন

বণিক ইংরেজ এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পরও ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, যতোটুকু সম্ভব নিরাপদ পরিস্থিতি বজায় রেখে দিনের পর দিন এদেশে লুণ্ঠন-পর্ব চালিয়ে যাওয়া। আর সেই জন্যই তাঁরা এদেশের সামাজিক অথবা ধর্মীয় বিষয়ের হস্তক্ষেপ থেকে প্রথম প্রথম নিজেদেরকে অতি সাবধানে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁদের ভয় ছিলো, এ সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন।[৫৩] তাঁরা এদেশের শাসনব্যবস্থায় ইংলণ্ডীয় নীতি প্রবর্তনেও বিশেষভাবে অনিচ্ছুক ছিলেন।[৫৪] জনৈক সমালোচক যথার্থই লক্ষ্য করেছেন—'The Company's Goverment was not eager to introduce the English legal system. The fear that a handful of Englishmen in India were always in danger of being overwhelmed by the 'native' inhabitants, once their feelings were roused by any imprudent measure, was sufficient to discourage any interference in the social and religious life of the people.[৫৫] এদেশীয়দের শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপারটিও এই একই কারণে বার বার বিভিন্ন ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টারের সময় চার্লস গ্রাণ্ট ও স্যার উইলবার ফোর্স ভারতবর্ষে খ্রীস্টান পাদ্রীদের প্রবেশের অনুমতি এবং পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ভারতবাসীদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিলেতে আন্দোলন শুরু করেন।[৫৬] পার্লামেন্টে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিলো; কিন্তু ঠিক তখনই তাদের সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে হাউজ অব লর্ডের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে জে. সি. মার্সম্যান যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'For a considerable time after the British Government

www.pathagar.com

had been established in India, there was great opposition to any system of instruction for the Natives. The feelings of the public authorities in this country were first tested upon the subject in the year 1792, when Mr. Wilberforce proposed ......for sending out school masters to India : this encountered the greatest oppositon in the Court of Proprietors, and it was found necessary to withdraw the clauses......, On that occasion, one of the Directors stated that we had just lost America from our folly, in having allowed the establishment of Schools and Colleges, and that it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to india.[৫৭] ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মুখে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেজর জেনারেল স্যার লায়ওনেল স্মিথ বলেছিলেন, "ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্ম-কর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগবে, এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে।......নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে. তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বার করে দিতেও স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করবে না।"[৫৮] বহু পরে লর্ড কার্জনের সাক্ষ্যেও এরূপ একটি মনোভাবেরই পরিচয় মেলে—'একটি শক্তিশালী দলের মতামতে এ ধারণাটি আর প্রচ্ছন্ন নয় যে, ইংরেজী শিক্ষার এদেশে প্রচলন ভুল হয়েছিল এবং তার ফলাফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৯]

কিন্তু তা সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতেই ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষীণধারা এদেশে মন্থর গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর সূত্রপাত কিন্তু হয়েছিলো পলাশী যুদ্ধেরও বহু পূর্বে। তখনকার কোলকাতা ছিলো প্রধানতঃ ইংরেজ, ইউরোপীয়, পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান প্রভৃতির বাসস্থান। দেশীয়দের তুলনায় অর্থ-সম্পদে তাঁরা ছিলেন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য সে সময়ে অনেকগুলো ইংরেজী স্কুল এদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায়, বিশেষ করে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে খ্রীস্টান মিশনারীরা অবাধে তাঁদের ধর্মপ্রচারের কাজ চালাতে পারতেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিজেরা বাঙলা শিক্ষা করেন এবং বাঙালীদেরকেও ইংরেজী শেখাবার জন্য সচেষ্ট হন। বলা চলে, প্রধানতঃ তাঁদের প্রচেষ্টাতেই এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। কোলকাতাবাসী বাঙালী হিন্দুরা ইস্ট ইণ্ডিয়া

www.pathagar.com

কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিভিন্ন কাজে-কারণে ইংরেজের আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে থাকেন। তখন ইংরেজরাও এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ-বোধ করতেন। এর পেছনে কারণ ছিল, 'তখন......ভারত প্রবাসী ইংরাজদিগের পক্ষে কথায় কথায় 'হোমে' যাওয়াটা এমন সহজসাধ্য ছিল না। তাঁহাদিগকে একাদিক্রমে প্রবাসে অনেকদিন কাটাইতে হইত, ফলে ভারতবাসীদিগের সঙ্গে তাহাদের অনেকটা মেশামেশী—ঘনিষ্ঠতা হইত, তাহাদের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধাও তাঁহারা অনেকটা বুঝিতেন।'[৬০] রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'সেকালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন।.........তাহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন।'[৬১]

প্রধানতঃ বাঙালী হিন্দুর—ইংরেজী শিক্ষার গরজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় তখনকার দিনে এদেশে বিশেষ এক ধরনের ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এ সমস্ত স্কুলে প্রধানতঃ কেনা-বেচার ব্যাপারে ইংরেজদের কথাবার্তা চালাতে এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হিসেব-পত্র রাখতে ও চিঠিপত্র লিখতেই শিক্ষা দেয়া হোত। স্কুলগুলোর শিক্ষার মান ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অদ্ভুত ধরনের। সে সময়ে যিনি বেশী ইংরেজী শব্দ জানতেন, তিনিই একজন মহা পণ্ডিত বলে পরিগণিত হতেন। আনন্দীরাম দাস নামক এক ব্যক্তি ইংরেজী ভাষা কিছু কিছু জানতেন বলে, তাঁর কাছে নব্য ইংরেজী-শিক্ষার্থীদের লাইন লেগে থাকতো। এ সমস্ত ছাত্ররা প্রতিদিন বহু কষ্টে পাঁচ-ছ'টি মাত্র ইংরেজী শব্দ শিখতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। রামরাম মিশ্র ও তাঁর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্র ঐ সময়ে ইংরেজী ভাষার মস্ত বড় পণ্ডিত বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজী শেখাবার জন্য যে স্কুল খুলেছিলেন, তার ছাত্র বেতন প্রতি মাসে চার টাকা হতে ষোল টাকা পর্যন্ত ছিলো। তৎকালীন অনেক কাগজ-পত্রে এ ধরনের আরো অনেক স্কুলের নাম পাওয়া যায়, এগুলোর মধ্যে রামমোহন নাপিতের স্কুল, কৃষ্ণমোহন বসুর স্কুল, শেম বসুর স্কুল, ভুবন দত্তের স্কুল, শিবু দত্তের স্কুল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।[৬২]

১৭৯৩ খৃীস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট উইলিয়ম কেরী এদেশে আসেন। যে সমস্ত খৃীস্টান মিশনারী এদেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেরীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এদেশে আসার এক বছরের মধ্যেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

www.pathagar.com

করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এই সমুদয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আধুনিক প্রণালীতে শেখান হইত।' ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আর্চার নামক এক সাহেবও একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ঐ সময়ে Farrell, Drummond, Halifax, Lindstedt, Draper, Canning, Sherbourne, Aratoon Peters, Hutteman, Gaynard প্রভৃতি আরো বহু ইউরোপীয় আর্মেনিয়ান এক একটি করে স্কুল খুলে বসেন। এগুলোর মধ্যে স্কটল্যাণ্ড নিবাসী ডেভিড ড্রমণ্ডের ধর্মতলা একাডেমী ও শারবোর্ন সাহেবের স্কুল এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী বাঙালী সন্তান শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেও, প্রধানতঃ এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ভারতে অবস্থানরত ইউরোপীয় এবং দেশীয় খৃষ্টানদের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই। তাছাড়া ছাত্র বেতন দ্বারা অর্থোপার্জন করাও অনেক প্রতিষ্ঠাতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁরাই শিক্ষা লাভ করতে আসতেন, যাঁরা কিছু ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করে এবং সামান্য যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি শিখে নতুন সওদাগরী অফিসে চাকুরী নিতেন বা ইংরেজ বেনিয়ানদের দালাল মুৎসুদ্দি হিসাবে কাজ করতেন। এ ধরনের স্কুলগুলোতে সেকালে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এবং তা প্রয়োগ-পরীক্ষার ক্ষেত্র যেরূপ সীমিত ও হাস্যকর ছিলো, তা বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু। 'সর্বপ্রথমে লোকেরা ইংরাজী পড়িতে হইলে, টাইমস্ ডিস প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুল মাষ্টার, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুল মাষ্টার" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডার। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ নাই।'[৬৬] 'তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্য শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুল মাষ্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন......ঘোষাব, না স্পাইস......ঘোষাব?" ইহার অর্থ উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, "পম্‌কিন্......লাউ কুম্‌ড়ো," অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিত, "পম্‌কিন--লাউ কুম্‌ড়ো"---সর্দার পোড়ো বলিল, "কোকোম্বর .... শশা", 'আর সকলে অমনি বলিল, "কোকোম্বর—

শশা।" সর্দার পোড়ো বলিল, 'ব্রিঞ্জেল··· বার্তাকু', আর সকলে অমনি বলিল, 'ব্রিঞ্জেল বার্তাকু।" সর্দার পোড়ো বলিল, "প্লোম্যান··· চাসা, আর সকলে অমনি বলিল 'প্লোম্যান একটি চাসা।' এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।

পম্‌কিন লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা। ব্রিঞ্জেল্ বার্ত্তাকু, প্লোমেন্ চাষা।[৬৪] তবে এ কথা সত্যি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ কৌতূহল পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও, সংকীর্ণ অর্থে হলেও, ক্রমান্বয়ে ইংরেজী শিক্ষা অন্ততঃ একদল বাঙালীর মধ্যে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাচ্ছিল। তাঁদের অনেকেই শুধুমাত্র জীবিকার তাড়নায় ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের বিদ্যালয়-গুলোতে প্রদত্ত মুষ্টিমেয় ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান নিয়ে এবং 'ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লোমান চাষা। পমকিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বর—শশা প্রভৃতি শব্দার্থ কণ্ঠস্থ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে মূলতঃ ও প্রধানতঃ দেশীয় ভদ্রলোকদের প্রচেষ্টায়ই জন্ম নেয় হিন্দু কলেজ। এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে দু'টো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তার একটি হলো ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাদ্রাসা এবং অপরটি ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বারানসী সংস্কৃত কলেজ। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এ তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পেছনেই কাজ করেছিলো মূলতঃ ইংরেজ-সরকারের শাসন ও বিচারকার্যের সুবিধে করে দেয়ার উদ্দেশ্য।[৬৫] তা ছাড়া মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের খুশী করার প্রচেষ্টাও একই সঙ্গে কাজ করেছিলো।[৬৬] জনসাধারণের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষাবিস্তার এগুলোর কোনটিরই লক্ষ্য ছিল না।

বাঙালী তথা ভারতবাসীদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও এ ব্যাপারে খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও অন্যান্য কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তির যথেষ্ট উৎসাহ সমর্থন লক্ষ্য করা গেলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা বারবার নানা অজুহাতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি শুধু এড়িয়েই গেছেন।

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে কোলকাতাস্থ চারজন চ্যাপেলন, ব্রান শার্ড, ওয়েন, কার এবং ব্রাউন একযোগে একটি দীর্ঘ পত্র লর্ড কর্নওয়ালিসকে লিখে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেনো কোম্পানীর এলাকার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য স্কুল স্থাপন করেন। এরূপ করা হলে শাসক ও শাসিতের ব্যবধান দূর, এদেশের লোকদের ধর্ম

www.pathagar.com

ও নীতির উন্নতি এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে মামলা মোকদ্দমা চালাবার সুবিধে হবে। এতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের সম্ভাব্য সাহায্যের প্রত্যাশা এবং স্বল্প বেতনে মাস্টার রাখার পরামর্শও ছিলো। কিন্তু কোন কথাই গবর্নর জেনারেলের হৃদয় স্পর্শ করলো না। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে উইলবার ফোর্স যখন ভারতে খ্রীস্টান মিশনারী ও স্কুল-মাস্টার প্রেরণের প্রচেষ্টার চালান তখন বলা হয়েছিলো, **"the Hindus had as good a system of faith and of morals as most people and that it would be madness to attempt their conversion or to give them any more learning or any other description of learning than what they already possessed.**[৬৭] প্রাচীন চিন্তা-ধারণা ও সংস্কৃতির শিক্ষাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করার যে নীতি ইংরেজ সরকার সেদিন অবলম্বন করেছিলেন, তার জের শেষ হতে বহু সময় লেগেছিলো। সংস্কৃতজ্ঞ হেনরি টমাস কোলব্রুক বড়লাট লর্ড মিন্টোকে অনুরোধ করলেন—তিনি যেনো বিলেতের ডিরেক্টরদের কাছে এ বলে সুপারিশ করেন যে এদেশে স্থানে স্থানে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।[৬৮] প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষ সমর্থক বড়লাট লর্ড মিন্টো ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে এক সরকারী 'মিনিটে' প্রাচ্য বিদ্যার সংরক্ষণে ইংরেজ জাতির যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তার উল্লেখ করে বিশেষ মন্তব্য ব্যক্ত করেন।[৬৯]

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার এক্টে এদেশের শিক্ষাখাতে প্রতি বছর অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার একটি ধারা সংযোজিত হয়। এ ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, বরাদ্দকৃত উক্ত এক লক্ষ টাকা সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি ও দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দানের জন্য এবং বৃটিশ ভারতের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হবে। বলা চলে ১৮১৩-এর ৫৩ ধারায় ভারত সরকারের শিক্ষানীতিতে ভারতবাসীদের প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত করার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৮১৪ এর ৩রা জুনের ডেসপ্যাচে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস যে নির্দেশ প্রদান করেন তাতেও প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার ওপরই জোর দেয়া হয়। বলা হয়, ভারতবাসীরা শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত নয়'[৭০] এমনকি রাজনৈতিক কারণে তাদের মধ্যে প্রচলিত জীবন-বিমুখ ও গতানুগতিক প্রথাগুলোর উচ্ছেদ সাধনে হস্তক্ষেপ করাও ঠিক হবে না।[৭১]এ ডেচপ্যাচে আরো বলা হয়, ভারতীয়দের জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দেবার জন্য সম্মান সূচক উপাধি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া উপযুক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করে, ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদেরকে সংস্কৃতাদি শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষাদাতা পণ্ডিতগণকে

www.pathagar.com

রাজস্ব হতে যথাযোগ্য আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এ ডেস্‌প্যাচে জনশিক্ষার কোনো অভাসই দেয়া হয়নি।[১২]

১৮১৩-এর চার্টার এক্টকে অনেকে এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করেন। বস্তুতঃপক্ষে বহু বছর উল্লেখিত এক্টের বরাদ্দকৃত টাকার কোনো সদ্ব্যবহার হয়নি। ১৮২১ খৃীস্টাব্দে ভারত সরকার জনসাধারণের শিক্ষাগত প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাঙলা প্রেসিডেন্সি অঞ্চলসমূহের জন্য একটি কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এবং সেজন্যই কারো মতে, ১৮১৩-১৮২১ খৃীস্টাব্দের এ সময়টি হচ্ছে ভারত সরকারের শিক্ষা নীতির "period of omission" এবং 'The real beginning of the Government's educational policy should, therefore, be dated not from 1813 but from 1821 when preparations were made for appointing a General Committee of Public Instruction for formulating, and carrying out, a policy for the education of the natives.'[১৩] ১৮২৩ খৃীস্টাব্দে কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠিত হয়েছিলো। এ কমিটির দায়িত্ব ছিলো, বাঙলা প্রেসিডেন্সির অঞ্চলসমূহে শিক্ষার এবং বিভিন্ন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিরূপ, সে সম্পর্কে সুষ্ঠু পরিমাপ করা, জনসাধারণের জন্য যাতে উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় ও তাদের মধ্যে হিতকর জ্ঞানের প্রসার ঘটানো যায় এবং যাতে সকলের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধন করা যায় সে সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ ধরনের মঙ্গলকর কার্যাবলী সম্পন্ন করা যাবে তদুদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সরকারের নিকট সুপারিশ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বহু বছর ১৮১৩-এর চার্টার এক্টে বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার কোনো সদ্ব্যবহার হয়নি। শেষ পর্যন্ত কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নের জন্যই উক্ত একলক্ষ টাকা ব্যয় করার মনস্থ করেন। এবং ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনকালে এই টাকা ব্যয়িত হোল। মোট কথা, এ সময় পর্যন্ত ভারত সরকার এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে তেমন কিছুই করতে সক্ষম হননি। এ যুগে প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারাই দেশীয় লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা চলতে থাকে। বেসরকারীভাবে কোলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে খৃীস্টান মিশনারীদের নানারূপ প্রচেষ্টার কথাটিও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

চার

কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথাটি ১৮২১ সালেই (লর্ড আমহার্স্টের আমল) উঠেছিলো। তখন রাজা রামমোহন রায় তীব্রভাবে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন।[৭৪] রামমোহনের বাস্তব বোধ ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সে সময়ে একমাত্র পাশ্চাত্যশিক্ষা ছাড়া বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনে মুক্তি আসতে পারে না। আর সেজনাই তিনি নিজে একজন প্রখ্যাত সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি হয়েও লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত এক প্রতিবাদ লিপির মাধ্যমে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা না করে থাকতে পারেননি।

কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ও আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহন রায়ের পত্র নিয়ে তখন বাঙলাদেশে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এ আন্দোলনের একপক্ষে ছিলেন সংস্কৃত-আরবী-ফারসীর অনুরাগী দল, অন্য পক্ষে ছিলেন ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য-জ্ঞান-বিস্তারে সমর্থক ব্যক্তিরা। সরকার কিন্তু প্রাচীন চিন্তা, ধারণা ও সংস্কৃতির শিক্ষাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ 'তাঁহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রণ-কার্যে অগ্রসর হইলেন। এই সকল কার্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবী 'আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে, সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থসকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০৲ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থসকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল। এই সকল কারণে অল্প কালের মধ্যেই কমিটীর সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, তাঁহারা দুই দল হইয়া পড়িলেন।'[৭৫]

এ সময়ে বিলাতে বেন্হামের শিষ্য জেম্‌স মিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পরামর্শে কোর্ট অব ডিরেকটরস ১৮২৪ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক নির্দেশপত্র প্রেরণ করেন। উক্ত নির্দেশপত্রে হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সমর্থন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন এতোদিন পর্যন্ত সরকারের অনুসৃত নীতি সম্পূর্ণ-ভাবে পরিত্যাগ করলেন না। ক্রমে ক্রমে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। একদল পুরোনো প্রথায় সংস্কৃত-আরবী-ফারসী শিক্ষার পক্ষপাতী, অন্যদল পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের সমর্থক। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক বড়লাট হয়ে ভারতে আসেন। তিনি বেন্থামও মিলের একজন ভক্ত ছিলেন। ১৮২৯ সনের ১৯শে নবেম্বর বেন্হাম তাকে একটি পত্র লিখে উৎসাহ প্রদান করেন।[৭৬] এ সময়ে উইলিয়ম অ্যাডাম ও বেন্টিঙ্কের নিকট শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে নিজ মতামত সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন।[৭৭]

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট এক আইন করে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে শিক্ষাখাতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত টাকা কিভাবে খরচ করা হবে তা নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্যবিদ্যা এবং বাকী পাঁচজন পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষা দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এ মতভেদ **Anglicist-Orientalist Controversy** নামে খ্যাত।

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য হিসেবে মেকলে ভারতবর্ষে আসেন এবং বেন্টিঙ্কের অনুরোধে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাক-শনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি যে নীতির সমর্থক ছিলেন, ইতিহাসে তা **Filtration theory** নামে খ্যাত। এ নীতির মূল লক্ষ্য ছিলো, সমাজের সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা নয়, তা' শুধু একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য। তাঁর মতে শিক্ষা 'ওপর থেকে নীচের দিকে চুঁইয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে তা চারদিকে বিস্তার লাভ করবে'। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী মেকলে এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মিনিটে সরকারের অর্থে প্রাচ্য-বিদ্যা শিক্ষার বিরোধিতা করে একমাত্র পাশ্চাত্য-বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, 'যে কোন ভালো ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের এক থাক বই সমগ্র ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমতুল্য।'[৭৮]

বেন্টিঙ্ক ব্যক্তিগতভাবে এদেশে শিক্ষাপ্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে একসময়ে তাঁকে সে পথেই অগ্রসর হতে হয়েছিলো। কোর্ট অব ডিরেকটরস কর্তৃক এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অনুমোদন, বেন্হামের অনুপ্রেরণা এবং ভারতস্থ দেশী-বিদেশী পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের প্রচেষ্টা, বেন্টিঙ্ককে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা

২—

www.pathagar.com

প্রবর্তনে আগ্রহী করে তোলে। সেসময়ে বলা চলে, 'Bentinck was only waiting for the ripe moment'।[৭৯] ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে এঙলিসিস্ট ও ওরিয়েন্টালিস্ট দল নিজ নিজ যুক্তি দিয়ে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। মেকলে এঙলিসিস্টদের পক্ষে তাঁর মত দিয়ে মন্তব্য লিখে পাঠালেন এবং ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ বেন্টিংক তাঁর অভিমতকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাখাতের সমস্ত সরকারী অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দশ হাজার হিন্দু ও আট হাজার মুসলমান পৃথক পৃথক দরখাস্ত পেশ করেছিলেন এবং এইচ. টি. প্রিন্সেপ, লেঃ কর্নেল মরিসন প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থকরা শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁদের বিতর্ককে আরো কিছুকাল জিয়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এতে ফল হয়নি কিছুই। এর আগে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর যাতে সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারিত হতে পারে, সেজন্য রিপোর্ট পেশ করার জন্য উইলিয়াম অ্যাডামকে কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছিলো। অ্যাডাম ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১লা জুলাই এবং ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে যথাক্রমে দু খণ্ডে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারের নিকট পেশ করেন। রিপোর্টের তৃতীয় খণ্ডটি পেশ করা হয়েছিলো ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে। অ্যাডামের রিপোর্টের মূল বিষয় ছিলো, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে এদেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাসৌধ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু অ্যাডামের রিপোর্টের অপেক্ষা না করেই সরকার শিক্ষাখাতে সমস্ত সরকারী অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে অ্যাডামের বহু পরিশ্রমের রিপোর্ট এবং পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও বহুল ব্যয়সাপেক্ষ আখ্যা দিয়ে বাতিল করা হোল। অ্যাডাম অত্যন্ত দুঃখে ও বিরক্তিতে পদত্যাগ করলেন।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে।[৮০] কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে: '...... **the decision merely meant that English, and not Sanskrit or Arabic should be the medium higher education. ...... the Orientalists never fought for making vernaculars the medium of instruction. It was not a practical proposition in those days where, as in Bengal, vernaculars were not sufficiently developed to be used as the vehicle of instruction in higher brances of literature and sciences.**[৮১] মোটকথা, যেজন্য এবং যে উদ্দেশ্যেই মেকলের শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হোক না কেনো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা আমাদেরই কাজে এসেছিল—একথা উপেক্ষা করার অবকাশ কম।[৮২]

www.pathagar.com

পাঁচ

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার শুরু হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন আইন বলে ইংরেজী রাজভাষা ও ফারসীর বদলে সরকারী ভাষা নির্দিষ্ট হয়। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে সর্বপ্রকার সরকারী কর্মে ফারসীকে দূরীভূত করে ইংরেজীর প্রচলন করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে, সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে একমাত্র তাঁদেরকেই প্রাধান্য দেয়া হবে, যাঁরা সরকার প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করবেন। ফলে দেশময় ইংরেজী স্কুল তৈরী ও ইংরেজী শিক্ষার একটা হিড়িক পড়ে যায় এবং **'English became a passport to services and that was its chief if not the only attraction.**[৮৩]

নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতি জেলায় সরকারী স্কুল (যা জেলা-স্কুল নামে পরিচিত) গড়ে ওঠে। এ সমস্ত স্কুলে প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষা প্রদান করা হোত এবং অন্যান্য বিষয়গুলোও ইংরেজীতে পড়ানো হোত। সরকার ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রী?টাব্দ পর্যন্ত এ জিলা-স্কুলগুলোর জন্যই শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত সমস্ত টাকা ব্যয় করেন।

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ব্রিটিশ শাসনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে—এ সন্দেহ তখনো ঘুচেনি। তাই ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুমোদনের সময়ও বিলেতের পার্লামেন্টারী কমিটি মার্সম্যান, ট্রেভেলিয়ান ডাফ প্রমুখ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে সন্দেহমুক্ত হতে চাইলেন। বিলেতের কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারলেন, ভারতের শিক্ষাবিস্তারে ব্রিটিশ শাসনের কোনো প্রকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং এ শিক্ষা তাঁদের শাসনকে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলারই সহায়ক হবে, তখন তাঁরা ভারতবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষভাবে আগ্রহী হলেন। এ সময়ে লর্ড ডালহৌসীও স্বয়ং এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি চাইলেন, **'to establish a complete class of vernacular schools, to extend throughout the whole of India, with a view to convey instruction to the masses of the people.**[৮৪] এর ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা পেলাম, বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের (১৯শে জুলাই) বিখ্যাত শিক্ষা সম্বন্ধীয় ডেস্‌প্যাচটি।

উডের ডেস্‌প্যাচকে **'Magna Carta of English Education in India'** বলা হয়। এ ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার তার শিক্ষানীতি পুনর্গঠনে তৎপর হন। পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে মঙ্গলকর যা কিছু ঘটে,

www.pathagar.com

তার মূলে ছিলো উডের এ ডেস্‌প্যাচ। বস্তুতঃপক্ষে উডের ডেস্‌প্যাচই এদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করেছিলো, একথা বলে অত্যুক্তি হয় না।

উডের ডেসপ্যাচে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুতর সংস্কারনীতি সূচিত হয়। এতে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার নীতির পূর্ণ সমর্থন করা হয়, তেমনি উচ্চ শিক্ষার বিস্তার প্রশমিত করে জনশিক্ষার প্রসার এবং দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতিকে মেনে নেওয়া হয়। এতে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ছাত্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদানের প্রতিও জোর দেওয়া হয়। জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়তার মানসে এতে নারী শিক্ষার প্রতিও জোর দেওয়া হয়। উডের ডেসপ্যাচেই একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাবিভাগ গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। উডের ডেসপ্যাচের পূর্বে বেসরকারী শিক্ষাখাতে সাহায্য প্রদানের কোনরূপ নীতি ছিল না। ডেসপ্যাচের নির্দেশের ফলে এক্ষেত্রেও সাহায্যদান-নীতির প্রবর্তন করা হয়।

উড-ডেসপ্যাচের নীতির ফলে এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা-বিভাগ গঠিত হয় এবং ডিরেকটর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন নিযুক্ত করা হয়। এ নীতির ফলেই ১৮৫৭ সালে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উড-ডেসপ্যাচে এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু একে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করার কোন প্রচেষ্টা সেদিন ভারত সরকার করতে সক্ষম হননি। 'There cannot be any doubt that it did layout a plan for a comprehensive system of education for this country. But unfortunately for us,......the plan was not given effect to in its entirely,[৮৫] এর পেছনে প্রধানতঃ যে কারণটি উল্লেখযোগ্য, তা'হচ্ছে 'অর্থনৈতিক সমস্যা'। উক্ত-ডেসপ্যাচে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা-খাতে সাহায্যদান-নীতি প্রবর্তনের কথা উল্লেখ থাকলেও তা' ছিলো অনেকটা নেতিবাচক। 'As a Government, we can do no more than direct the efforts of the people, and did them wherever they appear to require most assistance. The result depends more upon them than upon us; and although we are fully aware that the measures we have now adopted will involve in the end a much larger expenditure upon education from the revenues of India, or, in other words, from the taxation of the people of India, than is at present so applied, we are convinced,......will be amply repaid by

www.pathagar.com

the improvement af the Country......[৮৬] ফলে, উড-ডেসপ্যাচের নীতিসমূহ প্রবর্তনে প্রধানতঃ এর আর্থিক দায়-দায়িত্বের বোঝাটি চেপে থাকে এদেশের জনগণেরই ঘাড়ে। তা'ছাড়া ভারত সরকার সেদিন অন্য অছিলাও খুঁজে পেলেন। দেশীয় জমিদার শিক্ষিত বর্ণ হিন্দু ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সরকারী নীতির বিরুদ্ধতা করেন। তাঁরা বলেন, ভারতে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও ভাষার কোটি কোটি মানুষ বাস করেন, অতএব এরূপ ব্যাপক শিক্ষার প্রসারণ অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় এবং তা প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ বটে। তাঁদের মতে, এদেশে জনশিক্ষার প্রচলন হলে দৈহিক পরিশ্রমকারীর সংখ্যাও কমে যাবে। উচ্চ মধ্যবিত্তের লোকেরা এতোদিন শিক্ষা পেয়ে আসছে এবং এখনো একমাত্র তাঁদেরকে শিক্ষিত করে তুললেই যথেষ্ট হবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে জনশিক্ষা প্রসারের ওপর উড্র-ডেসপ্যাচ জোর দিয়েছিলো, বাঙলাদেশে সে জনশিক্ষার দুরবস্থা লক্ষ্য করেই রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ ১৮৮৬ খৃীস্টাব্দে একটি নোট তৈরী করে সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। ১৮৬৭ খৃীস্টাব্দে এ ব্যাপারে আরেকটি নোট তৈরী করে তিনি গবর্নর জেনারেল স্যার জন লরেন্সের নিকটও প্রেরণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষা প্রদানের জন্য লঙ সরকারকে শিখাখাতে আরো অধিক অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজন-বোধে জমিদারদের ওপর শিক্ষাকর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহের কথাও তিনি বলেন। কিন্তু মানিকতলার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনারারি সেক্রেটারী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি লঙ-এর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে সরকারকে পত্র লেখেন।[৮৭] কিশোরীচাঁদ মিত্র বললেন: **"The lower strata of the social fabric must be permeated through the higher strata. Educate the upper and middle classes, and the lower classes will be instructed and elevated.**[৮৮] ঐ সময়ে দিগম্বর মিত্র ও শিশিরকুমার ঘোষও জনশিক্ষা প্রসারের বিরোধিতা করেছিলেন। এর থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুতঃপক্ষে এদেশে জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে ভারত সরকার তখন পর্যন্তও কিছুই করতে সক্ষম হননি।

ছয়

১৮৫৭ খৃীস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ঘটে। ১৮৫৯ খৃীষ্টাব্দে স্টেট সেক্রেটারী (তখন বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতির পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে) স্টেনলি একটি শিক্ষা সমন্ধীয় ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। এতে তিনি উড-ডেসপ্যাচের একটি মাত্র ধারা ছাড়া অন্য

www.pathagar.com

সবগুলো ধারাই মেনে নিয়ে তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন এবং উড-ডেস্‌প্যাচের নীতি মোতাবেক ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের যে নীতি উড-ডেসপ্যাচে বর্ণিত ছিল, স্টেনলি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি চাইলেন, ...**primary education should be provided by the direct instrumentality of the state and it should, if necessary, be financed by levying a special rate on land.**[৮৯]

এতে কিন্তু মিশনারীরা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা এদেশের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানতঃ তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছিলো। বর্তমানে সরকার একদিকে আইন করে এসমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ করেছেন এবং অপরদিকে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য বন্ধ করে সেগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখারই পরিকল্পনা করছেন। মিশনারীরা আরো বললেন, উড-ডেসপ্যাচের নীতিকে লঙ্ঘন করে এদেশে শুধু উচ্চ শিক্ষারই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, জনশিক্ষার জন্য বর্তমান সরকার বস্তুতঃ-পক্ষে কিছুই করছেন না এবং এর আগেও করা হয়নি। আর সে জন্যই তাঁরা দাবী করেন, এ ব্যাপারে তদন্তের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ পরবর্তীকালে (১৮৮২ খ্রীঃ) ভারতের প্রথম শিক্ষাকমিশন গঠিত হয়। স্যার উইলিয়ম হান্টার হলেন এর সভাপতি।

শিক্ষাকমিশন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য দেশময় ঘুরে বেড়ান এবং বহু পরিশ্রমের পর ছ'শো পৃষ্ঠার ঊর্ধ্বের একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া, প্রায় সম-সংখ্যক পৃষ্ঠার প্রাদেশিক রিপোর্টও সে সময়ে তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু আকারের দিক থেকে বৃহৎ এ রিপোর্ট প্রণীত হলেও গুণগত দিক থেকে তা তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বস্তুতঃপক্ষে এ রিপোর্ট বিভিন্ন-ভাবে পূর্বের ডেস্‌প্যাচের নীতি সমূহেরই পুনরুল্লেখ করা হয়। তবে, এই কমিশন ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণসমূহ নিয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন। কমিশন মুসলিম শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক তদন্ত করে মুসলিম শিক্ষা শিরোনামায় ১৭টি সুপারিশ উপস্থাপিত করেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য কমিশন দেশের পুরোনো পাঠশালাগুলোর সংস্কারের কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে সরকারকে অধিকতর তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন। সরকার তার তৎপরতা দেখিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তা প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধ হতে ঝেড়ে ফেলে নব গঠিত বোর্ডগুলোর হাতে সে ভার অর্পণ করার মধ্য দিয়ে। ১৮৮৪

www.pathagar.com

খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডাফরিন সরকার এই নীতিকে সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এ সরকার ঘোষণা করলেন যে, এতোদিন পর্যন্ত ভারত সরকার এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং এ করে সরকার তাঁর দায়িত্বও সম্পন্ন করেছেন। এখন থেকে এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী উদ্যোগেই পরিচালিত হবে। অনাথনাথ বসু যথার্থই মন্তব্য করেছেন, **'Thus national education came to be recognised not as an obligation of the Government but as something which was to live and thrive on Government "doles".**[১০] ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন সরকারী ঘোষণার আকারে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন। এতে তিনি বিগত শিক্ষানীতির দোষসমূহের বিশদ পর্যালোচনা করেন। গোটা উনিশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থায় এদেশের কিরূপ উন্নতি সাধিত হয়েছিলো, তা কার্জনের নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই বুঝা যাবে : **'Four out of five villages are without a school Three boys out of four grow up without education and only one girl in forty attends any kind of school.**[১১]

সাত

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতবর্ষের গোটা উনিশ শতকের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ-মানসের একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবিই ফুটে রয়েছে। তবু ইংরেজী শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হয়েছিলো—অন্ততঃ নিজেদের গরজে হলেও ভারত সরকারকে সেদিন ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের কথা ভাবতে হয়েছিলো। আর সেদিনের এ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুরা। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলমান আমলে যেমন ফারসী শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না, তেমনি ইংরেজ আমলেও ইংরেজী না শিখলে নিজেদের ভাগ্য প্রসন্নের সম্ভাবনা কম। কিন্তু হিন্দুরা যখন ইংরেজ বিজয়কে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ জ্ঞান করে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, যখন তাঁরা সামাজিক সুখ-শান্তি ও রাজনৈতিক সুবিধে লাভের উৎস হিসেবে ইংরেজ শাসনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে ইংরাজী শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন, 'তখন সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানরা ইংরেজদিগকে ধিক্কার দিচ্ছিল বিধাতার চরম অভিশাপ হিসেবে, তাদের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের হেতু হিসেবে, আর এ জীবননাশা গুরুভার বোঝার চাপে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল, এবং আর কোন দিগন্তে নিরাপত্তার সূর্যের সন্ধান করছিল।'[১২] লর্ড হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে

www.pathagar.com

কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন প্রধানতঃ মুসলমান কাযী ও মুফ্‌তি পদসমূহের কর্মচারী সরবরাহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কয়েক বছর পর কর্ণওয়ালিস কর্তৃক এ সমস্ত পদের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের মধ্যেই সর্বপ্রকার সরকারী কর্মে ফারসীকে দূরীভূত করে ইংরেজীর প্রচলন করা হয় এবং সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে একমাত্র ইংরেজী শিক্ষিতদেরকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়। এতোদিন যে মুসলমানরা 'খ্রীস্টানী শিক্ষা' বলে ইংরেজী শিক্ষা হ'তে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং যাঁরা মনে করতেন, ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ হলো তাঁদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থার নিকট প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণ, অথচ সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক গুণগত গরিমার জন্য একদা তাঁদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলো, সে মুসলমানরাই এখন দেখতে পেলেন কি করে চোখের সম্মুখ দিয়ে সরকারী চাকরীর সব দরজাই তাঁদের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের চাকরী প্রাপ্তির আশা বিলুপ্ত হলেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলো না। তাঁরা মুসলমানদের হেদায়েত করে অন্ন সংস্থানের জন্য পল্লী-অঞ্চলের ভীড় জমাতে লাগলেন। অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে তাঁদের প্রভাব ছিলো অপ্রতিহত। শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও স্বাধীনচেতারূপে সাধারণ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ছিলো অপরিসীম। এই আলেম সম্প্রদায় দেশকে দারুল হরব্‌ বলে ঘোষণা করলেন এবং ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করে দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই মোল্লাদের সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে এসেও ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে বলতে হয়েছে ঃ

'বাহবা ! বাহবা ! ধন্য ! বঙ্গের মৌলবী
''নায়েব রসুল'' বলে তোমাদের দাবী।......

কোন ভাষায় নাহি মাত্র অধিকার
অথচ শিক্ষিত বলে পুরা অহংকার ?
নাহি জানে ইতিহাস না পড়ে ভূগোল
বাঙ্গালা শিক্ষিতে বল্লে মহা গণ্ডগোল।......

খবরের কাগজ পড়া হারাম হইল
কেননা আংরেজ লোগে এসব করিল।
মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা মস্ত অপরাধ
এলেম শিখিলে পরে ঘটিবে প্রমাদ।......

গোল, গতিশীল পৃথিবী বলয়ে যাহারা

www.pathagar.com

'ঈমান' তাদের নাই 'কাফের' তাহারা।[৯৩] ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশের মুসলমানদের পিছিয়ে রাখার ব্যাপারে এই মোল্লাদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জনৈক সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'The Muslim community which fromed the bulk of the population were misled by the 'Mullas' who asked them to boycott English, calling it the language of the infidels. These professional 'Mullas'....only helped to keep back the vast Muslim community from modern civilization for about half a century.[৯৪] মোল্লাভক্ত অশিক্ষিত মুসলমান সমাজ সেদিন ইংরেজী শিক্ষাকে পাপ বলেই জানলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মীর মোশাররফ হোসেনের আত্মীয়স্বজনের কিরূপ ধারণা ছিলো, তা নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাবে: 'ইংরাজী পড়িলে পাপত আছেই। আর মরিবার সময় গিডি-মিডি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লা রসুলের নাম মুখে আসিবে না।...ইংরাজী পড়িলে একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রসাব করে, সরাব খায়। ...হালাল হারামে প্রভেদ নাই। ...মাথায় চুল খাট করিয়া নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করেনা। আদব তমিজের ধার ধারেনা।'[৯৫] ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করেই সেদিনের বাঙালী মুসলমানরা নিশ্চিত থাকতে চাইলেন। খন্দকার ফজলে রাব্বি যথার্থই বললেন, 'একদিকে মুসলমানগণ অংশত অদূরদর্শিতা এবং অংশত ধর্মীয় সংস্কারের জন্য ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলো ও তাদের জাতীয় সাহিত্য অথবা আরবী ও ফার্সী শিক্ষার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলো। তাদের এই পশ্চাৎপরতার ফল হলো এই যে, ইংরেজী শিক্ষা থেকে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হলো।'[৯৬] এদেশের তথাকথিত আশরাফ মসুলমানরা বাঙলা ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন: 'The Bengali books are full of references to Hindu mythology and as such here can hardly be anything in it of interest to the Mussalman.'[৯৭] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও লেখা হোল: 'বাঙলা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা। সুতরাং হিন্দুগণই যে বঙ্গসাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ও প্রধান হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।'[৯৮] সেদিনের এই গোড়া মুসলমানরা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও বললেন: 'উর্দ্দু, ফারসী ভাষা আরবী অক্ষরে লেখা বলিয়াই মুসলমান সমাজে এত আদর পায়। এমনকি অনেক বাঙালী মুসলমান তাহাদিগকে মাতৃভাষা বলিতে চাহেন।... আমাদের মাতৃভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি অতি বেশী হইবে।'[৯৯] এর থেকেই বুঝতে পারা যায়,

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানরা নিজেদের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে ভাষা সমস্যায়ও পীড়িত হয়েছেন দীর্ঘকাল ধরে।

হেস্টিংস-এর সময় থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা বিভিন্নভাবে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করেন। পরিশেষে এ বিরোধ সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপ নেয়। বেরিলি শহরনিবাসী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর (১৭৮৭-১৮৩১ খ্রীঃ) নেতৃত্বে একটি 'জেহাদী' সংগঠন প্রথমে ধর্মসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং পরে তা ইংরেজ-শাসন বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে। আরবের আবদুল ওয়াহাব (১৭০৪-১৭৮৭ খ্রীঃ) নামক এক ব্যক্তি যে অতিনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তা 'ওয়াহাবী' আন্দোলন নামে পরিচিত। এই ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের কিছুটা সামঞ্জস্য থাকায়, ভারতবর্ষে তাও ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১০০]

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাটনার এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী জেহাদী সংগঠনের নেতৃত্বে প্রদান করেন। তাঁরা বাঙলাদেশ ও দক্ষিণ ভারত সফর করে রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ করেন। সিলেট ও রংপুর থেকে শুরু করে প্রায় সারা বাঙলাদেশের ধর্মভীরু মুসলমানেরা 'জেহাদী শিবিরের' জন্য সৈন্য ও রসদ যুগিয়েছেন। এবং 'মালদহ, পাটনা, আম্বালার বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সরহিন্দি মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। একই লক্ষ্যের অনুসারী।'[১০১]

বাঙলাদেশে অনুরূপ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর, শরীয়ত উল্লাহ ও দুদুমিয়া। প্রথমে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো ধর্মসংস্কার করা, কিন্তু ঘটনা-চক্রে সেগুলোও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্য তিতুমীর দেশে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ও মুসলিম শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে-ছিলেন হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া। ইংরেজ শাসিত ভারত-বর্ষকে দারুল হরব বলে ঘোষণা করে তাঁরা বলেন যে, এখানে ঈদ বা জুম্মার নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেখা দিলো বিখ্যাত 'সিপাহী বিদ্রোহ'। ইংরেজ সরকার এ বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব চাপালেন মুসলমানদের ঘাড়েই। তাঁরা মনে করলেন, সমগ্র বিদ্রোহটিই ছিল আসলে মুসলমানদের ক্ষমতা দখলে শেষ চেষ্টা মাত্র।

বাঙলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের গণ-বিক্ষোভ এবং সশস্ত্র আন্দোলন থেকে সেদিনের ইংরেজ শাসকদের এ ধারণাই হয়েছিলো যে, মুসলমানরা চাচ্ছেন ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে তাঁদের নিজেদের শাসন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মুসলমানদের ধর্মান্দোলন আসলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনেরই পর্যায় মাত্র। আর সেজন্যই ইংরেজের কোপদৃষ্টিতে পড়া ছাড়া সেদিনের মুসলমাদের গত্যন্তল থাকলো না।

উনিশ শতকের বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার অন্য একটি কারণ হোল তৎকালীন হিন্দু সমাজের অসহযোগিতা। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে এদেশের জমিদার, নতুন ধনী ও মধ্যবিত্তরাই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বলা চলে, এ সম্প্রদায়টি এককভাবেই ছিলেন হিন্দু। তাঁদের প্রচেষ্টায়ই স্থাপিত হয় সেদিনের বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষার নাভীকেন্দ্র হিন্দু কলেজ—'but the Hindu College was open to the Hindus alone.'[১০২] এমনকি বহু পরে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হলেও মুসলমান ছাত্রদের দুর্দশা ঘোচেনি।[১০৩] তখনো হিন্দু ছাত্ররা মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে আপত্তি করে কলেজের প্রিন্সিপাল টনি সাহেবকে লিখেছিলেন : 'মহাশয় ! আমরা মুসলমান ছাত্রদের নিকট বসিতে পারিব না, কারণ তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।' বিষয়টির মীমাংসা করেন অধ্যাপক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মুসলমান ছাত্রদের বাম পাশের বেঞ্চে বসার ব্যবস্থা করে (প্রবাসী : ১৩৩২ কার্তিক, পৃঃ ৪৮)।[108] শ্রী শীতাংসু মৈত্র লিখেছেন : '১৮১৭ সালে যে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় মহাসমারোহে স্থাপিত হইল তাহার নাম দেওয়া হইল হিন্দু কলেজ। কেন, মুসলমানেরা কি এদেশের বাসিন্দা ছিলেন না ?...ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমানেরা ইংরাজদের বেশ কিছুটা কোপদৃষ্টিতেই পড়িয়াছে। হিন্দুরা তাই এখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলমানদের প্রতি যুগ যুগ সঞ্চিত অবজ্ঞা আর ঘৃণা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। তাই হিন্দু কলেজের নাম হইল হিন্দু কলেজ।[১০৫] উনিশ শতকের শুরুতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় সত্য, কিন্তু সেদিনের সে মুসলমানরা হিন্দুরা কলেজ তাঁদের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত করতে পারেন নি, অথবা হিন্দু কলেজের অনুরূপ একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁরা সে সময়ে ভাবতে পারেননি। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তখন যে প্রতিষ্ঠানটি ছিলো, তা' হচ্ছে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোলকাতা মাদ্রাসা। প্রথমে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের দিকে ইংরেজী পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তখন দেখা গেলো ইংরেজী পড়ার ব্যয়-সংকুলানের ক্ষমতা মুসলমান ছাত্রদের নেই। উপরন্তু, মাদ্রাসার ব্যাপারে অতিরিক্ত ব্যয় করার ইচ্ছেও সরকারের ছিলো না। মাদ্রাসার কোন উন্নতির কথা উঠলেই সরকার সেটাকে টাকার প্রশ্ন তুলে চাপা দিতেন। ফলে

www.pathagar.com

মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে শোচনীয় দুরবস্থা বিরাজ করতে থাকে। মাদ্রাসার খাতায় নামে মাত্র তালিকাভুক্ত হয়ে ছাত্ররা বৃত্তি-ভোগ করতেন এবং 'আরবীর জনৈক অধ্যাপক এবং ইংরাজী গ্রন্থাগারিক কলিকাতা শহরে হেকিমি ব্যবসা করতেন. কদাচিৎ তাঁদেরকে মাদ্রাসায় উপস্থিত হতে দেখা যেত।[১০৬] এরূপ ব্যবস্থাপনায় ১৮২৬ খৃীঃ থেকে ১৮৫১ খৃীঃ পর্যন্ত কোলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগ মাত্র দু'জন (একজন আবদুল লতিফ অন্যজন ওয়াহিদুন্নবী) জুনিয়র স্কলার তৈরী করতে সক্ষম হন।[১০৭] এখানে অবশ্য একথাও অস্বীকার করার যো নেই যে, বহুদিন ধরে ইংরেজী শিক্ষা হতে বঞ্চিত থাকার ফলে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পরবর্তীকালের একটি বিস্তৃত ও অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পাঠ্যসূচীর আওতায় লেখাপড়া করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিলো। ১৮৩৬ খৃীস্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, '**and within 3 days counted 1200 pupils in the English and 300 in the Oriental Department the proportion of Mohomedans to Hindus being 31 to 948 in the former and 138 to 81 in the latter.**'[১০৮] ১৮৫০ খৃীস্টাব্দে কলেজ বিভাগের ৪০৯ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান এবং স্কুল বিভাগের ২৩০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭ জন মুসলমান ছিলো। কোলকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো-ফার্সিয়ান বিভাগকে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করা হলে ১৮৬৭-৭৮ খৃীস্টাব্দে মাত্র ৬ জন মুসলমান **Under graduate** ছাত্রকে ভর্তি হতে দেখা যায়. তাঁরা আবার সেশন শেষ হবার আগেই কলেজ ছেড়ে চলে যান।[১০৯]

হিন্দু কলেজ জাতিবর্ণ নির্বিশেষের জন্য উন্মুক্ত হলে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা অন্য যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন তার নাম হিন্দু মেট্রোপলিটন (১৮৫৩ খৃীঃ) কলেজ। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু ফ্রি স্কুল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টায় জন্ম নেয় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। তখনকার উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিলো-- হিন্দু প্যাট্রিয়ট, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, হিন্দু পাইওনিয়ায় প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের আর্থিক আন্তরিক সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় হিন্দু মেলা। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন. 'সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃীস্টান প্রভৃতির এদেশের উপর দাবী আছে—ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই।'[১১০] যুগের পর যুগ ধরে বাঙালী মুসলমানেরা হিন্দুদের এই বৈরী মনোভাব, ও এ সঙ্গে তাঁদের উন্নতি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত-বঞ্চিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের বড়ো দুর্ভাগ্য যে, গোটা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত

তাঁরা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব, হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান, ইয়ংবেঙ্গলের মতো উদ্দীপনা খুঁজে পাননি একটিও। ডঃ আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন, 'বাঙালী হিন্দুর উন্নতি শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মনেও ঈর্ষা জাগিয়েছিল, কিন্তু তা নির্জিতের মনে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা যোগায়নি।'[১১১]

আট

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে উনিশ শতকের বাঙলায় এক শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্ম হয়। এ শ্রেণীটি ছিলো সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল। তবু ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় বাহকরূপে উনিশ শতকের বাঙলায় তাঁরা নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। এ সময় 'অকস্মাৎ ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চত্য ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়, সহস্র বছরের অবরুদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং নূতন নূতন ভাবধারা ও জ্ঞানের বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইল।'[১১২] ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কাজ কর্মের সুবিধার জন্য ইংরেজ বণিক যৎসামান্য বিলেতী বিদ্যার চাষ আরম্ভ করেছিল।......মনের উর্বর মাটিতে সামান্য আবাদ করতেই সোনা ফলল। ইংরেজী বিদ্যা বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারকে প্রচণ্ড আঘাত দিল।...... জীবনের বহিরঙ্গ বাস্তব প্রয়োজন, পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সদাসন্তুষ্ট চিত্তপ্রবাহকে কল্লোলমুখর করে তুলল, জীবনের মূল্যমানেরও রূপান্তর হতে শুরু হল।[১১৩] জীবনের এ যে গতি পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির এ যে রূপান্তর ও উপলব্ধির এ যে প্রসারতা একেই বাঙলার 'নবজাগরণ' নামে অভিহিত করা হয়। এই জাগরণ দেখা দিয়েছিলো প্রধানতঃ কোলকাতা শহরের উল্লেখিত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীদের কেন্দ্র করেই—এর জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ। 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পর বাঙালী য়ুরোপীয় জীবনধারার পরিচয় পাইল এবং সত্যকারের নবজীবনের সূত্রপাত হইত।......হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রগণ ও অনুরাগী তরুণ সম্প্রদায় (রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া নবজীবনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিলেন।'[১১৪]

www.pathagar.com

এ বিস্ফোরণে সংকীর্ণ অর্থে হলেও বাঙলাদেশ আন্দোলিত হয়েছিলো। সম্পূর্ণভাবে ইংরেজাশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট হলেও সেদিনের ইংরেজী শিক্ষিত বিত্তবান বাঙালী সন্তানরা প্রতীচ্য আদলের একটা জ্ঞান-পিপাসার জগতের সন্ধান লাভ করেন। এ জগৎ তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরে, ইউরোপের ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের বিস্ময়কর রূপটিকে। 'বাস্তব প্রতিবেশ ও সামর্থ্য না থাকলেও তাদেরো জেগেছিল সে-বঞ্চিত জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির ও ঐশ্বর্যের কামনা। এই আবেগ-বহুল বাঞ্ছাই রামমোহনকেও উচ্ছৃংখল ও দ্রোহী করেছিলো, এজুদের করেছিল চঞ্চল, দিয়েছিল কালাপাহাড়ী মত্ততা, এনেছিল উচ্ছল প্রাণবন্যা-- এ প্রাণশক্তির নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। আবেগের ধর্মই হচ্ছে ক্ষণিকতা, তাই চল্লিশোত্তর জীবনে সবাই হলেন বিগত আবেগ স্থিতধী ব্রাহ্ম বা সনাতনী হিন্দু কিংবা নিষ্ঠ খ্রীস্টান। তবু রুশো-ভলটেয়ার-হক-লবস্-বেন্হাম-কোঁতে মিল রয়ে গেল তাঁদের স্বপ্নের ও সাধের জগতে। জনসেবায়-সমাজ সংস্কারে-জাতি চেতনায়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস চর্চায় নবলব্ধ আত্মসম্মান-বোধের বশে এগিয়ে এলেন তাঁরা। কোলকাতা শহরেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা নকল য়ুরোপ তৈরীর প্রয়াসী হলেন। সে-য়ুরোপে যা কিছু পশ্চিমী তাই গ্রহণীয় ও বরণীয় হল।[১১৫]

পাশ্চাত্যের অনুকরণ-অনুপ্রেরণায় সেদিনের নব্য শিক্ষিত সংস্কার-পন্থী বাঙালীরা উৎসাহিত হলেও, তাঁদের প্রায় সকলেই (বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, হরিশচন্দ্র প্রভৃতির মতো অল্প কয়েকজন বাদ দিয়ে) বিট্রিশ-শাসন-নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নতি ও মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথসহ তৎকালীন সকল বেনিয়ান মুৎসুদ্দি শ্রেণীর ব্যবসায়ী স্বার্থ ছিলো বিদেশী ইংরেজের বাণিজ্য ও প্রশাসন স্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত।[১১৬] ইয়ং বেঙ্গলের নেতারাও নিজেদেরকে এই সংকীর্ণ ব্যবসায়ী স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুল ধরতে পারেন নি। অধিকন্তু সেদিনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন স্বচেতন। তাই অসাধারণ বাগ্মী ও পণ্ডিত রামগোপাল ঘোষকে দেখা যায় কেল্‌স সাহেবের অংশীদার হয়ে ব্যবসা করতে, প্যারীচাঁদ মিত্র নিয়োজিত থাকেন বহু বিদেশী ফার্ম পরিচালানায়।[১১৭] ব্রিটিশ-শাসন-নির্ভরশীলতার আশীর্বাদ স্বরূপ মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি লাভ করলেন ডেপুটি কালেকটরের পদ। কোলকাতাকেন্দ্রিক 'নকল য়ুরোপের বর্ধিষ্ণু ব্রিটেনরা নব-অনুভূতি আত্ম-মার্যাদা-সুখ লালনের তাগিদে এবং ব্যবসায়, চাকুরীতে ও প্রশাসনে স্বার্থ বৃদ্ধির গরজে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান লীগ, ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি সংস্থা গড়ে তুলে তার মাধ্যমে আবেদন-নিবেদন,

www.pathagar.com

অনুযোগ-আবদারের আকারে চাকুরী, আইন, বিচারপদ্ধতি, শিক্ষাব্যবস্থা, খাজনার হার ও নীল কুঠিয়ালের পীড়ন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে পলিটিকস্ ক্রীড়ার আনন্দ আমোদ অনুভব করতে থাকেন।'[১১৮]

হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের যে প্রেরণা আমরা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে লক্ষ্য করি, ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শ তার থেকে খুব একটা অভিন্ন নয়। বরং বলা চলে, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও, তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী ইয়ং বেঙ্গল দলের মধ্য দিয়েই রামমোহনের কর্মপ্রেরণা স্বার্থক রূপ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ঃ 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং তরুণ ছাত্রগণ ডিরোজিওর বহ্নি-স্পর্শ লাভ না করিলে রামমোহনের আবির্ভাব অরণ্যেরোদনে পর্যবসিত হইত বলিয়া মনে হয়।'[১১৯] কিন্তু নবজাগরণ বলতে যা বুঝায় চরিত্রগত পার্থক্য, বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-নির্ভরশীলতা এবং প্রতিবেশের সংকীর্ণতার ফলে, সে জিনিসটির সার্থক প্রতিফলন ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ঘটেনি। আর সেইজন্যই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনায় আমাদের দেশে তা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। আমাদের স্মরণ রাখতে হয়, ইউরোপের রেনেসাঁসের সে দেশের জনগণের জন্য ছিলো তাঁদের জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম স্বাভাবিক পর্যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তা যতোটা দেখে শেখা জিনিস, ঠিক ততোটা ঠেকে শেখা নয়। মুখ্যতঃ এ কারণেই ইউরোপের রেনেসাঁসের তুলনায় বাঙলার নবজাগরণে ভাবাদর্শের প্রভাবটিও বেশী বলে মনে হয়। এদেশে 'ধর্ম সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি—এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে ভাবুক, কল্পনাবিলাসী ও ভক্তিপ্রবণ বাঙালীর চরিত্রানুযায়ী তাহার মানসলোকে ভাবাদর্শের যে নূতন বন্যা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনায় বাস্তব জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই নগণ্য। আর এই পরিবর্তনও অনেক বিষয়ে যতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততটা সমাজগত নহে।[১২০] এবং সেজন্যই আমাদের দেশের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সেদিন আনিছ যে ব্যাপক জিজ্ঞাসা, প্রতিটি জিনিসকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়ার প্রবৃত্তি, আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ প্রভৃতি রেনেসাঁস সুলভ গুণসমষ্টি আত্মপ্রকাশ করেছিলো, তা তৎকালীন বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একটি সুষ্ঠু ও সদূরপ্রসারী কর্মক্ষেত্রে পরিণত হতে পারেনি। তাঁদের জাগ্রত-চেতনার ফলশ্রুতি হোল প্রধানতঃ মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীগত বিকাশ ও সংহতি অর্জনের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা। স্বভাবতঃই তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের গন্ডীর বাইরে মুসলমান জনসমষ্টি ও হিন্দু সমাজের 'নিম্নশ্রেণী'র জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়ার কথা নয়। জনৈক সমালোচক আক্ষেপ করেই বলেছেন, 'পাশ্চাত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই—বিশাল জনসাধারণকে একেবারে উপেক্ষা করে। কেবল বীজের গুণে প্রথম দিকের উনিশ শতকে তার বিস্ময়কর অংকুরোদ্গমে আমরা ধাঁধিয়ে গেছি। ভেবেছি, নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে। কঠোর সত্য যে, তা আসেনি।'[১২১]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানদণ্ডে বাঙলার নবজাগরণকে যাচাই করলে, এর অসম্পূর্ণতার দিকটি সহজেই আমাদের চোখে ঠেকে; একথা সত্য। তবে যা পাইনি এবং যথার্থভাবে বলতে গেলে, বিভিন্ন কারণে সেদিনের বাঙলায় যা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না, তার জন্য আক্ষেপ করতে পারি; কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, সে ক্ষেত্রে যতোটুকুনই আমরা পেয়েছি–যা-ই আমরা লাভ করেছি, তার গৌরবকেও অস্বীকার করার যো নেই। 'যন্ত্রতাড়িত আর যন্ত্রশাসিত সেই পরাধীন জীবনের খণ্ডিত আয়োজনের মধ্যেও যে নব-জাগরণের চাঞ্চল্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শতবর্ষের বাঙলাকে শিহরিত উচ্চকিত উদ্বোধিত করেছিল আমাদের ইতিহাসে তার তুলনা কোথায় ?...কলোনির এই অপরিসর মধ্যবিত্ত-জীবনের মধ্যে, যেমন শক্তিমান বহু সংখ্যক মনীষার স্ফুরণ ঘটেছে এমন স্ফুরণ যে কোন জাতির ইতিহাসে গৌরবের।'[১২২] ইয়ং বেঙ্গলরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতা নিয়েও সেদিনের বাঙলায় জীবনের প্রায় সর্বস্তরে যে আলোড়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তাতে সীমিত অর্থেই বাঙলাদেশে প্লাবিত হয়েছিলো, একথা স্বীকার্য কিন্তু এ সঙ্গে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হচ্ছে, বাঙলাদেশে ঐটুকুন আলোড়ন সৃষ্টি করার যে অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা সেদিন তাঁরা পালন করেছিলেন, তার অবদান অসামান্য। আর এও আমাদের মনে রাখতে হয় যে, পাষাণ-বরফ ভাঙতে গেলে হাতুড়ির প্রয়োজন হয়। এবং একবার যদি কঠিন আঘাতের পর আঘাত হেনে সেই বরফ খণ্ডকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া যায়, তাহলে আর তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবহারে লাগাতে উত্তরসূরিদের ততোটা বেগ পেতে হয় না। উনিশ শতকের বাঙলার সেই রক্ষণশীল পাষাণ-বরফের যুগে হাতুড়ের কাজ করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গলরাই। তাঁদের কাছে এ সমাজ যা পেয়েছে, সে তুলনায় তাঁদের উচ্ছৃংখলতাকে অনেকটা অকিঞ্চিৎকার বলেই মনে হয়। তাঁরা সেদিন যে প্রাণ-শক্তির বলে বাঙালীর মোহমুক্তি ঘটিয়ে, তাঁদের একটি নতুন জীবনদর্শন প্রদান করেছিলেন, সে শক্তিই পরবর্তীকালে উগ্রতার পরিবর্তে শান্ত-সমাহিত রূপ লাভ করে আমাদের সুস্থ ও সুস্থ সামাজিক জীবনের

www.pathagar.com

ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে একটি 'ক্লাইমেক্স'-এ উপনীত হয়। ক্লাইমেক্সে না ওঠা পর্যন্ত ঘটনা বা বিষয়টির গতি থাকে উদ্দাম-উচ্ছল। এটাকে তুলনা করা যায় নদীর প্রাথমিক গতির সঙ্গে। সাগরে পতিত হওয়ার পর সে গতি ফিরে পায় না—প্রয়োজনও হয় না। এটাকেই বলা চলে ক্লাইমেক্সের পরবর্তী শান্ত-সমাহিত অবস্থা। উনিশ শতকের বাঙলায় এরূপ একটি শান্ত-সমাহিত পরিস্থিতিতে অনেক মনীষীই তাঁদের কর্ম ও চিন্তার সুদূর প্রসারী বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ইতিহাস-খ্যাত হয়ে আছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার, সে ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দেয়ার জন্যে যাঁরা সেদিন নব-জীবন চেতনার গতিটিকে ক্লাইমেক্স পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন ইয়ং বেঙ্গল; শান্ত-সমাহিত জীবনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তাঁদের সেদিন কম চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করতে হয়নি। আর নবজীবন বোধের যে ফলপ্রসূ ক্ষেত্রটি তাঁরা উনিশ শতকের বাঙলায় তৈরী করেছিলেন, তার সুদূর প্রসারী প্রভাবের ফলেই রাধাকান্ত-ঈশ্বরগুপ্ত-বঙ্কিম প্রমুখ ব্যক্তিও সেদিন শুধু রক্ষণশীল বা গোঁড়াই থেকে যেতে পারেননি। জীবেন্দ্রসিংহ রায় যথার্থই বলেছেন, 'ইয়ং বেঙ্গলের ইতিহাস হচ্ছে পরিবারের শাসন ও সমাজের দাসত্ব থেকে ব্যক্তির প্রথম মুক্তির ইতিহাস এবং তাতে উচ্ছ্বাস ও স্বেচ্ছাচারিতা, অতি সাহস ও স্পর্ধা থাকা স্বাভাবিক।··· আমাদের সমাজে গতি সঞ্চারের কৃতিত্ব এঁদের দিতে হবে—ইয়ং বেঙ্গলের ·· আলোড়নের ফলে দেশ অন্ততঃ ভাবতে শিখেছে, নড়ে বসতে জেনেছে।'[১২৩]

তথ্যনির্দেশ

১ K. Marx and F. Engels, The First Indian War of Independence 1857-1859. Foreign Languages Publishing House, Moscow. P. 24.

২ E. B. Havell, A short History of India, London-1924, PP. 199-200. এবং অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১ম সং, কলিকাতা—১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৩ দ্রষ্টব্য।

৩ Roy, M. N.: India in Transition, আবদুল হাই হুমায়ুনের 'ইংরেজ আমলে পাক-ভারতে মুসলমানদের অবস্থা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র—১৩৭৪, একাদশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২-এ উদ্ধৃত।

৪ R. C. Majumdar, British Paramounty and Indian Renaissance, Part II, Bombay, 1965. P. 4.

৫ গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, দ্বিতীয় খণ্ড, কোলকাতা, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৩১।

৬ আহমদ শরীফ, বঙ্কিম বীক্ষা: অন্য নিরিখে, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভাষা সাহিত্য পত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮২, পৃঃ ৫০।

www.pathagar.com

৭ গোপাল হালদার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

৮ আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ২৯।

৯ আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮।

১০ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

১১ A. F. Salahuddin Ahmed, Social Idias and Social Change in Bengal, Leiden, E. J. Brill, Netherlands, 1965. P. 36.

১২ 'Appeal to the King in Council', The English works of Raja Rammohan Roy, Published by, The Panini Office, Allahabad, 1906, PP. 445-446.

১৩ Letter 'To The Editor of Englishman', 6th December, 1838. From: Kishorichand Mitra, Memoirs of Dwarkanath Tagore, Calcutta—1870, PP. 60-61.

১৪ Bimanbehari Majumdar, History of Political Thought from Rammohan to Dayanand (1821-84), Vol. 1, University of Calcutta, 1934. PP.186-87.

১৫ The 'Bengal Harukaru' April 24, 1843, quoted in, Bimanbehari Majumdar Ibid. P. 206.

১৬ 'Memorial to the Supreme Court, 'The English works of Raja Rammohan Roy, Ibid. P. 439.

১৭ আনন্দমঠ, ২য় সংস্করণ, চুঁচুড়া, ১২৯০, পৃঃ ১০৪। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেন : সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে 'লিবারেল' (Liberal, 8th April, 1882) পত্রিকার সমালোচনাটিকে তিনি ব্যবহার করেন। ওতে এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus.'

১৮ আনন্দমঠ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

১৯ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮০।

২০ ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ—১৩৮০, পৃঃ ৬৫০।

২১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য়, খণ্ড কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৪৯৯।

২২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৫০০-৫০১ দ্রষ্টব্য।

২৩ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ—১৯৬৫, পৃঃ ৭২-৭৩ দ্রঃ।

২৪ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮, মিঃ ডাণ্ডাসকে লিখিত কর্ণওয়ালিসের পত্রাংশ B. D. Bose, Rise of the Christian Power in India থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

২৫ রামগোপাল ঘোষ, Bimanbehari Majumdar-এর History of Political thought—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬ দ্রষ্টব্য।

২৬ সমাচার দর্পণ, ৯ আগস্ট ১৮৩৪ খ্রীঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা) সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯।

২৭ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৩।

২৮ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী : ঢাকা ১৯৭৪, পৃঃ ২০ দ্রঃ।

২৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নবহিন্দুদের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ', ভারতী, ৪১ বর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃঃ ৯৭৩ ; প্রমথ বসুর Hindu Civilization. P. 4 XII.—থেকে উদ্ধৃতি দ্রঃ।

৩০ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯ খ্রীঃ পৃঃ ২। Parks and Merivale-এর 'Memoirs of Sir Philip Francis' Fifth Report II, P. 270 থেকে গৃহীত।

৩১ E. B. Havell Ibid, P. 200.

৩২ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬০—৬১। P. Spear-এর 'The Indian Nabobs' থেকে গৃহীত।

৩৩ A. Yusuf Ali, A cultural History of India during the British period, Bombay, 1940 P. 41.

৩৪ 'A man who had acquired his fortune by such crimes that his consciousness of them compelled him to cut his own throat.'—George Birkbeck Hill (ed.) Boswells life of Samual Johnson, Oxford 1887. vol III, P. 350.

৩৫ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, ২য় সংস্করণ কলিকাতা ১৩৫২ পৃঃ ৪।

৩৬ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৩৭ 'প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ', সাহিত্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩০৬, পৃঃ ৬৯০।

৩৮ The Economic History of India under early British Rule, 3rd edn. London-1908. P. XII.

৩৯ Romesh Dutt. Ibid PP. 398-99.

৪০ নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য।

৪১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য।

৪২ Stokes, Eric, The English utilitarians and India, Oxford, 1959, P. 26-দ্রষ্টব্য।

৪৩ বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ২য় সং, ঢাকা, ১৯৭৪ : পৃঃ ২২। Radha Kamal Mukherjee : Land Problems in India, P. 35 থেকে গৃহীত।

৪৪ Sir John Strachey, India Its Administration and Progress, 4th edn, London, 1911, PP. 452-53.

www.pathagar.com

৪৫ See, William Bolts, Considerations on Indian Affairs, London, 1772, PP. 191-93.

৪৬ 'উনিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকপত্রে নীলকরদের দৌরাত্ম্য ও দুর্বিনীত আচরণের কাহিনী এত প্রকাশিত হয়েছে যে শুধু বাংলা পত্রিকার রচনাগুলি সংকলন করলে একটি হাজার পৃষ্ঠার বড় বই হতে পারে।' —বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৩।

৪৭ Considerations on Indian Affairs, Ibid, P. Viii.

৪৮ R. P. Masani, Britain in India, Oxford University Press, Bombay, 1960, P. 52.

৪৯ India Its Administration and Progress, Ibid, PP. 192-93.

৫০ Sir John Strachey, Ibid, P. 48.

৫১ Romesh Dutt, Ibid, P. Xiii.

৫২ C. E. Buckland-এর Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I, Second Edition, Calcutta 1902, P.Xix. দ্রঃ।

৫৩ See, Ramgopal, British Rule in India, Bombay, 1963, P. 211.

৫৪ 'It was our policy in those days to keep the natives of India in the profoundest possible state of barbarism and darkness, and every attempt to diffuse the light of knowledge among the people was vehemently opposed and resented. —Kay'e Life of Metcalfe Vol. II. P. 248.; চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী', ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৩, উদ্ধৃত, পৃঃ ৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫ A. F. Salahuddin Ahmed, Ibid, P. 6.

৫৬ H. H. Wood Well (ed), The Cambridge shorter History of India, Cambridge Unversity Press, 1934, P. 715 দ্রষ্টব্য।

৫৭ B. D. Basu, Ibid, Quoted, P. 5.

৫৮ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, সলিলকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ৩৫।

৫৯ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৯, (শিক্ষাসম্মেলন লর্ড কার্জনের বক্তৃতাংশ), Curzon in India, PP. 315-16-থেকে গৃহীত।

৬০ নিখিলনাথ রায়, প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ, সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩০৬, পৃষ্ঠা ৬৯০।

৬১ সেকাল আর একাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৩-৫।

৬২ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, আদিম কলিকাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৫, ৩৮শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮১-৮২।

৬৩ সেকাল ও একাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩।

৬৪ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৪ ২৫।

www.pathagar.com

৬৫ C. E. Trevelyan, on the Education of the People of India, London, 1838, P.2 দ্রষ্টব্য।

৬৬ অনাথনাথ বসু, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, কলিকাতা, ১৩৫১, পৃঃ ১০।

৬৭ Ramgopal, Ibid, Quoted, P. 211.

৬৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৯৭২ পৃঃ ১০১।

৬৯ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার উচ্চ শিক্ষা, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃষ্ঠা ২ দ্রঃ।

৭০ See, B, D, Basu, op. cit. P-8.

৭১ See, B, D, Basu, Ibid, PP. 7-8.

৭২ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃঃ ৩।

৭৩ M. Fazlur Rahman, The Bengali Muslims and English Education, Bangla Academy, Dacca, 1973, PP. 62-67.

৭৪ See, The English works of Raja Rammohun Roy, op. cit. P-474.

৭৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ ৮১।

৭৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

৭৭ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

৭৮ কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩। Lord Macaulay, Minute of the 2nd Eebruary, 1835 on Indian Education. থেকে গৃহীত।

৭৯ R. C. Majumder, British Paramountcy and Indiam Renaissance, Part II, Bombay, 1965, P. 45.

৮০ ভারত-বাঙলা উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে সংকীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে মেকলেই প্রবর্তন করেন। ...মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় জনসাধারণের সমস্ত প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে যায়।'—কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

৮১ R. C. Majumder, op. cit. PP. 47-48.

৮২ B. D. Basu, op. cit. P-114. দ্রষ্টব্য।

৮৩ Anathnath Basu, Education in modern India : A brief Review Calcutta—1945 P. 30.

৮৪ Quoted in R. C. Majumder. op. cit. P. 49.

৮৫ Anathnath Basu, op. cit. P. 32.

৮৬ Quoted in B. D. Basu. op. cit. P. 154.

৮৭ অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৮৯-৯৩ দ্রষ্টব্য।

৮৮ Quoted in Bemanbihari Majumder, History of Political thoughts. Calcutta—1934, P. 256.

৮৯ Anathnath Basu. op. cit. P. 39.

www.pathagar.com

৯০ Education in Modern India : A brief Review. op. cit. P. 43.

৯১ Quoted, Ibid p. 150.

৯২ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২১।

৯৩ ইসলাম প্রচারক, ১৯০৩, উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২-২৭৫।

৯৪ Kamaruddin Ahmed, A Social History of Bengal, Dacca, 3rd edition, 1970, P. XXXII.

৯৫ আমার জীবনী, উদ্ধৃত, মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩।

৯৬ বাংলার মুসলমান, মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৫০।

৯৭ The Mussalman, December 21, 1906. Editorial. Quoted in Pradip Singha Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History, Calcutta, 1965, PP. 56-57.

৯৮ নবনূর, ১৯০৩, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৪৬।

৯৯ আল এসলাম, ১৯১৫, উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

১০০ সৈয়দ আহমদ বেরিলভী- প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত হলেও এর প্রকৃত নাম তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া।'—আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ছয়।

১০১ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

১০২ R. C. Majumder, op. cit p. 7.

১০৩ ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জনরব ওঠে যে, হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হবে। এতে হিন্দুসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন।—রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।

১০৪ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৪২৬ দ্রষ্টব্য।

১০৫ শীতাংশু মৈত্র, যুগন্ধর মধুসূদন, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৫৫।

১০৬ মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তফা নূরুল ইসলাম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ পৃঃ ১৪।

১০৭ M. Azizul Huque, History of Muslim Education in Bengal, Calcutta, 1917, P. 18.

১০৮ Ibid. P. 41.

১০৯ Ibid. P. 29.

১১০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৩, উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭।

১১১ যুগ-যন্ত্রণা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৯৭।

১১২ রমেশচন্দ্র মজুমদার; প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৫৯-৬০।

১১৩ উনিশ বিশ, কলিকাতা, ১৩৭৪ পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।

www.pathagar.com

১১৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য; প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮০-৮১

১১৫ আহম্মদ শরীফ, ভাষা-সাহিত্য পত্র, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা-১৩৮২ : পৃঃ ৬৩।

১১৬ বদরউদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৪ পৃঃ ৯।

১১৭ বিনয় ঘোষ, বাঙলার নব জাগৃতি, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃঃ ১৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।

১১৮ আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

১১৯ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

১২০ কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার নবজাগরণ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা—প্রাককথন-৮/

১২১ আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬।

১২২ গোপাল হালদার, মাসিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৬৮। উদ্ধৃত—জীবেন্দ্র সিংহ রায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় পর্ব, কলিকাতা, ১৩৮০, ভূমিকা।

১২৩ সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ১ম পর্ব, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

বাঙালী হিন্দুর বর্ণাশ্রমী ধর্ম ও সামাজিক প্রথা হাজার হাজার বছরের পুরোনো। বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণের প্রভাবে বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হলেও, বাঙলার আদিম অধিবাসী হিন্দুরা কিন্তু আর্যজাতির বংশদ্ভূত নন। বাঙলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত অন্ত্যজ জাতির লোক রয়েছেন, তাঁরাই হচ্ছেন বাঙলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। ভাষার ঐক্য হতে তাঁদের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এই মানব-গোষ্ঠীকে অস্ট্রিক বা নিষাদ জাতি নামে চিহ্নিত করা হয়। নিষাদ জাতির পরে দ্রাবিড় ভাষাভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভুক্ত এক জাতি বাঙলাদেশে বাস ও বাঙালী জাতির সৃষ্টি করে। এই জাতির লোকেরাই বর্তমান বাঙলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ। তাঁরা যে বৈদিক আর্যগণ হতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। বর্তমানকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ কর্ম ও জন্মান্তরবাদ, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞ বিরোধী পূজা-প্রণালী, শিব-শক্তি-বিষ্ণু প্রভৃতির আরাধনা এবং পুরাণ বর্ণিত অনেক কথা-কাহিনী তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। লৌকিক ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহে হলুদ-সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহারও তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিলো। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অথবা তার অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এই উপনিবেশের ফলে আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হয় এবং বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়, আর সমাজ গঠিত হয় বর্ণাশ্রমের নিয়মানুসারে। বিভিন্ন দিক থেকে তখনকার বাঙালী জাতি নবাগত আর্যগণের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেলো যে, তাঁদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করাও মুশকিল হয়ে পড়লো।[১]

জাতিভেদ ছিলো বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্য সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে যুগে মনুস্মৃতি-মহাভারত প্রভৃতি রচিত হয়, সে যুগে বাঙলাদেশেও আর্যদের বসবাসের ফলে এই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হয়। আর্যরা প্রথম ভারতে এসে আদিম অধিবাসী অনার্যদের যুদ্ধে পরাজিত করে

www.pathagar.com

কতকাংশকে ধ্বংস করে ফেলেন। যে সব অনার্য আর্যদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের দাস বা অনুগত হয়ে বাস করতে সম্মত হন, তাঁরা আখ্যা পেলেন শূদ্র। আর্যরা তখন পরিচিত হন দ্বিজাতি রূপে। এ দ্বিজাতি বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাতো। আর্যদের এই তিন বর্ণের মধ্যে আহার-ব্যবহারে ও বিবাহের আদান-প্রদান প্রভৃতিতে বিশেষ কোনো ভেদ ছিলো না। কিন্তু শূদ্র বলতে সাধারণতঃ যে সব অনার্যদের বুঝাতো, তাঁদের সঙ্গে দ্বিজাতি বর্ণের লোকদের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকলো না। আর্যরা তাঁদের সঙ্গে আহার-ব্যবহার মেলা-মেশা বা বৈবাহিক আদান-প্রদান করতেন না। আর এর থেকেই জন্ম নেয় 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তা'। শূদ্রদের মধ্যেও আবার একটি গন্ডী টানা হোল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিতান্ত হীন-অধম বা বর্বর বলে বিবেচিত হলেন, তাঁরা হলেন, অন্ত্যজ। আর্যদের অধ্যুষিত গ্রামে বা নগরে তাঁদের বাস করার অধিকার ছিলো না। শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণ বলে গণ্য হলেন, আর শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও, লোকাচার ও দেশাচারে অন্ত্যজদের বলা হোল পঞ্চম বর্ণ। 'দ্বিজাতি, সূদ্র এবং অন্ত্যজ—ইহাই হিন্দু সমাজে প্রথম জাতি ভেদ।...... উহার ফলে যে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে বর্দ্ধিত ও শাখাপ্রশাখা সমন্বিত হইয়া সহস্র শীর্ষ জাতিভেদরূপে প্রকট হইল।'[২]

আর্য সমাজের প্রথমাবস্থায় দ্বিজাতিদের মধ্যে বিশেষ কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ ছিলো না—সকলেই ছিলেন সমান মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন কারণে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা খুব বেড়ে যায়—তাঁরা অধিকার করলেন সমাজের শীর্ষ স্থান। ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা ব্রাহ্মণের পরে এবং বৈশ্যের মর্যাদা ক্ষত্রিয়ের পরে নির্দিষ্ট হোল। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহার, বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রভৃতি ক্রমশঃ লুপ্ত হোল। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে তা ছিলো এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই যথেষ্ট বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটতে লাগলো। এই প্রাকৃতিক নিয়ম হতে অনার্য শূদ্ররাও বাদ গেলেন না। তাঁদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন সংঘটিত হোল। এর থেকেই সৃষ্টি হয় সংকর জাতির—সমাজে তাঁদের স্থান কোথায়, এ নিয়ে দেখা দেয় বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার বিপুলতা ও জটিলতার প্রমাণ মনুসংহিতায় রয়েছে। সে যাই হোক, বর্ণ সংকরদের সেদিন উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না—সমাজের মধ্যে তাঁদেরকে স্থান দিতেই হোল। এভাবে চার জাতি বা চার বর্ণ ভেঙে বহুবর্ণ--বহুজাতিতে পরিণত হোল।[৩]

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ হতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রাহ্মবৈবর্তপুরাণ হতে জানা যায়, বাঙলাদেশের হিন্দু সমাজ অন্ততঃ ঐ

www.pathagar.com

সময় হতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চতুবর্ণের পরিবর্তে মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ দু'বর্ণ দিয়ে গঠিত হয়েছিলো। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ জাতিগুলোও এ সমাজের এক প্রান্তের নিম্ন স্তরে স্থান পেয়েছিলো। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ এ দুটো বর্ণ বাঙালী হিন্দু সমাজে সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি। বৈদ্য ও কায়স্থ এ দুবর্ণের লোকেরাও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শূদ্র পর্যায়ের। বৈদ্যজাতির একাংশের ব্রাহ্মণত্বের দাবী এবং কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনৈতিহাসিক।[৪] তবে একথা সত্যি যে শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত হলেও বাঙালী হিন্দু সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থদের স্থান বহুদিন ধরে ব্রাহ্মণদের পরেই নির্দিষ্ট ছিলো। বৈদ্য ও কায়স্থদের পর ছিলেন নাপিত, মোদক, বারুজীবী, তামবুলী, মালাকার, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, দাস (কৃষক) প্রভৃতি 'সৎসুদ্র' গোষ্ঠীর লোকেরা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এঁদের 'উত্তম-সংকর' বলে গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের নিম্নে স্থান পেয়েছিলেন, সূত্রধর, চিত্রকর, সুবর্ণকার, কৈবর্ত, ধীবর, শৌণ্ডিক প্রভৃতি 'অসৎ সুদ্র' বা 'মধ্যম সংকর' পর্যায়ের উপবর্ণগুলো। সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পেয়েছিলেন ব্যাধ, হাড়ি, ডোম, কোল, বাগদী, চামার, চণ্ডাল, প্রভৃতি 'অধম সংকর' পর্যায়ের লোকেরা এবং পুলিন্দ, শাবর, কম্বোজ প্রভৃতি 'ম্লেচ্ছজাতি'সমূহ। উত্তম, মধ্য ও অধম এই তিন পর্যায়ে প্রথমে মোট ছত্রিশটি উপ-বর্ণের স্থান হয়েছিল, কিন্তু পরে আরো কয়েকটি উপ-বর্ণও সেই তালিকাভুক্ত হয়েছিলো।[৫] মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরুতে বাঙালী হিন্দু সমাজে এই স্তর-বিন্যাসের কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন বৈদ্য ও কায়স্থদের পরেই 'নবশাখ' সম্প্রদায়কে গণ্য করা হোত। নবশাখদের তিলী, মালী, তামবুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় ও মোদক এ ক'টি শাখা ছিলো। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের কাছে তাঁরা অস্পৃশ্য বা খুব একটা হেয় ছিলেন না। নবশাখদের পরে ক্রমানুয়ে বিভিন্ন শাখার বণিক, নমশূদ্র, যুগী ও পীরালী প্রভৃতি 'নিম্নজাতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের কাছে প্রায় অস্পৃশ্য। অবশ্য মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে জন্মগত আভিজাত্য ছাড়া, অর্থের বা ক্ষমতার আভিজাত্যও যথেষ্ট ছিলো। সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা ব্যবসার দ্বারা অঢেল অর্থ ও সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতার হিন্দু সমাজে কায়স্থ ও সুবর্ণ বণিক জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছুটা বেশী ছিলো বলেই মনে হয়। কিন্তু তাঁরাও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা প্রদানে কুণ্ঠিত হতেন না।

বাংলাদেশে দ্বাদশ শতাব্দীরও কিয়দংশ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিলো। ঐ সময়ে বর্ণাশ্রমী হিন্দু ধর্ম বহুল পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং

www.pathagar.com

জাতি ভেদের ভিত্তিও শিথিল হয়ে পড়েছিলো। এই ব্যাপারে মুসলমান সভ্যতা ও পরবর্তীকালের শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তির প্রভাবও কম ছিলো না। কিন্তু সেন রাজগণের আমলে আবার হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান শুরু হয়ে যায়। বল্লাল সেন আত্মনিয়োগ করেন হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে—জাতিভেদের পত্তন হয় নতুনভাবে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার স্বীকার করে নেন জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, বলরামী প্রভৃতি বহু নতুন সম্প্রদায় জাতিভেদ প্রথাকে অগ্রাহ্য করার জন্য চেষ্টিত হন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব গোটা হিন্দু সমাজের অতি নগণ্য অংশকেই স্পর্শ করেছিলো। সমাজের বৃহত্তর অংশ জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্যকেই নির্বিচারে স্বীকার করে নিয়েছিলো।[৬] পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো অন্যভাবে—সেই সময়ের বক্তব্য ছিলো—জাতিভেদ প্রথা যাতে থেকেই যাচ্ছে, তখন আর নিম্ন জাতিতে কেনো। এই ব্যাপারে সভা-সমিতি করা ছাড়াও বিভিন্ন জাতির হিন্দুরা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যতোগুলো সেন্সাস হয়েছিলো, তার প্রত্যেকটির প্রাক্কালেই বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে তাঁদের জাতি-মর্যাদার উন্নতিকল্পে বর্ণ পরিবর্তনের জন্য বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাসের সময়ের কথা উল্লেখ করে O. Malley লিখেছেন : 'There was a general idea in Bengal that the object of the census is not to show the number of persons belonging to each caste, but to fix the relative position of different castes and to deal with questions of social superiority... Hundreds of petitions were received from different castes—their weight alone amounts to one and half a maunds—requesting that they might be known by a new name, be placed higher up...as Kshatriya and Vaishya etc...'[৭] কিন্তু এসবের ফলে বর্ণাশ্রমী বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় বা সামাজিক জীবনের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বরং বলা চলে, জাত্যাভিমানী বাঙালী হিন্দুরা নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে ধর্মের নামে এদেশে অনেক কুসংস্কার-দেশাচারকেও সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আবহমান কাল থেকে যে সমস্ত কুসংস্কার-দেশাচার সংযুক্ত হয়েছিলো তার প্রভাব বাংলাদেশে বহুদিন যাবৎ চলেছে। নানারূপ দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করা, মৃতদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও উৎসর্গ ক্রিয়া, মুক্তির পথ সহজ করার জন্য অর্ধ দগ্ধ শবের মাথার খুলি ভেঙে দেওয়া, স্বামীর মৃত্যু হলে সদ্য বিধবাকে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে পুড়িয়ে মারা, দেব-দেবীর কাছে মানত করে পুত্রকে গঙ্গার

www.pathagar.com

জলে বিসর্জন দেওয়া, দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নরবলি দেওয়া, জাতি রক্ষার জন্য বহু স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রদান, বালিকা বিবাহ দিয়ে এবং বিধবার বিবাহ বন্ধ রেখে শাস্ত্র ও কুল-মান রক্ষার প্রবণতা প্রভৃতি বহুবিধ প্রথাকে বাঙালী হিন্দু দ্বিধা সংকোচহীনভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। সেকালের সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে: 'অনেক লোকে বদ্ধমূল কুসংস্কার বিশেষের এতাদৃশ বশীভূত, যে সেই কুসংস্কার বিরোধী কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। প্রত্যক্ষ যদি সেই সংস্কারের বিরোধী হয় বিজ্ঞান যদি সেই সংস্কারের বিরোধী হয়—ধর্ম্ম যদি সেই সংস্কারের বিরোধী হয়—করুণাময় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ যদি সেই সংস্কারের বিরোধী হয়, তথাচ তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা যে শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও ঐ সংস্কারের বিরোধী হইলে তাঁহাদের গ্রাহ্য নহে।'[৮] কুসংস্কার ও আচার সর্বস্ব বাঙালী হিন্দু সমাজে সেদিন ব্রাহ্মণের কৌলিক মর্যাদার ক্ষেত্রটি ছিলো অত্যন্তই জাঁকালো। এই প্রসঙ্গে Sir Denzil Ibbetson-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়—'The veneration for Brahmans runs through the whole social as well as religious life of Hindu......No child is born, named, betrothed, or married, nobody dies or its burnt, no journey is undertaken, or auspicious day selected, no house is built, no agricultural operation of importance begun, or harvest gathered in, without the Brahmins beeing feed and fed ; a portion of all the produce of the field is set apart for their use, they are consulted in sickness and in health, they are feasted in sorrow and in joy.'[৯]

ব্রাহ্মণের কোনো অন্যায়কেও অন্যায় বলে গণ্য করার ক্ষমতা সেদিন কোনো হিন্দুরই ছিলো না। এমনকি সরকারী বিচারে কোনো ব্রাহ্মণ অপরাধী সাব্যস্ত হলে বা তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলে, তার সঙ্গে একমত হতে পারবেন না বলে, বাঙালী হিন্দুরা জুরির কাজ গ্রহণেও আপত্তি করতেন।[১০]

উনিশ শতকের বাঙলায় বর্ণাশ্রমী বাঙালী ধর্মসংস্কার ও কতিপয় শাস্ত্র-বিরোধী সামাজিক প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, বিদ্যাসাগর, বাংলাদেশে কর্মরত খৃীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ অনেক প্রগতিশীল বাঙালী হিন্দু। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর অনেকেই তাঁদের চিরাচরিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেন। রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিতঃশ্রদ্ধ হয়ে এই সময়ে অনেকেই খৃীস্টান ধর্মেও

www.pathagar.com

দীক্ষিত হতে থাকেন। হিন্দু ধর্মের সংস্কৃত রূপ নিয়ে যে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোল, সেখানে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়, ব্রাহ্মণত্বে কারো জন্মগত অধিকার থাকতে পারে না এবং কর্মের দ্বারা জাত্যন্তর সংঘটনও অসম্ভব নয়—বিস্তৃত বক্তব্য রাখা হোল মূর্তি পূজার অসারতা সম্বন্ধে। ধর্মের নামে তখন বাঙালী হিন্দু সমাজে যে সব সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিলো, তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু হয় প্রধানতঃ ব্রাহ্ম সমাজ, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির তরফ থেকে। ফলে সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে এবং বিধবা বিবাহ প্রভৃতির স্বপক্ষে বাঙালী হিন্দুর জনমত গড়ে ওঠতে থাকে। এই সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু নেতা ও ধনী ব্যক্তিরাও বসে থাকেননি। তাঁদের প্রচেষ্টা ছিলো মূলতঃ এই নব্য আন্দোলনের হাত থেকে সনাতন হিন্দু ধর্ম ও এর আচার-ব্যবস্থাকে সযত্নে রক্ষা করা। আর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ধর্মসভা ও সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকাসমূহ।

দুই

উনিশ শতকের বাঙলার সতীদাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে তখনকার বাঙালী হিন্দুর জীবনে যে নৈতিকতার বিপর্যয় ও চারিত্রিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর থেকেই ইংরেজরা এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে তাঁদেরকে বহু সংগ্রাম ও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে—এদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাবও অনেক বিলম্বের ঘটনা। মোটামুটি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রধানতঃ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী ও ইংরেজী শিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় বাঙালী হিন্দু ছাড়া আর সকলেই ছিলেন দেশীয় আচার-আচরণে অভ্যস্থ। এই আচার-আচরণ মুখ্যতঃ দুটো ধারা সংযুক্ত ছিলো। একটি হচ্ছে, বাঙালী হিন্দুর বহু পুরানো সামাজিক প্রথার ক্রমবিবর্তিত রূপ এবং অন্যটি হচ্ছে ক্ষয়িত 'নবাবী ঐতিহ্যের' স্মৃতির অনুবর্তন। এ দুটো ধারার সংমিশ্রণের ফলেই সেদিনের বাঙলার, বিশেষ করে কলকাতা এবং তার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের হিন্দুরা একদিকে ব্যস্ত থাকেন আচার-অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

বাহ্যাড়ম্বরতা ও অপরদিকে বিলাসবহুল জীবন যাপনের প্রবণতা নিয়ে। তাঁদের জীবনের এই অধ্যায়টি সেই সময়ে ভাঁড়ামি আর অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে একটি হাস্যকর সামাজিক পরিস্থিতিতে রূপ নিয়েছিলো। তখনকার বাঙালী হিন্দুর সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার ব্যাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না, কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ গমন, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল,... বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন।'[১১] প্যারিচাঁদ মিত্র ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিতে লিখেছেন, ডেভিড হেয়ার 'ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে' যেতেন এবং 'কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেমটানাচ, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিস অর্থাৎ গোল্লা বিচাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পরীক্ষার সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষী স্বরূপ থাকিতেন—সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা 'কুরুড় কিং ল্যাক্ জ্যাক্সন, গুলবর জ্যাক্সন, আলিপুরি জ্যাক্সন, কু-ড়।'[১২] বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না।...তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল-উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফ আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।'[১৩] তখনকার বিত্তশালী বাঙালী হিন্দুরা হলেন সমাজের কর্ণধার—বিখ্যাত 'বাবু'।[১৪] 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[১৫] বাবুদের বেশ-ভূষা সত্যিই

www.pathagar.com

অতি চমৎকার : 'সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহণা। ও কালাপেড়ো রাঙ্গা পেড়ো শালপেড়ো কাঁকড়া পেড়ো লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাই পেড়ো ধুতি পরিধান করেন এ সকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে...'[১৬]

বাবুদের আনন্দ-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি ছিলো অনেকটাই ক্ষয়িত নবাবী ঐতিহ্যের অনুকরণ। মুসলমান বাইজীর নৃত্য দর্শন এবং রক্ষিতা স্ত্রীলোক রেখে প্রচুর অর্থব্যয়, বেশ্যালয় গমন ও মদ্যপানের আতিশয্য প্রভৃতি হয়ে দাঁড়ায় বাবুদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি।

তখনকার কোলকাতায় বাবুদের জলসার প্রধান আকর্ষণ নিকী বাইজী : 'শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছে।'[১৭] অন্য একটি খবরে জানা যায়, বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিয়েতে 'যেমত সমারোহ হইয়াছিল, এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি হয় নাই।...তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গায়ক আর ২ অনেক তয়ফাও আসিয়াছিল এসকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়।'[১৮] ফ্যানী পার্কস্-এর বিবরণীতে জানা যায়, রাজা রামমোহন রায়ও তাঁর মানিকতলার বাগান বাড়ীতে স্ববান্ধবে নিকী বাইজীর নাজ-গান উপভোগ করেছিলেনঃ '1823, May.—The other evening we went to a party given by Ram Mohun Roy, a rich Bengallee Baboo ;......

In various rooms of the house nach girls were dancing and singing ..one of the women was Nickee, the Catalani of the East'[১৯] কারো কারো জীবনের প্রগাঢ় শোক-দুঃখ নিরারণের ব্যাপারেও বাইজীর উপদেশ মহৌষধের মতো কাজ করতো। রায় কালীনাথের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ অত্যন্ত শোক-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন : 'সেই সময়কার কলিকাতার বিখ্যাত গায়িকা মহাবক্স বাইজী, বৈকুণ্ঠনাথের শোকাপনোদন মানসে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ বলে তিনি আশ্বস্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাইজীর উপদেশ বাক্য বড় ভক্তিপূর্ণ।'[২০]

নিকী ছাড়া তখনকার অন্যান্য মুসলমান বাইজীর মধ্যে বেগম জান, হিঙ্গুল, নান্নীজান, সুপনজান, আসরুম, জিনত প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের একটি খবরে প্রকাশ, '...from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who are engaged by Neel Munee Mullik and Raja Ram Chunder, are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, performs at the house of Budr Nath Baboo,'[২১] মুসলমান বাইজীদের অভাবে অনেক সময় বাবুদের মজলিস নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠানে রূপ নিতো।[২২]

প্রবল সামাজিক চাহিদা ও আর্থিক প্রলোভনের ফলে বাইজীদের অনুকরণে তখন অনেক সাধারণ নর্তকীরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো বলে মনে হয়।[২৩] এ নর্তকীর অনেকেই রক্ষিতা—বারাঙ্গনা বৃত্তিরও আশ্রয় নিয়েছিলো। বারাঙ্গনা-বৃত্তি প্রাবল্যের অন্য একটি কারণ, 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ ও বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই দুই অনর্থকারী রীতি এতদ্দেশে ধর্ম্ম-পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।...ঐ দুই প্রথার প্রভাবে, কলিকাতা নগরী বেশ্যা-সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।'[২৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার সমাজে এটা যে খুব নিন্দনীয় ছিলো, এরূপ মনে হয় না: 'বেশ্যাগমন... কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, অতি দীন পর্যন্ত এই দুষ্কর্ম্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করেনা—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না।'[২৫] অন্য একটি খবর এরূপ—'নগরবাসি অনেক লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নান যাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক হইয়া যান কেহ কেহ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া...ছিয়াছিলেন।'[২৬] জনৈক শ্রী পঞ্চানন বসু মহাষ্টমী পূজা অনুষ্ঠিত হবার বেশ পূর্বেই বাঙালীর মনে কি পরিমাণ উৎসাহ-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাই খেমটাওয়ালা প্রভৃতি নর্তকীগণ দুর্গোৎসবের সময় বড় মানুষ বাবুদিগের বাটীতে স্বকীয় মনোমোহিনী বিশুদ্ধ, তান লয় স্বরে গান করিয়া সকলের মনোমোহন করিতে পারিবে...যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা প্রভৃতি...সংগীত আলোচনা করিতেছে,......বারাঙ্গনাকুল...চাতুরী করিয়া স্ব স্ব ক্রেতাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে...।'[২৭] হুতোম প্যাঁচার নক্শায় আছে, 'খ্যামটা বড়ো চমৎকার নাচ। শহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ভাগনে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম

www.pathagar.com

রসাস্বাদনে রত হন। কোনো কোনো বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান ···· ।'[২৮] ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন :

'বাড়ী বাড়ী বাই বাই ভেড়ুয়া নাচায় বাই
মনোমত রাগ সুর ধরে।
মৃদুতান ছেড়ে গান বিবিজান নেচে যান
বাবুদের লবেজান করে।।'[২৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "সে সময়ের যশোহর নগরের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে —'ইনি ইঁহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন', এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মান সম্ভ্রমের কারণ ছিল।"[৩০] তখন প্রকাশ্য বারাঙ্গনা-বৃত্তি করেও কেউ কেউ মনে হয় ধর্মের ঠাট বজায় রাখতেও প্রয়াসী ছিলেন, এবং বারাঙ্গনাদেরকে বাড়ী ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন করার ব্যাপারেও মনে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন—ভদ্রপরিবারের ব্যক্তিরাও সংকোচবোধ করতেন না—'For instance we have been able to retain some information about a prostitute called Moynah Tackooraney who owned two lots in Moonshy Sader udd'ys Lane in which there were 14 straw huts, one upper roomed house and a mosque. We do not however know who were her clients and whether they prayed in her mosque········a brothel 235 and 236 Bow Bazar St., owned by a member of Dwarkanath Tagore's Family. It had 43 rooms for prostitutes and its rental value was Rs. 140.'[৩১] মদ ও অন্যান্য নেশা জাতীয় জিনিস ছিলো বারাঙ্গনাসক্ত বাবুদের প্রধান সাথী : 'এমন পল্লীপথ বা গলি নাই যেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাস স্থান দৃষ্টি-গোচর না হয়, মদ্য পান ধূম্রপান গুলি গাজা ছররা টান ইত্যাদি টান পানের ব্যাপারে বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে।'[৩২] শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এক 'মামা' সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তাহার সুরাপান ও অন্যান্য দোষ ছিলো। একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর একজন আত্মীয় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, 'মামা' সুকিয়া স্ট্রীটের এক গণিকালয়ে মাতাল হইয়া বমি করিয়া পড়িয়া আছে। ·····আমরা যাইবা মাত্র স্ত্রীলোকটি গালাগালি আরম্ভ করিল।' মামাকে ঘরে নিয়ে আসার ভার চাকরের ওপর ন্যস্ত করে শাস্ত্রী মহোদয় বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু মামা চাকরের সঙ্গে মারামারি করে পালিয়েছেন। কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পর ভাগ্নে (শাস্ত্রী মহোদয়) উপরের ঘরে শুতে গিয়ে শুনতে পেলেন, 'মামা' বাসার পশ্চাতে অপর এক গণিকালয়ে গিয়া মাতালি সুরে এক গান ধরিয়াছে।'[৩৩] মদ ও বারাঙ্গনাসক্ত মাতালদের এরূপ আরো অনেক হাস্যকর চিত্র সেকালের সংবাদপত্রসমূহ এবং বহু পুস্তকাদিতে সুন্দর করে আঁকা হয়েছে। এবং তখন যে, শিক্ষিত হিন্দুদেরও একটি দল 'ব্রান্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কার্য' বলে মনে করতেন, এরূপ প্রমাণেরও অভাব নেই।[৩৪] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বলেন, 'ইংরাজ জাতির এদেশ অধিকার হইবার পূর্বে সাধারণ রূপে মদ্য ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃশ্য হয়; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে।'[৩৫]

তৎকালীন ধনাঢ্য বাবুরা নানারূপ সামাজি-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম তথা পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর: 'সম্প্রতি......বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্য রূপে হইয়াছিল তাহার শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থাল গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীতবাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা,...সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে।'[৩৬] আর এক খবরে জানা যায়, 'বাবু মতিলাল মল্লিক...... নূতন বাটীতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে একই যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং......৪৫ ঘর গোস্বামির-দিগকে এক এক যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটী খিরদের যোর ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন...... আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন......ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল।'[৩৭] অন্য একটি খবরে প্রকাশ, 'শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পোষ্যপুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চূড়াকরণ......হইয়াছে......ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।'[৩৮] আরো জানা যায়, 'বিজয় গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব......আটশত লোক সমভিব্যাহারে......ত্রিস্থলী......দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া......গয়াধামে গিয়াছেন এবং ঐ সকল লোকের গয়া শ্রাদ্ধকরণের যে ব্যয় তাহা শ্রীযুক্ত দেওয়ানজী আনুকূল্য করিয়াছেন।'[৩৯] এবং 'রাসবিহারী শর্ম্মা...দানপত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার...সম্পত্তি হইতে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করান যায়।'[৪০]

www.pathagar.com

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধে 'অনুমান সর্ব শুদ্ধ তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।'[৪১] বাবু রামগোপাল মল্লিকের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের খবরে জানা যায় তিনি 'পিতার শ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার দুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধন হইতে প্রাপ্ত হন...মাতৃ শ্রাদ্ধেও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজ হইতে দিয়াছেন।'[৪২] 'বাংগাল হরকরা'র সম্পাদক লিখেছেন, 'মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, ঐ টাকায় অনায়াসে এক চিরস্থায়ী কলেজ স্থাপিত হইতে পারে...।'[৪৩] বিবাহ সমন্ধীয় একটি খবরে বলা হয়, 'কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ...হইয়াছে তাহার বরাদ্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই...।'[৪৪] অন্য একটি খবর হতে জ্ঞাত হওয়া যায়, 'বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে ২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকা ব্যয় ব্যতিরেকে এমন মহাঘটা হইতে পারেনা।'[৪৫] বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে সমন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই।'[৪৬]

এ সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে বাবুদের প্রচুর অর্থব্যয়ের অনুরূপ বহু খবর তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ছাপা রয়েছে। তাছাড়া যাত্রা-সঙ-বুলবুলি ও কবির লড়াই-মল্লযুদ্ধ প্রভৃতিতেও বাবুরা বহু অর্থব্যয় করে অনেক সময় বিকৃত রুচির পরিচয় দিতেন এরূপ খবরের সংখ্যাও কম নয়: 'কলিকাতার...অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নল দময়ন্তী যাত্রার সং করিয়াছেন...ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানা প্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নিত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন...।'[৪৭]

'সং' সমন্ধীয় খবরে জানা যায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর এক অনুষ্ঠানে 'ভাঁড়েরা নানা সং করিয়াছিল...তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণ পূর্বক ঘাস চর্ব্বনাদি করিল।'[৪৮] সঙ-এর রসিকতা অনেক সময় এতো ইতর পর্যায়ে নেমে আসতো যে তার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। এজন্য কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি পুলিশের হাতে ধৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর '৫০ পঞ্চাশ টাকা ডণ্ড'ও[৪৯] হয়েছিলো। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাগান বাড়ীর মল্লযুদ্ধের খবরে প্রকাশ, 'কতগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ

www.pathagar.com

স্থানে আসিয়াছিল…তাহারা প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি ম্বাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি…করিয়া একজন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি ২ বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল।…শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহ চন্দ্র……বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা…চাঁদা করিয়া কতগুলি টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে…।'[৫০] অন্য খবরে জানা যায়, 'দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে।

…বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কেনা আহ্লাদিত হন,……।'[৫১] বুলবুলি -লড়াই সম্বন্ধেও দু' একটি হাস্যকর বর্ণনার উল্লেখ করা যায়ঃ 'সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয় এবং যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণরায় বাহাদুর উভয়ে শীতকালে বুলবুলি পক্ষি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন,……এই সামান্য সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন…।'[৫২] বিপিন বিহারী গুপ্ত লিখেছেন, 'প্রতিবৎসরে শীতকালে ছাতু বাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হইত, তাহা আমাদের দেশীয় নবাবি আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যেখানে অনাথবাবুর বাজার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রভৃতি হইয়াছে সেখানে কেবল মাত্র একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে খুব ধুমধামের সহিত বুলবুলির লড়াই হইত। অনেক তাঁবু পড়িত। পোস্তার রাজা নরসিংহ দেড়শত শিক্ষিত বুলবুলি লইয়া আসিতেন, ছাতু বাবুও দেড়শত বুলবুলি আনিতেন। উভয় দলের মাঝখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত, সেই খাবার লইয়া তাহাদের লড়াই বাঁধিয়া যাইত। লড়াইয়ে হারিয়া গেলেই পাখী উড়িয়া যাইত, অমনি অন্যদলের লোকেরা উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিত। "বো মারা"।'[৫৩]

তিন

মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সদ্য বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করে মারার মতো একটি নিষ্ঠুরতম প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের আর্য ও অনার্য উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিলো। আদিম যুগ হতে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, শ্লাভদেশ, গ্রীস, মিসর, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশেও এই প্রথা কোনো না কোনোভাবে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু ভারত ছাড়া অন্য কোনো সভ্য দেশেই এই প্রথা আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি।[৫৪] বেদে

www.pathagar.com

সতীদাহের কোনো বিধান নেই। মনুসংহিতায় বিধবার আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক স্মৃতিকার সতীদাহকে বাধ্যতামূলক বলে বিধান না দিলেও সহমরণ ব্যবস্থার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। শঙ্খ ও আঙ্গিরস সংহিতায় আছে, মানুষের গায়ের রোম-সংখ্যা পরিমাণ সময় বা সাড়ে তিন কোটি বছর কাল, সহমৃতা স্ত্রী বা সতী স্বর্গে বাস করবেন এবং অপ্সরাদের স্তুতি লাভ করে অনন্তকাল তিনি স্বামীর সঙ্গে ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করবেন। স্বামী যদি ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, মিত্রঘ্ন বা সুরাপায়ীও হন, তবু স্ত্রী সহমৃতা হলে তাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। বৃদ্ধ হারীতের মতে, স্ত্রী যদি সহমৃতা হন, তাহলে তাঁর পতি, পিতা ও মাতার কুল পবিত্র হয়ে যায়। সাধ্বী নারীর সহমরণ ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই। ধর্মশাস্ত্রের এ সমস্ত উক্তিই ভারতের সহমরণ প্রথাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলো, যার ফলে কোনো কোনো বিধবা স্বেচ্ছায়ই সহমৃতা হতেন—কোন অনুরোধ-উপরোধেও তাঁরা তাঁদের সংকল্প হতে নিবৃত্ত হতেন না।[৫৫] উনিশ শতকের সংবাদপত্রের একটি খবর হতে জানা যায়, 'অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সে স্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে যে তুমি কেন এই…বাসনা করিতেছ।…সে উত্তর করিল…আমি স্বামি শবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকাল পর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাইনা। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকেরদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ জন্মিল না।…ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম…। ইহার পর সে স্ত্রী শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।'[৫৬]

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিলো অধিক, এবং এর মধ্যে বাঙলাদেশে, বিশেষ করে কোলকাতায় সহমরণের সংখ্যাই সর্বাধিক।[৫৭] সমাচারদর্পণ লেখেন, 'অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয়না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশের কেবল জিলা হুগলিতে হয়।'[৫৮] ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতার চারদিকের ত্রিশ মাইল বিস্তৃত এলাকার মধ্যে প্রায় ৩০০ জন বিধবার সহমরণ হয়। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার হতে গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সহমৃতা হয়েছিলেন প্রায় ৭০ জন বিধবা।[৫৯]

www.pathagar.com

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের একটি খবরে প্রকাশ, 'তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে…।'[৬০] ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের নিকট পুলিশ কর্তৃক যে রিপোর্ট প্রদান করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, 'বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে' সেই বছরে ২৩৪ জন ব্রাহ্মণ, ৩৫ জন ক্ষত্রিয়, ১৪ জন বৈশ্য এবং ২৯২ জন শূদ্র বিধবা সহমৃতা হয়েছিলেন। এর মধ্যে 'কলিকাতা কোর্ট অব সরকীটের সীমার মধ্যে' সহমৃতা হয়েছিলেন ৩৪০ জন।[৬১] ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ৪৬৩ জন সহমৃতা নারীর মধ্যে ৪২০ জন ছিলেন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার, এবং এর মধ্যে ২৮৭ জনই ছিলেন শুধুমাত্র কোলকাতা ডিভিশনের।[৬২] বাঙলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রাবল্য ছিলো বলে, বহুবিবাহকারী কুলীনদের মৃত্যুতে একই সঙ্গে তাঁদের বহু স্ত্রীকে সহমৃতা হতে হোত। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নদীয়ার জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাঁর ২২টি বিধবা স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। এ সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী সুকচরা গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছিলো। তাঁর ৪০ জন স্ত্রীর মধ্যে যে ১৮ জন তখন জীবিত ছিলেন, তাঁদের সকলেই সহমৃতা হলেন।[৬৩] এর পরবর্তী সময়ের একটি খবরে জানা যায়, 'মোং কোননগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বসুদ্ধ বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন……তাঁহার জীবদ্দশাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্তমানা ছিল। তাহাদের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী তাঁহার নিজ বাটীতে ছিল আর সকলে সব ২ পিত্রালয়ে ছিল।……ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে…কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁশবাড়ীয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই…চারিজন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে।[৬৪]

উনিশ শতকের বাঙলায় বাঙালী হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা যে কতো চরমে পৌঁছেছিলো তার প্রধান নজির সে সমাজে প্রচলিত এই নির্মম সতীদাহ প্রথা। পুরুষের চরম নির্দয়তা ও সংস্কারজনিত আচারপরায়ণতাব ফলে সেদিন 'সতীদাহ' নামে এই যে বিভীষিকাময় অধ্যায়টির সৃষ্টি হয়েছিলো, অন্ততঃ আধুনিক যুগের বাঙালী হিন্দু জাতির সামাজিক ইতিহাসে তা শুধু একটি কলঙ্ক-রেখাই টেনে রেখেছে। একথা মেনে নিয়েও জনৈক জীবনীকার এরূপ লিখেছেন, 'সহমরণে স্ত্রী জাতির বীরত্বের বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা স্বেচ্ছায়, সচ্ছন্দচিত্তে ও সহাস্যবদনে সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় অনল-প্রবেশ করিতেন এবং ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে করিতে ভস্মে পরিণত হইতে প্রস্তুত হইতেন,……তাদৃশ দেবী প্রকৃতি সাধ্বী মহিলাদের পতিভক্তির ঋণ পরিশোধার্থে কয়জন সাধু পুরুষ পত্নীর অনুগমন করিয়াছেন?'[৬৫] আমাদের মনে হয়, জীবনীকারের এরূপ

www.pathagar.com

উক্তি শুধু দুর্বলের সান্ত্বনারই নামান্তর। অন্য একজন জীবনীকার কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'কিন্তু বাস্তব কথা এই যে, দশ সহস্রের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও...স্বাধীনভাবে জীবন বিসর্জন করিত কিনা সন্দেহ।'[৬৬] সহমরণের সময় সতীর আত্মীয়রা যে তাঁর প্রতি অতিনিষ্ঠুরভাবে বল প্রয়োগ করতেন, তার প্রমাণ তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহ ও জে. পেগ্স্, ফ্যানী পার্কস্ প্রভৃতির গ্রন্থে[৬৭] বিস্তর পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণের একটি খবরে প্রকাশ, 'হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে...এক ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসর বয়স্কা নিজ পতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে... তাহার তৎকালের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল। ...অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা ভ্রম জন্মাইয়া এরূপ উৎকট কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধকরণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনিকরণ অতি দুরাচার নির্দ্দয়িক মনুষ্যের কর্ম্ম এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারী ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন...।[৬৮] জে. পেগ্স লিখেছেন, 'The use of force by means of Bamboos, is...universal through Bengal... After shee (widow) has circumambuated and ascended the pile, several natives leap on it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three ropes to the corps of her husband, and instantly throw over the two bodies, thus bound to each other. Several large bamboos, which being firmly fixed to the ground on both sides of the pile prevent the possibility of her extricating herself when the flames reach her, Logs of wood are also thrown on the pile, which is then inflamed in an instant.[৬৯]

রাজা রামমোহন রায় বলেন,... the relatives of widows have, in the burning of infatuated females, almost invariably used to fasten them down on the pile, and heap over them large quantities of wood and other materials adequate to the prevention of their escape...[৭০]

সহমরণ কুপ্রথার পেছনে শুধু কুসংস্কারচ্ছন্ন হিন্দুর ধর্মীয় উপলব্ধি বা দেশাচারই কাজ করেনি। এর পেছনে অন্য স্বার্থও নিহিত ছিল। বিধবার স্বার্থপর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর সম্পত্তির লোভেও এই গর্হিত কাজটিতে অনেক সময় লিপ্ত থাকতেন। সহমরণে বিধবার প্রবৃত্তি জাগাবার

www.pathagar.com

জন্য আত্মীয়গণ অর্থলোভী ব্রাহ্মণকে উৎকোচ দিয়ে নিযুক্ত করতেন। 'পতি বিরহে শোকোন্মত্তা, বাহ্যজ্ঞান শূন্যা' বিধবাকে মাদক জাতীয় দ্রব্য ভাঙ ইত্যাদি সেবন করিয়ে উন্মাদপ্রায় করে ফেলা হোত এবং সময় বুঝে সহমরণ বিষয়ে তাঁর মত গ্রহণ করা হোত। মোট কথা, যে কারণেই হোক, আর যেভাবেই হোক, উনিশ শতকের বাঙলায়ও বাঙালী হিন্দু বিধবাকে সহমৃতা হতে হয়েছে অত্যন্ত নির্মম-নির্দয়ভাবে—পাইকারী হারে। জনৈক লেখক হিন্দুনারীর এই সতীদাহ নিগ্রহের কথা স্মরণ করে যথার্থই বলেছেন, 'কবে কোন স্বপ্ন দেখিয়া, কোন দেবদূতের মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রকার বলিলেন, হিন্দু পত্নী মৃতভর্ত্তার চিতানলে প্রাণবিসর্জন করিবে, তাহাই হিন্দু নারী জীবনের চরম আদর্শ। হিন্দু-ললনা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, প্রাণের টানে বা লোক গঞ্জনার ভয়ে, পরকালের সুখের আশায় বা ইহকালের যশের লালসায় হিন্দুরমণী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।'[৭১] সতীদাহের ন্যায় বহুবিবাহ প্রথাও প্রাচীন হিন্দুযুগে প্রচলিত ছিলো। 'কিন্তু মধ্যযুগে বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার ফলে যে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলেনি।'[৭২] আধুনিক যুগেও এই কুপ্রথাটির প্রবলতা হিন্দু সমাজে অত্যন্ত জাঁকালো রূপেই ধারণ করেছিলো। পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বিভিন্ন কারণে শাস্ত্র ও আচার-পরায়ণ বর্ণাশ্রমী হিন্দুর বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের সংযোগ এক সময়ে লুপ্তপ্রায় হলেও, বাঙালী হিন্দু সমাজে বিভিন্ন বর্ণের সামাজিক স্থান বা মর্যাদা চিরাচরিত প্রথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো এবং বৃত্তির বদলে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রভৃতিতে বহুকাল আচরিত বিধিনিষেধই তখন জাতি-মর্যাদা নির্ণয়ের মূল নিয়ামক হয়ে পড়েছিলো। এছাড়া পূর্ব হতেই সমবর্ণের লোকদের মধ্যেও কুলীন-শ্রোত্রিয়-বংশজ প্রভৃতি উচ্চ-নীচ ভেদের সৃষ্টি হওয়ায় বৈবাহিক আদান-প্রদান হয়ে উঠে অধিকতর দুরূহ—বাঙলা দেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবলতার সূত্রপাত তখন থেকেই।

বাঙলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় আঠারো ও উনিশ শতকে, এবং এর জের চলেছিলো বিশ শতকেরও কিছু অংশ ধরে। ঐ সময়ের, বিশেষ করে উনিশ শতকের কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা ও এ সম্বন্ধীয় অনেক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

সেকালে উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে কন্যাকে বিবাহ না দিতে পেরে কোনো কোনো কুলীন সম্প্রদায়ের লোকেরা 'করণ' প্রথার আশ্রয় নিতেন। এই প্রথানুযায়ী প্রথমে একটি কুশমূর্তি রূপী কুলীন বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেয়া হোত। কুলীন কন্যা এই মূর্তিকে স্বামী জেনেই কপালে সিঁদুর পরতেন। পরে কুশমূর্তিটিকে আগুনে পুড়ে ফেলে অকুলীন আসল বরের সঙ্গে

www.pathagar.com

ঐ কন্যার বিবাহ দেয়া হোত। এছাড়া কুলীনদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিলো 'আদ্যিরস' প্রথার ঃ 'মৌলিক গোষ্ঠী পতি ধনী কায়স্থ তাঁহার কন্যাকে কোন মুখ্য কুলীনের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবার পূর্বে', প্রথমে ঐ কুলীন ছেলেকে একটি গরীব কুলীনের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইতেন। ইহাতে ছেলের "কুলরক্ষা" হইত। তারপর ঐ ছেলেকে গোষ্ঠীপতি মৌলিক নিজের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। ইহাকেই বলে "আদ্যিরস"। ...এরূপ বিবাহে প্রথমোক্ত কুলীনের মেয়েটি প্রায়ই পরিত্যক্তা হইত এবং দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি মৌলিকের কন্যাকে লইয়াই স্বামী বাস করিত।'[৭৩] উপযুক্ত কুলীন পাত্রের সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহ অন্যভাবেও সম্পন্ন হোত। কন্যার পিতা ঘটকের উপস্থিতিতে কোনো কুলীন পাত্রকে শুধু বলতেন, 'আমার কন্যা থাকলে আপনার হাতেই তাকে সমর্পণ করতাম'—এই মৌখিক প্রতিশ্রুতিতেই বিবাহের কাজ সমাধা হয়ে যেতো।[৭৪]

সেকালের কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতারা পাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-গুণ, স্বভাব-চরিত্র বা বয়স ও বিষয়-সম্পত্তির অপেক্ষা কৌলীন্য মর্যাদাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-গুণ বা বিষয়-সম্পত্তির দিক থেকে শতো উৎকৃষ্ট হলেও যদি পাত্রের কৌলীন্য মর্যাদায় সামান্যতম 'কলঙ্ক' দৃষ্ট হোত, তাহলে সে পাত্র ছিলো কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন পিতার নিকট সম্পূর্ণ অচল। অপর পক্ষে কুলীন পাত্র চোর-চরিত্রহীন বা মূর্খ হলেও সমাজে তার আদরের অন্ত ছিলো না। এরূপ শোনা যায়, একবার জনৈক গণ্ডমূর্খ চোর কোনো এক বিবাহের বরযাত্রী হয়ে গিয়ে সেখানে বায়া-তবলা চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়েন। কন্যাপক্ষীয় কয়েক ব্যক্তি তাঁকে পুলিশে দেয়ার পরামর্শ করছিলেন, এমন সময় 'কন্যাকর্ত্তা কোন সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, সেই চোর নিকষ কুলীন, তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চোর যদি তাঁহার অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তিনি আর পুলিশ ডাকিয়া কোন গোলমাল করিতে দিবেন না। চোর জেলে যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কন্যা-কর্ত্তার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কন্যাকর্ত্তা সেই রাত্রেই তাঁহার...দ্বিতীয় কন্যাকে সেই চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় বংশ মর্য্যাদা উজ্জ্বল করিলেন।'[৭৫] কৌলীন্য প্রথার এই মহিমা কীর্তনই বুঝি মধ্যযুগের 'কুলসার' গ্রন্থে করা হয়েছিলো ঃ

'আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়।।
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম।।'[৭৬]

কুলীনদের যেমন মেয়ে বিবাহ দেয়ার সমস্যা, শ্রোত্রিয় বংশজদের ছিলো তেমনি ছেলে বিবাহ দেয়ার সমস্যা। তাদেরকে 'পণ' দিতে হোত মেয়ে

www.pathagar.com

সংগ্রহ করার জন্য। এর ফলে সমাজে তখন একদল কন্যা ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়েছিলো। তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান হতে পাত্রী সংগ্রহ করে শ্রোত্রিয় বংশজদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতেন। 'ভরা' বা নৌকোতে করে পাত্রীদের আমদানী করা হোত বলে লোকে এ'দেরকে 'ভরার মেয়ে' বলতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কন্যা ব্যবসায়ীরা প্রায় ক্ষেত্রেই 'নিম্নজাতীয়' পাত্রীর আমদানী করতেন। তৎকালীন সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরে অবগত হওয়া যায়, একবার দু'ব্রাহ্মণ এক দরিদ্র মুসলমানের মেয়েকে ছ'টাকা দিয়ে খরিদ করে জনৈক বৃদ্ধ কুলীনের নিকট চারশো টাকায় বিক্রী করেছিলেন। বিবাহের পরে সেই মেয়ে একদিন অসাবধানতা বশতঃ হঠাৎ বলে ফেলেন, 'কদুছে কেয়া ছালান হোগা ?' এতে স্ত্রীর আসলরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁকে পরিত্যাগ করেন। কাজলাপাড়ার দু'ব্রাহ্মণও 'ঘটকের কথা প্রমাণে বিবাহ করে সন্তানাদির জনক হওয়ার পর জানতে পারেন, 'ঘটকেরা প্রতারণা পূর্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।' ভাটপাড়ার অন্য এক ব্রাহ্মণও অনুরূপ কৃত কন্যা বিবাহ করে পরে জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী 'পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যা'।[৭৭] তথাকথিত কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা ও বিবাহ-ব্যবসার স্বার্থে কুলীনরা যে এক একজনে কি পরিমাণ বিবাহ করতেন তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে এতদ্দেশীয় কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। 'কিন্তু, একথা যে সত্য ছিলো না, তা প্রমাণ করার জন্য ঐ সময়ের আর একটি পত্রিকায় বহু বিবাহকার কুলীনদের নাম-ধাম ও বিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়।[৭৮] তালিকার প্রথমাংশের ১২ জন কুলীনের মোট ৫৪৭ জন স্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে মায়া পাড়ায় রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি বিবাহ করে প্রথম এবং জয়রামপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায় এবং আড়ুয়ার রামকান্ত বন্দ্য ৬০টি করে বিবাহ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের তালিকা।[৭৯] ঐ তালিকার প্রথমাংশের ১৫ জন কুলীনের স্ত্রী-সংখ্যা ছিল ৭৭২ জন। এ'দের মধ্যে বসো নিবাসী ৫৫ বছর বয়স্ক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০টি বিবাহ করে প্রথম ও দেশমুখো নিবাসী ৬৪ বছর বয়স্ক ভগবান চট্টোপাধ্যায় ৭২টি বিবাহ করে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রকাশের ২০ বছর পরে আর একটি পত্রিকায়[৮০] বহু বিবাহকারী কুলীনদের অনুরূপ তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকা হতে জানা যায় যে, বর্ধমান, বাঁকুরা, বীরভূম, হুগলী, কোলকাতা, নদীয়া, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি বাঙলা-দেশের ২৭৬টি গ্রামের ১০১৩ জন কুলীন মোট ৪৩২১৩টি বিবাহ করেছিলেন। এর মধ্যে একজন ৩৪ বছর বয়সে ৩৫টি অন্যজন (শিশু) ৪ বছর

www.pathagar.com

বয়সে ৩টি কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানকালের একজন পণ্ডিত কুলীনদের এসব বিবাহ সমবন্ধীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা এরূপ লিখেছেন: 'এই সব কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন, তথাপি ইহা যে অমূলক নহে সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যে গ্রামে আমার জন্ম সেখানে এক বাড়ীতে দুই কুলীন ভাই ছিলেন। বাল্যকালে তাহাদের একজনের ছেলে গ্রামের বিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে পড়িত বলিয়া তাহাদের বাড়ী যাইতাম। এইরূপে তাহাদের অনেক খবর শুনিয়াছিলাম। দুই ভাইয়ের প্রত্যেকেরই ৫০/৬০টি করিয়া স্ত্রী ছিল।[৮১]

বহুবিবাহকারী কুলীনরা কিন্তু তাঁদের সমস্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কখনো নিতেন না। এসব স্ত্রীর অধিকাংশই তাঁদের পিত্রালয়ে জীবন কাটিয়ে দিতেন এবং তাদের গর্ভজাত সন্তানরাও মাতুলালয়েই মানুষ হতেন। অনেক সময় কুলীন পিতারা তাঁদের সন্তানদের চিনতেনও না।[৮২] এমনকি অনেক কুলীন পাত্র তাঁদের বহু শ্বশুরালয়ের নাম মনে রাখতে পারতেন না বলে খাতা পর্যন্ত করে নিতেন।

কুলীনদের বাড়ীতে সাধারণতঃ কয়েকজন মাত্র স্ত্রী থাকার সৌভাগ্য লাভ করতেন। বাকী সবাই পালাক্রমে স্বামীগৃহে আশা-যাওয়া করতেন—কিন্তু বেশীর ভাগ স্ত্রীর ভাগ্যেই সে সুযোগ ঘটতো না। তাই অনেক অনুরোধ-আব্দার ও অর্থের বিনিময়ে কোন কোন সময় শ্বশুররা জামাতাদের স্বগৃহে নেয়ার ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—এর এক জায়গায় কুলীন স্বামীর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন: 'তাঁহারা দয়া ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জিত।—কোনও অতি প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুর দাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন,সকল স্থানে যাওয়া হয়কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেখানে যাই।'[৮৩] কুলীন পাত্র একদিনের জন্যও তাঁর স্ত্রীর মুখ দেখেননি—অথচ সে স্ত্রী মা হতে চলেছেন[৮৪] এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার পিতাকে জামাতা-গৃহে আনার জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হোত। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই, তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য,......অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলোভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।'[৮৫]

মোট কথা, 'কৌলীন্য প্রথার' আশ্রয় গ্রহণ করে সেকালের তথাকথিত কুলীন ব্রাহ্মণরা বাঙলাদেশের বুকে যে বহু-বিবাহ প্রহসনের সৃষ্টি করেছিলেন,

www.pathagar.com

বীভৎসতার দিক থেকে তা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা রহিত—'এক গাছি পৈতার জোরে মূর্খ সর্বস্বপবিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সহস্র সহস্র বঙ্গ ললনার সর্বনাশ করে গেছেন'[৮৬] তা ভাবলেও শিহরিত হতে হয়।

চার

উনিশ শতকের বাঙলায় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো, তার তুলনা এদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিরল। বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, স্মৃতি-পুরাণে যে তার বহু অসংশয়িত প্রমাণ বিদ্যমান, এবং 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের' কিছুকাল পর্যন্ত যে এ বিবাহ সমাজে একেবারে অপ্রচলিত ছিলো না, তা বিদ্যাসাগরের আগে-পরে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে উনিশ শতকের বাঙলায় একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব বলা চলে বিদ্যাসাগরেরই। হিন্দু সমাজের স্থিতিশীলতাও বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্র ও আচারপরায়ণতা বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সার্থক হতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আইনের আশ্রয়ের কথা ভাবতে হয়েছিলো, এবং আইন করেই ১৮৫৬ খৃীস্টাব্দে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু আইন করে সতীদাহের মতো একটি বর্বর প্রথা রহিত করা যতো সম্ভব ছিলো, এর মাধ্যমে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মতো একটি ব্যবস্থা স্থিতিশীল ও আচারপরায়ণ হিন্দু সমাজে নতুন করে প্রবর্তন ও চালু করা ততো সহজ ছিলো না।[৮৭] আর সেজন্যই হয়তো, গোটা উনিশ শতকের বাঙলায় একশো বিধবারও বিবাহ হয়েছিলো কিনা সন্দেহ।

বিধবা বিবাহ বিরোধী-সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে প্রবল রূপ ধারণ করে সতেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যে। অবশ্য সতীদাহ প্রথা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিধবাদের নিয়ে তখনকার সমাজে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সতীদাহ যখন বন্ধ হয়ে গেলো (খৃীঃ ১৮২৯, ৪ঠা ডিসেম্বর), তখনই প্রশ্ন উঠলো, এবার তাহলে কি করা? রক্ষণশীল-চূড়ামণি মনুর বিধানের প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেলো, দৃষ্টি পড়লো নতুন করে; ব্রহ্মচর্য পালনের চেয়ে উত্তম কাজ বিধবার পক্ষে আর কিছুই থাকলো না। বিনা প্রতিবাদে তাঁকে মাথা পেতে নিতে হোল সংসারের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণা শাসন প্রভৃতি এবং জীবনের যতোসব সংযমব্রত ও বিধিনিষেধ ঝঞ্ঝাটকে। সংসারের কোনো শুভকর্মেই ভাগ্যাহত এই বিধবা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না—এতে যে পরিবারের অমঙ্গল! শতো দুঃখ আর দুর্দশার বোঝা নিয়ে একান্ত নুয়ে পড়লেও, তাঁর পক্ষে

www.pathagar.com

দীর্ঘশ্বাস ফেলা অথবা কারো সঙ্গে এ নিয়ে সামান্যতম কথা বলাও নিষিদ্ধ। তিনি কারো কাছে পত্র লেখতে পারবেন না—কোনো পুস্তক পাঠ করতে পারবেন না। এমনকি কারো সঙ্গে হেসেও এতোটুকুন আলাপ করতে পারবেন না। তাঁর কাজ শুধু বুকের 'নরকাগ্নির ন্যায় লালসার আগুন পাষাণে চাপিয়া রাখিয়া, দাসীর ন্যায় খাটিয়া নীরবে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া'[৮৮] পড়া। সেকালের একটি সংবাদপত্রে জনৈক পত্র-লেখক এরূপ বলেছেন, 'যাঁহারা ব্রহ্মচর্য বলিয়া চীৎকার করেন তাঁহারাই বিধবাদিগের দ্বারা সাংসারিক সকল কার্য করাইয়া লন। স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখাইতে মহাযত্ন, কিন্তু বিধবা ভগ্নির হস্তে পুস্তক দেখিলেই মহা বিপদ মনে করেন।.........সে সংসারের দাসী এবং পরিচালিকা।'[৮৯] আদর্শ সংযম দেখানোর জন্য বিধবাকে নিরামিষ-ভোজী ও একাহারী হতে হবে। তাঁকে পরতে হবে সাদা থান, করতে হবে একাদশী আর সকল প্রকার আকর্ষণ ও প্রলোভনে থাকতে হবে উদাসীন। 'তাহার প্রতি তাহার মৃত্যু স্বামীর অনুরাগ না থাকিলেও, তাহার স্বামীর প্রতি তাহার নিজের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকিলেও তাহার বৈকুণ্ঠবাসী স্বামী জীবীতকালে লম্পট, সুরাপায়ী,......দুরাচার হইলেও, পরজন্মে তাহার সঙ্গসুখ লাভের আশায় তাহার বিধবা পত্নীকে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে।......তাহার রোগে ঔষধ নাই, ক্ষুধায় অন্ন নাই,......শোকে শান্ত্বনা নাই,......তাহার চতুর্দিকে হাসি, রাসলীলা, বিলাতী ভোগ, অবাধ অসংযত বিলাস, গল্প, উপন্যাস, গরল, সুধা, নাচ, গান; কিন্তু সে মধ্যস্থলে ভোগের আগুনে বেষ্টিতা হইয়া অবরুদ্ধ পরিবারে দাহ্য পদার্থময়ী বর্ত্তিকার ন্যায় আত্মরক্ষা করিয়া শক্তির পরিচয় প্রদান করিবে।'[৯০]

উনিশ শতকের বাঙলার এরূপ অবস্থায় অবলা বাঙালী হিন্দু বিধবার সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। ১৮৯১ খৃস্টাব্দের সেন্সাস থেকে জানা যায়, তখন সমগ্র বাঙলাদেশে বাঙালী হিন্দু-বিধবার সংখ্যা ছিল ২,৫৯৩,০৫৪ জন, এর মধ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের বিধবা ছিলেন ৭৯,৬৫৫ জন, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সেয় ১২৭,৪৪৮ জন, এবং ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সের বিধবা ছিলেন ২০৮,৫১৩ জন।[৯১] ১৯০১ খৃস্টাব্দের সেন্সাস থেকে অবগত হওয়া যায়, তখন বাঙলাদেশের, ২৪,৯০৬,৩২৪ জন হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ৫,৪৩৫,০৪১ জন ছিলেন বিধবা।[৯২] অন্য একটি পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে সমগ্র বাঙলাদেশের ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের প্রতি এক হাজার বাঙালী হিন্দু নারীর মধ্যে প্রায় ২০০ জনই বিধবা ছিলেন।[৯৩]

তখনকার সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিলো বলে বালিকা বিধবার সংখ্যাও অনেক বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৯৪]

www.pathagar.com

যে বালিকা মায়ের বুকের দুধ ছাড়ার আগেই বিধবা হয়েছেন, পরিণত বয়সের কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতই তাঁর জীবনের একমাত্র সহায় হয়ে থাকলো। 'সুপ্রবীণ পিতা নিজের অল্প বয়স্কা বিধবা কন্যার বৈধব্যানুষ্ঠানে বিষাদ রাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।'[১৫] এরূপ পিতার পক্ষে বিধবা কন্যার বৈধব্য-যন্ত্রণার কথা ভাববার অবকাশ কোথায়! বিদ্যাসগর অত্যন্ত দুঃখ করেই বলেছিলেন, 'তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।'[১৬] কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে এই 'দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া' যাওয়ার ব্যাপারটি যে ছিলো সম্পূর্ণ অসম্ভব, একথা বলাই বাহুল্য। আর এর স্বাভাবিক পরিমাণের ফলেই অনেক বিধবা সংযম হারিয়েছেন, আশ্রয় নিয়েছেন, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ হত্যা পাপের। বিধবাদের এই পদস্খলনে সেকালের বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে যে নৈতিকতার বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৭৭৬ সনের চৈত্র সংখ্যার তত্ত্ববোধনী পত্রিকা এক জায়গায় লিখেছেন, 'যে সমস্ত পরিবারে কোন কালে কোন প্রকার কলঙ্ক স্পর্শ হইতে শ্রুত হওয়া যায় নাই, তাহাও...পাপময়, ও কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে।...প্রত্যুত, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রাদি বহু ব্যক্তি স্বপরিবারে এক গৃহে একত্রে বাস করাতে, এবং স্ত্রীলোক-পরম্পরা সকলে অবরোধ মধ্যে সতত অবরুদ্ধ থাকাতে, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর পাপের উৎপত্তি হয়, যে বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বনও তদপেক্ষায় শ্রেয়স্কর।......ভ্রূণহত্যা ঐ পাপময়ী প্রথার অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল।......ব্যভিচারিণীর জনক-জননী ও শ্বশুর শ্বশ্রূ উহা না জানিতে পারেন এমত নহে, বরং অনেকে কলঙ্ক ভয়ে তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।'[১৭] সন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে[১৮] উল্লেখ করা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে তাঁর গ্রামের একজন বিধবা গর্ভবতী হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর সদ্যজাত শিশুটিকে সূতিকা গৃহেই গলাটিপে হত্যা করা হয়। উক্ত গ্রন্থ হতে আরো জানা যায়, ঐ সময় অনা একজন বিধবাও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে কোনো রকমে বেঁচে থাকেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এদেশে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিলো ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে। বিদ্যাসাগর মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। তার মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশিত শ্রী প্রফুল্ল-কুমার সরকারের 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' হতে অবগত হওয়া যায় যে, নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু অল্প বয়স্কা বাঙালী হিন্দু

www.pathagar.com

বিধবা বাস করেন। 'ইহারা যে সকলেই......ধর্মভজনের জন্য তীর্থ-বাসিনী হয়, তাহা নহে।...একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, তাহারা মুহূর্তের ভুলে পদস্খলনের জন্য বাধ্য হইয়া দেশ ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তীর্থে জীবনযাপন করিতে আসিয়াছে। তীর্থেও তাহারা কেবল ধর্ম্মাচারণ করিয়া জীবন যাপন করে, এমন কথা বলা যায় না।'[৯৯] বৃন্দাবনে আমেরিকান খ্রীস্টান মিশন হাসপাতালে এ সমস্ত বিধবার অনেকেই সন্তান প্রসব করেন এবং সদ্যজাত শিশুটিক মিশনের হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেন, এ খবরও 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'তে আছে।[১০০] এর থেকেই ধারণা করা সম্ভব, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পূর্বে বা তার পরেও অনেক বাঙালী হিন্দু বিধবার জীবনেই নৈতিকতার মূল্যবোধ কী চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল।

পাঁচ

উনিশ শতকের বাঙলায় বাল্য-বিবাহ প্রথাও বিশেষ প্রবলতা লাভ করেছিল। এর পেছনেও কাজ করেছিলো, সেকালে শাস্ত্র ও আচারপরায়ণ বাঙালী হিন্দুর সংস্কারাচ্ছন্ন মানস-প্রবণতা। ধর্মসূত্র, স্মৃতি ও মহাভারতে বাল্য-বিবাহের বিধি রয়েছে। কিন্তু এগুলোতে আবার এর ব্যতিক্রমেরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে তো কোনো বাল্য-বিবাহেরই উল্লেখ নেই। ঐ গ্রন্থ হতে যে-সব মহিলার কথা জানতে পারা যায়, তাঁরা সকলেই পূর্ণ যুবতী অবস্থায় বিবাহিতা হয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগ হতে অন্ততঃ বাঙলাদেশে বাল্য-বিবাহ-প্রথা কঠোরভাবেই প্রতিপালিত হ'তে শুরু করে। এযুগের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা তখনকার বাঙলাদেশে বেদবাক্যের ন্যায়ই গৃহীত হোত। তিনি তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে লিখেছেন, 'কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিণী, ১০ বৎসরে কন্যকা এবং ইহার পর রজঃস্বলা হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্নসহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য।......যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হওয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা বৃষহত্যা পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত।'[১০১] এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'অষ্টমবর্ষীয় কন্যাদান করিলে পিতা মাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়, দশম বর্ষীয়াকে প্রাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোক প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগ তৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণি পীড়নের

www.pathagar.com

প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।'[১০২] এই 'স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিতফল-মৃগতৃষ্ণা'কেই মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুরা ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করতে শুরু করেছিলেন। আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলায় এই ধারাটি কৌলীন্য প্রথা ও বৃদ্ধের বালিকা বিবাহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এক বিষময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। যার ফলে 'বলিপলীত কলেবর ধবলিতে কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসঙ্গ কল্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত' জনৈক বৃদ্ধকেও 'কোন এক...... সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে' স্বচেষ্ট হতে দেখা যায়।[১০৩] অন্য একটি খবরে জানা যায়, 'চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা'র জনক এক পাত্র দেখে' হাজার যদি শিশুকন্যা হয় তত্রাপি'ও পাত্রী 'সুশীলা' তাঁকে বিবাহ করবেন না বলে বেঁকে বসেন। 'এই সম্বাদ পাইয়া যত ২ আদবুড়া ও পৌণবুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ কেহ গোঁপ ছাটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ কেহ মাথাময় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়ে্য ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া ট্যাঁকে দিয়া ও গোঁপে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল'।[১০৪] সেকালের বৃদ্ধদের বালিকা বিবাহ করার এই অস্বাভাবিক প্রবণতার পরিণাম যে কতো বীভৎস রূপ ধারণ করেছিলো, তার প্রমাণ মেলে, জনৈক হরিমাইতি কর্তৃক তাঁর বালিকা স্ত্রীকে বলপূর্বক সহবাস করে মেরে ফেলার ঘটনায়।[১০৫]

সেকালের বাঙালী হিন্দু সমাজের নামমাত্র বয়সের শিশু ও বালক-বালিকার মধ্যে যে পরিমাণ বিবাহ সংঘটিত হোত, তার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস হতে জানা যায়, তখন সমগ্র বাংলাদেশে ৪,১৯৮, ৮১৯ জন বাঙালী হিন্দু-পুরুষ বিবাহিত ছিলেন। এর মধ্যে ০ থেকে ৪ বছর বয়সের বিবাহিত শিশুর সংখ্যা ছিলো ২,৩১৩ জন, ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের বালক ৯,৮৭৮ জন, এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোর ছিলো ৬৩,৩২৯ জন। ঐ সময়ে বাঙালী হিন্দু বিবাহিতা মহিলার সংখ্যা ছিলো ৩,৮৯০, ৭৭৬ জন। এর মধ্যে ০ থেকে ৪ বছর বয়সের বিবাহিতা শিশু বালিকার সংখ্যা ছিল ১৩,৩১৯ জন, ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের বালিকা ২০৩,১৬০ জন, এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের কিশোরী ছিলো ৫৬৬,০৫১ জন।[১০৬] অন্য একটি পরিসংখ্যানে অবগত হওয়া যায়, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে সারা বাঙলাদেশে ০ থেকে ৫ বছর বয়সের প্রতি একহাজার বালকের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ জনই ছিলেন বিবাহিত। ঐ সময়ের সমবয়সের প্রতি একহাজার বালিকার মধ্যে বিবাহিতা ছিলেন প্রায় দেড়শো জন।[১০৭] এই থেকেই ধারণা করা সম্ভব, গোটা উনিশ শতকের বাঙলায় 'পুত্তল পুত্তলিকার ন্যায় বালক বালিকার বিবাহ'[১০৮] বাঙালী হিন্দু সমাজে কতোটা ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিলো।

www.pathagar.com

ছয়

উনিশ শতকের বাঙলায় সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির ন্যায় আরো কয়েকটি নিষ্ঠুর প্রথাও বর্তমান ছিলো। এর মধ্যে চড়কপুজা এবং নরবলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের বাঙলায় চড়ক পুজার বীভৎসতা চরমে পেঁছেছিলো। তখন এই উপলক্ষে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু একটি শাল গাছের খুঁটি মাটিতে প্রোথিত করা হোত—একে বলা হোত চড়ক গাছ। এই চড়ক গাছের শীর্ষে একটি লম্বা-কাষ্ঠ-দণ্ড এমনভাবে সংযুক্ত করা হোত, যাতে একে কেন্দ্র করে কাষ্ঠ দণ্ডটি শূন্যে বৃত্তাকারে আবর্তিত হতে পারতো। উক্ত কাষ্ঠ-দণ্ডের এক প্রান্তে গাজুনে সন্ন্যাসীকে গামছা প্রভৃতি দিয়ে বেঁধে, আর এক প্রান্তে একটি দড়ির সাহায্যে শূন্যে চক্রাকারে আবর্তিত করা হোত। কোথাও কোথাও একটি বড়ো বাঁকানো লোহার কাঁটা সন্ন্যাসীর পিঠের চামড়ার মধ্যে বড়শির মতো গেঁথে দেয়া হোত।[১০৯] সেকালের রচিত অনেক গ্রন্থ ও সংবাদপত্রে চড়ক পুজার হাস্যকর চিত্র ও নিষ্ঠুরতার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেসব খবরের প্রতি লক্ষ্য করলে, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় বর্ণিত চড়ক পুজার দৃশ্যসমূহকে শুধুমাত্র ব্যঙ্গচিত্র বলেই মনে হয় না—এ যেনো তৎকালীন সমাজের বাস্তব এক প্রতিচ্ছবিই। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিলের খবরে জানা যায়, 'মোং কলিকাতায়......একপ্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল......তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। একজন হিন্দু সহীস ও তার একজন স্ত্রী এই দুইজন একত্র হইয়া এককালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ-প্রদীপ সূর্য্য জাজ্জ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।'[১১০] ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ২১শে এপ্রিলের একটি খবরে এরূপ লেখা হয়, 'চড়ক পুজার সময় সন্ন্যাসিদের মধ্যে কেহ কেহ মত্ত হইয়া পথেতে এমত কদর্যরূপে নৃত্যাদিত করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হয়'।[১১১] ১৮৩৩ খ্রীস্টব্দের ২৭শে এপ্রিলের একটি খবরে প্রকাশ, 'চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটির বারান্দার উপর লোকের মহা কোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দল সকল বাণ প্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্য সহিত আসিল···কয়েকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখানা ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নিৰ্ম্মাণ হয় ......পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা শরীর আবৃত করতঃ দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবার ন্যায় একজন তাহার গোদ পুজা করিতে-ছিল...দেব পুজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পুজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না'।[১১২] ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে-র অন্য একটি

www.pathagar.com

খবরে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ 'আমি এইবার কোন স্থানে দুই মোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্ন্যাসিকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে একজন মহাদেবের ন্যায় বেশ ভূষাকরতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুঁড়িয়া উর্দ্ধপদে অধঃ শিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। আরও বারুনী-পানোম্মত্ত হইয়া বারংবার কহিতেছে দেপাক্ দেপাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারিজন সন্ন্যাসিকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলেই মুমূর্ষুপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশধারী......ভক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবং তাহার যেস্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎকাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধ করি ঐ সন্ন্যাসি ছিড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত।'[১১৩]

উনিশ শতকের বাঙলায় প্রচলিত অন্য একটি নিষ্ঠুরতম প্রথা হচ্ছে নরবলি। বহু প্রাচীন যুগ হতেই ভারতীয় সমাজে এ নরবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে সুদ্রকের ও মহীরাবণের কাহিনী এবং মহাভারতে জরাসন্ধের কাহিনী হতে প্রমাণ মেলে যে, সে যুগেও এ ধরনের ঘটনা প্রচলিত ছিলো। পরবর্তীকালে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণদের পক্ষে গো হত্যা, অশ্বমেধ ও নরবলি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্মের অভ্যুত্থান হয় এবং বামাচারী তান্ত্রিক সাধকরাই সম্ভবতঃ নর-বলিকে আবার শাস্ত্রীয় মহিমা প্রদান করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত কালিকাপুরাণে নরবলি দানের শাস্ত্রীয় আচারের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। পূর্ব ভারতের কামরূপ অঞ্চল তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিলো এবং সমগ্র মধ্যযুগ ধরে এই তান্ত্রিক ধর্ম বাঙলা, আসাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রভাব লাভ করেছিলো এবং সম্ভবতঃ এরই ফলে উনিশ শতকের বাঙলায় নরবলির ব্যাপারটি (গোপনীয়ভাবে হলেও) অনেকটা স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছিলো। W. Ward, Rev. Long, W W. Hunter প্রমুখের গ্রন্থ ও রচনায়[১১৪] এবং সেকালের সংবাদপত্রসমূহে এই নিষ্ঠুর-জঘন্য প্রথাটির অনেক লোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। Long-এর বিবৃতি হতে জানা যায়, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কালীঘাটের জনৈক হিন্দু এক মুসলমান নাপিতকে একটি বলির ছাগল চেপে ধরতে বলেন। নাপিত ছাগলটিকে চেপে ধরলে, হিন্দু ভদ্রলোক ছাগল বলি না দিয়ে ঐ নাপিতকেই বলি দিয়ে ফেলেন। Hunter-ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যশোরের লক্ষ্মীপাশা গ্রামে কালীমূর্তির সম্মুখে একটি মুসলমান বালককে বলি দেয়ার কথা লিখেছেন।[১১৫] ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণ হতে জানা যায়, 'তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি......ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে...পিতলের

www.pathagar.com

বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে...কেহ ২ অনুমান করে যে নরবলি হইয়া থাকিবেক।'[১১৬] একই বছরের ২২শে জুন সংখ্যার খবরে বলা হয়, 'শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদান রূপে খুন হইয়াছে।'[১১৭] ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাইর বঙ্গদূত লিখেন, 'কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলির অন্তর্বর্ত্তি কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারিরা দ্বারবদ্ধ করণান্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারিরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগল ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে'।[১১৮] ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর জ্ঞানান্বেষণের একটি খবর হতে জানা যায়, 'একদিবস দেবীর (বৰ্দ্ধমানের নিকট রুকিমণী দেবী) পূজক ব্রাহ্মণ ··মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্ত প্লাবিত··· তাহার দুই চারিদিন পরে উক্ত নদ (মন্দিরের নিকটস্থ পুষ্করিণী) হইতে এক মুণ্ডহীন শব ভাসিয়া উঠিল'।[১১৯] ঐ বছরের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংখ্যার সমাচার দর্পণে লেখা হয় 'সম্বাদ প্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বৰ্দ্ধমানে শ্রীশ্রী রঙ্কিনীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্ত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে'।[১২০]

উনিশ শতকের বাঙলায় শাস্ত্র ও আচার সর্বস্ব বাঙালী বর্ণহিন্দুর জীবনে যখন নৈতিকতার মূল্যবোধ চরমভাবে লাঞ্ছিত, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক অসঙ্গতির বোঁজা-ভারে যখন সে ক্লান্ত, তখন (মূলতঃ ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভের ফলে নব-জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে) শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালী হিন্দুর একটি অংশ, চিরাচরিত ধর্ম-সমাজ-নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অবজ্ঞা-বিদ্রোহে ফেটে পড়েন এবং তার প্রতিকার প্রয়াসেও লিপ্ত হন, তাঁদের অপর নাম ইয়ং বেঙ্গল—যুক্তি আর কর্মময় প্রাণশক্তির বাস্তব নিদর্শন। তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস ও কর্মক্ষেত্রের শক্তিমান দোসর ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় প্রমুখ। পরবর্তী সময়ের বিদ্যাসাগর অন্ততঃ প্রাণশক্তির বিচারে তাঁদেরই সার্থক উত্তরসাধক। কিন্তু সে সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাচীন-পন্থী বাঙালী হিন্দুরাও তাঁদের সনাতন ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়াস, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া। এর ফলে গোটা উনিশ শতকের বাঙলায় যে একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার তুলনা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে বিরল।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের বাঙলায় হিন্দুর চিরাচরিত ধর্ম, শাস্ত্রীয় ও সমাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাজা রামমোহন রায়। একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বেদান্ত সূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদ্-গুলোর বঙ্গানুবাদ করে প্রচার করতে থাকেন। সে সময়ে সক্রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তি 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের কটূক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। রামমোহনও ভদ্রভাষায় তার জবাব দিয়েছিলেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭ খৃীঃ) লিখে। তিনি 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ খৃীঃ) ও 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯ খৃীঃ) লিখে, সতীদাহ যে অশাস্ত্রীয় ও নীতিবিরুদ্ধ তা প্রমাণ করেন। এতে প্রতিবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ করেছিলেন 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। এ ছাড়া বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রামমোহনকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন 'চারি প্রশ্ন' (১৮২২ খৃীঃ) এবং 'পাষান্ড পীড়ন' (১৮২৩ খৃীঃ)। রামমোহনকেও লিখতে হয়েছিল চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২ খৃীঃ) ও 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩ খৃীঃ) প্রভৃতি। ১৮২৯ খৃীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর 'সহমরণ বিষয় পুস্তিকা। ঐ বছরেই আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হয়।

ভারতের মুসলমান শাসনামলে সহমরণ প্রথা বন্ধ করার কিছু চেষ্টা চলেছিলো। পরে ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ শাসকরাও এই কুপ্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজরাও এই প্রথা নিবারণের জন্য অনেকদিন থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ এদেশীয়দের অসন্তুষ্টির ভয়েই, তাঁরা এই ব্যাপারে সহসা আইন করার সাহস পাননি। পরবর্তী সময়ে প্রধানতঃ রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তি ও খৃীস্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাতেই ভারত সরকার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হলে, কালীনাথ রায় চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এতে কিন্তু প্রাচীন-পন্থী নিমাই চাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক প্রমুখ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা যেনো এই সময়ে সতীদাহের বিপক্ষীয়দের লক্ষ্য করে দস্তুর মতো বিষোদগার করতে থাকে। তাঁরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য স্থাপন করেন ধর্মসভা এবং সতীদাহ নিবারণ-আইনের বিষয়টি যাতে পুনর্বিবেচনা করা হয়, তার জন্য চেষ্টা চালান বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। কিন্তু এতে ফল হয়নি কিছুই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়ে মূলতঃ বাঙলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ-চিন্তার নেতৃত্ব যুগিয়েছেন তাঁরাই। ধর্ম বিষয়ে তাঁরা ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তাই প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মকে তাঁরা আঘাত করেছেন যুক্তির তীক্ষ্ণ সায়কে—সে ধর্মের অজস্র বৈপরীত্যের প্রতি প্রকাশ করেছেন গভীর বিতৃষ্ণা। কেউ কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও, স্বদেশের কল্যাণ চিন্তাই ছিলো তাঁদের সকল কর্মের নিয়ামক। কিন্তু 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সেকালের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি ইঁহাদের দেশ ও মাটির সহিত সম্পর্কশূন্য অমূল তরু বলিয়া মনে করিতেন। ফলে গোমাংস ভক্ষণ, সুরাপান ও হিন্দুয়ানির বিরোধিতাই ইয়ং বেঙ্গলের একমাত্র আদর্শ—এইরূপ বিকৃত ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়।'[১২১] রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু এই ধারণার বশবর্তী হয়েই, আঘাত হানলেন ইয়ং বেঙ্গল শক্তির উৎসমূলে—তাঁদের চক্রান্তেই চাকরী হারালেন হিন্দু কলেজের সুযোগ্য শিক্ষক, নব্যবঙ্গের দীক্ষা-গুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। 'নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের ডিরোজিও নবযুগের নির্মল যুক্তি ও শাণিত বুদ্ধির আলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন—এই তাঁর অপরাধ।'[১২২] চাকরী হারাবার বছরই (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ) ডিরোজিও ইহলীলা ত্যাগ করেন। রামমোহন রায় ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের প্রাণ-শক্তি ও কর্ম প্রচেষ্টার সার্থক উত্তর সাধক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত হয়েও বিদ্যাসাগর প্রথম শ্রেণীর সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই এদেশে পরিচিত হয়েছেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বহু বিবাহ নিরোধের চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণ সন্তান ক্ষাত্রিয়োচিত মানসিক বলবীর্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষেই তার জুড়ি মেলে না, না সে যুগে না এ যুগে।'[১২৩] উনিশ শতকের বাঙলায় প্রধানতঃ বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, আমাদের সামাজিক ইতিহাসে যে তার তুলনা বিরল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর নিজেও এটাকে তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের শুরুতে (১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ) রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও—শিষ্য বেঙ্গল স্পেকটেটর নামে যে পত্রিকা বের করেছিলেন তাতে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু হতে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ-প্রবর্তন-চেষ্টা একটি ব্যাপক রূপ লাভ করতে থাকে। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র, বিধবা

www.pathagar.com

বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রতিপন্ন করার জন্য স্মার্ত পণ্ডিতদের নিকট থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহের চেষ্টা চালান। পণ্ডিতগণ বিধবা বিবাহকে শাস্ত্র-সম্মত মনে করলেও, প্রধানতঃ 'এক ঘরে' হওয়ার ভয়ে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেননি। কোলকাতার বহুবাজার নিবাসী নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো কয়েকজনও এই ব্যাপারে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। পটলডাঙ্গানিবাসী শ্যামাচরণ দাস তাঁর বিধবা মেয়ের বিবাহ দেবার জন্য বহু কষ্টে এক ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু পরে আবার উক্ত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষরকারী স্মার্ত পণ্ডিতরাই তার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে **British India Society** বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু এতেও ফল হয়নি কিছুই। এর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে সর্ব-শুভকরী পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে তাঁর যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তাতে বালিকা বিধবাদের বহুবিধ দুর্দশার কথা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।[১২৪]

বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য তার প্রচলন যে অত্যাবশ্যক, এবিষয়ে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি পুস্তিকা ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর স্বনামে প্রকাশ করেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' শিরোনামে রচনাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, ১৮৮৫—৫৬ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়েছিলো। ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগরের সমর্থন করেন। বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রত্যুত্তরে বিদ্যা-সাগরের দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং এর উপক্রম ও উপসংহার ভাগও মন্তব্যসহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো (অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক)। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সেকালের বাঙালী হিন্দু সমাজে শুধুমাত্র মানবতার যুক্তি ও শাস্ত্র নির্দেশই যথেষ্ট নয়, এজন্য সরকারী আইনের সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। আইনের মাধ্যমে সরকারের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তিনি ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ভারত সরকারের নিকট যে আবেদন পত্রটি প্রেরণ করেন. তাতে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর ছিলো। এছাড়া বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার বিধবা বিবাহের সমর্থনকারী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে একাধিক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে, সেগুলো ব্যবস্থাপক সভায় পাঠিয়েছিলেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগরের নামে এরূপ কিছু গান সমাজে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো ঃ

www.pathagar.com

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে,
সদরে ক'রেছো রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।······
আর কেন ভাবিস্‌ লো সই, ঈশ্বর দিয়েছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই,।'[১২৫]

শান্তিপুরের তাঁতীরা এ গাণাঙ্কিত শাড়ীও বের করেছিলেন, এবং সেসব শাড়ী 'অনেকেই আগ্রহাতিশয়ের সহিত অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিত।'[১২৬] এই সময়ে রাধাকান্তদেব—যাঁকে যথার্থই বলা হয়েছে **'the Hindu of Hindus'**[১২৭]-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রও ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়েছিলো। কিন্তু এতেও ফল হয়নি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়ে গিয়েছিলো। এবং আইনানুসারে প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন (ডিসেম্বর, ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে) বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধু, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিদ্যাসাগর তাঁর একাধিক রচনার মাধ্যমে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বহুবিবাহের বিরোধ কল্পেও বলিষ্ঠ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এর আগে রামমোহন রায়ও তাঁর 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ (১৬ই অগ্রহায়ণ,—১৭৪১ শক) বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখে-ছিলেন। তবে এই ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়েছিলো, পরবর্তী সময়ের বিদ্যাদর্শন পত্রিকায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। তাঁরা ঐ পত্রিকার ২য় ও ৩য় সংখ্যায় (জুলাই-আগস্ট, ১৯৪২, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৭৬৪ শক) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য আবেদন ও এই প্রথার কুফল নিয়ে আলোচনা করেন, এবং এই ব্যাপারে আইন তৈরী ও তা প্রযুক্ত করার জন্যও পরামর্শ দেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী—সুহৃদ সমিতি' স্থাপিত হয়েছিলো, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে এই সভার পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহ নিরোধ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন।[১২৮] বহুবিবাহের বিপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়াই উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলো যথাক্রমে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট ও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এর বহু আগেই (২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) তিনি আইন করে বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেছিলেন। সেই সময়ে বহুবিবাহ প্রথা রহিত

www.pathagar.com

করার জন্য আরো কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত ১২৭টি আবেদনপত্রও ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়েছিলো। অপরদিকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তিও (যাঁরা বহুবিবাহকে হিন্দুধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করতেন) বহুবিবাহ প্রথার স্বপক্ষে সরকারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেন। ১৮৬৬ খৃীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট, ভারত সরকার বাঙলা সরকারকে জানিয়েছিলেন এ দেশের কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি বহুবিবাহের বিরোধিতা করলেও, বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মধ্যেও অনেক প্রধান ব্যক্তি রয়েছেন। এরপর বাঙলা সরকার এই ব্যাপারে মতামত প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, হবহাউস, প্রিন্সেস সত্যশরণ ঘোষাল, বিদ্যাসাগর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র। বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর সকল বাঙালী সদস্যই আইন করে বহু বিবাহ রহিত করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। অপরদিকে তারানাথ বাচস্পতি, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্ম নামে 'অতি অল্প হইল' (মে. ১৮৭৩ খৃীঃ), 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃীঃ), এবং 'ব্রজবিলাস। 'যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য' (নভেম্বর ১৮৮৪ খৃীঃ) লিখে এ সমস্ত রচনার উত্তর প্রদান করেছিলেন। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ততো দস্তুর মতো সোচ্চার হয়েই উঠেছিলেন। তাঁর--

'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে ?............
সকলেই তুড়িনারে বুঝি নাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ।।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-ঘটন।। [১২৯]

জাতীয় বহু কবিতাই এর প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাশ্চাত্য-জ্ঞান ও উচ্চশিক্ষা লব্ধ খ্যাতিমান ব্যক্তিও সেদিন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী-গোবিন্দলালের 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়লেন, 'যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?' 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ লিখেছেন : 'স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে

www.pathagar.com

বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হয়েছিলেনে।……ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিবনা, কিন্তু…… উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ……উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহু বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি।[১৩০]

উনিশ শতকের বাঙলায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ সহ নব্যপন্থী হিন্দুরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ খৃীষ্টাব্দে (ভাদ্র, ১৭৭২ শক) সর্বশুভকরী পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে বিদ্যাসাগর যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন, তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির যুক্তিবাদ ও মর্মস্পর্শী আবেদন, সেকালের বাঙলায় বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। ১৮৮৫ খৃীষ্টাব্দ থেকে পার্শী মালাবারি এই আন্দোলনে যোগ দেন, এবং এ বিষয়ে তিনি একটি বই লেখায়, বাল্য-বিবাহের কুফলের প্রতি সরকার জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন পন্থীরা বরাবরই এই ব্যাপারে আইন করার তীব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন। উপরন্তু, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল রচনার মাধ্যমে তাঁরা এই প্রথার সুফল ও প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যাখ্যা করে চলেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখলেন, ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুইটীকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে?[১৩১] সেকালের কোনো কোনো লেখকের রচনায় যেনো একথারই প্রত্যুত্তর ধ্বনিত: 'বাল্যবিবাহে যাঁহারা দম্পতি সুখেব ঘনীভূত রসাস্বাদন করিবার আশা করেন তাঁহাদের নিজ নিজ দাম্পত্য বিবরণ পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।'[১৩২]

১৮৭৩ খৃীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়েছিলো। এর সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। কিছু দিন পরে এ সভার সভ্যগণ 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।[১৩৩] ১৮৮৯ খৃীষ্টাব্দে হরিমাইতি তাঁর বালিকা স্ত্রীকে জোরপূর্বক সহবাস করে মেরে ফেলার ফলে, বাঙলাদেশে ও বাঙলা-দেশের বাইরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। কোলকাতার **Health Society** এবং ৫৫ জন মহিলা চিকিৎসক এই ব্যাপারে মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন। অবশেষে প্রধানতঃ

www.pathagar.com

মালাবারি এবং সমাজ-সংস্কারকদের প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিলো—এতে বার বছরের কম বয়সের স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করলে স্বামী দণ্ডনীয় হবেন, এরূপ ব্যবস্থা থাকে। এই বিলের বিরুদ্ধেও রক্ষণশীলরা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। 'চিত্র দর্শন' পত্রিকা লিখেন, 'সহবাস সম্মতি আইন লইয়া দেশময় ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল। কলিকতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের জন্য, আইনের জন্য কখনও যে এত লোক একত্রিত হয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।...এই সময়ে হিন্দুগণ কাতর হইয়া জগজ্জননী মঙ্গলময়ী কালীর আরাধনার জন্য কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন। সেদিন কালীঘাটে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব।... এই উপলক্ষে গড়ের মাঠে ও কালীঘাটে কিরূপ লোকারণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে ইংলিশম্যান, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ডেলিনিউস প্রভৃতি পত্রসম্পাদকগণ সকলেই একান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।'[১৩৪] বিপিনচন্দ্র পাল এর সমর্থন করায় এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করেছিলেন।[১৩৫]

চড়ক পুজার নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্যও উনিশ শতকের বাঙলায় একটি বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো। সেকালের সংবাদপত্রসমূহে এবং Buckland-এর 'Bengal under the Lieutenant Governors' বইয়ে এই আন্দোলনের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিলের সমাচার দর্পণ হতে জানা যায়, 'চড়ক পুজার সময় সন্ন্যাসিদের মধ্যে কেহ কেহ মত্ত হইয়া পথেতে...কদর্য্যরূপে নৃত্যাদি' করায় 'তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন'।[১৩৬] ঐ খবরে জানা যায় হরকরা পত্রিকাও এ পুজাকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও নীতিবিগর্হিত কর্ম বলে মন্তব্য করেছেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের Reformer পত্রিকায় জনৈক ব্যক্তি চড়ক পুজা বন্ধ করার জন্য সরকার কর্তৃক আইন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। এতে ঐ বছরের ৩০শে এপ্রিল সমাচার দর্পণে জনৈক পুজারী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এতে তিনি এই পুজা বন্ধ হলে সমূহ ক্ষতির আশংকা করেন—কারণ এতে দেশাচার বিঘ্নিত হবে, পুজারীদের অন্ন সংস্থানের অসুবিধে হবে। এবং এই পুজায় দেশের বহু ভদ্রলোকেরও যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে, বিবৃতিকার একথাও স্মরণ করিয়ে দেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিলের সমাচার চন্দ্রিকা চড়ক বিরোধীদের 'ধর্ম দ্বেষী' বলেও অভিহিত করেন।[১৩৭] এমনকি ঐ শতকের সত্তুরের দশকেও (তখন চড়ক পুজার নৃশংস অনুষ্ঠানগুলো আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে) সংবাদ প্রভাকর লিখেছেন, 'কলিকতা নগরের পুলিশ ও কান্সর বেন্সির নিয়ম ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। এতদিনের পর রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন,... ... এই সংবাদ পাঠ

www.pathagar.com

করতঃ হিন্দু মাত্রেই ভীত হইবেন, এবারে চড়কের দফা একেবারেই রফা হইবেক, সন্ন্যাসীদিগের বানফোড়া ও চড়কে উঠা দূরে থাকুক যদ্যপি ঢাক বাজাইয়া নগর ভ্রমণ করে তবে পুলিশের লোকেরা ধরিয়া গারদে পুরিবেক, কাঁটা ঝাপ, ঝুল সন্ন্যাস কোন কার্যই হইবেক না। এই ব্যাপার যদিও আধুনিক বাবুদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সন্তোষজনক বটে, ফলত: হিন্দু মাত্রেরই পক্ষে সাতিশয় পীড়াজনক বলিতে হইবেক।'-[৩৮]

চড়কপুজা বন্ধ করার জন্য সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট লেখালেখি হলেও এবং এই ব্যাপারে দেশের শিক্ষিত যুবক ও প্রগতিশীল হিন্দুরা. Calcutta Missionory Conference, British India Association—প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশেষ তৎপর হলেও, বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস সহসা আইন প্রণয়ন ও তা বিধিবদ্ধ করার সাহস পাননি। অবশেষে ১৮৬২ খৃীস্টাব্দে স্যার সিসিল বীডন বাঙলার লাট হয়ে আসেন এবং তার দু'বছর পরেই আইন করে এই প্রথা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৬৫ খৃীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ বীডন এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে চড়ক পুজার নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারদের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং স্থানীয় জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অবশ্য এতে তিনি উল্লেখ করেন, 'It is to be understood that this order is not intended to authorize or justify any interference with the religious observances of the Charak Festival, or with the popular amusements other than hook swinging and its attendant cruelties, usual on that occasion.[১৩৯]

মুলতঃ সমাজ-সংস্কারদের প্রচেষ্টায় এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার ক্রম প্রসারের ফলে উনিশ শতকের বাঙলার নর-বলি প্রথারও উচ্ছেদ হয়ে চলেছিল। অবশ্য এই ব্যাপারে তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহের ভূমিকা ও সরকারী হস্তক্ষেপের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ[১৪০] প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও শিক্ষা-সভ্যতা প্রসারে ফলেই বাবুদের বেশ্যাশক্তির প্রবণতাও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু মদ্যপানের ব্যাপারটি যেনো তখনো অনেকটা সামাজিক সভ্যতার অঙ্গরূপেই পরিগণিত হতে থাকে। এই ব্যাপারে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তিও সম্ভব ছিলো না। তখন যে বাঙলাদেশের ইংরেজী শিক্ষিত তরুণ যুবকদের মধ্যেও, সুরাপানের অভ্যাস বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিলো, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নব্যবঙ্গের এই শিক্ষিত যুবকদেরই কেউ কেউ আবার সুরাপান নিবারণ আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিলেন। কোলকাতায় এই আন্দোলনের

www.pathagar.com

প্রাণস্বরূপ ছিলেন, প্যারীচরণ সরকার। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের পূর্বে (১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে) রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে 'সুরাপান নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন 'এই সুরাপান নিবারণী সভার জন্য আমাকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইনস্পেক্টর **H. L. Harrison** সাহেবের নিকট আমার নামে মিছামিছি নালিশ করে যে স্কুলের সময় আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি; ......মাতালদিগের আক্রোশের কারণ রাজা রাধাকান্ত দেবের পুত্র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর সুরাপান নিবারণী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে মাতালদিগের জটলা হইত ও পোলাও খাওয়া হইত। তাঁহাদিগের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন।'[১৪১]

তথ্যনির্দেশ

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৫২, পৃঃ ৮-১৩ দ্রষ্টব্য।

২ প্রফুল্ল কুমার সরকার, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ৭।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য।

৪ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ ১৯৭১, পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য।

৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য।

৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩ দ্রঃ।

৭ Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim Census Report, 1911, P. 440, Quoted in M. N. Srinivas, Social Change in Modern India, Third Printing, United States of America, 1968, PP. 95-96.

৮ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৭৬ শক, ১৪০ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৬১।

৯ Quoted, Sir John Strachey, India Its Administration & Progress, London, 1911, PP. 318-319.

১০ সমাচার দর্পণ, ১৬ জুন, ১৮২৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১৩৪৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০২ দ্রঃ।

www.pathagar.com

১১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭ শক, উদ্ধৃত, নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, কলিকাতা: ২য় সংস্করণ, ১২৯৬, পৃঃ ৪৩-৪৫।

১২ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), প্যারীচাঁদ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭১ সাল, পৃঃ ৪৫৯।

১৩ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃঃ ৮৫৩।

১৪ এই বাবুদের অনেক বাস্তব ও ব্যঙ্গচিত্র তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহ, ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা, রাজনারায়ণ বসুর একাল ও সেকাল, প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

১৫ ভবানী চরণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, নববাবু বিলাস, কলিকাতা, ১৩৪৪, পৃঃ ২০।

১৬ সমাচার দর্পণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৩।

১৭ সমাচার দর্পণ, ১৬ অক্টোবর, ১৮১৯, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

১৮ সমাচার দর্পণ, ৯ মার্চ, ১৮২২, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩।

১৯ Fanny Parkes, Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the East ; with Revelation of life in the Zenana. Vol. I., London, 1850, PP 20-30.

২০ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় সমাজ, বরাহনগর, পালপাড়া, ১৩০৬, পৃঃ ৪৪৫।

২১ Asiatic Journal, উদ্ধৃত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭২।

২২ 'এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারও বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।'—সমাচার দর্পণ, ২১ অক্টোবর, ১৮২০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯।

২৩ 'জিলা হিজলীর এলাকার ... জমীদার শ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায়' এর 'জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ রায়ের শুভবিবাহে ....৯২২ জন' বাইয়ের অংশ গ্রহণের খবর পাওয়া যায়।—সমাচার দর্পণ, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩২, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, ৩৭১-৭২ দ্রষ্টব্য।

২৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৭৬ শক, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

২৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ শ্রাবণ, ১৭৬৮ শক, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১।

২৬ সমাচার দর্পণ, ২৩ জুন, ১৮২১, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫।

২৭ সম্বাদ, ভাস্কর, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯।

www.pathagar.com

২৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৯, পৃঃ ৬৯-৭০।

২৯ 'শরদ্বর্ণন,' মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বৈশাখ-১৩৭৬, পৃঃ ২৮৭।

৩০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।

৩১ S. N. Mukherjee, Calcatta : Myths & History, Calcatta, 1977, PP. 100-101.

৩২ সংবাদ প্রভাকর, ১৫. ২. ১২৬৪, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪।

৩৩ আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩২৮, পৃঃ ৭৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।

৩৪ 'আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল...প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোল দীঘিতে মদ খাইতাম,...জল স্পর্শ শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।'—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃঃ ৪২।

৩৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৭৭২ শক, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৯।

৩৬ সমাচার দর্পণ, অক্টোবর, ১৮২৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯।

৩৭ সংবাদ কৌমুদী, উদ্ধৃত, সমাচার দর্পণ, ২৪ জুন, ১৮২৬, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।

৩৮ সমাচার দর্পণ, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-৭৭।

৩৯ সমাচার দর্পণ, ৬ জুলাই, ১৮২২, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।

৪০ সমাচার দর্পণ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫।

৪১ সমাচার দর্পণ, ১৫ জুলাই, ১৮২০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৪২ সমাচার দর্পণ, ১৫ মে, ১৮৩০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩।

৪৩ উদ্ধৃত, সংবাদ প্রভাকর, ১. ৭, ১৮৫৪, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩২।

৪৪ সমাচার দর্পণ, ২৭ মার্চ ১৮১৯, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭।

৪৫ সমাচার দর্পণ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

৪৬ সমাচার দর্পণ, মার্চ. ১৮২২. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩।

৪৭ সমাচার দর্পণ, ১৩ জুলাই, ১৮২২, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১।

৪৮ সমাচার দর্পণ, ২০ ডিসেম্বর, ১৮২৩, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।

৪৯ সমাচার দর্পণ, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।

৫০ সমাচার দর্পণ, ১৪ মে, ১৮২৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৫১ সমাচার দর্পণ, ৭ এপ্রিল, ১৮২৭, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

৫২ সংবাদ প্রভাকর, ১৮. ১. ১৮৫৩, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪।

৫৩ পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০, পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

৫৪ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ভারত কোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩।

৫৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯।

৫৬ 'কলিকাতা জরনেল', উদ্ধৃত, সমাচার দর্পণ, ১৬ আগস্ট, ১৮২৩, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।

৫৭ ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কোলকাতাসহ বাঙলাদেশের তিনটি প্রধান নগরের সতীদাহের সংখ্যা ছিলো নিম্নরূপ :

১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	১৮১৯	১৮২০	১৮২১	১৮২২	১৮২৩	১৮২৪	১৮২৫	১৮২৬	১৮২৭	১৮২৮
২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	৪২১	৩৭০	৩৭২	৩২৮	৩৪০	৩৭৩	৩৯৮	৩২৪	৩৩৭	৩০৯
৩১	২৪	৫২	৫৮	৫৫	৫১	৫২	৪৫	৪০	৪০	১০১	৬৩	৪৯	৪৭
১১	২২	৪২	৩০	২৫	২১	১২	২২	১৩	১৪	২১	৮	২	১০

এর থেকেই বুঝা যাচেছ, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কোলকাতার সহমরণের সংখ্যা ছিল কতো বেশী। (তালিকাংশটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পৃঃ ১১৭, হ'তে গৃহীত। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের তালিকাংশ, ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ই মার্চের সমাচার দর্পণেও ছাপা হয়েছে, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪ দ্রষ্টব্য)।

৫৮ সমাচার দর্পণ, ২৭ মার্চ, ১৮১৯, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

৫৯ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪০।

৬০ সমাচার দর্পণ, ৫ জুন, ১৮১৯, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

৬১ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

৬২ A. F. Salahuddin Ahmed, op. cit, P. 120, Foot-note দ্রষ্টব্য।

৬৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪০ দ্রষ্টব্য।

৬৪ সমাচার দর্পণ, ৫ নভেম্বর, ৮২৩, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬।

৬৫ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃঃ ১৮৫।

৬৬ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

৬৭ জে. পেগস্ ও ফ্যানী পার্কস-এর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'The Suttee's cry to Brtain এবং 'Wanderings of a Pilgrims in search cf the Picturesque. during four and twenty years in the East ; with Reveiations of life in the Zenana'.

৬৮ ২৭ আগস্ট, ১৮২৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭।

৬৯ The Suttee's cry to Britain, উদ্ধৃত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।

www.pathagar.com

৭০ Address to Lord William Bentinck. The English Works of Raja Rammohun Roy, op cit. P. 476.

৭১ রসিকলাল রায়, 'সমাজ সমস্যা', নব্য ভারত, ত্রয়ত্রিংশ, খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ৩২২, পৃঃ ৪৫৯।

৭২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশর ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

৭৩ প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

৭৪ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

৭৫ যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সেকালের বিবাহ', প্রবাসী, ৩১ শে ভাদ্র, ৮ম খণ্ড, বৈশাখ -আশ্বিন, ১৩৪৫, পৃঃ ২৬।

৭৬ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭ :

৭৭ জ্ঞানান্বেষণ, ১৭ জুন, ১৮৩৭, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০২-৮০৩ দ্রস্টব্য।

৭৮ জ্ঞানান্বেষণ, ২৩ এপ্রিল, ১৮৩৬, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০০-৮০১ দ্রঃ।

৭৯ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৭১ খ্রীঃ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডঃ আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ঢাকা, ১৯৬৮ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৫৪-৪৬৯ দ্রঃ।

৮০ সঞ্জীবনী, ১২৯৮ সাল, উল্লেখিত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৯-৮০।

৮১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

৮২ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এরূপ লিখেছেন, 'অনুরূপ ঘটনা আমি নিজে বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর ছিল, —— সেখানে——একদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। একটি অপরিচিত বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কোন পথে যাইব? ——জানাইল, শ্যামাচরণ তাঁহার পিতা। শ্যামাচরণ ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুবকের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। ঘটনাটি আমার নিকট এত অদ্ভুত মনে হইয়াছিল যে ৭৫ বৎসর পরে আজও তাহা মনে আছে। যতদূর মনে পড়ে সেখানে উপস্থিত বৃদ্ধের দল কিঞ্চিৎ হাস্যকৌতুক করিলেও বিশেষ আশ্চর্যবোধ করিলেন না। —প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৮।

৮৩ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদনা), বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃঃ ২২৬।

৮৪ অল্পদিন গত হইল, কোন পল্লিগ্রামস্থ একজন কুলীন বিপ্র পথিমধ্যে একটি বালকের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, পরে আলাপাদি দ্বারা ঐ বালক সম্পর্কে তাঁহার পুত্র হইলেন, ——কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, কুলীন প্রভু বিবাহের পরে একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গমন করেন নাই,——।' বিদ্যাদর্শন, ভাদ্র, ১৭৬৪ শক, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮।

৮৫ বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭।

www.pathagar.com

৮৬ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৮৭ বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১ দ্রস্টব্য।

৮৮ রসিকলাল রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৫।

৮৯ সোমপ্রকাশ, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১।

৯০ রসিকলাল রায়, প্রাগুক্ত, ৪৫৪-৫৫।

৯১ Census of India (Bengal), 1991, Vol. IV, Table-VIII, Part B, PP. 154-55.

৯২ Census of India (Bengal), 1901, Vol. VI. A, Part II, Table VII, Part A, P. 30.

৯৩ তালিকাংশ [১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বনে]

Number per 100 aged 15-40 who are widowed			
District and natural Division	Sex	Years	No. of widowed
Bengal	Famale (Hindu)	1881	181
		1891	172
		1901	166

See, Census of India (Bengal), 1901 Vol. VI, Part 1, The Report, chapter VII, Table No. IV, P-268.

৯৪ পূর্বোক্ত ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস হতে অবগত হওয়া যায়, তখন সমগ্র বাঙলাদেশে ০ থেকে ৪ বছর বয়সের বাঙালী হিন্দু বালবিধবা ছিলেন ২,৩৪৮ জন এবং ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের বিধবা ছিলেন ৭,৯৬৪ জন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস হতে জানা যায় তখনকার বাঙলাদেশে ০ থেকে ৫ বছর বয়সের বালবিধবার সংখ্যা ছিলো ৭,২৭৭ জন এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের ৩৪,৭০৫ জন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতে দেখা যায়, ০ থেকে ৫ বছর বয়সে বিধবার সংখ্যা কমে ১,৪৩৯ জনে নেমে এসেছে, কিন্তু তখনো ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের বিধবার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,৭৫১ জনে (See Sensus of India (Bengal), 1921, Vol. V, Part II, P. 32.)।

৯৫ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

৯৬ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৩।

৯৭ সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৮।

৯৮ প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী, আশ্বিন—১৩৭৭, পৃঃ ৫২ দ্রষ্টব্য।

৯৯ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

৬—

www.pathagar.com

১০০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫ দ্রষ্টব্য।

১০১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।

১০২ 'বাল্যবিবাহের দোষ', সর্বশুভকরী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৭২ শক, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫। অবশ্য এতে প্রবন্ধকারের কোনো নাম নেই। তবে রচনাটি যে বিদ্যাসাগরেরই, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রমাণ দিয়েছেন (ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নও (বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৮০-৮১ দ্রষ্টব্য) তথ্যটি বিবৃত করেছেন: শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ-এও রচনাটি স্থান পেয়েছে।

১০৩ বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন (সংবাদ), সমাচার দর্পণ, ১৫ মার্চ, ১৮২৮, সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩২ দ্রষ্টব্য।

১০৪ বৃদ্ধের বিবাহ (সংবাদ), সমাচার দর্পণ, ৩০ জুন, ১৮২১, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬-১৭।

১০৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

১০৬ Census of India (Bengal), 1891, Ibid, PP. 146-147.

১০৭ Census of India (Bengal), 1901, The Report, Ibfd, P. 268.

১০৮ 'বাল্যবিবাহ ও হিতৈষিণী', সোমপ্রকাশ, ২৫ ভাদ্র, ১২৮৫, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬।

১০৯ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভারতকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য।

১১০ সমাচার দর্পণ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

১১১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।

১১২ জ্ঞানান্বেষণ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯৬।

১১৩ সমাচার দর্পণ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭।

১১৪ W. Ward-এর View of the History, Literature and Religion of the Hindus, 3rd Ed. (1817), Vol. II, Bk. III; Rev. Long-এর 'The Banks of the Bhagirathi', The Calcutta Review, 1846, Vol. VI; W. W. Hunter-এর The Annals of Rural Bengal, 1897 দ্রষ্টব্য।

১১৫ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫-৯১ দ্রষ্টব্য।

১১৬ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬২-৬৩।

১১৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৬।

১১৮ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০০।

১১৯ উদ্ধৃত, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮।

১২০ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩।

১২১ যোগেশচন্দ্র বাগল, ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৭।

www.pathagar.com

১২২ অমর দত্ত, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্‌স্‌, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১।

১২৩ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসগর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬।

১২৪ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫-৪১ দ্রষ্টব্য।

১২৫ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, নতুন সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ১১২।

১২৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

১২৭ Lokenath Ghose, The Mondern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc. Part II, Calcutta. 1881, Quoted. P. 1-1.

১২৮ মন্মথনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃঃ ১০০-১০৮।

১২৯ 'বিধবা বিবাহ আইন', ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯-৬০।

১৩০ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৩১৪।

১৩১ পারিবারিক প্রবন্ধ, হুগলী, ১২৮৮, পৃঃ ২-৩।

১৩২ রামচন্দ্র দত্ত, বাল্যবিবাহ, কালিকাতা, ১২৯৪, পৃঃ ৬।

১৩৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

১৩৪ চিত্রদর্শন পত্রিকা, ১২৯৭ সাল, পৃঃ ৬৩।

১৩৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬ ও ৩৫৬ (পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

১৩৬ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

১৩৭ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১ দ্রষ্টব্য।

১৩৮ সংবাদ প্রভাকর, সম্পাদকীয়, ১২. ১২. ১২৫৮. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫-৮৬।

১৩৯ C. E. Buckland, Bengal under the Lieutenent Governors, Vol. I, Calcutta, 1902, P. 314.

১৪০ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে নগরের নির্দিষ্ট স্থানে বারাঙ্গনাদের বসতি সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই ব্যাপারে তিনি ব্যবস্থাপক সভায়ও আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন। আবেদনপত্রটি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে নবেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকরে' ছাপা হয়েছিলো।—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৯-২০ দ্রষ্টব্য।

১৪১ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

পূর্ব অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা একথা দেখতে প্রয়াস পেয়েছি যে, উনিশ শতকের বাঙলায় ধর্মের নামে কতোগুলো কুসংস্কার এবং আচার সর্বস্বতা বাঙালী বর্ণ হিন্দুর জীবনকে নিয়ত জীর্ণ থেকে জীর্ণতর করে তুলছিলো। তখন বারাঙ্গনাসক্তি, সুরাপান, বাইজীর নৃত্য, বুলবুলির লড়াই, কবি-খেউড় গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চলেছিলো এক বেপরোয়া বাবুয়ানির স্রোত। সেদিন রক্ষণশীল বাঙালী হিন্দুরা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক অসঙ্গতির বোঝা-ভারে নুয়ে পড়েও, সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন সতীদাহ, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির প্রচলন অব্যাহত রেখে এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতির গতিপথ রুদ্ধ করে। এর প্রতিকার প্রয়াসে এগিয়ে এসেছিলেন প্রগতিশীল নব্য সম্প্রদায়। বাঙালী বর্ণ হিন্দুর চিরাচরিত ধর্ম-সমাজ-নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অবজ্ঞা-বিদ্রোহে ফেটে পড়লেন তাঁরা।

কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের চোখে তা ছিলো ইংরেজী শিক্ষিতদের অভিমানিতা-প্রসূত নিছক এক 'অনাচার ও ভণ্ডামি' মাত্র। আর সে জন্যই 'তখনকার শৈথিল্য ও স্বৈরাচার-দুর্বল সমাজে বিজাতীয় ধর্ম ও বিগর্হিত নীতির প্রবল আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্ম ও শুচি-শুদ্ধ নীতির কল্যাণ রূপটি সযত্নে রক্ষা'[১] করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা। ফলে দেখা দেয় সংঘাত—রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের তুমুল সংঘর্ষ। সেদিন 'রক্ষণশীলদের নিকট প্রগতিশীলদের আচার-আচরণ যেমন কৌতুক সৃষ্টি করিত, প্রগতিশীলদের নিকট রক্ষণশীলদের আচার-আচরণ তেমনই কৃপার কারণ হইয়াছিল।'[২] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল মুখর উত্তেজিত পরিবেশে.........সমাজজীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া উঠে... .... ইংরেজ সভ্যতার তীব্র মদিরা তখন নব্য-বঙ্গসমাজে একটা উৎকট উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে, বাঙালী যেন দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও অবসাদের পর একটা নূতন জীবনস্পন্দন অনুভব করিয়াছে, ... সনাতন বন্ধন সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধগুলি তাহাদের পূর্ব প্রভাব হারাইয়াছে। পরিবারে পরিবারে একদিকে বিদ্রোহের উৎকট অভিব্যক্তি, অন্যদিকে গুরুজন অভিভাবক-দের মধ্যে একটা বিস্ময় বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ভাব, যেন তাঁহাদের সম্মুখে

www.pathagar.com

নরকের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়াছে।......তরুণ বিদ্রোহীদের দার্ঢ্য ও অহংকার প্রাচীনদের এই বিদ্বেষ ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ঘরে ঘরে একটা তুমুল অশান্তি ও খণ্ড বিপ্লব জাগাইয়া তুলিল।'[৩] উনিশ শতকের বাঙলার কৌতুক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনার সূত্রপাত এখানেই। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, 'এ সময়ে ইংরেজী সংস্কৃতির সংগে সংঘাত, সামাজিক পরিবর্তন, রক্ষণশীলতা ও উৎকেন্দ্রিকতার দ্বিমুখী প্রবাহ ব্যঙ্গ-রসিকদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী করেছে।'[৪] তবে এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, মূলতঃ সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিনের বাঙলায় যে সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা ও প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছিলো, তাতে প্রাচীন ও নবীনপন্থীরা স্বপক্ষীয়দের অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও নীতি বিগর্হিত স্বভাব-চরিত্রকে আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। এই সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকর (১৯শে মে, ১৮৫৫ খৃীঃ) লিখেছেন, আধুনিক যুবকদের পক্ষ প্রতিপক্ষরা.... বিবিধ কথার আন্দোলন করেন এবং উভয় পক্ষেই যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন আবার কতিপয় দীর্ঘদর্শি লোকদিগের এমত অভিপ্রায় যে এদেশে যে সমস্ত কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তন করা আবশ্যক বটে'।[৫]

উনিশ শতকের বাঙলায় বাঙালী হিন্দুর চিরাচরিত ধর্ম, আচার সর্বস্বতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃীঃ)। সেজন্য বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁকে আক্রমণ করে প্রকাশ করেছিলেন অনেক স্বনামী-বেনামী রচনা এবং রামমোহনকেও লিখতে হয়েছিলো তার প্রত্যুত্তর, একথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। অনেকটা ব্যক্তিপর্যায়ের হলেও, রামমোহন ও বিরুদ্ধবাদীদের এসমস্ত রচনায় স্বচেতন কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে ধারাটি আত্মপ্রকাশ করলো, মূলতঃ এতেই তখনকার এবং তার পরবর্তী সময়ের রঙ্গব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক রচনাসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধবাদী লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোস্বামী (সম্ভবতঃ রামগোপাল শর্মা) 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' ছদ্মনামী কাশীনাথ পঞ্চানন, কবিতাকার (কে জানা যায়নি) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধের বাঙলায় যথার্থ কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার সূত্রপাত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮ খৃীঃ)-এর হাতে—'সরস ব্যঙ্গ-রচনায় সে-যুগে তিনি প্রথম এবং অদ্বিতীয় ছিলেন।'[৬] তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক, এবং তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ। রামমোহন রায়ের সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় ভবানীচরণ দস্তুরমতো মসি-যুদ্ধে তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সহমরণ-নিবারণ-আইন বিধিবদ্ধ হলে, ভবানীচরণ তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য এবং 'স্বধর্ম ও সদাচার ও

www.pathagar.com

সদ্ব্যবহারাদি-রক্ষার্থ'[৭] 'ধর্মসভা' (১৮৩০ খ্রীঃ) স্থাপন করেছিলেন। তাঁর 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২ খ্রীঃ) ছিলো সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের মুখপত্র। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভবানীচরণ রামমোহনের বিবিধ সামাজিক আন্দোলন তথা নতুন ভাব-প্রবাহকে যতোটা বিদ্বেষের সঙ্গে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন, ঠিক ততোটা সমভাবেই তৎপর হয়েছিলেন পুরাতন সমাজের দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রভৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের ব্যাপারেও। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'শ্রী প্রমথনাথ শর্ম্মণ' এই ছদ্মনামে লেখা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩ খ্রীঃ)। তাঁর জীবনচরিত্র হতে জানা যায়, 'তিনি আত্মীয়গণের অনুরোধে গদ্য পদ্য রচনায় প্রথম নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুক-জনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য্য পরিহার করিয়া সৎপথালম্বন করেন।'[৮] নববাবু বিলাসের নায়ক সেকালের কোলকাতার বিত্তবান অশিক্ষিত 'ভদ্রসন্তান'—বিলাস-ব্যসন পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন কুখ্যাত 'বাবু' সম্প্রদায়। তাঁদের নীতি বিগর্হিত আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক অধঃ-পতনকে লেখক সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন। কি কি লক্ষণ থাকলে বাবু হওয়া যায়, লেখক তার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবেঃ 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[৯] বাবুদের লেখাপড়া শিক্ষার একটি বর্ণনাঃ 'বাবু সকল আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করেন ইহাতে শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্তামহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবা না আর ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবা না যেরূপ ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগের মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবা তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতি জ্ঞান নাই······ বাবুগণে এই কথা শ্রবণে মহা আনন্দ মনে প্রায় ধুড়ি বুল ২ মনিয়া খেলাইতে রত যদি কদাচিৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাঠশালায় আসিয়া বৈসেন ইহাতে যেরূপ বাঙ্গালী বিদ্যোপার্জ্জন হইয়াছে তাহা লেখাতে কেবল লিপিবাহুল্য মাত্র হয়।'[১০] অন্যত্র আছে, 'বিলাস-ব্যসন পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাবু 'পোষাক-পরিত্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন কাহার দুই কাহার চারি পাশবালিস আছে, পিতল। বান্ধা কেহবা রূপাবান্ধা, কেহ সোনবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহ বা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন, পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে

www.pathagar.com

বাম হস্তে দুই একটা মসলা বদনে দেন, নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহুবলে রমণী মেলক গাওক বাদক নর্তক নর্তকী ভণ্ড প্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়ত করিতে লাগিলেন।'[১১]

একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিলো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়'। এই গ্রন্থে দুর্নীতিপরায়ণ—অপদার্থ ধনীসন্তান, মোসাহেব চাটুকার, অহমিকা সর্বস্ব দলপতি, ভণ্ড পূজারী, অভিমানী ইংরেজী শিক্ষিতের দল প্রভৃতির প্রতি তাঁর সুতীব্র সশ্লেষ-বিদ্রূপ আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করে। 'কলিকাতার বিবরণ' দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'কলিকাতার মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে......বিবিধ বিদ্যাও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরুপমা ও সর্ব্বদেশ খ্যাতা হইয়াছে পর নিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস [৭] করিতেছে ও মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে'।[১২] বাবু-দের পূজা-পার্বণ ও পুস্তক প্রদর্শনীর খবর : 'পুণ্যসঞ্চয় হেতুক ও কেহবা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হেতুক [৬৯] বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকেন ঐ বিগ্রহের সেবায় পরিপাটী ও সুরীতি এবং নানা প্রকার আভরণ ও অপূর্ব্ব২ মন্দির করিয়া দেন কিন্তু আপনাকে সে বাটীতে একবার প্রণাম করিতেই যাইতে হয় না এওবা সেইরূপ হয় বিদ্যা সংস্থান হেতুক এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কারণ কতকগুলিন পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছে এবং জেলেদ্গর ও দপ্তরি নিযুক্ত আছে তাহারাই সর্ব্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে বাবুকে ঐ কেতাব কখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতেও হয় না, আপনি গুণনিধি অতএব এ অবোধকে ঐ বিষয়ের বোধ জন্মাও।'[১৩] ইংরেজী শিক্ষিতের অভিমানিতা : 'কলিকাতার এমত অখ্যাতি কেন হইল যে আপনাদিগের শাস্ত্রের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল পারসী [২১] ও ইংরেজী পড়েন......অত্যন্ত অপূর্ব্ব শিষ্ট শান্ত মহাশয়রা অশৌচ সুদ্ধাচারার্থে কেবল ব্রাণ্ডি মাত্র পান করেন অন্য সময়ে আহার বাজারে পাককরা মাংস মিঠাই ও মুছলমানকৃত পাঁতরুটী এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজন করেন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক ধুতি প্রভৃতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইজার জামাজোড়া [২২] ইত্যাদি পরেন কালাচর্ম্মের পাদুকা ফিতে-বান্ধা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁটা সকল পায়ে দেন'।[১৪]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূতী বিলাস' প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থ 'আদিরস ভক্তিরস ঘটিত'। এতে বাবুদের অবহেলিতা অন্তঃপুরিকাগণ, কুট্টনীদের ছলনায়, পাপ প্রলোভনের সহজ বলি স্বরূপ যে,

www.pathagar.com

কতোটা ঘৃণ্য ও অধঃপতিত জীবনের সন্ধানে লিপ্ত হতেন, তার প্রতি ইঙ্গিত মুখর শ্লেষ বর্তমান। লেখকের ভাষায়—

'ভাবিতে ভাবিতে ভাব হইল উদয়।
নূতন নূতন দূতী আছে কতিপয়॥
প্রবলা হইয়া তারা নব্যে করে বশ।
কত স্থানে কত মতে করে কত রস॥ ......
যুবক যুবতী পেয়ে করে কি আচার।
এসব বর্ণন করি করিয়া বিস্তার॥'[১৫]

বাবু-গৃহিণীদের একটি মজলিসের বর্ণনা ঃ

ভোজনান্তে সকলে বসিল সভাকরি।
তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি॥ ......
কাহারো আলবোলা এলো কার গুড়গুড়ি।
সকলে তামুক খায় নবীনা কি বুড়ি॥
এসব হইল পরে রাত্রি কিছু ছিল।
প্রেমিকারা প্রমারারা খেলা আরম্ভিল॥[১৬]

গ্রন্থকারের 'নববিবি বিলাস' প্রকাশিত হয়েছিলো সম্ভবত ১৮৩১ খৃীস্টাব্দে। গ্রন্থটি তিনি 'ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'—এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরূপটি 'আবরণ পত্রে'র লেখা থেকেই বুঝা যায় : 'নব বিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটাবর্ত্তে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা ঃ

"অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী॥"

এতদ্বৃত্তান্তমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ।'[১৭] গ্রন্থ থেকে বিবিদের আহার ও বিহারের কিছু বর্ণনাও এখানে উদ্ধৃত হোল ঃ 'কেহ কহে কালিয়া কাবাব, কেহ বলে লাল সরাব, কেহ বলে আচ্ছা বেরান্ডী, কেহ বলে ফাইল ব্রান্ডি, কেহ বলে এখনি পোলাও, কেহ বলে তবল বাজাও, কেহ বলে বহুত মজা, কেহ বলে খেমটা বাজা, কেহ বলে মোহন গাঁজা, কেহ বলে ফের লেগে যা, কেহ বলে সরস চরস, কেহ বলে আঙ্গুর কা রস॥'[১৮]

এছাড়া ১৮২১-২২ খৃীস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' 'বাবুর উপখ্যান', 'শৌকীন বাবু' 'বৃদ্ধের বিবাহ,' 'ব্রাহ্মণ পন্ডিত', 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি কয়েকটি কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পন্ডিতগণ এ লেখাগুলোকে সম্ভবতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বলেই মনে করেন।

www.pathagar.com

ভবানীচরণের পরে বাঙলা গদ্যে কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৮১৪—১৮৮৩ খ্রীঃ) ও হুতোম প্যাঁচা (কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৮৪০—১৮৭০ খ্রীঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দু'জনেই সেকালের দুর্নীতি বিলাসী-কলুষিত বাঙালী সমাজকে যেভাবে কশাঘাত হেনেছেন, একমাত্র ভবানীচরণ ও কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তকে বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থে তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা বিত্তবান অভিভাবক, 'বাবু' নামাঙ্কিত কুক্রিয়া ও বদসঙ্গাসক্ত ধনী-সন্তান, ইংরেজী শিক্ষাভিমানি ও অন্যান্যদের সুরাপান ও সামাজিক বেলেল্লাপনা, পণ্ডিতমন্য পূজারী ব্রাহ্মণ, কৃপণ-অনুদার-ধূর্ত-ফন্দিবাজ ব্যক্তি প্রভৃতিকে সকৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আক্রমণ করেছেন। এখানে তার কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত হোল।

বাবুরাম বাবুর মজলিস ও পণ্ডিতমন্য ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিকদের একটি বর্ণনা দেন লেখক এভাবে ঃ

'বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন।.........গদির নিকট ঠকচাচা একখান চৌকির উপর বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহ ২ ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি ধরিয়াছেন--কেহ কেহ তিথিতত্ত্ব বা মলমা সতত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন......কেহ কেহ বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব লইয়া মহা দ্বন্দ্ব করিতেছেন। কামাখ্যানিবাসী একজন ঢেঁকিয়াল ফুক্কন কর্তার নিকট বসিয়া হুঁকা টানিয়া বলিতেছেন—আপনি বড় বাগাবান পরেুষ......এ বচ্চর একটু লেরাং ভেরাং আছে কিন্তু একটি যাগ করেন সব রাঙ্গা ফুকনের মাচাং যাইতে পারবে ও তাহার বশীবৃত অবে--'।[১১] মতিলালের তোষামোদ চাটুকার প্রভৃতির বদ সঙ্গ ও অসামাজিক বেলেল্লাপনার একটি চিত্র ঃ

'মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়—হাঁচিলে "জীব" বলে। ওরে বলিলেই "ওরে ২" করিয়া চীৎকার করে ও ভাল মন্দ সকল কথারই উত্তরে "আজ্ঞা আপনি যা বলেছেন তাই বটে" এই প্রকার বলে প্রাতঃকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত মতিলালের নিকট লোক গস্‌গস্ করিতে লাগিল—ক্ষণ নাই—মুহূর্ত নাই—নিমেষ নাই—সর্বদা নানা প্রকার লোক আসিতেছে--বসিতেছে—যাইতেছে। তাহাদিগের জুতার ফটাং ২ শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পমান—তামাক মুহুর্মুহু আসিতেছে—ধুঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে।......দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাসিখুসি, বড়ফট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা, বট্‌কেরা, ভাবের-গালাগালি, আমোদের

www.pathagar.com

ঠেলাঠেলি-চড়ুই ভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছে।'[২০]

টেকচাঁদ ঠাকুরের দ্বিতীয় কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা 'মদ খাওয়ার বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে তিনি 'কালেজকে জলাঞ্জলি' দেয়া বাবুদের সুরাসক্তি ও মাতাল প্রভৃতির প্রতি কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। দ্বিতীয় অংশের 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা'য় লেখকের 'কৌতুক রস তীব্র ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাইরে প্রবীণ সমাজ নেতৃবর্গ ও ধর্ম-সংরক্ষকেরা জাত রাখা ও মারার ব্যাপারে সদাসতর্ক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা অতি নচ্ছার, কপট ও চরিত্রহীন। এদের ঘৃণ্য চরিত্রগুলি লেখক ভালোই ফুটিয়েছেন'।[২১] এই অংশের 'অতিলোভে তাঁতি নষ্ট' ও 'বাইরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার'—এ জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রভৃতির প্রতি লেখকের বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে এরূপ কিছু বর্ণনার উল্লেখ করা গেলো। দেবীভক্ত জনৈক মাতালের চিত্র ঃ

'তাঁহার বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন......তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন ? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্তা স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন।......কর্তার নেসা ছুটিয়াছিল,...... আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন—কর্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন ?'[২২]

ইংরেজের আচার-আচরণ ভক্ত 'কিঞ্চিৎ ইংরাজ' শিক্ষিত জয় হরি বাবুর বর্ণনা ঃ 'জয় হরির কিঞ্চিৎ ইংরাজ পাঠ হইয়াছিল—ইংরাজী রকম সকলই ভাল লাগিত।' চাকরীর উমেদারীর জন্য একবার তিনি জনৈক ইংরেজ সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করতে গিয়েছিলেন। 'সাহেবের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব নাকের উপর আই গ্লাস দিয়া চোক ঘুরাইয়া জয়হরির পেনটুলুন কাবা বাঁধা পাগড়ি দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন...... টোমলোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহুত টেড়ি হোনে চাতা—বাপ-দাদাকা পোষাক কাহে নেহি পেনতা ? জয়হরি একেবারে কাষ্ঠ—মুখ দিয়া বাক্য সরে না।'[২৩] কৌলীন্যের প্রতি ঃ 'ফুলে খড়দহ বল্লবী সর্বানন্দি—কি চমৎকার মেলে।......কৌলীন্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোকসমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম......এই পরিচয়েতেই ধর্ম অর্থ কক্ষ মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল হয়।'[২৪]

গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক রূপক উপন্যাস 'অভেদী' (১৮৭১) খ্রীঃ)-তেও মাঝে মধ্যে অসামাজিক বেলেল্লাপনা ও ভণ্ডামি প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের

www.pathagar.com

সুতীক্ষ্ণবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় বাবু সাহেবঃ 'তিনি বহুকাল ফিরিঙ্গি, ট্যাশ ও মেটেফোসের ন্যায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পোশাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম চাল চালেন।......দুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া শিস দেন ও দেশীয় লোকদিগের প্রতি এমনি বিদ্বেষ-স্বদেশীয় আচার ও ব্যবহারে এমনি বিরক্ত যে কেহ এতদ্দেশীয় কাহার নাম উল্লেখ করিলে তিনি অমনি বলিয়া উঠেন "ড্যাম বেঙ্গালী-ড্যাম বেঙ্গলী"।'[২৫] বাবু সাহেবের বন্ধ জেংকো বাবুর 'জাঁক' ও ভণ্ডামি ঃ 'জেংকো বাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে··· ইত্যবসরে জেংকো বাবু ও বাবু সাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত—ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ড্যাম বেঙ্গালি ড্যাম বেঙ্গালি বলিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন। জেংকো বাবুর সর্ববিষয়ে জাঁক—বিদ্যাবিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাঁক—ধন বিষয়ে জাঁক। ···বাবু সাহেবকে বলিলেন= দেখ বন্ধু! এসব কিছুই মানিয়া কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়।'[২৬]

আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পরে (১৮৬২ খৃীঃ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ১ম ভাগ আত্মপ্রকাশ করে। ২য় ভাগসহ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো তারো দুবছর পরে (১৮৬৪ খৃীঃ)। এই গ্রন্থকে বলা চলে, সেকালের কোলকাতার সমাজ ও ব্যক্তি চরিত্রের একটি সামগ্রিক ব্যঙ্গ প্রদর্শনী। হুতোম নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই ····অনেকে নক্শাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন ···আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ং ও নক্শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।'[২৭] হুতোম প্যাঁচার নক্শায় সেকালের 'আজব শহর কল্কাতা'র ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবিধ দুর্গতির চিত্র রয়েছে—এতে অসামাজিক বেলেল্লাপনায় নিমগ্ন ব্যক্তি, মাতাল, ভণ্ড, ফন্দি-ফিকির বাজ প্রভৃতি সকল স্তরের চরিত্রই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গ্রন্থকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থা, বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং পদ্মলোচনের মতো অপসঞ্চিত বিত্তের বাষ্পে ফুলে ওঠা 'হঠাৎ বাবু'দেরই। হুতোমের বর্ণায় 'বাবু পদ্মলোচনা দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতাবে'র চিত্রঃ 'পদ্মলোচন প্রভৃতি হিন্দুর মুকোশ পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পদধূলো খান—পা চাটেন—দলাদলি ও হিন্দু ধর্মের ঘোঁট করেন—ঠাকুরুণ বিষয় ও সখী সংবাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্রটিং পেপার ; পদ্মলোচনের দোর্দণ্ড প্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না,......এসিয়াটিক সোসাইটির মিউ-জিয়ামের মতো বিবিধ আশ্চর্য জীব একত্র করলেন—বেশির ভাগ জ্যান্ত !!!...

www.pathagar.com

কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুললে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে উঠে। ওরে! ওরে! হুজুর ও 'যো হুকমের' হল্লা পড়ে গেল,······কল্‌কেতার ন্যাচর্‌র্যাল হিষ্টিরির দলে একটি নম্বরে বাড়লো!'[২৮] 'শহরের ইংরাজি কেতার বাবু'দের বর্ণনা : 'শহরে ইংরাজি কেতার বাবুরা······ 'উচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট্‌'।······সকলে ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রান্ডী ও কাঁচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালুমোড়া-হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পলিটিক্স ও বেস্ট নিউজ অব দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন! টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন।'[২৯] দুর্গোৎসবে নবমীর বর্ণনা ঃ 'আজ নবমী ;······ ক্রমে শহরের বড়ো রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশ্যালয়ে বারান্দা আলাপীতে পুরে গেল,···সৌখিন বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোটে, পিনেস ও বজরার ছাতে বার দিয়ে বসলেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু-একটা রংদার গান গাইতে লাগলো।'[৩০]

হুতোমের প্রভাবে তখনকার বাঙলায় কৌতুক ব্যঙ্গ নকশা লেখার একটা ধুম পড়ে গিয়েছিলো। 'ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উতোর গাইলেন' আপনার মুখ আপনি দেখ'। কিন্তু হুতোমের সত্য ও স্পষ্ট ভাষণে তাঁরই দল ভারী হয়ে উঠল। হুতোম-পন্থী 'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক 'নিশাচর' হুতোমকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়ে এইভাবে ভোলানাথকে বিধ্বস্ত করলেন ঃ

'বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্‌মায়েশদের তাক্‌ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চম্‌কে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম, চিড়িয়াখানায় নানা প্রকার স্বর শোনা যেতে লাগলো। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো করে ধরে ফেল্লেম, সেটা পাখি নয়. সুতরাং উড়তে পাল্লেনা, আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়লো।'[৩১] নিশাচরের বর্ণনায় সেকালের কোলকাতার সরস্বতী পূজা ঃ 'কলকেতা শহরের সকলই সৃষ্টি ছাড়া। এখানে গৃহস্থের চেয়ে বেশ্যাবাড়ীর সরস্বতী পুজোর সংখ্যা ও জাঁকজমক শতগুণে অধিক।···· এখানকার বাবু, পুজো, ধর্ম্ম, ঠাকুর ও বেশ্যাদিগকে ধন্যবাদ।'[৩২] 'টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র)' লিখলেন, 'কলিকাতার নুকোচুরি'। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'খানিক ছেলেখেলা করে বদমায়েসদের আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়া যাক এই চিন্তা করিয়া এই আর্শিখানি ·····ধরলেম, যদি ইহা দেখে আমাদের সমাজের উপকার ও কুচরিত্র সংশোধন হয়।'[৩৩] গ্রন্থকার হুতোমকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হুতোমের নকশা খানির রচনা চমৎকার কিন্তু বিশেষ স্মরণ করিয়া পাঠ করিলে মহোদয়

www.pathagar.com

টেকচাঁদ ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহই সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইবে······পেঁচা এখন চুপ চাপ, আর মুখে কথা সরে না।'[৩৪] এ ধরনের আরো বহু নকশা-জাতীয় গ্রন্থই তখন প্রকাশিত হয়েছিলো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক এরূপ কিছু রচনা, তার উত্তর-প্রত্যুত্তর সেকালের বাঙলায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর বা হুতোমকে কেন্দ্র করে যেমন রচিত হচ্ছিলো, তেমনি কবির লড়াই প্রভৃতির মতো, এক সংবাদপত্রের সঙ্গে আর এক সংবাদপত্রের লড়াইও প্রায় লেগেই থাকতো। ১৮২১ খৃীস্টাব্দে ভবানীচরণ যে 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য দেখা দিলে, তিনি সে পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২১) প্রকাশ করেন। এবং কিছুকাল পরে উক্ত রায় [রামমোহন] এতদ্দেশীয়া সাধ্বীদিগের সনাতন ধর্ম্মসহ গমন নিবারণোদ্যোগে স্বীয়াভিপ্রায় কৌমুদীপত্রে ব্যক্ত করাতে উক্ত মহাশয় [ভবানীচরণ] রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাত প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জল্পিত হইয়াছিল'।[৩৫] কবি ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র নামের সঙ্গে মিল রেখেই মনে হয়, তার প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বি গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য তাঁর 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা বের করেছিলেন। সেকেলে এ দু'সম্পাদকের কলহ বেশ ঘনিভূত হয়ে উঠেছিলো। সংবাদ প্রভাকরকে ততোখানি নীচে না নামিয়ে গুপ্ত কবি বের করেছিলেন 'পাষণ্ড পীড়ন'। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের কলহ প্রায় লেগে থাকতো। সোমপ্রকাশের দল বঙ্কিমচন্দ্রীয় ভাষাকে ব্যঙ্গ করে তাঁর অনুসারীদের 'শব পোড়া-মরা দাহের' দল, এবং বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠপোষকগণ সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্য্যের চানা' নাম দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণে তৎপর ছিলেন।

হুতোমের পর বাঙলা গদ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খৃীঃ) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪ খৃীঃ) নাম উল্লেখ করতে হয়। বিদ্যাসাগর রচিত 'অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' প্রভৃতি রঙ্গ ব্যঙ্গ রচনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর রচনা—নিদর্শন উদ্ধৃত হলো। বহু বিবাহ প্রথা প্রভৃতির সংস্কার (Reform) বিরোধী তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতি : 'এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজকাল শুনিতেছি তাঁহার যত বড় নাম ও যত ধুমধাম, তত বিদ্যা ও তত জ্ঞান নাই।......সকল লোকেই অবাক হয়েছে......তারানাথটা কি।······কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি······।······জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্গজ

www.pathagar.com

পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তর্কবাচষ্পতি খুড়ের মত আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায়, তাঁর শরীরে সেরোগ ছিল না ·····রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। পুঁটি মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।'[৩৬] কৃষ্ণহরি শিরোমণির ভণ্ডামি ঃ

"একদিন, শিরোমণি মহাশয়······কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পর পুরুষের উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্তকাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। ···ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, ···· 'এক্ষণে শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া ··গাঢ় আলিঙ্গন দান কর'।·····ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী,·· প্রতিজ্ঞা করিল, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই, আমি প্রাণান্তেও পর পুরুষে উপগতা হইব না'। ·· সেবাদাসীর কথা শুনিয়া ·· শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং··· সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্যমুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি!····· আমরা পূর্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ, পূর্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন আলিঙ্গন করিলে সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়।' এই বলিয়া ····শিরোমণি মহাশয় তাহাকে, পূর্ববৎ চরণ সেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।'[৩৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'লোক রহস্য', 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'। বঙ্গদর্শন হতে সংকলিত হয়ে লোকরহস্য (এর আখ্যান পত্রে 'কৌতুক ও রহস্য' এরূপ লেখা ছিলো) পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মানুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।'[৩৮] কমলাকন্তের তিনটি অংশ, কমলাকান্তের দপ্তর--কমলাকান্তের পত্র এবং কমলাকান্তের জোবানবন্দী। এর সবগুলো রচনাই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিলো। কমলাকান্তের দপ্তর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী অংশগুলো নিয়ে সমগ্র কমলাকান্ত প্রকাশিত হয়েছিলো ১২৯২ বঙ্গাব্দে। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ও প্রথম বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে উল্লেখিত রচনা থেকে মাত্র একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো। ব্রাহ্মধর্ম-বিধবা বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং কৌলিন্য ও জাতিভেদে প্রভৃতির পক্ষে ঃ

www.pathagar.com

'হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১।। .... হে মিষ্ট ভাষিণ্। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব, পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেননা, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়। ২৪।।'।[৩৯]

তোষামোদ-চাটুকার প্রভৃতির বর্ণনা ঃ

'কলুপটিতে গেলাম, দেখিলাম যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে।......তোমার কাছে চাকরি নাই ......নগদ টাকা আছেত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রান্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তেল মাখাইব......কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন।'[৪০]

অপসঞ্চয়ের বাষ্পে ফুলে 'ওঠা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব' বাবু মুচিরাম গুড় ঃ

'মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তারপর দাঁও শিখিল।......মুচি শীঘ্রই বড় মানুষ হইয়া উঠিল—কোন মুচি না হয়?......মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পেঁাছিল। পরিচ্ছেদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—সাদা, কালো, নীল জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রিদিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।'[৪১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িককালে কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন, এঁদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১ খৃীঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'উৎকৃষ্ট কাব্যম' 'ভারত উদ্ধার', 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম', এবং 'পাঁচ ঠাকুর' এধারার রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কল্পতরু ও ক্ষুদিরামে ব্রাহ্মধর্মের নব্য চিন্তাধারা লেখকের রঙ্গ-ব্যঙ্গের উপকরণ। অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে মুখ্যতঃ সে সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের আবেগ উচ্ছ্বাস এবং এই সঙ্গে সামাজিক কিছু প্রসঙ্গকেও

www.pathagar.com

তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গের গদ্য-পদ্যে চিত্রিত করেছেন। যথা—'বঙ্গীয় ভারত হিতৈষীর প্রতিজ্ঞাপত্র ঃ 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বাঙ্গালা লিখিব না ও বাঙ্গালা পড়িব না। ......ইংরেজী প্রণালীতে সভা করা, সভার কার্য্যবিবরণ রীতিমত ইংরেজীতে লিখিয়া রাখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা এবং ইংরেজীতে আবেদন পত্র লেখা এই কয় বস্তুর অভাব প্রযুক্তই ভারতবর্ষের বর্তমান হীনাবস্থা, অন্য কারণবশতঃ নহে,...আমি বিশ্বাস করি যে, সভ্যতা, ভব্যতা কর্ম্মশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, বিদ্যা, বুদ্ধি এ সমস্তই পোষাকের গুণে; জর্ম্মানীর লোককে সাঁওতালের বেশ দিলে, তাহারা ঠিক সাঁওতাল এবং বানরকে ইংরেজের সাজ পরাইলে বানর ঠিক ইংরেজ হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।'[৪২]

প্রেমনিকেতন আলোক প্রাপ্ত ব্রাহ্ম সভ্য ও সভ্যদের সভায় 'সভাপত্নী শ্রীমতী নিস্তারের বক্তৃতাংশ ঃ 'হৃদয় রঞ্জনগণ! এবং হৃদয়রঞ্জিনী গণী। আমি এ সভার পত্নী হইয়া, ভয় পাইতেছি। আমার সবচেয়ে যোগ্যতরী বীরাঙ্গনা এ সভায় বিরাজমনা। (পুরুষ কণ্ঠে না না) কিন্তু যখন আমাকে সম্মান করাই সভ্য-সভ্যাদের অভিপ্রায় তখন আমার পশ্চাৎপদী হওয়া আবশ্যক করে না। (করতালি) যেমন সাধ্য আমি, ততদূর পর্যন্তই নির্বাহ করিতে থাকিব। (খুব পার্বেন খুব পার্বেন শব্দ)।'[৪৩] ভারত উদ্ধারের সংগ্রামী-নায়ক বিপিন স্ত্রীর নিকট থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কান্নায় ফেটে পড়েন। স্ত্রীরও কান্নার বিরাম নেই। কিন্তু বীরকে যে বিদায় দিতেই হবে—তাই বীরাঙ্গনার শেষ অনুরোধ ঃ

'নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ,
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।'[৪৪]

উনিশ শতকের বাঙলার প্রথমার্ধের কবিগান, পাঁচালি প্রভৃতির মধ্য দিয়েও কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার ধারাটি অগ্রসর হচ্ছিলো। বিখ্যাত কবিওয়ালা রামবসুর (১৮৭৬-১৮২৭ খ্রীঃ) একটি গানে 'কূলের কূল পাওয়া দুষ্কর' (রবীন্দ্রনাথ) হলেও, এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

'গেল গেল কূল কুল, যাক কূল, তাতে নাই আকূল।
রয়েছি যাহার কূল সে আমারে প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়
অকূলের তরী কূল পাবে পুনরায়।।'[৪৫]

পাঁচালীকারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭ খ্রীঃ)। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে অনেক রঙ্গ-ব্যঙ্গপূর্ণ পালা তিনি রচনা করেছিলেন।

www.pathagar.com

'বিধবা বিবাহ' তাঁর এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য পালা। এতে বিদ্যাসাগরের প্রতি যে সশ্রদ্ধ কটাক্ষ ফুটে উঠেছে, তাও লক্ষণীয় ঃ

'ক্ষীর পাই নগরে ধাম
ধন্য গণ্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর
তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়
হাকিমের হয়েছে রায়......
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত
প্রমাণ দিয়ে নানা মত
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত
ইহাদের যে উত্তর
টিকবে নাকো উত্তর
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত।।
ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।'[৪৬]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খৃীঃ) বিভিন্নভাবে কবিওয়ালাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও, শক্তিমান কবি হিসেবে, সেকালের কাব্যজগতে তিনি ছিলেন একক ও অনন্যসাধারণ। কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার ক্ষেত্রেও, সে যুগের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিলে, ঈশ্বরগুপ্ত অতুলনীয়। এখানে গুপ্ত কবির কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত হোল। ইংরেজের আচার-ব্যবহার ও বাঙালীর হাস্যকর অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে ঃ

'মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটি কাটা ড্রেস।।...
রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম।।...
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্।।...
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।।'[৪৭]

www.pathagar.com

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে :

'বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।। ..
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বলে।।...
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে।।'[৪৮]

কৌলীন্য প্রথাকে লক্ষ্য করে :

'মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা আঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।।...
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে।।'[৪৯]

নারী শিক্ষার প্রতি :

'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কর্ত্তো সবে
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।...
ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে পাবেই পাবে দেখতে পাবে;
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।।'[৫০]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুকণ্ঠি-গায়ক রূপচাঁদ-পক্ষীও (রূপচাঁদ দাস, ১৮১৪-৮৮ খৃীঃ) দাশরথি রায় ঈশ্বর গুপ্তের মতো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। নিম্নে তার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হোল। ইংরেজ-আচার-আচরণ-অনুকরণপ্রিয় ইয়ং বেঙ্গলকে লক্ষ্য করে :

'ইংরাজ লোকের আফিসে ভাই, মলিন বসন পরবার যো নাই,
কোট প্যাণ্টলন বুট পায়ে চাই, চলেনা সাদা ধুতি ।।

www.pathagar.com

হোটেলেতে খান খানা, বেরিয়ে পড়ে সে সব দেনা,
পুঁজির মধ্যে গাড়ী খানা, লাণ্ঠনের টোটা বাতি ॥
বিদেশীর দেখে শিখে চাল, চাল বাড়ালে ইয়ং বেঙ্গল
পানীয় দোষে চক্ষু লাল, কালস্য কুটীল গতি ॥'[৫১]

বিধবা বিবাহ, ব্রাহ্মধর্ম ও নারী স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি ঃ
'(কেহ) দিলেন বিধবার বিয়ে, (কেহ) ব্রহ্ম মত দিলে চালায়ে।
(হ'ল) স্বাধীন ইয়ং বাবু ভেয়ে, বেদব্যাস কি কল্কে পায় ॥
কহে কবি খগমণি, স্বাধীন রমণী ইদানি, ঘর ভাঙ্গানি।
দেশ চলানী, ভাতারকে বাঁদর নাচায় ।।'[৫২]

কৌলীন্য ও পণপ্রথা সম্বন্ধে ঃ
'আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল, আজকাল হচ্ছে বঙ্গ দেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায় ভিটে মাটী চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে ॥ ...
বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরু যে হ'তে ॥ ...
বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের ততোধিক, কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে।
সম্বন্ধ না হ'তে, বরের মুরুব্বিবতে, লম্বা ফৰ্দ্দ দেন হাতে নবাবি মতে ॥
মহামান্য কুলিন ঘরে, পাশ করা বাহাত্তুরে, আদর করে ধরে তারে, হয় কন্যা দিতে।'[৫৩]

সেকালের সংবাদপত্রগুলোতে এরূপ বহু কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতাই প্রকাশিত হোত। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কবিরা থেকে যেতেন অজ্ঞাত। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার গরজে এখানে মাত্র দু'টো উদাহরণ প্রদত্ত হোল। প্রথম কবিতাটির শিরোনামে শুধু লেখা রয়েছে 'পঞ্চপদী', লেখক, 'কস্যাচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপুর নিবাসী অত্যাচার দর্শিন' ঃ (সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে প্রকাশিত)।

তাঁর বর্ণনায় সেকালের কোলকাতা ঃ
'গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই ছিলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত, কতমত কচ্ছে দেশে ২।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়া হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়া গেলে, বলে
গোটো হেল। পেন্টলুন জাকিট পরে, ধূতি চাদর তুচ্ছ করে,
সদাই চাবুক করে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল।'[৫৪]

দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'সুবৃষ্টি', লেখক, 'ইয়ং বেঙ্গল'। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুনের সংবাদ প্রভাকর কবিতাটি প্রকাশ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

লিখেছেন, 'আমরা নিম্নলিখিত পদ্য ইয়ং বেঙ্গল মহাশয়ের বান্ধবদিগের বিশেষ আমোদ জন্য প্রকাশ করিলাম।' কবিতাটির একটি অংশ এরূপ,—

'ঢল ২ লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার পেয়ালা ।।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগা গণেতে শুদ্ধ দোষ।
বহ ২ সমীরণ বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ।।' [৫৫]

উনিশ শতকের বাঙলায় প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল মনোভাবের সংঘর্ষের অভিব্যক্তি স্বরূপ, এবং মূলতঃ সমাজ সংস্কার (Reform) প্রয়াসে বা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নিছক কৌতুক উপভোগের জন্য যে সমস্ত রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো, তার মধ্যে সংখ্যা এবং গুণগত দিক থেকে প্রহসনই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

দুই

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলন্ডে Farce (ইতালীয় Farse, ল্যাটিন Farcita)-এর প্রচলন শুরু হয়। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যবহৃত এই শব্দটির সমার্থক পরিভাষা হিসেবেই বাঙলা সাহিত্যের প্রহসন শব্দটি চিহ্নিত। জীবনের অতিলঘুরূপ বা Comic aspect of life-এর পর্যালোচনাকালে জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'জীবনের রূপকে মোটামুটিভাবে...... তিনটি বৃত্তের দ্বারা সীমায়িত করে দেখা যেতে পারে। প্রথম বৃত্তে—জীবনের ট্র্যাজেডির রূপ, দ্বিতীয় বৃত্তে জীবনের ট্র্যাজি-কমেডি-এর সিরিয়াস কমেডি রূপ; তৃতীয় বৃত্তে—জীবনের কমিক বা হাস্যোদ্দীপক রূপ।'[৫৬] ফার্স বা প্রহসন হচ্ছে জীবনের এ তৃতীয় বৃত্তেরই অভিব্যক্তি—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় যাকে বলা হয়েছে, **'a form of comedy in dramatic art, the object of which is to excite laughter by ridiculous situations and incidents.'** নিকলের ভাষায় **'This situation......is of the most exaggerated and impossible kind, depending upon the coarsest and rudest of improbable incongruities.'**[৫৭]

www.pathagar.com

প্রহসন নাট্যশিল্পের কমেডির পর্যায়ভুক্ত, এই টুকুন বলা চলে। সার্থক কমেডি বা শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পের জগতে এর প্রায় প্রবেশাধিকার নেই। ট্র্যাজেডি বা কমেডিতে মানুষের সার্বিক জীবন-সত্যের যে পরিচয় বিস্তৃত-বিকাশের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে, প্রহসনে তা অপ্রত্যাশিত। অবশ্য মানুষের সার্বিক জীবন-সত্যের রূপায়ণ বা এর ধারণ-ক্ষমতা কমেডি ও ট্র্যাজেডিতে এক রূপ নয়। কমেডি ট্র্যাজেডির চেয়ে নিম্নস্তরের রচনা। ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল তাঁর 'পয়েটিক্স'-এ বলেছেন, **'is an imitation of action that is serious, complete and of certain magnitade.'** কমেডি সম্বন্ধে তিনি বলেন, **'an imitation of characters of a lower type.'**[৫৮] যা স্থূল, অসঙ্গত ও পারম্পর্য বর্জিত, মূলতঃ তা নিয়েই প্রহসনের কারবার—এবং বলা চলে এর মধ্য দিয়েই একটি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দর্শক সমাজকে আনন্দ প্রদানই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্য কিন্তু আবাব বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সে উদ্দেশ্য, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের পাপাচার ও অন্যায় অসঙ্গতির ব্যঙ্গ করার। তবে, 'এখানে ব্যঙ্গ যত তীব্রই হউক একটা লঘু, কৌতুকময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রহসনের পরিসর হয় খুব ছোট। এই সংক্ষিপ্ততাই কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য।...প্রহসন আয়তনে সংক্ষিপ্ত; তাহার উদ্দেশ্য হইল সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতির উপরে লঘু বিদ্রূপ বর্ষণ। বলা বাহুল্য, এই কারণেই প্রহসনের মধ্যে সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণের অবতারণা করা যায় না এবং ইহার প্লটের মধ্যেও জটিলতা বা বিস্তৃতি থাকে না।...এই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহসন সাহিত্যের পর্যায়ে পঁহুছাইতে পারেনা।'[৫৯] প্রধানতঃ লৌকিক ও বাস্তবধর্মী রচনা হলেও অনেক ক্ষেত্রে কমেডিতেও অতিরঞ্জন দোষ দেখা দেয়—'কিন্তু তাতেও কমেডির বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় না, এবং কৃতি লেখক এর উপরে গভীর অর্থও আরোপ করতে পারেন।'[৬০] জনৈক সমালোচক বলেন, 'মেলোড্রামার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যকে যদি ট্র্যাজেডির সুলভ সংস্করণ বলে চিহ্নিত করা যায়, তবে 'ফার্স'-কে উচ্চ কমেডির লঘু-স্তরাশ্রয়ী শিল্প বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্ট্য হোল **'Staffed with low humour and extravagent wit '**[৬১]

আমাদের দেশে যথার্থ প্রহসন রচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে—এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ইংরেজী ফার্স—আদর্শের অনুসারী হলেও, এদেশের যাত্রা-পালার সঙ ও প্রচলিত নকশা প্রভৃতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। 'বাংলাদেশের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের করার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যই সেকালের মানুষ পূজা-পার্বণে সঙ বের করতেন। মুখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যই সঙের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হত। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে ঘুরত এবং সেই সঙ্গে সঙ বের করত।'[৬২] সেকালের পত্র-পত্রিকা, নকশা বা নকশা জাতীয় রচনাগুলোতে পূর্বেই আমরা এর খানিকটা বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের দেশের যাত্রা পালাগুলোতেও এ সঙের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে কবি, হাফ্-আক্‌ড়া, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। ...যাত্রায় বড় একটা কথাবার্তা ছিলনা, দু-একটা কথার পর 'তবে প্রকাশ করে বল দেখি ?' বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ হালকা সুরে গাইত....সঙ গালাগালি দিত। তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত।'[৬৩] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, 'বাঙ্গালা নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বে যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে রঙ্গ মঞ্চের প্রয়োজন হইত না—ভূমিতেই "আসর" রচনা করা হইত। এবং দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল না। সাধারণতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনেই অভিনয়ের "পালা" রচিত হইত। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা—গাহনা হইত বলিয়া সময় সময় অকারণ হাস্যোদ্দীপন জন্য সং আনিতে হইত।'[৬৪]

বস্তুগত বা বাহ্যিক দিক থেকে বাঙলা প্রহসনগুলোর উৎপত্তি যাত্রা-পালা থেকে না হলেও, স্বভাব ও আমেজের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো তার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না। সে স্বভাব-আমেজ-সঙ-তামাশা ও আনন্দ-কৌতুক উপভোগ এবং বিকৃত ও অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনকে নিয়ে জীবনের রসিকতা করার প্রবণতা সম্ভূত। জীবনের এ হাসি-তামাশা ও রসিকতাপূর্ণ লঘু দিকটিকে প্রত্যক্ষ করার প্রতি বাঙালীর মনে সেদিন একটা বিশেষ মোহ জেগেছিলো বলেই হয়তো রুশীয় লেখক লেবেডেফ আঠারো শতকের শেষ দশকেই দু'টো ইংরেজী কমেডি-নাটক বাঙলায় অনুবাদ করেন এবং এর একটি সেদিন একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়।[৬৫] একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই মনে হয় উনিশ শতকের বাঙলার প্রথমার্ধের মাঝামাঝিতেও কেউ কেউ অনুবাদ করলেন সংস্কৃত প্রহসনের।[৬৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের দেশে যথার্থ প্রহসন রচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে। মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসারের ফলে আমাদের সমাজের অনাচার-কুসংস্কারগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নতুনভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তখন নিষ্ঠার সঙ্গে এর অভিব্যক্তি ঘটিয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কলুষতাকে সংশোধিত করে তাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের প্রহসনকারেরা এগিয়ে এলেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল

www.pathagar.com

সমাজ-সংস্কারে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব হইতেই যাত্রাশালায় কবিতায় ও নকশায় সমাজ অথবা শ্রেণীবিশেষের ব্যঙ্গচিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়াছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামি, মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ, মাতালের লাঞ্ছনা, ধনীর লাম্পট্য, কুটনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা—ইহাই ছিল সাধারণ যাত্রার সঙের এবং নকশা-চিত্রের প্রধান বিষয়। বাঙলা নাটকের আবির্ভাবের সময়ে কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে হইয়াছিল, নাটকে এইভাবে সপরিমাণ সমাজ কলংকচিত্র দেখাইতে পারিলে সাধারণের চোখ সহজে ফুটিতে পারে।'[৬৭] রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সেদিন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে সহ্য করতে পারেননি বলে দেখা দেয় সংঘাত-সংঘর্ষ। এই সংঘাত-সংঘর্ষ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই বাঙলা প্রহসন প্রাণ পায়—এর ক্ষেত্রটি হয়ে ওঠে অধিকতর প্রাণোদীপ্ত ও উপলব্ধ এবং এর গতিও হয় বিচিত্রমুখী।

পুরো উনিশ শতকের শেষার্ধব্যাপী যে অগণিত প্রহসন প্রকাশিত হয়েছিলো, তার অনেকগুলোই আজ বিলুপ্ত—টিকে থাকা বেশীর ভাগ প্রহসনগুলোর অবস্থাও মরো মরো। ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা প্রহসন'-এর পরিশিষ্টে বাঙলা প্রহসনের কালানুক্রমিক একটি তালিকা (১৮৫৪-১৮৯৯ খৃীঃ) প্রস্তুত করে এতে সর্বমোট ৫০৫টি প্রহসনের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য প্রারম্ভেই তিনি বলে রেখেছেম, 'গত শতাব্দীর প্রচুর প্রহসন আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র সেগুলোর নামই পাওয়া যায়। অনেক প্রহসনে তাও পাওয়া যায় না। ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত সরকারী নথি, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকা, পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও উল্লেখ, প্রহসনের বা অন্যান্য পুস্তকের চতুর্থ কভারে বিজ্ঞাপন এবং গ্রন্থাকরের পরিচয়জ্ঞাপক বিশ্লেষণাবলী ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।'[৬৮] এর থেকেই ধারণা করা সম্ভব, সেকালের বাঙলায় প্রহসন রচনার কি ভীষণ হিড়িক পড়েছিলো। এই হিড়িক পড়ার কারণ ছিলো। প্রহসনকারগণ মুখ্যতঃ সমসাময়িক সমাজকেই তাঁদের রচনার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করতেন। সমাজের বিচিত্র অন্যায়-অসঙ্গতি, ব্যক্তি মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে, প্রহসনকাররা যেরূপ সহজ-স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন, তেমনটি আর অন্য কোন ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। জনৈক সমালোচক লিখেছেন, '......Once these plays started to be staged, it was easy to understand that the drama[৬৯] was a weapon more suited then any other literary genere to help a cause which required as much popularity as posssible, because it could use instances drawn directly from life and moreover, could reach even

www.pathagar.com

the illiterate masses who had no access to the written word.'[৭০] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'সমাজ-জীবনের এমন কোনও পাপ নাই, যাহা এই প্রহসনগুলিতে বর্ণিত হয় নাই। একমাত্র প্রহসনগুলির মধ্যেই যেন সেদিন মানুষের মন সর্ব বিষয়ে এক মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিল।'[৭১] সুকুমার সেন এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বিধবা বিবাহ—বহুবিবাহ ও গ্রাম্য-দলাদলি ইত্যাদি লইয়া অজস্র নাটক-প্রহসন রচিত ও প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যে আবর্জনার স্তূপ তুলিয়াছিল।'[৭২] বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের এনিয়ে আলোচনার অবকাশ কম। কিন্তু একটি কথা মনে হয় আমাদের সকলকেই স্বীকার করতে হয় যে, সেকালের সমাজে এই প্রহসনগুলোই ছিলো লোকচিত্ত বিনোদনের প্রধানতম উপকরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একান্ত বাস্তবভিত্তিক রচনা বলেই, এগলো আজও আমাদের অতীত জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার এক মূল্যবান দলিল হয়ে রয়েছে।

উনিশ শতকের বাঙলার সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে (বিশেষ করে প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদে) যে সমস্ত সমস্যা (যথা—অসম ও বৃদ্ধের বিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, নারীদের ব্যভিচার ও নৈতিকতার বিপর্যয়, বাবুয়ানা, অসামাজিক বেলেল্লাপনা ও জীবনোলব্ধির সংঘাত, ধর্মধ্বজ-লম্পট, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও রক্ষণশীল মর্যাদার অসারতা প্রভৃতি)-এর কথা উল্লেখ করেছি, তার প্রায় সবগুলোরই সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে তখনকার প্রহসনগুলোতে। অবশ্য, যথার্থ প্রহসনের মাপকাঠিতে যাচাই করতে গেলে, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনের রচনার কথাই আমাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে (আমাদের পরবর্তী আলোচনা মূলতঃ তাঁদের রচিত প্রহসনের ওপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হবে)। কিন্তু তাঁদের চারপাশে যে অগণিত প্রহসনকার সেদিন ভিড় জমিয়েছিলেন, অন্ততঃ সামগ্রিকভাবে আমাদের তৎকালীন সামাজিক জীবন ধারার একটি নিখুঁত-প্রায় চিত্র প্রণয়নের জন্য, তাঁদের অবদানও যে কম নয়, এ কথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধারায়, এরূপ কিছু প্রহসনকারের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হোল।

অসম ও বৃদ্ধের বিবাহ এবং বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধীয় প্রহসন

এই ধারার প্রহসন, শেখ আজিমদ্দীর 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'তে (২য় সংস্করণ, ১৮৬৮ খৃঃ), মৃত্যুপথযাত্রী জনৈক বৃদ্ধ কর্তৃক অর্থলোভী এক গৃহস্থের ষোড়শী কন্যা সৌদামিনীকে বিবাহ, কিছুদিন পর বৃদ্ধের মৃত্যু, এবং সৌদামিনীর অন্য এক যুবকের সঙ্গে মিলনের বর্ণনা রয়েছে।

www.pathagar.com

ফেলনারায়ণ শীলের 'সাধের বিয়ে'তে (১৮৭৩ খৃীঃ) ৬০/৬৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ বাবুর বালিকা স্ত্রী উমা, এবং অন্য এক শিশু-স্বামীর স্ত্রী সৌদামিনীর দুঃখের বর্ণনা রয়েছে। অজ্ঞাত লেখকের 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'য় (১৮৭৪ খৃীঃ) রয়েছে, বৃদ্ধ রাজীব গাঙ্গুলীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী কর্তৃক গ্রাম্য যুবক প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্তের কাহিনী ও বৃদ্ধ স্বামীর অসহায় অবস্থার চিত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদারের 'রামের বিয়ে প্রহসনে' (১৮৭৬ খৃীঃ) আছে, বিবাহ পাগল বৃদ্ধ রামতারণ মুখোপাধ্যায়ের নাকাল অবস্থার বর্ণনা। একদল লোক পাত্রীপক্ষ সেজে রামতারণের বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং গৌরীভূষণ নামে এক ব্যক্তিকে কন্যা সাজিয়ে বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী, পুলিশ এসে পিরালি গোত্রের হয়ে বরোজগোত্রীয় ভরদ্বাজ-কুলীন পরিচয় দিয়ে, বিবাহের ব্যবস্থা করার অভিযোগে, রামতারণকে ধরে নিয়ে যান এবং তাঁর জেল হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'অযোগ্য পরিণয়' (১৮৮০ খৃীঃ) প্রহসনে বৃদ্ধ নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অর্থপিশাচ পিতার তরুণী কন্যা তরুলতাকে, এবং অন্য এক অর্থলোভী ব্রাহ্মণ শিরোমণির শিশুপুত্র কেনারাম কর্তৃক যুবতী কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করা ও পরিণামে কাঞ্চনমালার বিষপানে আত্মহত্যা এবং তরুলতার পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ প্রহসন' (১৮৮২ খৃীঃ) হতে জানা যায়, কুলীন ব্রাহ্মণ পদ্মনাথ গুণালংকার বসন্তকে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেও, অন্য একটি সেবাদাসী রেখেছিলেন এবং মাঝে মধ্যে পতিতালয়েও যেতেন। একদিন বারাঙ্গনালয়ে গিয়ে, তিনি তাঁর পালক পুত্র নরেন ও বারাঙ্গনা কমলার হাতে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হন। তীব্র দুঃখ-বেদনা নিয়ে নরেন বাড়ী ছেড়ে চলে যান। অপর দিকে পরম গ্লানি ও যন্ত্রণার বোঝা মাথায় করে বসন্ত 'কুলের প্রদীপ' হয়ে কোন রকমে টিকে থাকেন। শম্ভুনাথ বিশ্বাসের 'ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্ত কথা'য় (১৮৮৩ খৃীঃ) আছে, জনৈক বৃদ্ধের তরণী স্ত্রী উপপতির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত জেনে, বৃদ্ধ তাঁকে ধরার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীর চালাকির দরুন তা আর হয়ে ওঠে না। এস. এন. লাহার 'বুড়ো পাগলার বে' (১৮৮৬ খৃীঃ) হতে জানা যায়, বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গিয়ে একটি লোক কিভাবে নাজেহাল হয়েছিলেন। কৃষ্ণবিহারী রায়ের 'পশ্চিম প্রহসন' (১৮৯২ খৃীঃ) হোল, প্রতিবেশীগণ কর্তৃক, পিঠ কুঁজিয়ে পড়া ষাট বছরের বৃদ্ধ বিবাহ-পাগল গবেন্দ্রের কয়েকটি কাল্পনিক বিবাহানুষ্ঠানের রঙ্গরসের চিত্র। শেষ পর্যন্ত বুড়োকে শনির দৃষ্টি কাটাবার জন্য, গাধার পিঠে চড়ে পথে পথে ঘুরতে হয়েছিলো এবং তাকে বরণ করা হয়েছিলো, ভাঙা কুলোর

www.pathagar.com

উপর জুতো, চুলের নুড়ি ও ঝাঁটা রেখে। এই ধরনের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে রামকানাই দাসের 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৮৪ খ্রীঃ), ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'রাঙ্গা-বৌয়ের গোদা ভাতার' (১৮৮৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কানাইলাল সেনের 'কলির দশ দশা'তে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে কিছু প্রচ্ছন্ন বক্তব্য করা গেলেও, মূলতঃ তা বহুবিবাহের সমস্যাজনিত প্রহসন। সাবিত্রী, তরঙ্গিনী ও কালিন্দীর স্বামী হরিহর দত্তের সংসার কি করে সপত্নী কলহ ও ব্যভিচারের ফলে ধ্বংস হয়ে গেলো, এতে তা বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে তরঙ্গিনী ব্রাহ্মসমাজী নবীন কিশোরের সঙ্গে চলে যান এবং ঘটনাক্রমে হরিহর, কালিন্দী ও সাবিত্রী আত্মহত্যা করেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে মুনসী নামদারের 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৯ খ্রীঃ), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'সপত্নী কলহ' (১৮৭২ খ্রীঃ), রাধাবিনোদ হালদারের 'এক ঘরে দুই রাঁধুনী পুড়ে মলো ফ্যান গালুনি' (১৮৮৭ খ্রীঃ) এবং 'দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ' (১৮৮৭ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৌলীন্য প্রথার সমস্যা নিয়ে লেখা অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্যের 'কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে' (১৮৮৪ খ্রীঃ) প্রহসনে আছে, জনৈক ৭০/৭৫ বছর বয়সের অচলপ্রায় এক 'কুলীন' ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের জন্য পাগল হয়ে ওঠেন। এই ব্যাপারে তাঁর পুত্র-কন্যা ও পৌত্রীদের কেউ কেউ অমত প্রকাশ করলে, তিনি নাকি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে পদ্মপলাশ নামক এক ব্যক্তি কুল দেখে তাঁর মেয়েকে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেন। বাসর ঘরে দু'টো মেয়ের কিল-চড় খেয়ে বৃদ্ধ মেঝেতে গড়িয়ে পড়েন। পুত্র রামনাথ দেখেন তাঁর পিতা মৃত। অন্যরা বলেন, নেশার ঘোরে এমন হয়েছেন, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। আশুতোষ বসুর 'সমাজ কলঙ্ক' (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রহসনের নীলকমল বাবু কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার লোভে তাঁর মেয়ে সুরবালাকে অপদার্থ-নেশাখোর বিনোদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। বহুদিন যাবৎ সুরবালাকে পিত্রালয়েই একা একা থাকতে হয়। এক সময়ে তিনি তাঁর কাকাত ভাই অবিনাশের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, এবং পরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে কৌলীন্য ও নিজের কৃতকর্মের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়ে কুলীনদের বহুবিবাহ সমর্থন করেও কেউ কেউ প্রহসন রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরিত্রবান কুলীন' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রহসন

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্ত চাপল্য' (১৮৫৭ খৃীঃ) বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রহসন। এতে জমিদার বাসব রায়ের বালিকা কন্যা বিধবা চপলা এবং তাঁর প্রতিবেশিনী অন্য দু'জন বিধবা, বিনোদা ও মোক্ষদার জীবনের দুঃখকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চপলা বিধবা হয়েও, আচার অনুষ্ঠান পুরোপরি পালন করতেন না। উপরন্তু ভূদেব বাবুর ছেলে চারুর সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয়নও ছিলো। বিনোদা এবং মোক্ষদাও আচার-অনুষ্ঠান পালনে খুব একটা মনোযোগী নন। কিন্তু চপলার ব্যাপারে তাঁরা ঈর্ষাবোধ করতে থাকেন। এই সময়ে আবার বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। এতে তর্কালংকার চিন্তিত। মালিনী তাঁর গর্ভপাতের ঔষধ অচল হয়ে পড়বে বলে দুঃখিত। কিন্তু অবশেষে চারু-চপলার বিবাহ সংগঠিত হোলই। শিমুয়েল পির বক্সের 'বিধবা বিরহ' (১৮৬০ খৃীঃ) প্রহসন থেকে জানা যায়, বৃদ্ধ উমাচরণ বাঁড়ুজ্যের দু'স্ত্রী। এছাড়া তিনি রক্ষিতাও দুজন রেখেছেন—বাড়ীর ঝি চাঁপাকেও তিনি একবার অন্তঃসত্ত্বা করেছিলেন। মনোমোহিনী তাঁর কন্যা—বালিকা বিধবা। কিন্তু বাড়ুজ্যে মশাইর বিধবা বিবাহে ঘোর আপত্তি। এনিয়ে ভট্টাচার্য ও তর্কলংকারদের মধ্যেও তর্কবিতর্ক হয়। রক্ষণশীলরা যুক্তিতে হেরে গিয়েও নিরাশ হন না। সংস্কারপন্থীরা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেও, কার্যক্ষেত্রে তেমন কিছুই করার আগ্রহ দেখান না। এদিকে পেয়ারী দত্তের মেয়ে বিধবা মুক্তকেশী নিমে তাঁতীর সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। মাধব চাটুয্যের বিধবা মেয়ে বাড়ীর চাকরের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে, অবশেষে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন। পরে গর্ভপাত ঘটিয়ে, জ্যান্ত শিশুটিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। মনোমোহিনী এসব জেনে শোনে অবাক হলেও, এক সময়ে নিজেও সেপথই বেছে নেন। নঙ্গরা নামে এক হাড়ীর ছেলের সঙ্গে অবৈধ মিলনে, তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে তাঁকে নিয়ে দেশান্তরী হন। মনোমোহিনীর বাবা-মাও লজ্জায় কোথায় যেনো আত্মগোপন করলেন। হরিশচন্দ্র মিত্রের 'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬১ খৃীঃ) ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত গৌরমোহন বসাকের 'অশুভ পরিহারক' (১৮৬২ খৃীঃ) প্রহসন থেকে জানা যায়, শ্যামচাঁদের দশ বছর বয়সের বিধবা মেয়েকে একদল লম্পট লোক বিবাহ দিতে দেননি। পরে নিতাইদাস বাবাজী কর্তৃক শ্যামাচাঁদ বাবুর মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন। বিশাখা নাম্নী এক বালিকা বিধবাও, তাঁর যৌবনকালে এক মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। উপেন্দ্র, মহেন্দ্র ও মহিম এ সমস্ত লক্ষ্য করে বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী ধর্মানন্দ বিদ্যাভূষণ, যুক্তি তর্কে বার বার হেরে গিয়েও এর বিরোধিতা করতে থাকেন। হরিহর নন্দীর 'ঘোড়ার ডিম'

www.pathagar.com

(১৮৮৯ খৃীঃ) প্রহসনে, বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলনকারীদের বাক সর্বস্বতার প্রতি বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। বিধবা বিবাহ-আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে রচিত বিহারীলাল নন্দীর 'পরিণয়োৎসব' (১৮৫৭ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'বিষম বিপদ' (১৮৫৭ খৃীঃ), যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবা বিলাস' (১৮৬৪ খৃীঃ) প্রহসনের নাম জানতে পারা যায়।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রহসন

শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যদ্বাহ নাটক' (১৮৬০ খৃীঃ) বাল্যবিবাহের দোষ নিয়ে লেখা। এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি এরূপঃ ধনাঢ্য গৃহস্থ বলহীন বাল্যা-বস্থায় বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ১১ বছর বয়সে গোপালের মা হন। গোপাল ন বছর বয়সেই পিতার মতো যক্ষ্মারোগী। তবু এই অবস্থাতেই বুদ্ধিহীনের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেয়া হয়। কিন্তু অসংযমে গোপাল আরো দুর্বল হয়ে পড়েন, এবং অবশেষে মারা যান। কাঁদতে কাঁদতে বলহীনের কাশি ওঠে, এবং দম আটকে তিনিও মারা যান। প্রহসনের অন্য চরিত্র, বিদ্যা-হীনও, বাল্যবিবাহের অশুভ পরিণামে জর্জরিত হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। সারদাচরণ ঘোষ এম. এ.-এর 'বাল্যবিবাহের অমৃত ফলে' (১৮৮৪ খৃীঃ), বাল্যবিবাহ যে বিদ্যাশিক্ষার সম্পূর্ণ অননুকূল এবং তা যে জীবনের স্বাভাবিক ধারাকে পাল্টে দেয়, এ মত ব্যক্ত করা হয়েছে। হরিমোহন কর্মকারের 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে গামছা পড়গে' (১৮৬৪ খৃীঃ) প্রভৃতি প্রহসনেও সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহের বিরোধী মত ব্যক্ত করা হয়েছে। হরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০ খৃীঃ), সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে তৎকালীন সমাজে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিলো, তারই ছায়াবলম্বনে রচিত। ভূপতি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুত্র এ আইন ভঙ্গ করেছেন বলে জমিদার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে নালিশ করেন। ফলে ভূপতি এবং তাঁর পুত্র উভয়েরই জেল হয়ে যায়। এরূপ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তখন আরো অনেক প্রহসন রচিত হয়েছিলো।

পণপ্রথা সম্বন্ধীয় প্রহসন

এ ধারার প্রহসনের মধ্যে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' (১৮৬৩ খৃীঃ), এবং 'জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ'-এর 'অসুরোদ্বাহ' (১৮৬৯ খৃীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে প্রহসনের অর্থপিশাচ রায় মহাশয়, দর কম ওঠবে বলে, অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ প্রদানে আগ্রহী নন। এই দর কমের জন্যই ওকালতি পড়া ছেলেও তাঁর পছন্দ হয় না। অবশেষে আটশো টাকা পণের বিনিময়ে, তিনি অত্যন্ত এক বৃদ্ধ বরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য করেন। মেয়ের

www.pathagar.com

ঠাকুর দাদার বয়সের বর দেখে, রায়-গিন্নি কেঁদে-কেটে হয়রান। অবশেষে নিরুপায় কর্তা সমস্ত টাকাগুলো গিন্নিকেই নিতে বলেন। গিন্নির মুখে হাসি ফুটে ওঠে এবং তিনি তখন টাকার পুটলি বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুরোদ্বাহের সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি এই ঃ অর্থলোভী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হরিহর চক্রবর্তী, তাঁর তিনবছর বয়সের মেয়ে জ্ঞানদার সঙ্গে বিবাহ দেয়ার জন্য, ছত্রিশ বছর বয়সের এক বর ঠিক করেন। বিবাহের দিন তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে, বরের নিকট থেকে চুক্তির অতিরিক্ত আরো অনেক টাকা আদায় করেন। অপরদিকে, প্রহসনের অন্য চরিত্র কেদার ঘটনাক্রমে ছ'শো টাকা পণ দিয়ে কুমুদিনী নামক এক পাত্রীকে বিবাহ করে মুশকিলে পড়েন। অর্থলোভে কুমুদিনীর অভিভাবকরা, শিশুকালে আর একবার তাঁকে অন্যত্র বিবাহ দিয়েছিলেন। কুমুদিনীর সেসব কথা মনে নেই। তবু সতীত্বের সংস্কার তাঁর মনকে বিচলিত করে তোলে। এদিকে সকলে কেদারকে এ স্ত্রী ত্যাগ করতে বলেন—কেদার নির্বাক। অবশেষে দশজনের পরামর্শে পিত্রালয়ে পাঠাবার ছলে, কুমুদিনীকে নির্মমভাবে তাঁর মামা কালিপ্রসাদ সাহার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। কালিপ্রসাদ জানান, এই ব্যভিচারিণীর মুখ তিনি দেখতে নারাজ। অবশেষে, কন্যাপণ ও সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে, কুমুদিনী আত্মহত্যা করে সকল সমস্যার সমাধান ঘটান। শিশির কুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' প্রহসন থেকে জানা যায়, অর্থপিশাচ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রামধন মজুমদার, হাজার টাকা পণের কমে কিছুতেই তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী নন। পণের অভাবে, মুখুজ্য বংশের বিশ বছর বয়স্ক শিক্ষিত যুবকও তাঁর অপছন্দ। প্রতিবেশী রঞ্জনের সঙ্গে মজুমদারের মেয়ে সরলার প্রেম ছিলো। কিন্তু রঞ্জন পণের টাকা প্রদানে অক্ষম। রঞ্জনের চার মামাও পণের টাকার অভাবে বিবাহ করতে পারছিলেন না। মজুমদারের ছোটো ভাই সাতুলাল চালাকি করে, সকলের অজ্ঞাতে গ্রামের কুলীন ভুবন মুখুয্যের চারজন প্রৌঢ়া কুমারী বোনের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ দিয়ে দেন। প্রহসনের অন্য চরিত্র গোপীনাথ ভট্টাচার্যও আর এক অর্থপিশাচ। তিনি পণের টাকা সম্পূর্ণ আদায় না করায়, জামাইকে মেয়ের সঙ্গে মিলিত হতে দিচ্ছিলেন না। অবশেষে জামাইবাবু একদিন শ্বশুরের তিনশো পঞ্চাশ টাকা ও মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান। অপর দিকে, রঞ্জন এক সময়ে নির্ধারিত পণ দিয়ে সরলাকে বিবাহ করতে রাজী হন। রঞ্জনের সঙ্গে সরলার আত্মীয়ের সম্পর্ক থাকলেও, মজুমদার টাকা পেয়ে, বিদ্যাভূষণ প্রমুখের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বিবাহের দিন রঞ্জন দশ টাকা কম দেয়ায় মজুমদার রেগে গিয়ে বলেছিলেন, পাত্রের অভাব হবেনা, দরকার হলে এই রাত্রেই বুড়ো—মুখুজ্যের সঙ্গে তিনি সরলার বিবাহ দেবেন। বহু অসুবিধে কাটিয়ে, অবশেষে রঞ্জন-সরলার বিবাহ হয়। রাধাবিনোদ হালদারের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৫ খৃীঃ), প্রহসনে

www.pathagar.com

অর্থপিশাচ পিতা ভজহরি কর্তৃক প্রচুর পণের বিনিময়ে ৮৪ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে নিজের মেয়ে সুশীলার বিবাহ প্রদান ও পরিণামে সেই বৃদ্ধের হাস্যকর ও পর্যুদস্ত অবস্থা, এবং মদ্যপ যুবক নটবরের সঙ্গে সুশীলার দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হীরালাল ঘোষের 'রোকা কড়ি চোকা মাল' (১৮৭৯ খ্রীঃ) বর পণের বিষয় নিয়ে লেখা। রাখালচন্দ্র রায়ের মেয়ে কুসুম কুমারী বিবাহযোগ্যা। কিন্তু ছোক্‌রা বর পেতে হলে, অনেক পণের প্রয়োজন। তাই রাখালবাবু বুড়ো পাত্রের সঙ্গেই মেয়ের বিবাহ প্রদানের কথা ভাবেন। গিন্নি কিন্তু এতে নারাজ। অবশেষে, বসন্ত কুমার ঘোষের পুত্র চারু-চন্দ্রের সঙ্গে কুসুম কুমারীর বিবাহ ঠিক হয়। কথা থাকে, পাত্র পক্ষের সমস্ত দাবীই রাখালবাবু মেনে নেবেন। বিবাহের দিন মেয়ে কুসুম কুমারীকে সকলের সম্মুখে হাজির করে রাখালবাবু জানান যে, এর বেশি পণ দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বসন্তবাবু ভীষণ রেগে গিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসতে চান। কিন্তু বর পাত্রীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং শুভ কার্যটি সম্পন্ন হতে আর দেরী হোল না। রাধাবিনোদ হালদারের 'পাশ করা জামাই' (১৮৮০ খ্রীঃ) প্রহসনে রয়েছে, কেদারের বাবা বড় ধরনের পণ পাবার আশায় ছেলেকে, বি. এ. পাশ করিয়েছিলেন। ননীগোপাল বাবু পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়ে ঐ পাত্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দেন। কিন্তু কুরুচিপূর্ণ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে, বর বাসর রাত্রেই পালিয়ে যান। বরের পিতা সকলের নিকট অপদস্থ হন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র' (১৮৯০ খ্রীঃ) প্রহসনে অর্থপিশাচ লোভেন্দ্রের নাজেহাল অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। লোভেন্দ্র অনেক চক্রান্ত করে, পরাণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তাঁর পুত্র গবেন্দ্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন, এবং পণ হিসেবে মেয়ের পিতার কাছ থেকে তাঁর বসত বাড়ীটি ও নগদ চার হাজার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। গবেন্দ্রবাবু কিন্তু বেশ্যা পান্নাবাইকে নিয়েই ব্যস্ত। অপর দিকে পরাণবাবুর বন্ধু শ্যামবাবু ও হরিবাবু সন্ন্যাসী ও কাফ্রী সেজে লোভেন্দ্রের কাছ থেকে চালাকি করে বিশ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে তাঁকে জব্দ করেন।

কন্যা ও বর পণ নিয়ে আরো অনেক প্রহসন রচিত হয়েছিলো, এর মধ্যে ব্রজমাধব শীলের 'পরের ধনে বরের বাপ' (১৮৬৩ খ্রীঃ) নফরচন্দ্র পালের 'কন্যা বিক্রয়' (১৮৬৩ খ্রীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'বঙ্গমাতা' (১৮৭৫ খ্রীঃ), যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মার 'কন্যাদায়' (১৮৯৩ খ্রীঃ), দুর্গাচরণ রায়ের 'পাশ করা ছেলে' (১৮৯৭ খ্রীঃ) ও অজ্ঞাত লেখকের 'রহস্যের অন্তর্জ্জলী' (খ্রীঃ-?) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

মদ্যপান সম্বন্ধীয় প্রহসন

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা' (১৮৫৮ খ্রীঃ) মদ্যপান বিষয়ে রচিত প্রথম প্রহসন।[৭৩] গোপালচন্দ্র মিত্র, হরিহর মিত্র, নিতাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল গুপ্ত তাঁরা চার বন্ধু। মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা করে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। নিতাইবাবু, অনেক ভেবে চিন্তে, অন্ন সংস্থানের একটি উপায় বের করেন—তাহলো 'বাবু' সেজে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব করা, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁকেও মদে আসক্ত করে তোলা। যথারীতি তাঁরা প্রসন্নবাবুর সঙ্গে ভাব জমান। মদ্যপান ইত্যাদি একটানা চলতে থাকে। তাঁদের এই আসরে অন্য এক ইয়ার নন্দরাম ভট্টাচার্যও যোগ দিয়েছেন। নিতাই-বাবু শ্যামবাবুকে একদিন বলেন, প্রসন্নও যখন তাঁদের মতো 'বাবু' হয়ে যাবেন, তখন তাঁরা সকলে মিলে বৃন্দাবনে চলে যাবেন। সেখানে তাঁরা সুখেই থাকবেন—কারণ, তাঁরা তো আর অশিক্ষিত নন। ইতিমধ্যে প্রসন্নবাবুও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অবশেষে বসতবাড়ীটি বিক্রি করে, তিনি সকলের তীর্থের খরচ যোগাড় করেন, এবং তাঁরা সকলেই প্রতিজ্ঞা করেন, আর কখনো মদ খাবেন না। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দলভঞ্জন' (১৮৬১ খ্রীঃ) প্রহসনে মদ্যপান প্রভৃতি নেশার কুফল বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের 'সুধা না গরল' (১৮৭০ খ্রীঃ) প্রহসনে সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মদ্যপান ও অন্যান্য ব্যভিচারের বর্ণনা রয়েছে। উকিল বিধুবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সংস্কার মুক্ত হওয়ার জন্য, তিনি তাঁর স্ত্রীকেও মদ্যপানের অভ্যাস করিয়েছিলেন। অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপানের ফলেই বিধুবাবুর অকাল মৃত্যু ঘটে। গণেশ ডাক্তার মদতো পান করেনই, উপরন্তু, বোসদের বউয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে জব্দ হন। শিক্ষক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও কমল মাস্টারও মদে আসক্ত। গোলাপী বেশ্যার সঙ্গেও মধুবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে। অবশ্য, এসব তিনি অত্যন্ত সাবধানেই করে থাকেন। শম্ভু ও নলিনবিহারী ক্লাব-থিয়েটার ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত। মদ-বেশ্যা তাঁদের নিত্য সহচর। অর্থের অভাবে শম্ভু তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে রত্ন-চুড় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্ত্রী আপত্তি জানালে, অধৈর্য হয়ে তাঁকে লাথি মারেন। স্ত্রী সরোজিনী ছট্ফট্ করতে করতে ইহলীলা সংবরণ করেন। রামচন্দ্র দত্তের 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪ খ্রীঃ) প্রহসনের ব্রাহ্ম সমাজী হরিশবাবু ও জনৈক এটর্নির অতিরিক্ত মদ্যপান, অসামাজিক বেলেল্লা-পনা এবং কামিনী বেশ্যার নিকট যাওয়ার জন্য, টাকা দিতে অস্বীকার করায়, হরিশবাবু কর্তৃক তাঁর বৃদ্ধা মা সাবিত্রীকে আঘাত করা ও এনিয়ে বৃদ্ধার আকুল কান্না প্রভৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪ খ্রীঃ) প্রহসনের ঘটনাটি এই ঃ শারদা ও বরদা কমলাকান্ত

রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। শারদা স্ত্রী সৌদামিনীকে ফেলে নিরুদ্দিষ্ট। বরদা কমলাকান্তের জামাই গোরাচাঁদ ও বন্ধু উড়ুম্বর, বিধুভূষণকে সহ মদ ও বেশ্যা নিয়ে সদা ব্যস্ত। তাঁরা মদ খাওয়াকে রিফর্মারের কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু কমলাকান্ত তাঁদের ভীষণ অসুবিধের কারণ। অবশেষে গোড়াচাঁদের পরিকল্পনানুযায়ী, তাঁরা কমলাকান্তকে জ্যান্ত পুড়ে ফেলতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কমলাকান্ত দেশ ছেড়ে কাশীতে চলে যান। সৌদামিনীও গোরাচাঁদের ব্যভিচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এক সময়ে কাশীতে চলে যান। বরদা অত্যধিক মদ্যপানের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী হিমাঙ্গিনীও আত্মহত্যা করেন। এদিকে গোরাচাঁদ তাঁর স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে, কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে সৌদামিনীর সন্ধান পেয়ে, তাঁকে আক্রমণ করেন এবং ভীষণভাবে প্রহার করেন। অজ্ঞান অবস্থায় সৌদামিনীকে উদ্ধার করে যে গৃহে আনা হয়, সেখানেই শারদা থাকতেন। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হোল—সৌদামিনী তখন বিধবার সাজ ফেলে, সধবার সাজ পরেছেন। অপর দিকে, আত্মহত্যার জন্য কমলাকান্ত যে বিষ তৈরী করে রেখেছিলেন, ঘটনাচক্রে তা পান করেই গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়। 'জ্ঞান-গর্ব শিক্ষাভিমানীর' (রাজকৃষ্ণ রায়) 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮ খৃীঃ) প্রহসনে, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল ঘোষ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও জহরলাল পণ্ডিতের অতিরিক্ত মদ্যপান ও তিলোত্তমা বেশ্যাকে নিয়ে রঙ্গরস করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ভীষণভাবে নাজেহাল হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মদ্যপানের বীভৎসতা নিয়ে রচিত অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে, কেদারনাথ ঘোষের 'জ্ঞান দায়িনী' (১৮৭১ খৃীঃ), নিত্যানন্দ শীলের 'আর কেহ যেন না করে' (১৮৭৩ খৃীঃ), পণ্ডিত মানবজন্ব, নারায়ণ বিদ্যাশূণ্যের 'মাতালের সভা' (১৮৭৪ খৃীঃ), শ্রীপতি ভট্টাচার্যের 'কি লাঞ্ছনা' (১৮৭৫ খৃীঃ), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যেমন দেবা তেমনি দেবী' (১৮৭৭ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'এই এক প্রহসন' (১৮৮১ খৃীঃ), বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রেমের নক্শা বা রগড়ের চাঁচি' (১৮৯৯ খৃীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাবুয়ানা, অসামাজিক বেলেল্লাপনা ও জীবনোপলব্ধির সংঘাত সম্বন্ধীয় প্রহসন

এধরনের সমস্যা নিয়ে অনেকগুলো প্রহসন রচিত হয়েছে। গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালির মুখে ছাই' (১৮৭৫ খৃীঃ) প্রহসনের খেতাব—পাগল যাদববাবুর প্রতি বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। যাদববাবুর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি নজর দেয়ার অবকাশ নেই। বৈঠকখানায় তাস খেলেন আর সভা-সমিতি করে বেড়ান। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে অনবরত দান করেন। রাজাবাহাদুর প্রভৃতি জাতীয় একটা খেতাব পেতে হলে, তাঁকে যে তা করতেই হবে। আর্থিক সঙ্গতি

www.pathagar.com

শূন্যের কোঠায় পেঁছোলে, তিনি স্ত্রী কাত্যায়ণীর গয়নাগুলোর জন্য ঘুর ঘুর করেন। যাদববাবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, তাঁর ছেলে ক্ষেত্র আত্মহত্যা করেন। এই শোকে কাত্যায়ণীও আত্মহত্যা করেন। যাদববাবু ভেবে পান না তাঁর বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়। হরিহর নন্দীর 'হঠাৎ বাবু' (১৮৭৮ খৃীঃ)-তে মদ্যপানের কুফলের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকলেও, সামগ্রিকভাবে বাবুয়ানার প্রতিই লেখকের বিদ্রূপ ফুটে ওঠেছে। গোপাল-চন্দ্র মিত্রের 'পদীর বেটা পদ্মলোচন' (১৮৭৯ খৃীঃ) প্রহসনেও পদীর পুত্রের অভিজাত নাম গ্রহণ ও তাঁর হাস্যকর বাবুয়ানার প্রতি বিদ্রূপ রয়েছে। কামিনী গোপাল চক্রবর্তীর 'বক্কেশ্বরের বোকামি' (১৮৮১ খৃীঃ) প্রহসনে বৃদ্ধা ফল-ওয়ালীর পুত্র বক্কেশ্বর ও তাঁর বন্ধু রামচন্দ্রের মদ্যপান ও গোলাপ বেশ্যাকে নিয়ে বাবুগিরি করা পরিশেষে মায়ের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়া, এবং বেশ্যা কর্তৃক প্রচুর ঝাঁটা পেটা খেয়ে, অনুতপ্ত হওয়ার চিত্র রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'কর্ম্মকর্ত্তা' (১৮৮২ খৃীঃ) প্রহসনে আছে, নবীনবাবুর ছেলে আহ্লাদ, সঙ্গতি না থাকলেও, নাম হবার জন্য ঋণের টাকা দিয়ে ঘটা করে ঠাকুর দাদা ও মায়ের শ্রাদ্ধ করেন। পরিণামে তাকে বিশেষ অপমানিত হতে হয় এবং দেনার দায়ে জেলে যেতে হয়। অনুকুলবাবু ঋণের টাকা শোধ করে তাঁকে মুক্ত করলে, তাঁর সুবুদ্ধি ফিরে আসে। কালীচরণ মিত্রের 'কাপ্তেন বাবু' (১৮৮৯ খৃীঃ) প্রহসনের নরেন্দ্রবাবু ইংরেজী শিক্ষার গর্বে গর্বিত। তিনি নিজে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়ে থাকলেও, তাঁর আদরের বেশ্যা মনোমোহিনীকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত পড়াতে চান। অর্থ-সঙ্গতির অভাবে মহাজন রামকৃষ্ণের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে মনোমোহিনীর জন্য ২৫০ টাকা বেতন দিয়ে বাঙালী মেম প্রমদাকে শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। ঋণ শোধ করতে না পারায়, মহাজন নরেন্দ্রের নামে মকর্দমা করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর সমস্ত টাকাই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এদিকে নরেন্দ্রেরও অনুশোচনা জাগে। অঘোরনাথ বসু চৌধুরীর 'বিলাসী যুবা' (১৮৯৬ খৃীঃ) প্রহসনে রয়েছে হঠাৎ বাবু ঈশানের কুকীর্তির বর্ণনা। তিনি গরীবের সন্তান, বিখ্যাত ধনী মৃত যজ্ঞেশ্বর বাবুর পোষ্যপুত্র। ঈশানবাবু ইংরেজীতে কথা বলেন, বাইজীর নাচ দেখেন, সাহেবী খানা খান, বেশ্যা রেখে আনন্দ করেন। তাঁর দু' বন্ধু কামদেব ও ধনঞ্জয়, বসন্তের কোকিল। তাঁদের সহায়তায় ঈশানবাবু, পরিচারিকা জাহ্নবীর সঙ্গেও ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা চরম লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে একসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরে ধনঞ্জয় ও কামদেবেরও মৃত্যু হয়। নিঃস্ব ঈশানবাবুর দ্বারে, পাওনাদার ও যমদূতের এক সমানেই হানা চলতে থাকে। বাবুয়ানা সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দত্তের 'আজব জোলা' (১৮৮৭ খৃীঃ), কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৌবাবু' (১৮৯০ খৃীঃ), অজ্ঞাত

www.pathagar.com

লেখকের 'যতো নবাবি' (খ্রীঃ ?), দুর্গা দাস দে'র 'ল-বাবু' (১৮৯৮ খ্রীঃ), ধীরেন্দ্রনাথ পালের 'ভুটিয়া মাণিক বা দারজিলিন্যের নক্সা' (১৮৯৮ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' (১৮৭২ খ্রীঃ) প্রহসনে একদল লোকের যথেচ্ছাচারিতার নিদর্শন বর্তমান। পুত্রহীন জগচ্চন্দ্র বারাঙ্গনাসক্ত এবং মদ্যপ। জানকী নামের যে বেশ্যালয়ে তাঁর যাতায়াত, সেখানে তাঁর জামাই পরেশ ও পোষ্যপুত্র শরচ্চন্দ্রও গিয়ে থাকেন। শরচ্চন্দ্র মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গ ও **enlightened** হওয়ার উপকরণ মনে করেন। ব্রাহ্ম বক্কেশ্বরও মদ এবং বেশ্যায় আসক্ত। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব' (১৮৮৪ খ্রীঃ) প্রহসনের নায়ক, রামধন বসুর পুত্র গোপাল, সিবিলিয়ানশিপ পাশ করে দস্তুর মতো সাহেব বনে ফিরে এসেছেন। অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণি রামধন বাবুকে জানান, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাঁদের বিদায়ের ব্যাপারটি বিশেষভাবে বিবেচনা করলে, তাঁরা গোপালকে গোবর খায়িয়ে কোনো রকমে সমাজে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু গোপালের কাছে যে প্রণাম-নমস্কার ইত্যাদি হচ্ছে **barbarous custom**, গোমাংস হচ্ছে **capitalfood**, ধর্ম হচ্ছে **puzzless.** তিনি তাঁর স্ত্রী সরলাকে গাউন পরিয়ে টেবিলে খানা খেতে শেখাতে ইচ্ছুক। তাঁকে **reformation** এবং 'সভ্যটা' শিক্ষা দেয়ার জন্য, ভারত আশ্রমে পাঠাতেও বিশেষ আগ্রহী। রামধনবাবু তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করার মনস্থ করেন। এ ধরনের আর একটি প্রহসন গিরি গোবর্ধনের 'একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব' (১৮৭৬ খ্রীঃ)। এতে অবশ্য বিলাত ফেরত গদাধরের সাহেবিয়ানার চেয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাড়াবাড়িই অধিক ফুটে ওঠেছে। ডেপুটি গৌরদাস, উকীল কৃষ্ণদাস প্রমুখ ব্যক্তি নিজেদের মদের আসরে বসে **Nationality health drink** করছেন এবং বিলেত ফেরত বাঙালী সাহেবদের নিন্দে করছেন দেখে হাসি পায়। প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সভ্যতা সোপানে' (১৮৭৮ খ্রীঃ), **Reformer** নামধারী ধনী-পুত্র মহেন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের অসামাজিক বেলাল্লাপনার প্রতি বিদ্রূপ রয়েছে। মহেন্দ্র তাঁর স্ত্রী বসন্তকুমারীকেও রিফরম্‌ড্ করে নিচ্ছেন। বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপান, হই হট্টগোল আর বিরাজী বেশ্যার সঙ্গে রঙ্গরসেই তাঁর দিন কাটে। তাঁর মতে আহাম্মকরাই ধর্মের নামে ভয় করেন—নরক-টরক বলেও কিছু নেই। ঘটনাক্রমে, নিজের অজান্তে মহেন্দ্র একদিন বিষমিশ্রিত মদ পান করে ঢলে পড়েন—তখন তাঁর অতীতের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জাগে। রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'অবলা-ব্যারাক' (১৮৮৭ খ্রীঃ) প্রহসনে রয়েছে, নিঃসন্তান ভাগ্যধর তলাপাত্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাধ্যমে সাত ছেলের মা মনোমোহিনীর সঙ্গে প্রেমের চেষ্টা চালান। অষ্টমপক্ষের স্বামী হিসাবে ভাগ্যধরকে গ্রহণ করতে মনোমোহিনীরও

www.pathagar.com

যথেষ্ট আগ্রহ--তিনি তাঁর ছেলেদের এই বলে বুঝিয়েছেন, **Love always blind.** ছেলেরাও অনন্যোপায়। কেননা, বিপিনবাবুর সঙ্গেও তো তাঁদের মা'র বিয়ে হতে পারে না, তিনি যে তাঁদের চেয়েও বয়সে ছোটো। প্রহসনের (অবলা-ব্যারাক বা মহিলা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) কালীবাবুকে নিয়ে টানাটানি করছেন culture-রাখা মহিলা সুহাসিনী ও হেমাঙ্গিনী। দু'জনকেই নাকি তিনি বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের 'লণ্ড-ভণ্ড' (১৮৯৬ খৃীঃ) প্রহসনে অসামাজিক বেলাল্লাপনার চরম রূপ ফুটে ওঠেছে। রাঘবরামের দ্বিতীয়া স্ত্রী জেস্‌মিন সুন্দরী, শিক্ষিতা ও নিজেকে আধুনিকা ভেবে গর্বিতা। ছেলেমেয়েদের মধ্যপান ও অন্যান্য নেশাকে তিনি আধুনিকতার চিহ্ন বলেই মনে করেন। রিফর্মার নির্বিকারের সঙ্গে জেস্‌মিনের অবৈধ প্রণয়। নির্বিকার কিন্তু জেসমিনের চতুর্দশী মেয়ে বোকেকেই বেশি ভালোবাসেন। অপর দিকে 'এজুকেটেড ইয়ুথ' লোহারামও বোকেকে পেতে চান। বোকেরও এদিকে ঝোঁক। কেননা, তিনি জানেন, নির্বিকার হচ্ছেন তাঁর মা'র 'লভার'। পরে কিন্তু নির্বিকারই বোকেকে নিয়ে পালিয়ে যান। জেস্‌মিন গার্ডেনে গিয়ে তাঁদের সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু নির্বিকার তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। এদিকে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, লোহারাম গিয়ে নির্বিকারকে হত্যা করেন। প্রহসনের অন্য চরিত্র মদ্যপ জমিদার রামকান্তও এবার বোকেকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। রাঘববাবু কাশীবাসী হওয়ার কথা ভাবেন। অসামাজিক বেলল্লা-পনাকে লক্ষ্য করে রচিত অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে দ্বারকানাথ মিত্রের 'মুষলম্ কুলনাশনং' (১৮৬৪ খৃীঃ), শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের 'তুমি যে সর্বনেশে—গোবৰ্দ্ধন' (১৮৭৯ খৃীঃ), ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের 'সমাজ সংস্করণ' (১৮৮৩ খৃীঃ), নলিনীলাল দাস গুপ্তের 'তোমার ভালবাসার মুখে আগুণ' (১৮৮৫ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'যৌবনের ঢেউ' (১৮৮৫ খৃীঃ), লালবিহারী সেনের 'ভালবাসার মুখে ছাই' (১৮৮৬ খৃীঃ), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'টাট্‌কা টোট্‌কা' (১৮৯০ খৃীঃ), অপূর্বকৃষ্ণ মিত্রের 'আজব কারখানা বা বিলাতী সং' (১৮৯৪ খৃীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংস্কার (Reform) বা দেশোদ্ধার প্রভৃতির নামে একদল লোক সমাজ জীবনের গতিপ্রবাহকে এক চরম নৈরাজের দিকে ঠেকে দিচ্ছিলেন। এর প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপও সেদিন অনেক প্রহসন রচিত হয়েছিলো। অবশ্য, এ সমস্ত প্রহসনে অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতির ছবিও বর্তমান। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের 'অপূর্ব ভারত উদ্ধার' (১৮৮০ খৃীঃ) প্রহসনের ভারত উদ্ধারকামী আত্মশর্মা, বাগ্মী প্রবর-বাক্য সর্বস্ব, বিভিন্ন কাজের নাম করে শ্রীপতিবাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করেন। সর্ববর্ধনবাবু চাটুকর--প্রপঞ্চক। সভাকরের মতে, একমাত্র সভা করেই দেশোদ্ধার সম্ভব। তাঁর দেশতারিণী-ভারত উদ্ধারিণী

www.pathagar.com

সভার নিয়মানুসারে সভ্যদের হিন্দু ধর্ম, আচার-ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে, স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে হবে, প্রেম করে বিবাহ করতে হবে ইত্যাদি। তাঁরা সকলেই আবার মদ ও বেশ্যা নিয়ে ব্যস্ত। আত্মশর্মাবাবু আর এক ধাপ এগিয়ে, শ্রীপতিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে গিয়ে ভীষণভাবে অপদস্থ হন। জি. সি. রায়ের 'বউ-ঠাকরুণ বা সমাজ কলঙ্ক' (১৮৮১ খ্রীঃ) প্রহসনের ভারত বন্ধু ভণ্ড সমাজ হিতৈষী। তিনি বিধবা বিবাহ প্রভৃতির জন্য আন্দোলন করেন। কিন্তু তাঁর বিধবা বৌদি কামদাকে তিনি অন্তঃসত্ত্বা করেছেন। পরে আবার বীরচন্দ্র প্রভৃতির সহায়তায় কামদাকে প্রিয়নাথের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। এতে কামদা ও প্রিয়নাথের বাকী জীবনটা শুধু দুঃসহ যন্ত্রণাতেই ভরে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'সংস্কারক প্রহসনে'র (১৮৮৬ খ্রীঃ) নায়ক নব্যযুবক যোগীন্দ্রনাথ তাঁর সগোত্রীয় বন্ধু নবীন ও কালীপ্রাণকে নিয়ে Whole India-Reformation-এর জন্য ব্যস্ত। স্ত্রী স্বাধীনতা—বিধবা বিবাহের প্রচলন, জাতিভেদ ওঠানো, পৌত্তলিকতা বর্জন ইত্যাদি তাঁর মূল লক্ষ্য। চাঁদার টাকায় যোগীন্দ্র একটা বাড়ী করেছেন, নাম দিয়েছেন, নব্য সমাজ। এতে বিধবা বিনোদিনীকে নিয়ে বন্ধুদেরসহ মদ্যপান ও অন্যান্য অনাচারে তিনি লিপ্ত। মতের মিল না হওয়ায়, বিধবা কামিনীকে যোগীন্দ্র পদাঘাতে হত্যা করেন। প্রহসনের অন্য চরিত্র বিনোদিনী চলে যান নবীনের সঙ্গে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'গাধা ও তুমি' (১৮৮৯ খ্রীঃ) প্রহসনের সারদাদাস সদ্য বিলাত ফেরত। বরদা দাস ভাইকে পেয়ে সমাজ-সংস্কারের জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা করেন—ভাইকে সামনে রেখে তিনি Society Paper বের করবেন, বেশ্যার বিবাহ দেবেন ইত্যাদি। সারদাবাবু ইংরেজীতে কথা বলেন, তাঁর বাংলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ সাহেবদের মতো, দেশী পোশাক পরা আর উলঙ্গ থাকা তাঁর চোখে সমান। সংস্কার মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ছোট ভাইয়ের বউয়ের হাত ধরে টানাটানি করেন। অপর দিকে পেলারামকে দিয়ে (দু'ভাইয়ে বিবাহ করার জন্য) বেশ্যা লালমণি ও তাঁর মেয়ে ল্যাভেণ্ডারকে সংগ্রহ করেন। পরে জানতে পারেন, লালমণি তাঁদের পিতা বামদাস গুঁইয়ের উপপত্নী ছিলেন এবং ল্যাভেণ্ডার তাঁরই ঔরসজাত কন্যা। এমন সময় John Bull বিলেত থেকে সারদাকে ধাওয়া করে আসেন। সারদা সেখানকার জেল পালাতক দাগী আসামী। এভাবে সব কিছুই পণ্ড হয়ে যায়। হরিহর নন্দীর 'ঘোড়ার ডিম' (১৮৮৯ খ্রীঃ) প্রহসনের মাণিক বিধবা বিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকল্পে সভা-সমিতি করে বেড়ান। একদিন আসন্ন এক সভায় এনিয়ে আলোচনা হবে বলে, গোবর্ধন জানতে চান, মাণিক কোন পক্ষ সমর্থন করবেন। জবাবে মাণিক জানান তাঁর আবার পক্ষ বিপক্ষ কি? যেদিক জয়ী হবে সেদিকেই

www.pathagar.com

তিনি আছেন। দীন দয়ালবাবু বহুবিবাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রত্যেককে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহবান জানালে, শ্রোতারা সব আস্তে আস্তে সরে পড়েন। এসব দেখে মাণিক বলে ওঠেন 'ঘোড়ার ডিম'। এই ধরনের আরো অনেক প্রহসন সেদিন রচিত হয়েছিলো। এর মধ্যে বংকুবিহারী মিত্রের 'আই ডোণ্ট কেয়ার' (১৮৭০ খ্রীঃ), অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'টেক্‌টেক্ নাটেক্ নাটেক্ একবার তো সি' (১৮৭২ খ্রীঃ), বিরাজ মোহন চৌধুরীর 'সরস্বতী পূজা প্রহসন' (১৮৭৫ খ্রীঃ), হরিহর নন্দীর 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি' (১৮৭৯ খ্রীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'বঙ্গ রত্ন' (১৮৮১ খ্রীঃ), বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলির ছেলে প্রহসন' (১৮৮৫ খ্রীঃ), পূর্ণচন্দ্র সরকারের 'হাল আমলের সভ্যতা' (১৮৮৫ খ্রীঃ), মহেন্দ্রনাথ নাথের 'কলির অবতার' (১৮৮৭ খ্রীঃ), রাখাল দাস ভট্টাচার্যের 'ভণ্ড বীর' (১৮৮৮ খ্রীঃ), অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বক্কেশ্বর' (১৮৮৯ খ্রীঃ), দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বেজায় আওয়াজ' (১৮৯৩খ্রীঃ), দুর্গা দাস দে'র 'Encore! 99 !! শ্রীমতী !!!' (১৮৯৯ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

'বারাঙ্গনাসক্তি' নারীদের ব্যভিচার ও নৈতিকতার বিপর্যয় সম্বন্ধীয় প্রহসন

উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত বেশির ভাগ প্রহসনের মধ্যেই এ সমস্যাটি কোনো না কোনোভাবে উল্লেখিত। তবে যে সমস্ত প্রহসনের মূল লক্ষ্য বেশ্যাসক্তি, নারীদের ব্যভিচার ও নৈতিকতার বিপর্যয় প্রদর্শন, সে সমস্ত কিছু প্রহসনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই এখানে প্রদত্ত হোল।

প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসক্তি নিবর্তন নাটকে'র (১৮৬০ খ্রীঃ) শ্যামাচরণ মদ্যপ এবং বেশ্যাসক্ত। গোলাপী বেশ্যার বাড়ীতেই তাঁর অধিক সময় কাটে। এদিকে তাঁর স্ত্রী শশিমুখীর দুঃখের অন্ত নেই। শ্যামাচরণের বোন বিনোদিনীর দুঃখও কম নয়। বিবাহিতা হয়েও তাঁকে পিত্রালয়েই থাকতে হচ্ছে। একবার অবশ্য পঞ্জিকা দেখে, বহু চেষ্টা করে, তাঁর স্বামী মদনকৃষ্ণকে আনা হয়েছিলো। মদনকৃষ্ণ কিন্তু পালিয়ে গেলেন শ্যামাচরণের স্ত্রী শশিমুখীকে নিয়ে। পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মদনবাবুর জেল হয়। শশিমুখী আর ঘরে না ফিরে খাতায় নাম লেখান। হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩ খ্রীঃ) প্রহসনের হঠাৎবাবু মোহন মদ্যপ ও লম্পট। তাঁর বন্ধু রসিক ইংরেজী শিক্ষিত। পিতাকে তিনি মনে করেন শকুনীর মড়া। পিতার বন্ধুরা হচ্ছেন, যতো সব বিড়াল তপস্বী—old fool. রসিকবাবু সব সময়ে বাইরে বাইরেই থাকেন, বারাঙ্গনা বুঁচিই তার প্রাণ সর্বস্ব; স্ত্রীর কাছে কখনো বা যদি আসেন, তাও শুধু গয়নার জন্য। এতে প্রমীলার দুঃখের অন্ত নেই। রসিকবাবু একদিন বন্ধু নসীর সংগে, বুঁচির বাড়ীতে গিয়ে

www.pathagar.com

চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অপদস্থ হয়ে ফিরে আসেন। প্যারীমোহণ সেনের 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা' (১২৭০ সাল) প্রহসনে রয়েছে, এক সাধু কোলকাতা দেখতে এসে জনৈক লম্পটের হাতে পড়েন। লম্পট তাঁকে কোলকাতা দেখাবার ছলে সোনাগাছি, মেছুয়া বাজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গণিকালয়গুলোতে নিয়ে যান। সাধু সে সব স্থানে ঘুরে ঘুরে বেশ্যা ও মাতালদের রঙ্গ-রস প্রত্যক্ষ করে ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু পরে তিনি নিজেও আর ঠিক থাকতে পারেন না। বেশ্যা-প্রেমে মত্ত হয়ে তাঁর কোলকাতার দিনগুলো কাটতে লাগলো। বিপিন বিহারী দে'র 'একাদশীর পারণ'-এর (১৮৭১ খৃীঃ) আশুতোষ মদ্যপ ও বারাঙ্গনাসক্ত। মদ খাওয়াকে তিনি Civilization মনে করেন। তাঁর রক্ষিতা হেমাঙ্গিনী ওরফে হিমিবিবির কাছে অন্য বাবুর যাতায়াত আছে জেনে তিনি বলেন যে, তাঁর স্ত্রী প্রেমলাঙ্গিনীর ঘরে কেউ আসতো, তাহলেও তাঁর এতো দুঃখ হোত না। প্রেমলাঙ্গিনীর দুঃখ-লাঞ্ছনার অন্ত নেই। কিন্তু অব্যাহত মদ্যপান ও ব্যভিচারের ফলে এক সময়ে আশুতোষ মৃত্যুর মুখোমুখি হন। এবং পরিশেষে, স্ত্রীর আন্তরিক সেবা-যত্নে আরোগ্য লাভ করে, তাঁর মনে অনুশোচনা জাগে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মা এয়েচেন !!!' (১৮৭৩ খৃীঃ) প্রহসনের কামিনী ও মোহিনী দু' বেশ্যা। কামিনী কুলীনের মেয়ে হলেও, মামাত ভাইয়ের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে, ভাগ্যচক্রে খাতায় নাম লিখিয়েছেন। মোহিনী কানাইর রক্ষিতা। কিন্তু তাঁর কাছে গোপনে গিরিশ বোসও যাতায়াত করেন। একদিন গিরিশ মোহিনীর ঘরে। এমন সময় কানাই গিয়ে কড়া নাড়েন। মোহিনী গিরিশকে বিধবার পোশাক পরিয়ে কানাইকে জানান, দেশ থেকে তাঁর 'মা এয়েচেন'। পরে কানাইর সন্দেহ থেকে এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। কামিনী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যান। নিজের স্ত্রী শশিকলার দুঃখের কথা স্মরণ করে কানাই তখন অনুতপ্ত হন। একই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে সেদিন অনেক প্রহসনই রচিত হয়েছিলো। এর মধ্যে, শ্রীনাথ চৌধুরীর 'আমিতো উন্মাদিনী' (১৮৭৪ খৃীঃ), শ্যামলাল বসাকের 'ইহারই নাম চক্ষুদান' (১৮৭৫ খৃীঃ), রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮১ খৃীঃ), দিবাকান্ত রায়ের 'অমৃতে গরল' (১৮৮৩ খৃীঃ), প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের 'বড় বৌ বা ডাক্তার' (১৮৮৪ খৃীঃ), বেচুলাল বেনিয়ার 'সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১৮৮৫ খৃীঃ), তিতুরাম দাসের 'কলির ছেলে প্রহসন' (১৮৮৭ খৃীঃ), সুধামাধব দাসের 'বিচিত্র অন্ন প্রাশন' (১৮৮৯ খৃীঃ), মীর মশাররফ হোসেনের 'এর উপায় কি' (১৮৯২ খৃীঃ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নারীদের ব্যভিচার নিয়ে লেখা, অজ্ঞাত লেখকের 'হেমন্ত কুমারী' (১৮৬৮ খৃীঃ) প্রহসনে দেবরের সঙ্গে একটি মহিলার অবৈধ প্রণয়ের বর্ণনা রয়েছে।

www.pathagar.com

কুঞ্জবিহারী বসুর 'তুই না অবলা !!' (১৮৭৪ খৃীঃ); প্রহসনে রয়েছে, লম্পট ফিরিঙ্গী গোমিসের সঙ্গে অন্নদার স্ত্রী গোলাপের পালিয়ে যাওয়া এবং পরিশেষে গোমিস কর্তৃক তাঁকে প্রতারণা ও পরিত্যাগ করার কাহিনী। অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'কলির মেয়ে ছোট বৌ ওরফে ঘোর মুখ' (১৮৮৮ খৃীঃ) প্রহসনে রাম ভট্টাচার্য, শ্যাম ভট্টাচার্য, অবিনাশবাবু প্রমুখ চরিত্রের কান্ডজ্ঞানহীন হাস্যকর আচার-আচরণের বর্ণনা রয়েছে। তবে, এই সঙ্গে শ্যামবাবুর স্ত্রী সারদার ব্যভিচারসর্বস্বতাও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাদাই ভাল' (১৮৮৪ খৃীঃ) প্রহসনের অবতার, রমেশ, গিরিশ, ঈশান নব্য সম্প্রদায়ের নাম করে মদ আর বারাঙ্গনা নিয়ে ব্যস্ত। ঈশানের স্ত্রী বিরাজমোহিনী ব্যভিচারিণী। তিনি অবতারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে অবশেষে চরমভাবে লাঞ্ছিতা হন। 'কবিরত্ন বিরচিত' 'রহস্য মুকুর' (১৮৮৬ খৃীঃ) প্রহসনের জমিদার পরেশ বাবুর বিবাহ-বাতিক রয়েছে। এদিকে তাঁর কুলটা স্ত্রী সুচতুরা তাঁকে পানের সঙ্গে মরফিয়া খায়িয়ে অর্থ ও গয়না ইত্যাদিসহ মদনের সঙ্গে পালিয়ে যান। নারীদের ব্যভিচার প্রবণতাকে লক্ষ্য করে লেখা অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে বিনোদবিহারী বসুর 'সরসীলতার গুপ্ত কথা' (১৮৮৩ খৃীঃ), চন্দ্রশেখর শর্মার 'নারী চাতুরী' (১৮৮৫ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'ফচ্‌কে ছুড়ীর ভালবাসা' (১৮৮৬ খৃীঃ), এস. এন. লাহার 'গোপাল মনির স্বপ্নকথা' (১৮৮৭ খৃীঃ), হারান শশিদের 'কলিকালের রসিক মেয়ে' (১৮৮৮ খৃীঃ), মোহনলাল মিত্রের 'রসিক কামিনীর হদ্দমজা', 'রথ দেখা আর কলা বেচা' (১৮৮৯ খৃীঃ), শরৎচন্দ্র দাসের 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' (১৮৯৬ খৃীঃ), কালু মিঞার 'রাতে উপুড় দিনে চিৎ ছোট বউর একি রীত' (খৃীঃ ?), সিদ্দিক আলীর 'সোমত্য মাগীর সখ' (খৃীঃ ?) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যান্য কিছু প্রহসনের বৈচিত্র্যবহুল ঘটনার মধ্যে সেকালের সমাজের নৈতিকতার বিপর্যয়ের দিকটি উদ্ভাসিত। অজ্ঞাত লেখকের 'বিধবা বঙ্গবালা' (১৮৭৫ খৃীঃ) প্রহসনে জনৈক ব্রাহ্মণ একজন বিধবাকে প্রলুব্ধ করে, তাঁর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে, বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী বাবু প্রহসনে' (১৮৭৬ খৃীঃ) জনৈক শিক্ষিত বাঙালীবাবু তাঁর স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, অন্য একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত। বাবুর বিধবা বোন আসক্ত ঐ স্ত্রী লোকটির ভাইয়ের প্রতি। একদিন তিনি প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। বাঙালীবাবু জব্দ হন তাঁর প্রণয়িনীর মিথ্যে মকর্দমায়। নটবর দাসের 'মক্কেল মামা' (১৮৭৮ খৃীঃ) প্রহসন হতে জানা যায়, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিজের বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। মামার প্রলোভনেই এই মহিলা সতিত্ব ধর্মেরও জলাঞ্জলী

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র দাসের 'মামা ভাগ্নীর নাটক' (১৮৭৮ খ্রীঃ) এরূপ বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা। যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমি তোমারই' (১৮৭৯ খ্রীঃ) প্রহসনের লম্পট-প্রবর নটবর অন্যের স্ত্রী সুশীলার প্রতি আসক্ত। সুশীলা অনেক ছল চাতুরী করে, নটবরের কুকীর্তি তাঁর স্ত্রী বিমলাকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেন। ক্রুদ্ধ নটবর পদাঘাতের পর পদাঘাতে বিমলাকে হত্যা করেন। উপেন্দ্র কৃষ্ণ মন্ডলের 'পূজারী বেটা ছুঁচো' (১৮৮০ খ্রীঃ) প্রহসনের লম্পট পিতা, পুত্রের লাম্পট্যকেও প্রশ্রয় দেন। পুত্রটি, নষ্টমেয়ে সংগ্রহকারী দালালদের প্রতারিত করতেও ওস্তাদ। কালীপদ ভাদুড়ীর 'গুণের শ্বশুর' (১৮৮১ খ্রীঃ) প্রহসন হতে জানা যায়, অতিবৃদ্ধ রুই দাসের নাকি চরিত্র দোষ আছে। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ এদিক থেকে বাপকেও অতিক্রম করেছেন। বিশ্বনাথের পুত্রেরা বিবাহিত। বড় পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি ব্যভিচারে আসক্ত হলে, তাঁর স্ত্রী হৈমবতী ষড়যন্ত্র করে পুত্রবধূকে দূরে সরিয়ে দেন। অন্য দু' পুত্রবধূ প্রমদা এবং সতীর কাছেও বিশ্বনাথ কুপ্রস্তাব রাখেন। অপরদিকে বিশ্বনাথের ছেলে কিশোরীও বৌদি প্রমদাকে প্রেম নিবেদন করেন। কিশোরীর স্ত্রী সতী বিষপান করে শ্বশুর-স্বামীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। নৈতিকতার বিপর্যয়কে লক্ষ্য করে রচিত এরূপ অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে নিবারণচন্দ্র দে'র 'দু কূল ফর্সা' (১৮৭৭ খ্রীঃ), কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'গোলক ধাঁধাঁ' (১৮৮২ খ্রীঃ) মনোরঞ্জন বসুর 'প্রণয় বিচ্ছেদ' (১৮৮৩ খ্রীঃ), যশোদা নন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'কলির কাপ' (১৮৯৫ খ্রীঃ), কালীচরণ মিত্রের 'সই' (১৮৯৭ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধর্মধ্বজ লম্পট, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও রক্ষণশীল মর্যাদার অসারতা সম্বন্ধীয় প্রহসন

ধর্মধ্বজ লম্পটদের অনেক কাহিনী সেকালের পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। এরূপ এক কুখ্যাত ব্যক্তি তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি কর্তৃক, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট এবং অনন্যোপায় ও ক্রোধান্ধ নবীনচন্দ্র সে স্ত্রীকে হত্যা করায় উনিশ শতকের সত্তরের দশকের প্রথম দিকে বাঙলাদেশে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো।[৭৪] এনিয়ে বহু প্রহসনও তখন রচিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'উঃ! মোহন্তের এই কাজ!' (১৮৭৩ খ্রীঃ) প্রহসন থেকে জানা যায়, নবীনের স্ত্রী সরলা তাঁর পিত্রালয়ে থাকতেন। নবীন সেখানে মাঝে মধ্যে যেতেন। অর্থলোভী নবীনের শ্বশুর হরিশংকর ও সরলার বিমাতা তরঙ্গিনী ষড়যন্ত্র করে সরলার সঙ্গে মোহন্তের ব্যভিচারের সুযোগ করে দেন। নবীন একথা জানতে পেরে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে সব কথা জিজ্ঞেস করলে সরলা তাঁর পিতা-মাতার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে, ঘটনাটির সত্যতা

www.pathagar.com

স্বীকার করেন এবং কাঁদতে থাকেন। নবীন স্ত্রীকে শ্বশুরালয় থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মোহন্ত চারদিকেই লোক রেখে দিয়েছেন— কিছুতেই তিনি সরলাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। অনন্যোপায় নবীন যেনো উম্মাদ হয়ে যান। তাঁর বর্তমানেই সরলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকবেন মোহন্ত ? এক সময়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়—তিনি দা দিয়ে কোপিয়ে কোপিয়ে তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলেন। এদিকে থানার পুলিশগণ মিথ্যে অজুহাতে দীননাথের স্ত্রী ফুলমনিকে ধরে এনে, তাঁর সতীত্ব নষ্ট করার চেষ্টা চালান। দীননাথ সেখানে উপস্থিত থেকেও অসহায়। এমন সময় উম্মাদ-প্রায় নবীন হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে থানায় উপস্থিত হন। নবীনের আচার-আচরণ সন্দেহজনক মনে করে, পুলিশগণ ইন্‌স্‌পেকট্‌রকে খবর দিতে চলে যান।

একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোহন্ত সম্বন্ধীয় প্রহসনগুলো রচিত বলে, এগুলোর মধ্যে খুব একটা বৈচিত্র্য নেই। আলোচনা সংক্ষেপ কবার জন্য এখানে শুধু সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারকেশ্বরের নাটক অর্থাৎ মহন্ত লীলা' (১ম খণ্ড, ১৮৭৩ খৃীঃ), লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের 'মোহন্তের এই কি কাজ' (১ম খণ্ড, ১৮৭৩; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৭৪ খৃীঃ), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মোহন্তের এই কি কাজ' (১৮৭৩ খৃীঃ), তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের কি দুর্দশা' (১৮৭৩ খৃীঃ), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' (১৮৭৪ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'মোহন্তের শেষ কান্না' (১৮৭৪ খৃীঃ) দক্ষিণাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড তপস্বী' (১৮৭৪ খৃীঃ), নারায়ণ চন্দ্রের 'মোহন্তের য্যাসা কি ত্যাসা' (১৮৭৪ খৃীঃ), প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসনের নাম উল্লেখ করা হোল।

ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে লক্ষ্য করে লেখা নিমাইচাঁদ শীলের 'এ'রাই আবার বড়লোক' (১৮৭৬ খৃীঃ) প্রহসনের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি রাজাবাবু সুনাম অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো চাঁদার খাতায় নাম লেখান। তাঁর কিন্তু মদ্যপান ও ব্যভিচার দোষও রয়েছে। জয়কুমার ডাক্তার ও কৃষ্ণকিশোর মাস্টার প্রমুখ ব্যক্তি তার যথার্থ ইয়ার। পাড়াগাঁয়ে তাঁরা ব্রহ্ম-সমাজও স্থাপন করেছেন। রাজাবাবু তাঁর নিজের স্ত্রী নির্মলা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, অন্যের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত। সতীত্ব নষ্ট করার জন্য রাজাবাবু অন্য এক বিধবা শশিমালার প্রতিও আকৃষ্ট। নির্মলার মর্মবেদনা অন্তহীন। কিন্তু মাতাল রাজাবাবু একদিন মদের বোতলের আঘাতে নির্মলাকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি দেন। লম্পট ডাক্তার, শশিমালার পরিচারিকা ক্ষমার ঝাঁটা খেয়ে দেশ ত্যাগ করেন। কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিলেন অন্যের সঙ্গে। কেংড়েল চন্দ্র ঢাকেন্দ্রের (মনোমোহন বসু) 'নাগাশ্রমের অভিনয়' (১৮৭৫ খৃীঃ) প্রহসনে উন্নতশীল নামাঙ্কিত কতোগুলো ব্রাহ্ম সমাজীর বাকসর্বস্বতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আচার-আচরণের প্রতি

www.pathagar.com

বিদ্রূপ রয়েছে। নাগরাজ বাসুকী এম. এ. রাজভ্রাতা অনন্ত, রাজমন্ত্রী তক্ষক, পরম ভক্ত রামমাণিক্য বা পুঁয়ে বোড়া প্রমুখ সকলেই 'নাগ সমাজের' হর্তা-কর্তা। নারী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ প্রভৃতির উচ্ছেদ নিয়ে তাঁরা বড়ো বড়ো কথা বলেন। কিন্তু বিধবা মেথরাণীকে বিবাহ করার কথা শুনে, পুঁয়ে বোড়াও বলেন, 'হ্যাক থুঃ' ! পরম ব্রহ্মের পূজারী হলেও তাঁরা নর-পূজায় অন্ধ। ফকিরদাস বাবাজীর (কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ) 'অবতার' (১৮৮১ খ্রীঃ) প্রহসনে মাধবগুপ্তের একান্ত বাসনা বুদ্ধ, খ্রীস্ট বা মুহম্মদের মতো মহাপুরুষ হওয়ার। তিনি মনে মনে তাঁর বক্তৃতাশক্তি ও গম্ভীর ভাব ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করেন। বিক্রম মজুমদার প্রমুখ শিষ্য তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ। মাঝে মধ্যে খুশীতে আত্মহারা হয়ে, মাধববাবু আদিরসাত্মক দু একটা গান গাইতে চান। কিন্তু সমাজের কথা মনে হলেই থেমে পড়েন। তাঁর স্ত্রী কিন্তু বলেন, তিনি ঢেঁকী অবতার। একদিন শিষ্য লাবণ্যময় অবতারকে যীশু খ্রীস্টের গর্দভ আরোহণ-পর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অবতার তাঁদের নিজেদের জন্যও সে ব্যবস্থা করার অনুমতি দেন। গাদার পিঠে শিষ্য-পরিবৃত অবতার নগর পরিভ্রমণ করতে থাকেন—পেছনে পেছনে বাউলরা গাইতে থাকেন বিদ্রূপাত্মক গান। নগরে মহা হৈ চৈ। রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'সরুচিত ধ্বজা' (১৮৮৬ খ্রীঃ) লালচাঁদ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। লালচাঁদের মতে তাঁর স্ত্রী Accomplished wife নন। স্বসমাজী বন্ধু চারু সে স্ত্রীকে divorce করার পরামর্শ দেন। সমাজচার্যও এতে সম্মতি দেন, কেননা, লালচাঁদের কাছ থেকে সমাজে অনেক টাকা আসে। কালাচাঁদের স্ত্রী সুরুচি অর্থলোভে লালচাঁদকে বিবাহ করার জন্য তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করেন। লালচাঁদ সমাজের বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে খেমটা নাচিয়ে ফুর্তি করেন। কিন্তু তাঁর পিতা এ বিবাহে সম্মত হন নি বলে, লালচাঁদকে অগত্যা শূন্য হাতেই সুরুচির কাছে গিয়ে ওঠতে হয়। সুরুচি অর্থহীন লালচাঁদকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁকে পরামর্শ দেন, এক চোখ কানা গৌরমণিকে বিবাহ করতে—অবশ্য এর আগে তাঁর আরো ১৫/১৬টি বিবাহ হয়েছিলো, এই যা। একই ধরনের অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয় প্রকাশ নাটক' (১৮৭৫ খ্রীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'কপালে ছিল বিয়ে—কাঁদলে হবে কি ?' (১৮৭৮ খ্রীঃ), বঙ্গ বিলাস সমজদার (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার সরকার) রচিত 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের বাঙলায় ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অসংগতি, চারিত্রিক অধঃপতন ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে লিখিত কিছু প্রহসনে, মূলতঃ রক্ষণশীল মর্যাদার অসারতাকে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির

www.pathagar.com

'কলি কৌতুক' (১৮৫৮ খ্রীঃ) প্রহসনে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের অনাচারের কথা উল্লেখ থাকলেও, এতে প্রাধান্য পেয়েছে কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তির ('সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য''র) লাম্পট্য ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ব্যভিচার পরায়ণতা। শিব মুখুজ্যের ষোড়শী কন্যাকে আট-ন'বছরের নৈকষ্য কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেয়ার, এবং নেড়া সখীচরণকে, নেড়ী মা গোসাই তাঁর চরণে তৈল মর্দনের অনুরোধ করায়, প্রহসনের একটি ঘৃণ্য ও হাস্যকর চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বুঝলে কিনা ?' (১৮৬৬ খ্রীঃ) প্রহসনের দলপতি অটলকৃষ্ণ মদ্যপ-লম্পট। তাঁর যথার্থ ইয়ার পুরোহিত বিদ্যালঙ্কার। অটলের কুকীর্তির অন্ত নেই। তিনি কোন প্রতিবেশীকে একঘরে করার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করেন, স্বার্থের খাতিরে খ্রীস্টান নীলাম্বরকে জাতে ওঠান, এবং তাঁর বসতবাড়িটি পর্যন্ত আত্মসাতের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কাছে বিধবা হাবুলের মা'র দশহাজার টাকা পাওনার কথাটিও তিনি অস্বীকার করেন। দর্পনারায়ণের ভাই ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর মেয়েকে স্কুলে দিয়েছেন বলে, অটল তাকে একঘরে করে রেখেছেন। অপরদিকে দর্পনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীর কাছে তিনি বিদ্যালঙ্কারের মাধ্যমে কুপ্রস্তাব প্রেরণ করেন। এতে ব্যর্থ হলেও তিনি দমবার পাত্র নন। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়েছে মেথরাণী সুখীর উপর—তাঁকে তিনি সন্ধ্যাবেলায় আস্তাবলে আসার মন্ত্রণা দেন। দর্পনারায়ণের পরামর্শে, মেথরাণী যথাসময়ে সেখানে যান এবং অটল ও বিদ্যালঙ্কারের মদ-মাংস খাওয়ার সময় সঙ্গদানের অভিনয় করেন। এমন সময় দর্পনারায়ণ সেখানে আত্মপ্রকাশ করে বিদ্যালঙ্কারকে জব্দ করেন। অটলকে চালাকি করে ভালুক সাজিয়ে এবং তাঁর গলায় দড়ি লাগিয়ে, সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখান—ইনিই আমাদের দলপতি, বুঝলে কিনা ? শ্যামলাল চক্রবর্তীর 'কি মজার কর্তা' (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রহসন হতে জানা যায়, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এক ধর্মধ্বজ ব্যক্তি সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ করতেন এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতেন। এই সুযোগে তিনি কোনো কোনো মেয়েদের ব্যভিচারিণী করে তোলার প্রচেষ্টাও চালাতেন। কিন্তু একদিন তিনি হাতেনাতে ধরা পড়ে ভীষণভাবে নাজেহাল হন। কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'চক্ষুস্থির প্রহসনে'র (১৮৮২ খ্রীঃ) কৃষ্ণদাস বৈরাগী, জমিদার হরগোবিন্দের স্ত্রী বৈষ্ণবীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবীর দ্বারা হরগোবিন্দকে বিষপানে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। উভয়ের উপরই তখন সমানে উত্তম মধ্যম চলতে থাকে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড দলপতি দণ্ড' (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রহসনের নায়ক লম্পট দলপতি হরিহরবাবু। লুসি তাঁর ফিরিঙ্গী রক্ষিতা। কালী পূজার নামে তিনি লুসির নাচ গান আর মদ্যপানের মহড়া চালান। অর্থলোভী পুরোহিত

www.pathagar.com

কেনারাম, পৌরহিত্যের দক্ষিণা হিসেবে লাভ করেন মাত্র এক গ্লাস ব্রাণ্ডি। অপরদিকে মালা জপতে জপতে দলপতি মশাই, নন্দরাম মুখুজ্যেকে একঘরে করেছেন। নন্দরামের দোষ, তিনি তাঁর জনৈক বিলাত ফেরত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। পরে অবশ্য নন্দরাম প্রমুখ কর্তৃক দলপতির মুখোশ উন্মোচিত হয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'মুই হ্যাঁদু' (১৮৯৪ খ্রীঃ) প্রহসনে অনেক অদ্ভুত 'হ্যাঁদু'র ভীড়। সদারং ও সবলুট সন্ন্যাসীদ্বয় মদ্যপ ও লম্পট। তাঁরা 'মজা' লুটছেন, 'হিন্দুয়ানি'ও বজায় রাখছেন। লম্বোদর সার্বভৌম ও খগপতি তর্কচঞ্চু একই ধরনের লোক--তাঁরা গোপনে গোপনে অনেক 'কড়েরাঁড়ীর সর্ব্বনাশ' করতেন, যেখানে সেখানে নিমন্ত্রণ রাখতেন। চেদবাবু এ দু'ব্রাহ্মণকে একঘরে করেছেন। অপরদিকে চেদবাবু মেথরাণী রেবীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, উক্ত দু'ব্রাহ্মণের হাতে ধরা পড়েন। পরে অবশ্য দশ টাকা খরচ করায় সব মিটে যায়। চেদবাবু তাঁর বন্ধু গোলকবসু, ভানুসিংহ, নাড়ুগোপাল প্রমুখকে নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা-দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এতে স্বগোত্রীয় পুরুষ-রমণীগণ প্রতিমা সাজেন। কিন্তু পূজার সময় মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে অসুর হঠাৎ দুর্গাকে আক্রমণ করে বসেন। দুর্গা আর্তনাদ করে ওঠেন। উপায়ান্তর না দেখে অন্যান্য দেব-দেবী ও পূজারীগণ সেস্থান ত্যাগ করেন। এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে অজ্ঞাত লেখকের 'ধূর্ত প্রহসন' (১৮৭৪ খ্রীঃ), রাধামাধব হালদারের 'এই কলিকাল' (১৮৭৫ খ্রীঃ), কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাপরে কলি' (১৮৮৬ খ্রীঃ), গোবর্দ্ধন বিশ্বাসের 'বৌল্লিক বামুন' (১৮৮৯ খ্রীঃ), বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'নব রাহা বা যুগ মাহাত্ম্য' (১৮৯৭ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা-প্রসঙ্গীয় প্রহসন

প্রগতিশীল সম্প্রদায় নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি কামনা করেছিলেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অনেকে এই ব্যাপারটিতে তেমন উৎসাহ খুঁজে পাননি। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার নামে সমাজে যে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিলো, তা রক্ষণশীল রুচি এবং সমাজ সংস্কারকদের আঘাত করে। এবং স্বাভাবিক কারণেই, এই বিষয়টির অভিব্যক্তিও ঘটেছে সেকালের রচিত অনেক প্রহসনে। ক্ষেত্রমোহন ঘটকের 'কামিনী' (১৮৬৮ খ্রীঃ) প্রহসনের সংস্কার-মুক্ত উদয়রামবাবু তাঁর মেয়ে কামিনীকে শিক্ষিতা করেছেন এবং এই সঙ্গে মদ্যপানেরও অভ্যাস করিয়েছেন; ফলে তিনি একঘরে হয়ে পড়েছেন। মেয়ের বিবাহ দেয়াও সম্ভব

www.pathagar.com

হচ্ছে না। অবশেষে অশিক্ষিত কেবলরামের সঙ্গে কামিনীর বিবাহ হয়। কিন্তু কামিনী তাঁর এ স্বামীকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। তাঁর ব্যভিচার চলে মুন্সেফ মিহির ঘোষের সঙ্গে। অপরদিকে প্রকাশবাবুর গৃহেও কামিনীর মদ্যপান ও নৃত্যাদি চলে। সে আসরে মিহিরবাবুর স্ত্রী সারদাও উপস্থিত। হঠাৎ যেনো কামিনী উন্মাদ হয়ে যান। অশ্লীলভাবে নাচতে নাচতে বাইজীদের মজলিসে ঢুকে পড়েন এবং সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করেন। অজ্ঞাত লেখকের 'মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসনে'র (১৮৭৫ খৃীঃ) মীরার, পেটিট্রয়ট, অমৃত, এডুকেশন, উন্নতবাবু প্রমুখ, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি প্রচলন আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। তাঁরা সীমিত সংখ্যক 'পাবলিক স্পিরিটেড' লোক নিয়ে কোলকাতার টাউন হলে এক সভার আয়োজন করেন। এতে স্বয়ম্বরা হওয়ার আশায় আগত। অনেক বিধবা ও কুলীন কন্যা, পাবলিক স্পিরিটেড ভদ্রলোক-দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। উন্নতবাবু তাঁর স্ত্রী সৌদামিনীর হাত ধরে সভার মধ্যে নাচতে শুরু করেন। পরে বক্তৃতা চলে স্ত্রী স্বাধীনতার ওপর। এমন সময় জেম্‌স্‌ সৌদামিনীকে চুমু খান এবং তাঁর হাত ধরে নাচতে চান। উন্নতবাবু বাধা দিলে, জেম্‌স্‌ তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন এবং খাপ হতে তলোয়ার খোলেন। সভা পণ্ড হয়ে যায়—উন্নতবাবু তাঁর স্ত্রীকে সেখানে ফেলে রেখেই প্রাণে বাঁচেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'খণ্ড প্রলয়' (১৮৭৮ খৃীঃ) প্রহসনের তরুবালা রামশঙ্কর ঘোষের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে। তিনি তাঁর ইয়ার শৈলবালা, শরৎকুমারী, ভাগ্যধরী ও মাতঙ্গিনীকে নিয়ে মদ্যপান ইত্যাদি নেশা করে থাকেন। জেনানা সিস্টেম ওঠিয়ে দিতে পেরেছেন বলে তাঁরা গর্বিতা। তাঁদের চোখে পুরুষ মাত্রই Pet animal. এনলাইটেণ্ট ফিমেলদের জন্য তাঁরা স্বতন্ত্র পার্ক ও সুইমিং বাথের ব্যবস্থা করতে চান। তরুবালা বৈজ্ঞানিক হতে চান, মাতঙ্গিনীর ইচ্ছে বিলেতে গিয়ে সিভিল হওয়ার, শরৎকুমারীর বাসনা ভল্যান্টিয়ার হওয়ার। তাঁরা পথে পথে দল বেঁধে মনের আনন্দ স্বাধীনতার গান করেন। এক সময়ে বিদেশী শিক্ষায় পাকা হওয়ার জন্য, ভাগ্যধরী-তরুবালা প্রমুখ বি. ব্যানার্জীর সঙ্গে চিকাগোর পথে যাত্রা করেন। মাতঙ্গিনীর পিতা তর্কালঙ্কার এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য নিতে গিয়ে নিজেই অপমানিত হন। তরুবালার পিতা রামশঙ্করও হতভম্ব। 'নাদা পেটা হাঁদা রামে'র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' (১৮৮০ খৃীঃ) প্রহসনের রতিকান্ত মদ্যপ, অন্যান্য দোষও কিছু আছে। তিনি নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর। অবশ্য সস্ত্রীক একবার ট্রেনে আসার সময় দু'জন মাতাল গোরার কার্যকলাপে স্ত্রী কমলাকে নিয়ে তিনি বড়ো বিপদে পড়েছিলেন। রতিকান্ত তাঁর বন্ধু রামবাবুর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সভ্যসমাজের রীতি বজায় রাখার জন্য তাঁকে

www.pathagar.com

কমলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রামবাবু এবং কমলার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলেও, ধীরে ধীরে একের প্রতি অন্যের একটি দুর্বলতা গড়ে ওঠে এবং পরিশেষে তা গুপ্ত প্রেমে পরিণতি লাভ করে। একদিন কমলা রামবাবুর সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেন। অনুশোচনায় রতিকান্ত পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করতে গিয়ে আহত হন। অজ্ঞাত লোকের 'ছোট বৌর গুপ্ত প্রেম' (১৮৮৬ খৃীঃ) প্রহসনের শিক্ষিতা ছোট বৌ স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু এই শিক্ষিতা ও উন্নতমনা মহিলাটিই পরে গুপ্ত প্রেমের মাধ্যমে ব্যভিচারিণী হয়েছিলেন। কেদারনাথ মণ্ডলের 'বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা' (১৮৯৪ খৃীঃ) প্রহসনের বড়বাবু গোঁড়া হলেও, তাঁর মেয়ে কৃষ্ণভাবিনী ড্যান্স শিখতে গিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্যান্সিয়ান মাস্টারের প্রেমে পড়েন। মিস গেঙ্গুলী মেয়েদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের পক্ষে আন্দোলন চালান। তাঁরা মিস টপ্সি টার্ভিকে নিয়ে 'রাক্ষসী সভা'র আয়োজন করেন। এর উদ্দেশ্য মহিলাদের ব্যায়াম চর্চায় উৎসাহ প্রদান ও জাতি নির্বিশেষে বলবান্-স্বামী নির্বাচন। রাক্ষসী সভায় কাবুলী, বাগ্দী, মগ, হাবসী ইত্যাদি জাতের অনেক ব্যক্তি স্বামী হবার আশায় যোগ দেন। সেখানে ড্যান্সিং মাস্টারও আছেন। মেয়েরা অনুষ্ঠানের অন্যান্য পর্ব শেষ করে বরদের গলায় মালা পরাতে যাবেন, এমন সময় কয়েকটি গুণ্ডা গিয়ে তাঁদেরকে টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে আসেন। উল্লেখযোগ্য যে, হরিহর বাবু ও অন্যান্য প্রবীন ব্যক্তিরাই এই গুণ্ডাদের ঠিক করে রেখেছিলেন। এই ধারার অন্যান্য প্রহসনের মধ্যে রাখাল দাস ভট্টাচার্যের 'স্বাধীন জেনানা' (১৮৮৬ খৃীঃ), 'রুক্মিনী রঙ্গ' (১৮৮৭ খৃীঃ), অজ্ঞাত লেখকের 'নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বৌ' (খৃী ?), বিপিন বিহারী দে'র 'অবলা কি প্রবলা' (১৮৮৯ খৃীঃ), অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীর 'আকেল সেলামী বা উদ্ভট মিলন' (১৮৯৫ খৃীঃ), এস. বি. পালের 'মাগ-মুখো ছেলে' (১৮৯৫ খৃীঃ) পঞ্চানন রায় চৌধুরীর 'আমার ঝকমারীর মাশুল' (১৮৯৯ খৃীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ২৭৬।

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, জয়ন্ত গোস্বামীর 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', কলিকাতা, ১৩৮১, ভূমিকা, পৃঃ চব্বিশ।

৩ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ২১-২৩।

৪ বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, দুষ্প্রাপ্য রস সাহিত্য, কলিকাতা, বৈশাখ—১৩৭৮, ভূমিকা পৃঃ ৭।

৫ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭।

www.pathagar.com

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা কমলালয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮/০।

৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪।

৮ জীবন রচিত, পৃঃ ১৫, উদ্ধৃত, কলিকাতা কমলালয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৯ নববাবু বিলাস, কলিকাতা, ১৩৪৪, পৃঃ ২০।

১০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২-১৩।

১১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

১২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পাদনা), কলিকাতা কমলালয়, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃঃ ৪।

১৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

১৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১২।

১৫ প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত পৃঃ ১।.।

১৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভচানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিত মালা-৪, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃঃ ২৪-২৫।

১৭ মুন্সী আবদুল করিম সঙ্কলিত, 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৬৬, উদ্ধৃত, কলিকাতা কমলালয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।-১।/।

১৮ নব বিবিবিলাস, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ৬২, উদ্ধৃত, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮১।

১৯ আলালের ঘরের দুলাল, প্যারিচাঁদ রচনাবলী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৪৭।

২০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫-৯৬।

২১ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ২৪।

২২ মদ খাওয়ার বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১-৫১।

২৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।

২৫ অভেদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫।

২৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৪।

২৭ হুতোম প্যাঁচার নকশা, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা, ১৩৬৯, গ্রন্থকারের ভূমিকা, পৃঃ ২১।

২৮ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭-২৮।

২৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৬-৬৮।

৩১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য।

৩২ দুষ্প্রাপ্য রস সাহিত্য, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৮।

৩৩ টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র), কলিকাতার নুকোচুরি, উদ্ধৃত দুষ্প্রাপ্য রস সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

www.pathagar.com

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯-৫৫।

৩৫ জীবন চরিত (ভবানীচরণের), পৃঃ ১৪-১৫, উদ্ধৃত, কলিকাতা কমলালয়, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৮৶০।

৩৬ অতি অল্প হইল, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫।

৩৭ ব্রজবিলাস, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৯-৪০০।

৩৮ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', পৃঃ ষোল।

৩৯ লোক রহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

৪০ কমলাকান্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃঃ ৭৮-৭৯।

৪১ মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭-১৮।

৪২ পাঁচু ঠাকুর (প্রথম কাণ্ড), দুষ্প্রাপ্য রস সাহিত্য, ১৩৮০, প্রাগুক্ত উদ্ধৃত, পৃঃ ৫১।

৪৩ 'ক্ষুদিরাম', বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৪১।

৪৪ ভারত উদ্ধার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২-৪৩।

৪৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা সহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬১।

৪৬ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৫, উদ্ধৃত, পৃঃ ৬০৬।

৪৭ ইংরাজি নববর্ষ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫-৫৬।

৪৮ বিধবা বিবাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

৪৯ কৌলীন্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

৫০ দুর্ভিক্ষ (১৬) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।

৫১ সঙ্গীত রস কল্লোল, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৫৭।

৫২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫৯।

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪৯-৫০।

৫৪ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৭-২৮।

৫৫ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬।

৫৬ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্য তত্ত্ব, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ২৪২।

৫৭ A. Nicoll, Dramatic Theory.—ভবানী গোপাল সান্যাল (সম্পাদনা), মধুসূদনের নাটক,, ১৯৬৮, উদ্ধৃত পাদটীকা, পৃঃ ১৯০।

৫৮ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচনার কথা, কলিকাতা, ১৯৬৪, উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬।

৫৯ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, মধুসূদন কবি ও নাট্যকার, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ১৪৮।

৬০ বিমলকৃষ্ণ সরকার, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৮১।

৬১ প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৭৮।

৬২ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ২।

www.pathagar.com

৬৩ সচিত্র শিশির, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৮।

৬৪ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বাংলা নাটক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃঃ ৮।

৬৫ অনূদিত নাটক দু'টোর নাম—Love is the best Doctor এবং The Disguise। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ও ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে The Disguise দু'বার অভিনীত হয়।

৬৬ এক্ষেত্রে জগদীসের 'হাস্যার্ণব' (১৮২২ খ্রীঃ), এবং রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুক সর্বস্ব' (১৮২৮ খ্রীঃ)-এর নাম উল্লেখ্য।

৬৭ বাঙ্গালা সহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

৬৮ জয়ন্ত গোস্বামী, সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ১২৩৩।

৬৯ এখানে 'Drama' বলতে সমালোচক প্রহসন-সামাজিক নাটককেই বুঝিয়েছে।

৭০ Jan Gonda (Edited), A History of Indian Literature, Vol. IX. Fasc. 3, Bengali Literature, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1976, P.224.

৭১ সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ একুশ।

৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ৫৩।

৭৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, কলিকতা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৯৩ দ্রঃ।

৭৪ ভারত সংস্কারক (পত্রিকা), ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সাল দ্রষ্টব্য। এছাড়া ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণেও তারকেশ্বরের অন্য এক মোহন্ত মন্তগিরি বেশ্যাসক্তি ও তৎকর্তৃক ব্রহ্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় বিভিন্ন সূত্রে উনিশ শতকের বাঙলার সামাজিক অবস্থার যে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত প্রদানের প্রয়াস পেয়েছি, বর্তমান পরিচ্ছেদে রামনারায়ণ তর্করত্ন, ও তার পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের প্রহসনের আলোকে, সে সমাজকে প্রত্যক্ষ করে দেখা যাক। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, 'প্রহসন', 'সামাজিক রঙ্গ চিত্র' বা 'সামাজিক নাটক' প্রভৃতি যে কথা ক'টি নাট্য সমালোচনায় স্থান পেয়েছে, তার আলোচনা এখানে মুখ্য নয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের দু'টো রচনা—'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' ও 'নবনাটক'কে কেউ কেউ প্রহসন না বলে সামাজিক রঙ্গ চিত্র[১] বা সামাজিক নাটক[২] নামে অভিহিত করেছেন।[৩] কিন্তু আমাদের মনে হয়, রামনারায়ণের এ দু'টো রচনা যে মূলতঃ প্রহসনই একথা অস্বীকার করা যায় না।[৪]

বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন[৫] একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তাঁর 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪ খৃীঃ) সমসাময়িক বাঙলার সমাজ-জীবনের বাস্তবতা নিয়ে রচিত প্রথম প্রহসন।[৬] জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন, কুলীন কুলসর্ব্বস্বই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সামাজিক সমস্যামূলক নাটক এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রহসনের অগ্রদূত।[৭] রামনারায়ণের পূর্বেও কিছু প্রহসন এবং নাটক রচিত হয়েছিলো,[৮] কিন্তু সে সমস্ত প্রহসন—নাটক ছিলো মূলতঃ অনুবাদ, মৌলিক রচনাগুলোও ছিলো জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। আর সেজন্যই, নাটকগুলো তৎকালীন সমাজে খুব একটা সমাদৃত হয় নি, এবং সেগুলোকে মঞ্চস্থ করার কথাও কেউ তেমন একটা ভাবেন নি।

কুলীন কুলসর্ব্বস্বর কাহিনী জীবন থেকে নেয়া বলেই সেদিনের বাঙলায় তা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। রামনারায়ণ যদি পূর্বসূরীদের ন্যায় শুধু জীবন বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিতেন, তাহলে আমরা তাঁর কুলীন কুলসর্ব্বস্ব-এর মধ্য দিয়ে 'সমাজের একটি হৃদয়হীন অনাচারের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পাইতাম না।'[৯] জনগণের প্রবল আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে একদিকে তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা যেমন প্রহসনটির বহুবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন,[১০] তেমনি কুলাভিমানী প্রাচীনপন্থীরাও অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বিভিন্নভাবে এর অভিনয়ের বিরুদ্ধে শুরু

www.pathagar.com

করেছিলেন প্রচণ্ড বিরোধিতা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৫ই জুলাই, ১৮৫৮ খ্রীঃ)-এর একটি খবরে জানা যায়, "The acting of the 'Kooloshurboshwo Natuck' at Chinsurah has, it appears, givien great offence to the Koolins of the locality. The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste and the Coolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind."[১১] এ সমস্ত কারণেই মনে হয়, যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূধন দত্তের জীবন চরিত'-এর পরিশিষ্টে গৌরদাস বশাকের যে স্মৃতিকথা মুদ্রিত হয়েছে, তাতে কুলীন কুলসর্ব্বস্বকে (১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে) একটি 'Sensational Bengali play'[১২] বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও, সেদিনের কোলকাতায় খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ার কথাটি উল্লেখ করেছেন।[১৩]

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা একথা বলাই বাহুল্য। এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রহসনকার কোথাও কোনো গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করেন নি। প্রহসনের বিজ্ঞাপনেই লেখক, রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায় কর্তৃক ঘোষিত ৫০ টাকা পারিতোষিক[১৪] প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রহসনটির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাহিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহনুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যরহার-সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে কুল-কামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ ঘোষণা। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ। ...ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।[১৫] লেখকের চরিত্র চিত্রণ থেকেও স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যের কথাই ঘোষিত হয়—কুলপালক, বিবাহ বণিক, অধর্ম রুচি, উদর পরায়ণ, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি নামকরণেই তার প্রমাণ মেলে। প্রহসনের অঙ্গ-কাহিনীগুলোও উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্ট। কুল-পালকের চারটি মেয়ের বিবাহ-সমস্যা প্রধান ঘটনা হলেও, ফুলকুমারী, বিবাহ বণিক প্রভৃতির কাহিনী, কৌলীন্য-প্রথার বিষময় পরিণতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্ন, কন্যাবিক্রয় ও বাল্য বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাগুলোকেও আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। এছাড়া অর্থগৃধ্নু ঘটকদের নীচাশয়তা, ব্রাহ্মণদের ঔদরিকতা, পুরোহিতদের মূর্খতা প্রভৃতিকেও লেখক রঙ্গ-রসের মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির করেছেন। সমসাময়িককালের প্রখ্যাত সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'—নাটকের সমালোচনা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে বলেন, 'তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্য্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটি রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তম্মধ্যে কন্যাকর্ত্তা কুলপালকই প্রসঙ্গ-বিধায়ে সর্ব্বপ্রধান; তাহার বর্ণনাপাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনের মধ্যে অবিকল উদিত হয়, কোন অংশে কিছু মাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। ......যশোদা ও ফুল কুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণ-হৃদয় কেহ নাই, যে একেবারে মহাপাপীয়সী কৌলীন্য প্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়; তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমন্ডলে আর আছে?'[১৬] রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের বিষময় ফল সকল নয়নাগ্রে যেন নৃত্য করিতে থাকে।'[১৭] এই প্রসঙ্গে প্রিয়রঞ্জন সেনের অভিব্যক্তিটি আরো সুন্দরঃ নাটকখানি পড়িয়া অনেক কথা মনে হয়; ... ইহাতে হাস্যরসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীন কুলের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার ছবিই শুধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কৌলীন্য ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচন্ড অসংগতি রহিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তর্করত্ন মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই; 'কুল সর্ব্বস্ব কুলীনে'র তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন,—'কু'তে লীন, কুলীন, অর্থাৎ কুক্রিয়াসক্ত। আর, অনুকম্পা করিবেন কাহাকে, দুঃখবোধ করিবেন কাহার জন্য ?... ..গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত,—বল্লালী প্রথার সহিত তাঁহার সমাজের কোনও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাঁহার অধীন ছিলেন না, তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল.—বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় নাই।'[১৮]

কুলীন কুল সর্বস্ব উদ্দেশ্যমূলক রচনা হলেও, এর বাস্তবতা, লেখকের আন্তরিকতা ও পরিবেশনার স্বতঃস্ফূর্ততা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করেছিলো। এই নাটকে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কেবল মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়ও চালিত হয়েছে।[১৯] আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'এই বিষয়ের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও এই বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকিলে যেমন তাঁহার রচনার পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতাও হইত না, তেমনই ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও কোন স্থায়ী কীর্তিও রাখিয়া যাইতে পারিত না। রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই কুপ্রথার প্রতি তাঁহার ঘৃণা যেমন দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই যে সমাজের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সমাজ সম্পর্কেও তাঁহার অভিজ্ঞতা তেমনই ব্যাপক ছিল।'[২০] প্রহসনকারের এই যোগ্যতাই তাঁকে দুদিক থেকে যশস্বী করে তুলেছিলো—একদিকে পারিতোষিক প্রাপ্তি, অন্যদিকে 'নাটুকে রাম-

www.pathagar.com

নারায়ণ' খ্যাতি লাভ। এক্ষেত্রে সুকুমার সেনের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 'সেকালে বাঙ্গালা নাটকের—ঠিক করিয়া বলিতে গেলে প্রহসনের—একটা বিশেষ পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-৮৬) 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক (১৮৫৪)। বাঙ্গালা নাটক-লেখকদের মধ্যে রামনারায়ণই প্রথম এই কাজে অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন।'[২১] প্রহসন ও প্রহসনকারের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা এবং সুখ্যাতি অর্জনের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, 'অভিনয়ের দিক থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাদ দিলে রামনারারণ তর্করত্নের… 'কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব'-এর মতো সেকালে আর কোনও নাটকই এত জনপ্রিয় হয়নি। এই নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌতুক ও ব্যঙ্গে নাস্তানাবুদ করা হয়েছে, তার সঙ্গে আছে কুলীন কন্যাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা। …পুরাতনপন্হী হয়েও রামনারায়ণ নাট্যামোদী সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, তার কারণ তিনি আধুনিক সমাজ—প্রগতির সমর্থক ছিলেন, এবং তাঁর প্রায় সমস্ত রচনায় প্রসন্নতা ও কৌতুক পরিহাসের পরিচ্ছন্নতা আছে।'[২২]

উনিশ শতকের বাঙলার সামাজিক প্রতিচ্ছবির একটি নগ্ন রূপ নিয়ে, রামনারায়ণের কুলীন কুলসর্বস্বের আত্মপ্রকাশ ছিলো 'উচ্চতর সামাজিকবোধ বা Social realism-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।'[২৩] বস্তুতঃ পক্ষে, তৎকালীন যুগের অন্তরের কথা ছিলো, প্রবল মানবতা বোধ এবং প্রগাঢ় জীবনোপলব্ধি। এর ফলে প্রগতিশীল বাঙালী মাত্রেরই সামাজিক আদর্শ ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। স্ব-সমাজের দৈন্য, তথা প্রচলিত বৃদ্ধ-প্রাথাসমূহের উৎপীড়নগ্র তাঁদের মনকে একান্তই বিষিয়ে তোলে। সমাজ-সংস্কার বা প্রচলিত বৃদ্ধপ্রথার উৎপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তাঁরা উন্মুখ হয়ে ওঠেন—এবং নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রথম সার্থক অভিব্যক্তিই হচ্ছে, কুলীন কুলসর্বস্ব। বৈদ্যনাথ শীল যথার্থই বলেছেন, 'উনবিংশ শতকের নব্য বাংলায় সমাজ সংস্কারের প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রামনারায়ণই প্রথম নাট্যকার যিনি বর্তমান সমাজে বাস্তব সমস্যাপূর্ণ প্রখর কদর্যতা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কুলীন কুলসর্বস্বের জনপ্রিয়তা উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া নহে। উহা সমাজের অনাচারের রূঢ় সমালোচনা। সুতরাং এই কারণেই জাগ্রত জনমন উহাকে অত ভাল বাসিয়াছিল।'[২৪]

প্রহসনটির মূল কাহিনী, বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর, কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার মেয়ে—জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী ও কিশোরীর বিবাহ-সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। কুলপালকের মেয়েদের বয়স যথাক্রমে ৩২/৩৩, ২৬/২৭, ১৪/১৫ ও ৮ বছর। মেয়েদের বিবাহের

www.pathagar.com

বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি চিন্তিত—সমাজে নিন্দিত। কিন্তু কি করবেন! যথাযোগ্য কুলীন পাত্র না পেলে যে-কোনো মতেই বিবাহ দেয়া সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, কুলপালক মনে করেন, 'বিবাহ নির্বাহ বিধির ঘটনা'। কিন্তু এনিয়েই বা আর কতোক্ষণ শান্তিতে থাকা যায়—কৌলীন্যের 'দুরন্ত প্রথা'কে স্মরণ করে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন: 'আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কূলে আনিবেন; কবে কুল রক্ষা করিবেন।' (দ্বিতীয় অংক)

প্রধানতঃ শুভাচার্য ও অনৃতাচার্য নামে দু'জন ঘটক, কুলপালকের মেয়েদের বিবাহ প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছেন। শুভাচার্যের ন্যায়নীতি আছে, কিন্তু অনৃতাচার্য স্বার্থপর, মূর্খ এবং হীনপ্রতারক। অনেক 'ক্লেশ স্বীকার করিয়া' তিনি কুলপালকের মেয়েদের জন্য এক 'পরম পবিত্র পাত্র'-এর সন্ধান নিয়ে এসেছেন, পাত্রটি 'বিষ্ণুঠাকুরের বংশোৎপন্ন, ফুলের মুখটী।' পাত্রের সবগুণেই আছে, বয়সও খুব বেশি নয়—মাত্র ষাট। ঘটকের পরামর্শে, লগ্ন না থাকলেও অতি তাড়াহুড়ো করে বিবাহের দিন ঠিক করা হোল। শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করলে পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মেয়েদের বিবাহের কথা শুনে, কুলপালকের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি তাঁদেরকে এই শুভ খবর প্রদানের জন্য ডাকা-ডাকি শুরু করেন। খবর শুনে বড়ো মেয়ে জাহ্নবী বললেন, 'আর কত কালইবা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ'। মেজো মেয়ে শাম্ভবীর কথায় যেনো চাপা ক্রোধই ফেটে পড়ে, 'ও মা তুই কি কুল রক্ষা কর্ব্বি, তবে জাতি রক্ষা কে কর্ব্বে মা?' সেজো মেয়ে কামিনীতো এসব কথা বিশ্বেসই করতে পারছেন না, 'না মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই, তুই এমন করে আমায় কতোবার ভুলিয়েছিস্।' ছোটো মেয়ে কিশোরী পাড়ার মেয়েদের সংগে খেলায় মত্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনিও ছুটে এলেন—বিবাহের কথা শোনে তিনি বললেন, 'বে' কাকে বলে মা?...তাকি আমি খাব?' (তৃতীয় অংক)

বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে। খবর পেয়ে পড়া-প্রতিবেশিনীরাও এলেন। ভীড় জমলো পুরোহিতদের। তখন কুলপালকের চার মেয়ের প্রতিক্রিয়াটি জানা গেলো আবার। জাহ্নবী বলেন, 'এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া। উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া।।' শাম্ভবী অতোটা নিরাশ হন না, তিনি বলেন, 'হোক্‌না, দেখা যাক।' কামিনী এবং কিশোরী বর দেখার লোভ সামলাতে না পেরে ছুটে যান, ফিরে আসেন হতাশ হয়ে। শাম্ভবী বরের কথা জানতে চাইলে কামিনী বলেন:

'দেখিলাম বাসায় বসিয়াছে বর।
প্রবীণ বয়স শীর্ণজীর্ণ কলেবর।। ...

www.pathagar.com

তামাক টানিয়া মরে কাশিতে কাশিতে।
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে।' (ষষ্ঠ অঙ্ক)

জাহ্নবীকে দেখে তিনি করতালি দিয়ে বলেন, 'যেমন দেবা তেমনি দেবী'। শাম্ভবী সকলকে নিয়ে পিতার কাছে আপত্তি জানাবেন বলেন। কিন্তু সংগে সংগে তাঁরা এটাও বুঝতে পারেন, এই সময়ে এরূপ আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভই হবে না।

বিবাহ সভায় বরকে ভালো করে দেখা গেলো। পুরোহিত ধর্মশীল ও ঘটক-প্রবর অনুতাচার্যের মধ্যে বরের রূপ-গুণ নিয়ে যে কথোপকথন হয়, তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেলো ঃ

"ধর্ম 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সবগায়।'
অনু 'বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায়।।'
ধর্ম 'দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জল দোষ।'
অনু 'এ দোষ ইহার নয় এ যে জল দোষ।।'...
ধর্ম 'বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ।'
অনু 'শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ।।'
ধর্ম 'দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।'
অনু 'যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই।।' " (ষষ্ঠ অঙ্ক)

তবু 'লগ্ন' এলো—বিবাহও হোল। কুলপালক এই সুযোগ্য কুলীন বরের হাতেই একই সঙ্গে তাঁর চার কন্যাকে সম্প্রদান করে, স্বীয় কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুলীন কুলসর্বস্বের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর বাস্তবতাগুণ। বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথার প্রাদুর্ভাবে বাঙালী হিন্দু সমাজে যে নিদারুণ অধোগতি নেমে এসেছিলো, এবং উনিশ শতকের মধ্য ভাগেও যার বিষময় প্রকোপ সে সমাজে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিলো, তারই একটি বাস্তব ও হৃদয়বিদারী চিত্র প্রহসনটিতে ফুটে উঠেছে। এই প্রথার নিষ্ঠুর যূপকাষ্ঠেই কুলপালক তাঁর চারটি মেয়েকে একই সঙ্গে বলি দিয়েছেন। না দিয়েই বা করবেন কি ? যে সমাজ শুধুমাত্র প্রথার দাস, সে সমাজের মানুষের মনুষত্ব বিকাশের অবকাশ কই ? কুলপালক যা করেছেন, তাকি জগতের কোনো পিতারই কাম্য হতে পারে ? কুলপালকওতো তা চান নি। কিন্তু একে অস্বীকার করার মতো কোনো ক্ষমতাও তার ছিলো না। এখানেই কুলপালকের জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। ছাত্র তর্কবাগীশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে, পুরোহিত ধর্মশীল এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন ঃ 'আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে

www.pathagar.com

পতিত; তাঁহার চারিটি কন্যা; তম্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটির কেবল কন্যা কাল আছে, তৃতীয়টি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা অনূঢ়াবস্থায়ই যৌবনযাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই। কুল ভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই।' (৪র্থ অংক)

প্রহসনের শুরুতেই যে কুলপালককে আমরা পাই, তিনি, 'কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা নিমিলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন' করেন—তাঁকে কোনো মতেই সুস্থ বলা যায় না। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণা মেয়েদের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিবাহ নির্বাহবিধি--বিধির ঘটনা'। কিন্তু সে যে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত নিতান্ত এক অসহায়েরই উক্তি—দর্বলেরই সান্ত্বনা মাত্র, তা আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। তার পরপরই তিনি যে আবার বলছেন, 'আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই', সেখানেও গর্ব নয়—শ্লাঘা নয়, বরং দুঃসহ কৌলীন্য-প্রথার প্রতি আত্যন্তিক ধিক্কারই প্রকাশ পেয়েছে। এই ধিক্কারই আরো স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে এভাবে: 'আমাদের গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎপরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব ?···'আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি দুরন্ত প্রথা ! অতি মন্দ অতি মন্দ, এমন দেখি নাই।' (১ম অংক)। এর পরই তিনি আবার সেই দুর্বলের সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চান। প্রতিবেশী কুলধনের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে কুলপালক বলছেন, 'আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না,...তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব ? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে।' (১ম অংক) এই অসুস্থ অস্থির মানসিক অবস্থা নিয়েই তিনি ষাট বছরের বৃদ্ধ এক কুলীন বর, যাঁর সারা গায়ে দাদ, মুখে বসন্তের দাগ এবং একচোখ কানা—এর সঙ্গে চারটি মেয়েরই বিবাহ প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এরচেয়ে অতিবৃদ্ধ বরে, এবং আরো অধিক সংখ্যক মেয়েকেও, তখন একই সঙ্গে সম্প্রদান করা হোত। যশোদা এবং তাঁর অন্য ছ'বোনকে, যে বরের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হয়েছিলো, 'তার বয়সের সম পাহাড় পর্বত কম'। যশোদা বলেন:

'ভগিনী আমার ছয় আমারে নে সাত হয়
সবার বিবাহ একদিনে।...
পাইয়া সুযোগ্য ঘর বলি মোরা সেই বর
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।
তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব ।।' (৩য় অংক)

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, কুলপালকের এই অসহায়-মর্মান্তিক অবস্থা, সেকালের প্রায় সকল কুলীন পিতার জন্যই ছিলো একান্ত স্বাভাবিক। কুলপালকের নিকট নিজ মেয়ের বয়সের কথা বলতে গিয়ে কুলধন জানান, 'বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলামনা, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায়না, তা নাই গেলো, সে তার বড় পিসীর বইসী।' (১ম অংক) এই কৌলীন্য-প্রথার শিকার হয়ে কুলধনের মেয়ের ন্যায় সেদিন আরো কতো অনূঢ়াকেই আজীবন শুধু চিত্ত-দাহ নিয়েই গুমরে মরতে হয়েছে। কুলপালকের মেয়েদের বিবাহের দিনে, সখিদের কাছে নিজের দুঃসহ বেদনার বর্ণনা দিতে গিয়ে যমুনা বলেন :

'বাপের প্রদান ঘর নাহি মিলে যোগ্যবর
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।
মনে সদা এই চাই বাহির হইয়া যাই
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥
আইবুড়ো থেকে মোর বয়স হইল ভোর
নুড়ো দিই মুখে বল্লালের ॥' (৩য় অংক)

হেমলতা বলেন :

'যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি আর
শরীরে কত জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ ইচ্ছা হয় খাই বিষ
মনে মনে কত রীষ হয় ॥ ......
মনেতে ভেবেছি সার সুধিব বল্লালি ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে ॥' (৩য় অংক)

কৌলীন্য-প্রথার আশীর্বাদ নিয়ে কোনো কোনো কুলীন বিবাহকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র তর্কবাগীশকে কুলীনদের সম্বন্ধে ধারণা দিতে গিয়ে ধর্মশীল বলেন, 'কুলীন মহাত্মরা,...ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, গুণ পর্যালোচনা, সৌন্দর্যাভিলাষ, জাতি বিনাশশংকা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই; অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ-ব্যাপারে আলস্য নাই।' (৪র্থ অংক) এখানে ন্যায়-নীতি বিবর্জিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলের লক্ষণ সম্বন্ধে ঘটক-প্রবর অনন্তাচার্যের সংজ্ঞাটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে :

'দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে নিবাস শ্বশুর-ঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আট্ক্যা বন্ধ
সদানন্দ-পূর্ণ-কলেবর ।।
মুখে সদা বেরিগুড্ তুড়ি দিয়া বলে হুট্
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
বড় ভক্তি পাঁচালিতে কে আঁটিবে বাচালিতে
এই নয় গুণ লও গণে ।। (২য় অংক)

ঘর-জামাই কুলীন অধর্ম রুচি, ধর্মশীলের নিকট নিজের পরিচয় দেন এভাবে ঃ

'ধর্ম ...আপনার নিবাস কোথায় মহাশয় !
অধর্ম। শ্বশুর বাড়ী।
ধর্ম ...ইহা কেমন কহিলেন্ ?
অধর্ম। যেখানে থাক্‌তে হয়, সেই নিবাস।......
ধর্ম ...কি ব্যবসায় করেন ?
অধর্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা ?
ধর্ম ...বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয় ?
অধর্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীনচ্ছেলের বিষয় জানেন না ?' (৪র্থ অংক)

প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের সংখ্যারও প্রশ্ন ওঠে ঃ

'ধর্ম ...আপনি কত সংসার করিয়াছেন ?
অধর্ম। আমাদ্দের কুলীনেচ্ছেলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্মভীত অধর্মরুচি মুকুয্যে, আমি অধিক করি নাই।
ধর্ম। তবু কত, শুনিতে পাই না ?
অধর্ম। শুন্তে পাবেন না কেন ? আমি সাড়ে আঠার গন্ডা বৈ আর বে করি নাই, কতগুলো বে কল্যে কি হবে ? আমাদ্দাদা মহাশয় চারিকুড়ি পোনের টা বে করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়েছেন, তবু পেলে ছাড়েন না।' (৪র্থ অংক)

কুলীন ব্যক্তিরা অনেক সময় শ্বশুরালয়ের কথা স্মরণ রাখতে পারতেন না বলে, খাতা করে নিতেন। প্রধানতঃ আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলেই, খাতা বের করতেন, এবং ঠিকানা মতো জায়গায় গিয়ে হাজির হতেন। বিবাহ বণিক একদিন বলছেন, '(স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুরবাড়ি নাই ? (চিন্তা করিয়া)

www.pathagar.com

হ্যাঁ, যেন মনে হচ্ছে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি একবার বে হয়েছিল। (চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্ছে না,—পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে ত ফর্দ আছে তাই দেখি না কেন? (ফর্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে ১২৪২ সাল ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমলন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করিছি, হু, দেখেছ? লেখা পড়া রাখা ভাল, মনে করে কত রাখা যায়? (৪র্থ অংক)

কুলীন ব্যক্তিদের এই পাইকারী হারে বিবাহ করার ফলে, স্বামীর কর্তব্য পালনের প্রশ্নই ওঠতো না। সধবা হয়েও কুলীন কন্যারা বৈধব্য যন্ত্রণাই ভোগ করতেন। 'সপ্তশালকে'র মতো অশুভ দিনে কুলপালকের মেয়েদের বিবাহ হচ্ছিলো বলে, ঘটক অনাচার্য বলেন, '(স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশালকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশংকা কি? (২য় অংক) এর ফলে বিবাহিতা কুলীন মেয়েদের অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন—এবং জারজ সন্তানও দেশে প্রচুর জন্ম নিতো। বহুদিন পূর্বে 'মহিলা'র বিবাহ হয়ে থাকলেও, স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যও কাছে পান নি। তাই তাঁর প্রশ্ন; সেত আমার নয়ন পথে কখন পতিত হলো না, তাহাদ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতেও নিস্তার পেলেন না, তবে সে কি পতি?' শেষ পর্যন্ত মহিলা তাঁর পথ বেছে নিয়েছেন : '...... ভাবনা করি? কত লোক আছে ...... এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাব?' (৫ অংক) মাধবীর একই দশা :

দুরন্ত বসন্ত কাল এ যে যুবতীর কাল
কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতির বিচ্ছেদ-বাণ কত আর সহে প্রাণ
বুলি ত্রাণ নাহি ইথে পায়।। (৫ম অংক)

অবশেষে তিনিও মহিলার পথ অনুসরণ করেই 'ত্রাণ' খুঁজে পেলেন।

অধর্মরুচি তিন বছর শ্বশুর বাড়ী না গেলেও, তাঁর কন্যার অন্ন প্রাসনের নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পিতা বিবাহ বণিক তাঁকে সান্ত্বনা দেন : (উচ্চ হাস্য করিয়া) বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু'। (৪র্থ অংক) বিবাহ বণিক 'ফর্দ' দেখে তাঁর বিমলাপুরের একটি শ্বশুর বাড়ীতে রোয়ানা করতেই, উত্তম মুখোপাধ্যায় নামে বিশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে পরিচিত হন; এবং কথা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে একসময়ে জানতে পারেন যে, এ যুবকটি তারই সন্তান। এখানে পিতা পুত্রের কথোপকথনের কিছু অংশ উদ্ধৃত হোল ঃ

'উত্তম। আমি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্মরুচি বাপা এমন কোথায়,— কন্যা হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেম; দেখুন এসে আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে! (প্রকাশে) হাঁ, আমারও আজি পরম আহ্লাদ—পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।' (৪র্থ অংক) অনেক সময় অবৈধ সন্তানের মা হওয়ার কলঙ্ক থেকে নিজেদের মেয়েকে মুক্তি দেয়ার এবং সেই সঙ্গে সামাজিক সুনামও অক্ষুণ্ণ রাখার গরজে, পিতা-মাতা অর্থের বিনিময়ে জামাতা-রত্নকে একদিনের জন্য হলেও বাড়ী নিয়ে আসতেন।

অধর্মরুচি ধর্মশীলকে জানান ঃ

অধর্ম ।...আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই, কুল মর্যাদা না পেলে কদাচ সেথায় [শ্বশুর বাড়ী] থাকিনে; আরও কোন রকম সকম আছে।

ধর্ম ঃ কিরূপ রকম সকম?

অধর্ম ঃ পেটের দায়ে আমাদের এসে ধরে, আমরাও পেটের দায়ে কিছু নে থাকি।' (৪র্থ অংক)

এমনিতেও কুলীন জামাতাদের শ্বশুর বাড়ীর আদর-যত্নের অন্ত ছিলো না। অধর্মরুচি বলেন ঃ

'বরফী তুলিয়া হাতে দাঁত দিয়া কাটি।
পায়স আঙুলে করে বসে চাটি॥ ......
বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি।
অহঙ্কার ভরে মোরা না মাড়াই মাটি॥'

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত 'ব্যাভার' না পেলে, জামাতারা স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপনে সম্মত হতেন না। স্বামী-আগমনের খবর শোনে, ফুলকুমারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন—আসন্ন রাতটিকে ঘিরে তাঁর কতো সাধ, কতো স্বপ্ন-কল্পনা। এদিকে ঃ

'শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া॥
ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে।
ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবে এখানে॥
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি॥'

www.pathagar.com

জামাইবাবু পা ধোলেন বটে, কিন্তু ব্যাভার মনের মতো না হওয়ায় প্রসন্ন হতে পারেন নি। তাই, 'ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া'। শোয়ার ঘরে গিয়ে তিনি স্ত্রীকে বলেন ঃ

'শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।।'

ফুলকুমারী 'কাট্‌না কাটা কড়ি' থেকে শুরু করে, নিজের সঞ্চিত যা-কিছু ছিলো, সবই দিলেন। কিন্তু এই অল্প সেলামীতে স্বামী-দেব সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি শ্বশুরের টোলে গিয়ে, দরমা পেতে রাত যাপন করে সকালে চলে গেলেন। কান্নায় ফেটে পড়েন ফুলকুমারী ঃ

'মম সম অভাগিনী আছে কোন্ দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে।।' (৩য় অংক)

ব্যাভার না দিতে পারায় চন্দ্রমুখীর স্বামীও বিমুখ—এক দিনের জন্যও তিনি স্ত্রীর কাছে আসেন না। চন্দ্রমুখী বলেন ঃ

'যৌবন বিফলে যায় বারেক না দেখি তায়
জীয়ন্তে মরা কিবা বাকি।।
আসিবেক করি আশ তাহার বিবাহ চাস
মাস মাস ফেরে নানা দেশ।
ব্যবহার দিতে নারি তাই মোরে বিভা করি
স্বপ্নেও না করে উদ্দেশ।।' (৩য় অংক)

কৌলীন্য প্রথার আর এক জঘণ্য—অধ্যায় মেয়ে-ব্যবসা। কোনো কোনো সময়ে উপযুক্ত কুলীন পাত্রী অভাবে, অনেক কুলীন পাত্রই বিবাহ করতে পারতেন না। তাই অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরকে পাত্রী সংগ্রহ করতে হোত। গর্ভবতী নামে এক মহিলা উপর্যুপরি চার পুত্র সন্তানের মা হওয়ার অভিযোগে, তাঁর স্বামী কর্তৃক ভীষণভাবে লাঞ্ছিতা হচ্ছেন। আবার তিনি মা হতে চলছেন। তাই এবার তিনি একটি মেয়ে সন্তান লাভ করার জন্য, পুজোর আয়োজনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গর্ভবতী, পুরোহিত ধর্মশীলকে জানান, 'আমার বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারটিই ছেলে, মেয়ে হয়নি, তাই আমাদের সেই মিন্সে আমারে সর্বদা তাড়না করে, বলে 'এমন হতভাগিনী তুই, একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে'।" (৪র্থ অংক)

এরূপভাবে মেয়ে কিনে বিবাহ করেছিলেন বিরহি-পঞ্চানন। কিন্তু তাঁর সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—এখন তিনি নিঃস্ব। কুলপালকের মেয়েদের বিবাহে

www.pathagar.com

গিয়ে, আর তিনি 'প্রজাপতির গন্ধ' গায়ে লাগাতে চান না : 'ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্বস্ব বিক্রয়পূর্বক সেই বিবাহ-বিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।' (ষষ্ঠ অংক) বিবাহ বণিকতো অর্থের অভাবে মেয়েই কিনতে পারলেন না। তাই তাঁর সংকল্প ঃ

'এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক।
মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক॥
কানা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ।
তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ॥' (ষষ্ঠ অংক)

এই দুঃসহ মেয়ে বিক্রয় প্রথাটি, সরকার কর্তৃক আইন করে বন্ধ করার পক্ষে, সেদিন অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত সরকার এটাকে হিন্দু ধর্মে হস্তক্ষেপ বলেই মনে করতেন। ধর্মশীল বলেন, 'বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্তনে ও অপথ্য-বিক্রয়-বারণে যদি রাজ-পুরুষেরা মনোযোগী হন, তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাহারা প্রজার ধর্মে হস্তার্পণ করেন না।' (৪র্থ অংক)

এই কৌলীন্য প্রথার ফলেই, সমাজে প্রচলিত ছিলো বাল্যবিবাহ। কুল-পালকের কনিষ্ঠা মেয়েটির বিবাহের কথা এখানে আর একবার স্মরণ করা যায়। তাঁকে যখন বুঝিয়ে দেয়া হোল, বিবাহ একটি 'সংস্কার' এবং তা একই সঙ্গে তাঁর দিদিদেরও হচ্ছে, তখন তিনি প্রশ্ন করে বসেন, 'ওমা, তবে তোর হবে না ?' 'সুলোচনা, কুলপালকের মেয়েদের বুড়ো বরের কথা শোনে অন্যান্যদের মতো আশ্চর্য বোধ করেননি। তিনি বলেন, 'বুড়ো বর ? এতো ভাল, মন্দ কি ?' এর পরক্ষণেই বুঝতে পারা গেলো, সুলোচনার এরূপ বৃদ্ধ বরকেও 'ভাল' বলার কারণটি কি ? ঃ

'কি জানিবে ওলো ধনি এ বর মাথার মণি
মোর পতি দেখে বুক ফাটে,
বয়স খতালে পর নাতি ভেবে এ-সে জ্বর
কোল শোভা হয়ে রাত কাটে।' (৩য় অংক)

কৌলীন্য প্রথার এই জাঁকালো বাজারে, ঘটকরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে-ছিলেন। অধিকাংশ ঘটকরাই ছিলেন স্বার্থপর ও হীন প্রতারক। ঘটক-চূড়ামণি অনন্তাচার্য নিজের পরিচয় দেন এভাবেঃ 'আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্তকন্যা চালাইয়েছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণুঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটায়েছি; আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এসমস্ত

www.pathagar.com

ত আমার শরীরের আভরণ। (২য় অংক) সমাজে যে শুভাচার্য বা সুধীরের মতো বিবেক সম্পন্ন ঘটক ছিলেন না, তাও নয়। কিন্তু তাঁরা বার বারই পরাজিত হয়েছেন, অনৃতাচার্যের মতো ধূর্ত ঘটকদের হাতে।

ব্রাহ্মণ জাতির লোকেরা পৌরহিত্য, গ্রহাচার্য ও অধ্যাপনা প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকার্জন করতেন। অভব্য চন্দ্রের মতো পুরোহিত নামধারী মূর্খ ও বাকসর্বস্ব ব্যক্তি তখন সমাজে দুর্লভ ছিলেন না। তাঁর বিবাহ পড়াবার মন্ত্রটি এই রূপ ঃ 'ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানালল-দগ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈঃ'। (ষষ্ঠ অংক) উদরপরায়ণের মতো ব্রাহ্মণরা শুধু ফলারের জন্যই ব্যস্ত থাকেন। এই ফলারের ভাগ বুঝি, তাঁরা নিজেদের পুত্র-সন্তানকে দেয়ার কথাও ভাবতে পারতেন না। উদর-পরায়ণ যখন তাঁর শিশু পুত্রটিকে কুলপালকের বাড়ীর বিবাহের নিমন্ত্রণে নিয়ে যেতে বার বার আপত্তি জানাচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী শেষ অস্ত্রটি নিক্ষেপ করেও চাইলেন ঃ' ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আস্‌বে।' (৫ম অংক) কিন্তু এতেও উদরপরায়ণের মন টলেনি। শিশুটিকে 'চপেটাঘাত' করে চলে গেলেন ফলার খেতে। সাধারণতঃ কোনো অনুষ্ঠানের 'দক্ষিণা' প্রাপ্তির ব্যাপারটিই ছিলো, পুরোহিতদের নিকট মুখ্য। ধর্মশীলের মতো নীতিবান ব্যক্তিও, কুলপালের মেয়েদের বিবাহনুষ্ঠান সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে বলেন, 'এতদিনের পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর, কুলীন এক পাত্র পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে। করুক, যাহার অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি ?' (৪র্থ অংক)

শুভানুষ্ঠানের কোনো কাজ কর্মে বিধবারা অংশ নিতে পারতেন না। বিজয়া জানতে চেয়েছিলেন, যশোদা কুলপালকের মেয়েদের বিবাহনুষ্ঠানে যাবেন কিনা। এর উত্তরে যশোদা বলেন, 'আমি গে কি কর্বো ? রাঁড় মানুষ, ছোব না, নেপ্‌বো না।' এর পরের তাঁর স্বগোক্তিটি আরো করুণ ঃ 'এই যে সকলেই গেল। যাবে না কেন ? ঈশ্বর যেতে দিচ্ছেন তাই যাচ্ছে; আমি যে আহ্লাদ আমোদ কার্ব্বো তারতো যো নেই।' (৩য় অংক) এই মর্মান্তিক যাতনা নিয়েই বিধবারা সমাজে বাস করতেন। কিন্তু রসিকার মতো বিধবারা বেছে নিতেন অন্য পথ ঃ

'নবীন যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি।...
তৃষিত পথিকগণ এসে করে আকিঞ্চন
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।
নাহি যায় অন্য স্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা।।' (৩য় অংক)

www.pathagar.com

সমাজে তখনো বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়নি—তবে এনিয়ে চেষ্টা চলছিলো, নারী মহলে তাই বিবিধ গুঞ্জন। ফুল কুমারী বলছেন, 'আমিও পাড়ায় শুনলেম রাঁড়ের বে নাকি চলতি হবে।' বিধবা যশোদা উত্তর দিচ্ছেন, 'আর ভাই, হবে হবেই শুণ্চি, হয় কৈ ? আমি থাক্তে আর হবে ?' (৩য় অংক)

তখনকার সমাজে নৈতিকতার অধোগতি অন্যভাবেও দেখা দিয়েছিলো। বিধবা রসিকা, নাপ্তে বউ হলেও, পুজারী ব্রাহ্মণ দেবল তাঁর সঙ্গে জমিয়েছেন ভালো। এখানে তাঁদের কথোপকথনের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হোল ঃ

'দেবল।...এখন দেক্‌তে পাইনে কেন ?
রসিকা।...আর ভাই। দেক্‌তে পার না, তা দেক্‌তে পাবে কি ?...
দেবল । (সহাস্য মুখে) নাপ্‌তে বৌ ! তোমাকে দেক্‌তে পারে না এমন লোক কে ?
রসিকা।...সকলে কি সকলকে দেক্‌তে পারে ?...
দেবল ।...এখন পরামাণিক দাদা ও নাই, তোমার চলে কিসে ?
রসিকা। চল্‌বার ভাবনা কি ভাই,
দেবল । এখন কোথা যাচ্ছ ?
রসিকা। এই সব কামাতে যাচ্ছি ভাই।
দেবল । (পরিহাস পূর্বক) তুমি কি সব কামিয়া থাক।' (৩য় অংক)

পুরুষদের পরনারী এবং নারীদের পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কিছুটা ইঙ্গিতও রয়েছে প্রহসনটিতে। সুমতি তাঁর স্বামীকে ডেকে আনার জন্য, শিশুকে বলছেন, 'সেই মিন্সেকে ডাক, থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।' কথাটির মধ্যেই যেনো চরিত্রহীন স্বামী অথবা যে নারী তাঁর স্বামীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকতে চায়, তার প্রতি ফুটে ওঠেছে পরোক্ষ এক সন্দেহ, অশ্রদ্ধা বা আক্রোশ। স্ত্রী সম্বন্ধে স্বামী উদরপরায়ণের মনোভাবটিও তদ্রূপ। এখানে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছে ঃ

'উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি। এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর। লজ্জা নাই। ভাদ্রমাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না ? এই চারিদিগে পুরুষ, এখানে আসা, দেক্‌বি একবার ?
শিশু। বাবা, মা তোকে ডাক্‌তে এয়েচে।
উদর। আমাকে ডাক্‌তে এসেছে কি, আর কাকে ডাক্‌তে এসেছে, তার নিশ্চয় কি ?' (৫ম অংক)

এরূপ সন্দেহপ্রবণ স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীদের সংযত রাখতে চাইতেন শাসন করে—অনেক সময় মার-পিট করেও। উদরনারায়ণের 'ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না'—কথাটিতেই তার প্রমাণ মেলে।

www.pathagar.com

সামাজিক ও পরিবারিক অন্যান্য কিছু চিত্রও প্রহসনটিতে সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। তখন বিবাহোপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশিরা একত্রিত হতেন। স্ত্রী-আচার বিবাহনুষ্ঠানে একটা বড়ো অংশ জুড়ে থাকতো। 'জল সইতে' যাওয়াছিলো মেয়েদের নিকট একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় মেয়েরা খুব ভালো সাজতেন। কানবালা, কেয়াপাত, কুন্ডল, বলয়, কেয়ূর রত্নের অঙ্গুরী, চন্দ্রহার; মল প্রভৃতি ছিলো তাঁদের উল্লেখযোগ্য অলংকার। কেউ কেউ খোঁপার মধ্যে গোলাপ ফুল গুঁজে রাখতেন। (৩য় অংক)

তখন 'কাটনাকাটা' বা চড়কায় সুতো কাটা প্রায় ঘরে ঘরেই প্রচলিত ছিলো। এই কাটনাকাটার পয়সাই ছিলো কুলীন মেয়েদেরও দুর্দিনের সম্বল। ফুলকুমারী বলেনঃ 'অবশেষে এই যুক্তি মনে করে স্থির। কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।।' অর্থলোভী কুলীন স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই ছিলো তাঁর শেষ সম্বল। কিন্তু তা দিয়েও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফুলকুমারীর কান্না দেখে যশোদা সান্ত্বনা দেন, 'কাঁদিসনে'। যা, মেয়েদের সঙ্গে যা, আবার আসবে, ভাবনা কি ? রাগ করে গেছে কি কর্বি ? এবার এই অবদি কাট্‌না মাট্‌নাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ—।' (৩য় অংক) বিবাহ বণিক ভাবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ—শ্বশুরালয়ে গিয়ে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। হঠাৎ তাঁর মনে হোলঃ 'ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনাকাটাও কি কিছু নেই ? দেখে আসিনে কেন ?' (৪র্থ অঙ্ক)

মেয়েরা অনেক সময় কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, প্রবাদ বাক্য আওড়াতেন—'যার বে তার মনে নাই কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর'; (৩য় অংক) 'আম ফুরালে আমসি, যৌবন ফুরালে কাঁদ্যে বসি' (৫ম অংক) প্রভৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। কোন কোন সময়ে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীদের 'কাব্যরস'ও জমে ওঠতে খুব। ফুলকুমারী বলেন, 'বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কব্যরস। কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস।।' (৩য় অংক) কুলীন জামাতাদের তো সর্বত্র অবারিত দ্বার, তাই তাঁদের নিয়ে শাশুড়ীদের যতো ভাবনা, তন্ত্র-মন্ত্র কিছু দিয়েও যদি তাঁদের বসে রাখা যায়। কুলপালকের মেয়েদের বিবাহের খবর শোনে, ব্রাহ্মণী মনে মনে বলেন,

> 'শাশুড়ী হইয়া বসি ঘোমটা টানিব
> ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র কতই ছাড়িব।।
> ভেড়া করে সে বেটারে রাখিব বাড়িতে।
> যেন আর, নাহি চায় ঘরতে যাইতে।।' (৩য় অংক)

হিন্দুনারী স্বামীর নাম মুখে নেন না—অথচ কোন না কোন সময়ে তাঁকে স্বামী সম্বন্ধে কথা বলতে হয়। তখন তিনি যেভাবে, যে উপায়ে সে কথাটি

১০—

www.pathagar.com

ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন, তার কিছু হাস্যকর চিত্রও সেকালের এ প্রহসনটিতে রয়েছে। কুল পালকের স্ত্রী, মেয়েদের নিকট তাঁদের দুর্ভাগ্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, 'তা বাছা, তোদ্দের তাঁরা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে।' (৩য় অঙ্ক) কুল পালকের মেয়েদের যথেষ্ট বয়স হয়েছিলো, সুতরাং তাঁদের একথা বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি। কিন্তু অবুঝ শিশুকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন সুমতি। শিশুটি কুল পালকের বাড়ীতে ফলার খেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার মাকে ধরে বসেছে ঃ

'সুমতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্বে।
তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।
শিশু । ওমা! কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে মা।
সুমতি । সেই মিন্সেকে ডাক্,......
শিশু । কোন মিন্সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়েছিলো?......
সুমতি । সেই কত্তাকে রে কত্তাকে, ছেলেটাও তেম্নি!
শিশু । কোত্তাকে, তাই বল না কেন। আয় তুতুতু।
সুমতি । (সক্রোধে) না রে পোড়া-কপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?
শিশু । ...তুই যে বল্যি...তবে আর কোত্তা'কে?
সুমতি । সেই তোদ্দের তাকে।
শিশু । (সভিলাষে) ওমা! আমাদ্দের তাকে কি আছে মা? বল না মা বল।
সুমতি । কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।' (৫ম অংক)

মোটকথা রামনারায়ণ তর্করত্ন মূলতঃ কৌলীন্য প্রথার দোষদ্ঘাটনের জন্য তাঁর কুলীন কুলসর্বস্ব রচনা করে থাকলেও, সমাজের বহুবিধ সমস্যার কথাও এতে স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। প্রহসনটিকে এক কথায়, তৎকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তব এক চিত্র-প্রদর্শনীই বলা চলে।

দুই

প্রকাশকালের দিক থেকে, রামনারায়ণ তর্করত্নের দ্বিতীয় প্রহসন, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' (১৮৬৫ খ্রীঃ)। প্রকাশনার বছর, অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই প্রহসনটির অভিনয় হয়েছিলো। ১৮৬৬খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসেও এর আরো কয়েকটি অভিনয়ের খবর জানা যায়। রামনারায়ণের আত্মকথা হতে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রহসনটি রচনা করেও

www.pathagar.com

তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন, এবং ঠাকুরবাড়িতে তা সাত-আটবার অভিনীতও হয়। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, সমসাময়িক সমাজের বাস্তব সমস্যাভিত্তিক রচনা বলেই 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'ও সেদিন জনগণের নিকট খুব সমাদৃত হয়েছিলো।

সাধারণ লোকেরতো কথাই নেই, সমাজের তথাকথিত পদমর্যাদা সম্পন্ন—দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব যে পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি বা লাম্পট্য প্রবৃত্তির ফলে কতোটা উচ্ছন্নে যেতে পারেন, তারই একটি হাস্যকর চিত্র দু' অংক বিশিষ্ট এই ছোট্ট প্রহসনটিতে ফুটে ওঠেছে। সুধীর কোলকাতায় চাকরী পেয়েছেন। বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর 'পরমাত্মীয়' ও ধর্মপরায়ণ প্রতিবেশী ভোলানাথকে, স্ত্রী সুমতি এবং দাসী মতের মা'কে দেখা-শুনার ভার দিয়ে যান। ভোলানাথ চাকরীজীবী—'মুন্সেব'-এর সেরেস্তাদার, কাচারীর কতো কাজ কর্ম নিয়েই না তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবু তিনি সময় করে নেন, আত্মীয়ের মতোই সুধীরের বাড়ীতে 'আজ মাচ পাঠান্, আজ মিঠাই পাঠান, আসেন, যান জিজ্ঞাসাবাদ করেন।' কিন্তু এক সময়ে ভোলানাথের মুখোশ খোলে যায়--তাঁর লাম্পট্যপরায়ণ-অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে শিউরে ওঠেন মতের মা' ও সুমতি। অপরদিকে আর এক 'বিখ্যাত' নাগর মুন্সেফের নারী মাংস-লোলুপতাও তাঁদেরকে করে তোলে বিচলিত।

এই সময়ে সুধীর বাড়ী এসে, সুমতির কাছ থেকে সব কথা জানতে পারেন, এবং তিনি তাঁর আগমনের খবরটি গোপন রেখে, নাগরদ্বয়কে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য ফন্দি আঁটেন। পরিকল্পনানুসারে, মতের মা গিয়ে ভোলানাথ এবং মুন্সেফকে আমন্ত্রণ জানান—দুটো পৃথক পৃথক সময়ে নাগরদ্বয়কে সুমতির বাসভবনে আসার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

যথা সময়ে ভোলানাথ এসে সুমতির আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হয়। রঙ্গ-রসের দু' চারটে কথা বলার পর, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুমতির কাছে প্রেম নিবেদন করেন তিনি। এমন সময় মতের মা দৌড়ে এসে খবর দেন, 'মুন্সেব' আসছেন। আত্মগোপনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন ভোলানাথ। সুমতির পরামর্শে বিছানার ধারে উপুড় হয়ে পড়ে থাকেন তিনি এবং একটি গদি চাপা দিয়ে কোন রকমে তাঁকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হয়।

আনন্দে গদগদ হয়ে মুন্সেফ এসে ঘরে ঢোকেন। সুমতি তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে, উঁচু গদিটিতে বসতে বলেন। মুন্সেফ সেখানে বসার সঙ্গে সঙ্গেই 'ওঁক' করে শব্দ হয়। তিনি সভয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ও কে!' সুমতি অভয় দেন, ঘাবড়াবার কিছুই নেই--'ঘড়াঞ্চেটা' পুরানো বলেই এরূপ শব্দ হয়েছে। মুন্সেফ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন—শুরু হয় রঙ্গরসের পালা। আনন্দের

www.pathagar.com

আতিশয্যে এক সময়ে তিনি বেসুরো কণ্ঠে স্বরচিত আদিরসাত্মক গান গেয়ে, নিজেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। এমন সময় মতের মা দৌড়ে এসে খবর দেন, 'সর্বনাশ! বাবু আসছেন!' ভয়ে আৎকে ওঠেন মুন্সেফ। সুমতির পরামর্শে তিনি একটা খালিবস্তার মধ্যে ঢোকে পড়েন। তাঁর মাথাটি শুধু বাইরে রেখে, মতের মা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বস্তার মুখটি বাঁধতে থাকেন—যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন মুন্সেফ, 'উ হু হু হু! ও মতের মা, গলাটায় বড় লাগে যে।' বাঁধা শেষ হলে মুন্সেফের মাথার ওপর একটা মাছের চুপড়ি চাপা দিয়ে রাখা হয়—অন্ধকারে যেনো ভালো করে বোঝা না যায়।

ভোলানাথ হাঁপানীর রোগী। গদি চাপা পড়ার সময়ই তিনি বলেছিলেন, 'ভাব্‌ছি যদি কেস্যে উঠি।' শেষ পর্যন্ত বুঝি তাই হোল। সুধীর যখন ঘরে এসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন, তখন ভোলানাথ হঠাৎ কেশে ওঠেন—তারপর আবার। সুমতি বলেন, মনে হয় ঘরে চোর ঢোকেছে। সুধীর একটা লাঠি হাতে চোর খোঁজার ভান করেন, এবং মতের মা'কে নির্দেশদেন গদিটা সরাতে। ভোলানাথ অবস্থা বেগতিক দেখে পালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই সময়ে কিছু উত্তম মধ্যমও তাঁর ভাগ্যে জোটে যায়। ভোলানাথকে আটক করে সুধীর বস্তার মধ্যে লাথি মেরে বলেন, 'এটা আবার কি?' মতের মা জবাব দেন, 'চেলের বস্তা'। সুধীর অবাক হন, 'চেলের বস্তা? চেলের বস্তার কি মাথা থাকে? এই যে ফেল্‌ ফেল্‌ করে চাচ্চে।'

এইভাবে নাগর-যুগল সুধীরের হাতে ধৃত হন। সুধীর, মুন্সেফকে তাঁর উপরওয়ালা হাকিম বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যাবেন বলে জানালে মুন্সেক বলেন, এর চেয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলাই শ্রেয়।

সুধীর মতের মা'কে দিয়ে নাগর-যুগলের শ্রীমুখে তেল কালি লাগিয়ে দেন। এরপর মহামান্য মুন্সেফকে গাধায় চড়াবার পালা। ঠিক হয়, ভোলানাথকেই গাধা সাজতে হবে। ভোলানাথ গাধা সেজে হামাগুড়ি দেন, মুন্সেফ তাঁর পিঠে। সুধীরের আদেশে ভোলানাথকে বার কয়েক গাধার ডাকও ডাকতে হয়—মতের মা তখন পেছন থেকে কুলো বাজান। আনন্দের আতিশয্যে, মতের মা একবার গাধাটিকে লাথিও মারেন। ভীত বিহ্বল, দুর্বল হাঁপানীর রোগী গাধারূপী-ভোলানাথ চিৎ হয়ে পড়েন—মুন্সেফের গড়াগড়িও তখন আর দেখে কে!

রামনারায়ণ তর্করত্নের এই ছোট্ট প্রহসনটিতে একদিকে তৎকালীন সমাজে পুরুষদের লাম্পট্যপরায়ণতা, এবং অপর দিকে অযোগ্য, মূর্খ ও পক্ষপাতী হাকিম সমাজের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভোলানাথের মতো

www.pathagar.com

চরিত্রহীন বকধার্মিক ব্যক্তিরা, নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য সব কিছুই করতে পারতেন। তাঁদের নিকট ন্যায়-নীতি বা ধর্মাধর্মের প্রশ্ন তখন অতি তুচ্ছ বলেই পরিগণিত হোত। যে ভোলানাথ 'বড় জ্ঞানী, বড় ধার্মিক', প্রতিবেশী—সম্পর্কে হলেও যিনি সুমতির ভাসুর, তিনিই কিনা মতের মা টাকা ধার চাইতে গেলে বলেন, 'বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, ধার কেন যত টাকা চান অম্নি দিতে পারি'।[২৫] একথা শোনে মতের মারও 'হাত পা পেটের ভিতর শেঁদিয়ে যায়।' কিন্তু ভোলানাথ হাল ছাড়ার ব্যক্তি নন। অন্য একদিন সুযোগ পেয়ে তিনি সুমতিকে বলেন, 'বৌ, তুমি আমার সঙ্গে কথা কওনা অথচ আমি তোমার দেওর হই; মতের মা'কে যা বলেছি তাতেই সম্মত হও। আমি তোমাকে পরম সুখে রাখবো। (১ম অঙ্ক) এই বলেই থামতে চাননি ভোলানাথ। তাঁর জঘন্য লোলুপতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই সুমতিকে মিথ্যে করে বলতে হয়েছিলো, 'আমার বড় ব্যামো হয়েছে, সারুক, পরে যা বল্‌বে তাই করবো।' (১ম অঙ্ক)

ভোলানাথের এই চারিত্রিক অধঃপতন আকস্মিক কিছু নয়—ক্ষণিকের ভুল বা পদস্খলনের প্রশ্নও এখানে ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে এই ল্যাম্পট্যপরায়ণতা ছিলো একটি সামাজিক ব্যাধি—এর মর্মমূল নিহিত ছিলো, ভোলানাথের মতো লম্পটদের অন্তর্গহনে। সুমতির পরিকল্পিত আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোলানাথ বলেন, 'দেহ ভাই, আজ আমার কি আহ্লাদের দিন। আমার হৃদয়ের চির-রোপিত আশালতা আজ ফলিত হবে, বহু কালের যে মনোবাঞ্ছা তা পূর্ণ হবে, একি সামান্য আহ্লাদের কথা! (২য় অঙ্ক) ভোলানাথের এই পৈশাচিক আহ্লাদের শিকার যে শুধুমাত্র সুমতি, তাই নয়। অধঃপতিত চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাঁর জীবন—লম্পটতা তাঁর নিত্যসহচর। সুমতির বাড়ীতে আসার সময় মুন্সেফের চাকর তাঁকে পিছু ডেকেছিলেন। ভোলানাথ এজন্য দস্তুর মতো বিরক্তই বোধ করেন, অ্যাঁ, বেটা যেন পুলিশ, কোথা যাচ্ছ্য, কি কচ্ছ্য, সকল কথাই ওকে বলে আসতে হবে,—আর একটি কার্য যেদিন গড়ে সেদিন আর রাস্তায় লোক ছাড়া নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আবার জোৎস্না রাত্রিটে হয়ে পড়েছে। (২য় অঙ্ক)

অতিবৃদ্ধ ও অপদার্থ—চরিত্রহীন মুন্সেফের মতো তথাকথিত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অভাবও দেশে ছিল না। লাম্পট্যপনা বাতিকের ফলে, তাঁরা নিজেদের বয়স ও পদ মর্যাদা প্রভৃতিকে কখনো ভেবে দেখার অবকাশ পেতেন না। 'ভুদো' মুন্সেফ সম্বন্ধে সুমতি তাঁর স্বামীকে বলেন, 'তিনি আবার প্রতিদিন কাছারি থেকে যাবার সময় ঐ খিড়কির পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি যদি ঘাটে যাই দেখ্‌তে পান, তবে কত রঙ্গ ভঙ্গ করেন, ঠাট্টা তামাসা করা হয়, সে সকল দেখে-শুনে ভাই আমার কেবল হাসি পায়।

www.pathagar.com

(১ম অংক) এখানেই সব শেষ নয়—একদিন সুযোগ পেয়ে মতের মা'কে তিনি বলেন, 'ওরে, তোর মা-ঠাকুরণের সঙ্গে আমায় দেখা করিয়া দিতে পারিস? তোকে দশ টাকা দেবো।' (১ম অংক) এই অর্থের বলেই মুন্সেফের মতো লোকেরা সেদিন নারী মাংসলোলুপতা নিয়ে সমাজকে চষে বেড়িয়েছেন। সুমতির কৃত্রিম আতিথ্য লাভ করার সুযোগ পেয়ে মুন্সেফ পুলকিত—কথা প্রসঙ্গে মতের মা'কে তিনি বলেন, 'আমি এই বয়েসে কত কাপ্তান ভাসালেম। এই দু-শ টাকা করে মাইনে পাই, কেবল এই কর্ম্মেতেই আমার সব যায়। কি তা জান্‌লে "প্রাণটা সকের বটে'—হি-হি-হি।" দুর্দিনে সুমতির জন্য টাকা হাওলাত চাইতে গিয়ে, ভোলানাথের কাছ থেকেও মতের মাকে আরো শোনতে হয়েছিলো, 'বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ধার কেন যত টাকা চান অম্নি দিতে পারি।' (১ম অংক)

মুন্সেফ-সেরেস্তাদাররা শুধুমাত্র বেতনের টাকার ওপরই নির্ভর করতেন না, তাঁরা যে আরো কিছু উপরিও পেতেন, তার প্রমাণও মেলে প্রহসনটিতে। কিন্তু এ উপরি পাওনার প্রায় সবটাই যেতো বড়োকর্তার পেটে। ভোলানাথ বড়ো আক্ষেপ করেই বলেন, 'মুন্সোব বেটা বড় দুষ্টু, অন্য কাউকেওতো বেটা দু' পয়সা নিতে দেয় না; 'বেটার আপনারই পেট সর্ব্বস্ব।' (২য় অংক)

পরনারীর প্রতি অবৈধ আসক্তির ফলে সেকালের অনেক হাকিম নামধারী ব্যক্তি যে, বিচার নামক প্রহসনের সৃষ্টি করতেন, তারও প্রমাণ মেলে মুন্সেফ চরিত্রে। সুধীর তাঁকে ভালো করেই জানতেন: 'ও বেটার চরিত্র আমি বিশেষ জানি, যার স্ত্রী, কি ভগিনী বড় সুন্দর, সে নালিশ করলে অম্‌নি ডিক্রী, আর সাক্ষী-সাবুদ চাই না।' (১ম অংক) সুমতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য, মুন্সেফ মতের মা'কে ধরে বসেছিলেন—বিনিময়ে তাঁকে দশটি টাকা বখ্‌শিস প্রদানের প্রলোভনও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মতের মা তাঁকে 'খুব দশ কথা' শুনিয়ে চলে আসেন। পরে যখন মতের মা'র সুমতির পরিকল্পনানুসারে মুন্সেফকে আবার নিমন্ত্রণ করেন, তখন তাঁর আনন্দ আর ধরে না—সে মুহূর্তে বেচারী মতের মা'র জন্য তাঁর বিশেষ করুণাও প্রকাশ পায়: 'সেই সব হলো, তবে তুই মাগি সেদিন আমাকে অমন কথা বল্লি কেন? তাই তেই তো তোর বোনপোর মোকদ্দমাটী গেল। তা যা হবার হয়েছে; আমি আগে যাই; তোকে এখন খুব খুসি করে দেব।' (২য় অংক) তাঁরাই আবার আদালতে 'ধর্ম্ম ছাড়া' কথায় বলেন না। কিন্তু ধর্মের এ নামাবলীর অন্তরালে যে যথার্থ অর্থে কি সম্পদ লুকিয়ে থাকতো, মুন্সেফের কথাতেই প্রকাশ পায়। সুমতিকে তিনি বলেন, "কিন্তু তাও বলি, তোমাকে যেদিন মনে হয়, সেদিন মকদ্দমা ফকদ্দমা কিছুই ভালো লাগে না। কাছারীতে গিয়ে মেজের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে কেদারায় শুয়ে পড়ে চোক বুঝিয়ে

www.pathagar.com

তোমার এই মোহিনী মূর্তি ধ্যান কর্তে করতে অমনি নিদ্রাটুকখানি আসে তা আর কি বল্বো।' (২য় অংক) তাঁদের বিদ্যার বহর এতোই ছিলো যে, অনেক সময় পেটে বোম মারলেও শব্দ হোত না। কিন্তু লাম্পট্যপনা করতে গিয়ে বুঝি কখনো কাব্যরস করতে ছাড়তেন না তাঁরা। মুন্সেফ সুমতির বাড়ীতে গিয়েছেন—কিন্তু তখনো গৃহকর্তৃর সাক্ষাৎ মেলেনি। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে আসে সুমতির কণ্ঠস্বর: 'মতের মা, একি ভাগ্যি যে আমার বাড়ী আজ্ মুন্সোব মশার পদ্ধুলো পড়লো।' (২য় অংক) মুন্সেফের ভাবের রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি হোল যেন: 'আহা! কি মিষ্টি বাক্য, যেন নতুন গুড়ের মন্ডা, শুনে আমার লোল-মরু, কানটা জুড়ুলো। হেদ্দেখ সুন্দরি, এই যেমন দময়ন্তীর রূপ দেখে রাবণ রাজা উম্মত্ত হয়ে—'। সুমতি তার ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারেন, এহেন পণ্ডিতদের কাছে রাবণ রাজা আর নল রাজা একাকার না হয়ে উপায় কি। সুমতির প্রতি 'অনুরাগ' বশতঃ 'ভুদো' মুন্সেফ একটি গানও তৈরী করেছেন। আনন্দের অতিশয্যে তিনি সে গানটি সুমতিকে গেয়ে শোনান:

"সুন্দরি মরি তোরি তরে নাভি ফুলেছে
[অর্থাৎ পেট]।...
আড় নয়নে চাউনি তোরি
করে ভারি ডিক্রী জারি,
[আইন ঘটিত কথা]...
আছি তোমার পায়ের কাছে।
আমি ঐ শ্রীচরণের ছুঁচো।" [প্রণিপাত]। (২য় অংক)

গান গেয়ে নিজেই তার প্রশংসা করেন—এতে নাকি যথেষ্ট 'অনুপ্রয়াস' আছে। কথাটা সহজবোধ্য করে তোলার জন্য তিনি আবার ব্যাখ্যাও প্রদান করেন: 'এই একজাতি কতগুলি শব্দ একত্রে থাকলে তাকেই বলে অনুপ্রয়াস। 'কোথা কাঁথা মাথা ব্যথা'—বুঝলেতো? আর এতেই কবিদের গুণপনা।' (২য় অংক)

লম্পটরা অনেক সময় তাঁদের 'প্রেয়সীর' কাছে 'তত্ত্ব' বা উপহারও পাঠাতেন। একত্রে বসে 'জলখাবার' না খেলে কি আর রঙ্গরস জমে? দ্রব্য-সামগ্রী কিনে পাঠাবার মতো সময় ভোলানাথের ছিলো না। তাই তিনি মতের মাকে বলেছিলেন, 'এই পাঁচ টাকা বৌকে দে বলিস্ যা খরচপত্র করেন করবেন। আর আমার জন্যে কিছু যেন জলখাবার তৈয়ের থাকে।' (২য় অংক) মুন্সেফ দস্তুর মতো খানদানি কায়দায় লোক দিয়েই সুমতির বাড়ীতে সন্দেশ আর বস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ভোলানাথ আর মুন্সেফের মতো চরিত্রহীন-লম্পট ব্যক্তিরাই সমাজের

www.pathagar.com

রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেদিন পাপের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁরাই ছিলেন 'সাধু' মানুষ। শুধুমাত্র মুখোশের জোরেই তাঁরা তাঁদের তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতেন। স্ত্রীর প্রতি ভোলানাথের অশুভ আচরণের কথা জানতে পেরেও, সুধীর যেনো বিশ্বেসই করতে পারছিলেন না—তিনি বলেন, '(স্বগত) ভোলা দাদা তো লোক ভাল, অতি জ্ঞানী, অতি ধার্ম্মিক, এ কেমন হলো বুঝতে পাচ্ছি না।' (১ম অঙ্ক) মুন্সেফ তো তাঁর কাছারীর প্রতাপ-প্রতিপত্তিটুকুন সুমতিকে দেখাতে পারছেন না বলে দস্তুর মতো আফ্‌সোসই করেন: আঃ! সুন্দরি, যদি একবার কাছারী ঘরটা দেখ্‌তে—অমনি প্রতাপে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। কত উকিল, কত মোক্তার, আর ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই।' (২য় অঙ্ক)

এই অসুস্থ-অসামাজিক পরিবেশে স্বামীকে দূরদেশে রেখে, সুমতির মতো কোনো সতীনারীই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। সুমতির ভয় নিজের জন্য যেমন, তেমনি স্বামীর জন্যও বটে। স্বামীকে তিনি হেসে হেসে হলেও বলেন, 'কুমুদিনীর এক চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নাই, কিন্তু চন্দ্রের তো অনেক কুমুদিনী মেলে। তোমরা পুরুষ জাতি, তোমাদের অপ্রতুল কি ভাই?' (১ম অঙ্ক) অপর দিকে ভোলানাথ আর মুন্সেফের মতো লম্পটদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই সে দেশ, সে সমাজের প্রতি সুমতির মনে জেগেছিলো ধিক্কার। স্বামীকে তিনি বলেন, 'তোমাদের যে দেশ, আমি যে কি করে দিনপাত করছি তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।' (১ম অঙ্ক) অনোন্যপায় হয়ে সুমতি একবার আত্মহত্যার প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। যে দেশের মুন্সেফ থেকে আরম্ভ করে সেরেস্তাদার পর্যন্ত সকলেই লম্পট, সে দেশের অবলা এক সতীর পক্ষে নিষ্কৃতির জন্য, এপথ বেছে নেয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি! স্বামীকে তিনি জানান, 'ভাবলেম বলি কেন আর ভেবে ভেবে মরি, এর চেয়ে একবারে যাই সে ভাল। তাই দড়ির যো করে রেখেছি। ঐ দেখ গদির নীচে রয়েছে।' (১ম অঙ্ক) এমনি সময়ে 'ধর্ম্মই' সুধীরকে সুমতির কাছে এনে দিয়েছেন। তাই এবার আর তিনি কোনো কিছুর বিনিময়েই স্বামীকে হাতছাড়া করতে চান না: 'এ অধিনীকে একাকিনী রেখে কি তোমার দূরদেশে—যাওয়া উচিত? প্রাণের ভয় অপেক্ষা জাতির ভয় অধিক, তা তুমি বিবেচনা কর না? নাথ্‌, আমার ধনে কায্‌ নাই, অলঙ্কারে কায্‌ নাই, কেবল তুমি কাছে থাকো এই চাই, তাতে যদি ভিক্ষা করে দিনপাত করতে হয় সেও ভাল। (১ম অঙ্ক)

www.pathagar.com

তিন

রামনারায়ণ তর্করত্নের তৃতীয় প্রহসন 'বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয় নব—নাটক' বা সংক্ষেপে 'নবনাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এরূপ একটি নাটক রচনার জন্য দু'শ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এর উত্তরে প্রাপ্ত রচনাগুলোর বিচারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রাপ্ত রচনাগুলোর কোনোটিকেই তাঁরা পুরস্কার প্রাপ্তির উপযোগী বিবেচনা করতে পারেন নি। পরে তাঁদের পরামর্শেই গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাটুকে রামমারায়ণ'কে এরূপ একটি নাটক রচনার জন্য অনুরোধ করেন। রামনারায়ণ নবনাটক লিখে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে পুরস্কার লাভ করেন।

নবনাটক যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা একথা বলাই বাহুল্য। কুলীন কুলসর্বস্বের ন্যায় এখানেও রামনারায়ণ তাঁর উদ্দেশ্যের কথাটি গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রহসনের বিজ্ঞাপনেই তিনি বলেছেন, 'আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহু বিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম।' উপহার পত্রে তিনি লিখেছেন, 'ইহা বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।' প্রহসনটির যবনিকান্তে সূত্রধর বলছেন, 'আর কি আপনারা বহু বিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন ? ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন ? যাতে ঐ নানা দোষকার ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না ? যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থ কর্তা কৃতার্থ হন,'। কুলীন কুলসর্বস্বের ন্যায় নবনাটকের চরিত্র-চিত্রণেও এই উদ্দেশ্যের কথাই স্পষ্ট। চরিত্রগুলোর বিশেষ বিশেষ নামকারণ থেকেই একথা বোঝা যায়—যথা গবেশ বাবু—গ্রাম্য জমিদার, সুধীর—সুপন্ডিত, বিধর্মবাগীশ—পন্ডিতাভিমানী, চেত্ত-তোষ—তোষামোদকারী ব্রাহ্মণ, গ্রাম্য-প্রতিবাসী, নাগর-নগর প্রবাসী, দন্তাচার্য—দলপতি প্রভৃতি। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'নামগুলি চরিত্রের গুণ বা দোষজ্ঞাপক label স্বরূপ।'[২৬] প্রহসনকারের এই বিশেষ উদ্দেশ্যপনার দিকে লক্ষ্য করেই কেউ কেউ বলেছেন, বাস্তব জীবনের ছবি এখানে ফুটেছে, একথা বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু বক্তব্য হোল, যা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় হয়, জন সভায় বক্তার কণ্ঠে মুক্তি পায়, তাকি নাটকের বিষয় বস্তু হতে পারে ?[২৭] এখানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অবকাশ খুবই কম। তবে, শুধু এইটুকুন কথা মনে হয় আমার স্মরণ রাখতে পারি যে, যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে তখনকার সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো, যার ফলে সম্পাদকরা বাধ্য হয়ে ছিলেন

www.pathagar.com

সম্পাদকীয় লিখতে, বক্তারা বাধ্য হয়েছিলেন জনসভা করতে; ঠিক সে একই কারণে রামনারায়ণ শুধু রামনারায়ণই বা বলি কেনো, সকল প্রহসনকার—এমনকি সমসাময়িককালের প্রায় সকল উপন্যাসিক বা প্রাবন্ধিকও বাধ্য হয়েছিলেন—নাটক-প্রহসন, উপন্যাস-প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করতে।

নবনাটকে যে বহুবিবাহ সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথাগুলোকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা গ্রন্থের পুরোনাম 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক'-এর থেকেই বোঝা যায়। বস্তুতঃপক্ষে বহুবিবাহ সমস্যা গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য হলেও, বিধবা বিবাহ, গ্রাম্য দলাদলি প্রভৃতি সমস্যা এবং বৃদ্ধ ও অকর্মন্য বিলাসী জমিদার, তোষাকোদকারী ব্রাহ্মণ, পন্ডিতাভিমানী ব্যক্তি প্রভৃতির চিত্রও এতে সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। সমসাময়িককালের একটি সংবাদপত্রে, নবগোপাল মিত্র নবনাটক সম্বন্ধে বলেছেন, '......a tragic drama depicting the vices of polygamy, and other obnoxious practices, which of late, have grewn much into fashion in our society'.[২৮] নবনাটকে সমাজের এই নিখুঁত-বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হওয়ায়, প্রাচীনপন্থীদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন কুলীন কুলসর্বস্বের সমালোচনার ন্যায়, সব নাটকের আলোচনাকালেও কলেছেন, 'গ্রন্থকার পরিহাসও শ্লেষোক্তি প্রিয়।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার, অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও, প্রহসনটির বাস্তবতার প্রশংসাও তাঁকে করতে হয়েছে: 'নাগরের ইংরেজি শব্দ-সম্বলিত কথোপকথনটি এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিবামাত্র ঐরূপ কতকগুলি নাগর আমাদের চক্ষুর উপর আসিয়া উপস্থিত হন। তর্কতন্ত্র, নাগরের কোন বেশভুষা দেন নাই—পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা দাড়ী, ছড়ি, চশমা, মাথার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের মত সিঁতে প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়া দিতে বলতাল।'[২৯] কারো কারো মতে, ''নবনাটক' নাটক হিসেবে আদৌ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, কিন্তু 'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রথম নাটক—যা অসাধারণ অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল।''[৩০] আমাদের মনে হয়, কথাটির দিকে আর একবার দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। কুলীন কুলসর্বস্ব অভিনয়ের জন্য রচিত না হলেও, তা যে বহুবার অভিনীত হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নবনাটক মূলতঃ অভিনয়ের জন্যই রচিত, এবং সাফল্যজনকভাবে এরও বহুবার অভিনয় হয়েছিলো। রামনারায়ণের আত্নকথা হতে অবগত হওয়া যায় যে, একমাত্র গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতেই প্রহসনটি নয় বার অভিনীত হয়েছিলো।'[৩১] নবনাটকের একটি অভিনয় দেখে সেকালের কোনো সংবাদপত্রে এরূপ লেখা হয়েছিল:

'শনিবার আমরা জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সংকীর্ণ স্থানে অধিক সংখ্যক চৌকি সন্নিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

এককালে দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্র ঘর্ষণ, ও আসন ভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যতদিন গালারি না হইতেছে, ততদিন আগন্তুকদিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনিট কাল রেলওয়ে ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।'[৩৯]

এর থেকেই ধারণা করা সম্ভব, জীবনের বাস্তব সমস্যাভিত্তিক রচনা বলেই কুলীন কুলসর্বস্বের ন্যায় নবনাটকও সেদিন জনগণের নিকট কতোটা সমাদৃত হয়েছিলো।

নবনাটকের বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য বিলাসী জমিদার গবেশবাবু, স্ত্রী সাবিত্রী ও দু' পুত্র সন্তান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহের কথা ভাবেন। অবশ্য, তিনি যে পঞ্চাশ বছর বয়সের বৃদ্ধ, এবং সমাজে যে বহু বিবাহ নিবারণী সভাও রয়েছে, এসমস্ত কথাও তাঁর মনে হয়। চাটুকার বিধর্মবাগীশ ও চিত্ততোষ কিন্তু এর কোনোটিকেই সমস্যা বলে মনে করেন না। পঞ্চাশ বছর বয়স আর তেমনি কি, 'এখন পেটে থেকে পড়তে না পড়তেই মানুষের ৫০ বৎসর বয়স হয়।' আর বহুবিবাহ নিবারণী সভায়তো 'যত বেটা ভণ্ড একত্র হয়েছে।' সুপণ্ডিত সুধীর, গবেশবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর পূজা এবং শিক্ষকতার কাজ করেন। তিনি চাটুকারদের এসমস্ত কথার প্রতিবাদ করেন এবং গবেশবাবুকে জানান যে, বহু বিবাহ অবশ্যই একটি ন্যায়-নীতি বিরুদ্ধ, কাজ। গবেশবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ঃ 'থাকুক থাকুক আমাকে আর তোমার উপদেশ দিতে হবে না। ওঃ ভারি বিজ্ঞ হয়েছে।'

'জেতে কিছু খাটো' হলেও কুসুমপুরের 'উত্তম' মেয়ে চন্দ্রলেখাকেই গবেশবাবু বিবাহ করে ঘরে আনেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সংসারে বহুবিবাহের কুফল ফলতে শুরু করে। ছোটো বউয়ের পরামর্শে, গবেশ বাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে আবার তা বেনামীতে ছোটো বউয়ের নামেই ডেকে রাখেন। তাছাড়া বড়ো বউ এবং তাঁর সন্তানদের ওপরও শুরু হয় ছোটো বউয়ের নির্যাতন। বড়ো বউ রান্না বসালে, ছোটো বউ ইট দিয়ে পাতিল ভেঙে দেন। বড়ো বউয়ের ছেলে সুবোধ আহার করতে গেলে আহার পান না, তাঁর বিছানাতে ছোটো বউ 'জল ঢেলে রাখেন'। ছোটো বউকে সন্তুষ্ট করার জন্য, গবেশ বাবু একটি গোল পাতার ঘর করে, বড়ো বউকে পৃথক করে দিয়েছেন। তবু ছোটো বড়য়ের সন্দেহ যায় না—বুড়োর প্রাণের টানটা বুঝি বড়ো বউয়ের দিকেই বেশী। তাই রসো গোয়ালিনীকে দিয়ে তিনি, বশ করার ঔষধ আনিয়ে স্বামীকে খাওয়ান।

www.pathagar.com

বিমাতার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সুবোধ বাড়ী ছেড়ে চলে যান—কান্নায় ফেটে পড়েন বড়ো বউ, কিন্তু ছোটো বউয়ের আনন্দ আর ধরে না। এদিকে নানাহ দুশ্চিন্তায় গবেশবাবুর স্বাস্থ্যও ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে। তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা বলতেও এখন আর কিছুই নেই—চাটুকরদেরও ভীড় জমে না। এমতাবস্থায় সাবিত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতিনী হন। কিছুদিন পর অসহায় বৃদ্ধ গবেশবাবুও মারা যান। সুবোধ দেশে ফিরে এসে পিতা মাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন এবং মাতার আত্মঘাতিনী হওয়ার খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন—তাঁর সে মূর্ছা আর ভাঙেনি।

এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে, প্রহসনটিতে তৎকালীন সমাজের অনেক চিত্রই সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। গবেশবাবুর মতো বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য বিলাসী জমিদাররা অনেক সময়েই স্ত্রী-পুত্র বর্তমান থাকাসত্ত্বেও 'তরুণী ভার্যা' গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠতেন। কুসুমপুরের চন্দ্রলেখা 'জেতে কিছু খাটো' হলেও, মেয়ে হিসেবে 'উত্তম'। তাঁকে দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার আগে, কিভাবে গবেশবাবুর মানসিক—ব্যস্ততার ক্রমোন্নতি ঘটেছে, তা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি-সমূহ হতেই বোঝা যায়। কথা প্রসঙ্গে বিধর্মবাগীশকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : স্ত্রী-পুত্র সত্ত্বে কি বিবাহ করতে পারা যায় না ? বিধর্মবাগীশ ও চিত্ততোষ যখন এ নিয়ে মনু প্রভৃতির বচন থেকে শুরু করে, স্বীয় উদ্ভাবিত শ্লোকাদি দিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করেন, তখন যেনো গবেশবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চায় : 'বহু বিবাহটা কর্ত্তব্য কিনা আমি এই কথাই জিজ্ঞাসা করি।' সুধীর এই ব্যাপারে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন তোললে তিনি দস্তুর মতো ক্রুদ্ধ হয়েই ওঠেন :

'থাকুক্ থাকুক্ আমাকে আর তোমার উপদেশ দিতে হবে না। ওঃ ভারি বিজ্ঞ হয়েছে' পরে বুঝি বয়সের কথাটা ভেবে একটুখানিক খট্‌কাও লেগে ছিলো। কিন্তু তাও কাটিয়ে ওঠেন। চাটুকারদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন :

'বয়সও যে নিতান্ত অধিক হয়েছে তাও তো নয়।'[৩৩]

কিন্তু এরূপ তরুণী ভার্যা গ্রহণের পর, বৃদ্ধদের অনেক সময় বিপাকেই পড়তে হোত। গবেশবাবুর দাসী সাবিকে অন্য বাড়ীর দাসী ভগি জিজ্ঞেস করেন, 'শুনলেম তোর মনিবের যে বে ?' সাবি উত্তর করেন 'ও বে নয় বেহাল।' (১ম অঙ্ক) প্রকৃত পক্ষে তরুণী চন্দ্রলেখাকে বিবাহ করে গবেশবাবু এই বেহাল অবস্থারই শিকার হন। চন্দ্রলেখার মনযোগাতে গিয়ে তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে আবার তা বেনামীতে চন্দ্রলেখার নামেই কিনে রাখতে হয়েছে—একটি গোলপাতার ঘর বানিয়ে সাবিত্রীকে করে দিতে হয়েছে পৃথক। প্রবল প্রতাপশালী গবেশবাবু 'এখন শিংভেঙে বাছুরের পালে ঢুকেছেন।' অনূঢ় প্রতিবেশী কৌতুক, এ সম্বন্ধে রসময়ী গোয়ালিনীকে আরো

www.pathagar.com

বলেন, 'সেদিন দেখি বাগানে যাচ্যেন, পোশাক দেখেই তো আমার হাসি পেলে, বলি আবার বুঝি যৌবন ফিরে এলো, না যযাতি রাজার মত কারও কাছে যৌবন ধার করো্য নেছেন।' (৩য় অংক) কিন্তু এতো কিছু করেও বৃদ্ধ তাঁর তরুণী স্ত্রীর মন যোগাতে পারেন না, 'যার প্রণয় পিপাসায় এই প্রবীণ বয়সেও আমি নবীন জনসেব্য পরিচ্ছেদ পরিধান করে থাকি, যার জন্যে বিসদৃশ সামান্য আলাপ, সামান্য কথা লয়ে বালকের মত এখন রহস্য করতে হচ্ছে, এমন কি, এ অবস্থায় নিধুর টপ্পার বই পর্যন্ত কিনিছি, আর আপনার পূজা আহ্নিকের সময়কেও সংকোচ করো্য সেই অসার ঘৃণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করেছি, যার জন্যে এতদূর পর্যন্ত হলো সেই বা আমার প্রতি প্রসন্ন কৈ ? (৫ম অংক) এমতাবস্থায়ই বুঝি প্রথমা স্ত্রীর কথা আবার স্মরণ হয়—অতীতের দুর্লভ স্মৃতিগুলো খোঁচিয়ে খোঁচিয়ে বিষিয়ে তোলে মনকে : সাবিত্রী তখন আমাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করতো, কত শুশ্রূষা করতো, কতইবা আমার প্রতি যত্ন করতো, তা সে সুখেও আমাকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। (৫ম অংক) কিন্তু সেজন্য এখন যে আর এতোটুকুন সহানুভূতি প্রকাশ করারও যো নেই। সুবোধ বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সাবিত্রী। কিন্তু চন্দ্রলেখা বলেন, 'ওর কান্না শুনতে আমার বড় মিষ্টি লাগে—তা মিন্সে করেছে কি, কান্না শুনে বুঝি দুঃখ হয়েছে তাই দুটো কথা বল্যে শান্ত করবার জন্যে বটুকখানা থেকে আস্তে আস্তে ওর ঘরের কাছে গে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছে আর আমি অমনি খড়খড়ি খুল্যে বলি কি ও ? (হাস্য-বদনে) অমনি মিন্সে অপ্রস্তুত হয়ে—ভাই তুই যদি রঙ্গ দেখ্‌তিস্, বলে—নানা কিছু নয়, আমি এদিগে যাচ্যি, আমিতো ওর ঘরের কাছে যাইনি। (৪র্থ অংক) ছোটো বউয়ের অনুপস্থিতিতে গবেশবাবু বুঝি তাঁর অন্তরের কথাটুকুন আরো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন : 'গিছিলেম, যাবোইতো, স্ত্রী লোকটা একেবারে মারা পড়ে, আমার কি শরীরের দয়াধর্ম নাই ? (৫ম অংক) কিন্তু 'যে সংসারের মেয়েরা বালিকা বয়সেই বারব্রতের ভিতর দিয়া সতীন কাটিয়া আলতা পরিতে শিখে, চন্দ্রলেখা সেই সংসারেরই সন্তান।'[৩৪] সুতরাং তাঁর মনেতো এ সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক, 'মিন্সের এখনো ওদিগে টানটী বিলক্ষণ আছে।' (৪র্থ অংক) কিন্তু এর প্রতিবিধানও চন্দ্রলেখার জানা আছে, 'এখনো মিন্সেকে ভাল করো্য হাত কত্যে পারিনি, তারি নিমিত্তে গোয়ালা দিদিকে বলেছিলেম, তা সেও আবার এক রকম ঔষধ দে বলেগিছিল এতেই ও বিষয়ের শেষ হবে। তা তাও খাইয়ে দিচ্ছি।' (৪র্থ অংক)

বহু বিবাহের অপর নাম যে সংসারে অশান্তি আর যন্ত্রণাকেই ডেকে আনা, তার প্রমাণ মেলে অন্যত্রও। চন্দ্রকলা সতীনের ঘর করছেন বলে তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, কিন্তু বেচারা 'মহিনের বাপের' অবস্থাটাই বুঝি সবচে

www.pathagar.com

শোচনীয়। এখানে বিমলা প্রভৃতির সঙ্গে চন্দ্রকলার কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃত দেয়া গেলো ঃ

অমলা। ··· লোকে বলে ······ তুমি মাগীকে জবালা যন্ত্রণা দেও ··· ।
চন্দ্র । লোকে কিনা বলে ?
বিমলা। হাঁ লা চন্দ্রকলা, তবেতো তোদেরও কেউ সুখী নয় ?
চন্দ্র । সুখ ? সুখের দ্বারে আগড় দে বসেছি ভাই, আর সুখে কাজ নাই।
বিমলা। তা মহিনের বাপ্ তো তোদের নে ভারি ভুগ্‌ছে ?
চন্দ্র । ভুগ্‌বেইতো, খুব হচ্যে। 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' হবে না ? 'দু নৌকোয় পা দিলে কি হয়ে থাকে ?' (২য় অঙ্ক)

বসুজো মশাই কোলকাতায় চাকরী করেন। বাড়ীতে তাঁরও দু'টো সংসার। একদিন একচোর সেই বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে, বউদের হাতে ধরা পড়ে-ছিলেন। আদালতে চোরের শুধু একটি আবদার ছিলো, তাঁকে যে শাস্তিই দেয়া হবে, তিনি তা মাথা পেতে নেবেন—শুধু দুটো বিবাহ করার শাস্তিটি যেনো না দেয়া হয়। চোরের বিবরণ হতে জানা যায়, বসুজো মশাইর 'একখানি ঘর, তাতে দুজনকে দুটি কামরা কর্য়ে দেছেন, তারা দুজনে ভিন্ন খায় দায় থাকে, ইনি শনিবার বাড়ীতে এসে শনি রবি দুদিন দুজায়গায় পালা খাটেন। 'সেদিন ছিলো বসুজো মশাইর এ পালা খাটার দিন—কিন্তু চোরের তা জানা ছিলো না। চোর যখন ঘরের ভেতর লুকিয়ে, এমন সময় কর্তা এসে উপস্থিত। চোরের ভাষায়—'স্ত্রী দুটী দুদিক্ থেকে দৌড়ে এসে ও'র দুটী হাত ধলো, ········ একবার এদিক একবার ওদিক-টানাটানি ছেঁড়া ছেঁড়ি—কর্ত্তা মরুন আর বাঁচুন্ তাদের কি ? ····· সমস্ত রাত্রি এই পর্ব্ব, কর্ত্তার দুটী হাত ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠলো··· · পালাতেও অবকাশ পেলাম না, রাত্রি পুইয়ে গেল অমনি ধরা পড়িছি।' (৩য় অঙ্ক) দৃশ্যটিতে অতিরঞ্জনের প্রশ্ন ওঠে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই, বহু বিবাহকারী স্বামীর এরূপ দুরবস্থা যে অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও স্বাভাবিক ছিলো, তাও অস্বীকার করা যায় না।

সেকালের সমাজে কৌলীন্য প্রথার আশীর্বাদ নিয়ে যাঁরা বিবাহ করতেন, তাঁরা কখনো তাঁদের স্ত্রীর সংখ্যার ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ফলে একই কুলীন স্বামীর নামমাত্র বিবাহিতা বহুস্ত্রীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা আর ব্যর্থতার গ্লানিই সম্বল হয়ে থাকতো। ভাগ্যাহতা নারীদের নিকট এই 'কুলীন' নামটিই যেনো একটি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলো—'কুলীন পড়া' তখন একটি আতঙ্কিত প্রবাদ হয়ে ওঠেছিলো। গবেশবাবুর বাড়ীতে চন্দ্রলেখা, চপলা ও চন্দ্রকলা বসে বসে মেয়েলি বিষয়াদি

www.pathagar.com

নিয়ে আলাপ-আলোচনায় রত। কথায় কথায় চপলার প্রসঙ্গ এসে যায়ঃ

চন্দ্রকলা। ওটী বেশ মানুষ, কিন্তু বড় মনের দুঃখ পাচ্যে।
চন্দ্রলেখা। কি মনের দুঃখ ?
চন্দ্রকলা। ও যে কুলীনে পড়েছে।
চন্দ্রলেখা। হাঁ গা, তুমি কি কুলীনে পড়েছ ?
চপলা। পড়িছিতো পড়িছি, একেবারেই হাত পা ভেঙে
চন্দ্রলেখা। সতিন আছে ?
চন্দ্রকলা। তা শত্রুমুখে ছাইদে অনেকগুলি।
চন্দ্রলেখা। কয়টী ?
চপলা। এই দুকুড়ি তেরটী, এমন অধিক নয়, আরো দুটী-চাট্টি এখনো হবে।' (৪র্থ অংক)

নিতান্ত আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়েই কুলীনরা একটার পর একটা বিবাহ করে চলতেন। মেয়ের পিতারাও কুলরক্ষার গরজে অনেক সময় একই বরে একাধিক মেয়ে সম্প্রদান করে নিষ্কৃতি পেতেন। দম্ভাচার্যের মতো বহু বিবাহ সমর্থনকারী ব্যক্তিও কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে বলেছেন, 'আমার তিনটি কন্যা একটা কুলীনকে দিতে হয়েছে, তার আবার একশ দেড়শ বিবাহ, একবার উঁকি মেরে দেখে না, দুঃখের কথা বল্‌বো কি ? মেয়েদের যাতনা দেখলে বুক ফেটে যায়।' (৩য় অংক) স্ত্রীদের শতো দুঃখ-দুর্দশাতেও কুলীনদের কিছুই যেতো আসতো না। সুধীরের এ সম্বন্ধীয় এক প্রশ্নের জবাবে বিধর্ম্ম-বাগীশ বলেন, তা স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশ হলো তা কুলীনদের কি ? তাঁরা পয়সা পেলেন বিয়ে করলেন, ও ব্যবসায়ই কি মন্দ ? ভায়া বিবেচনা করো না ? (১ম অংক) এর ফলে কুলীনের স্ত্রীদের কেউ কেউ ব্যভিচারিণী হয়ে পড়তেন —কিন্তু কুলীনদের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই ছিলো না। এখানে সুধীর এবং বিধর্ম বাগীশের কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

সুধীর ।। এক ব্যক্তি ৫০/৬০টে বিবাহ করলে, কর্য়ে সেই সকল স্ত্রীর কি সে ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারে ?
বিধর্ম্ম ।। কেন ? সে ধর্ম্ম রক্ষা করবে কেন ? যার যার ধর্ম্ম তারা আপনারাই রক্ষা কর্‌বে, না করে তাদেরই পাপ। (১ম অংক)

এমনকি, কুলীনের স্ত্রীদের কেউ কেউ ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হলেও, কুলীনরা সেজন্য বিচলিত হতেন না। বিধর্মবাগীশ, সুধীরকে কলেন, "অহে ভায়া হে, কুলীনের ছেলেদের এতে অযশ হয় না। ঐ যে শাস্ত্রে লিখেছে 'তেজীয়সাং নদোষায় বহেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" (১ম অংক) কৌলীন্যের এই নৈরাজ্যে, অপরদিকে অনেকের জীবনে চির কুমারত্বই সম্বল হয়ে থাকতো। অনূঢ় কৌতুক

www.pathagar.com

বলছেন, 'হুঃ এমনি হয়েছে ঘোর কলি, কারও দুধে চিনি কারও শাকে বালি, কেউ বিশ, পঞ্চাশটা বিয়ে কচ্চো, কারও প্রজাপতির গন্ধও একবার গায়ে লাগলো না।' (৩য় অংক)

সমাজে তখন সতীদাহ প্রথা রহিত। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার ফলে দু'চারটে বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হলেও, সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক হারে তার প্রচলন শুরু হয়নি। বিধর্ম'বাগীশের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সুধীর জানান, 'একটি স্বামীর মৃত্যু হলে ‥‥ ৫০/৬০টি স্ত্রী সকলেই বিধবা হলো, ‥‥ পূর্বে' সহগমন প্রথা ছিল, এক্ষণে তা নাই, বিধবা বিবাহও সাধারণে চলিত হয়ে আজও ওঠে নাই, ঐ ৫০/৬০টি স্ত্রীর দেহ বৈধব্য দাবানলে যে দিবা-নিশি দগ্ধ হতে লাগলো।' (১ম অংক) দু'চারটে বিধবার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়াতেও চন্দ্রকলার মতো কুলীনের স্ত্রীরা আশান্বিতা— স্বামীর মৃত্যু হলে, এখন আর তাদের ভাববার কিছু নেই। নির্মলার বিধবা হওয়াটাকে চন্দ্রকলা ভাগ্য সুপ্রসন্নের ব্যাপার বলেই মনে করেন, 'তা তোর ভাই অদেষ্ট সুপ্রসন, আহা কেমন দুখুনি হাত তেল পারা, বেশ, আমার কপালে তা ঘটে কৈ? আর তা হলেও আবার সুবিধেও আছে, বিধু এই ফাগুণ মাসে রাঁড় হয়ে ছিল এর মধ্যে সেদিন তার আবার বিয়ে হয়ে গেল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেন নির্মলা, 'হবে না কেন? ওদের যে বাড়ি ভাল। ওরা তো আর হাপা জুজুর ভয় করে না, যা মনে কচ্চো তাই কচ্চো, আমাদের কি তা হবার যো আছে? (২য় অংক)

বহু বিবাহ নিবারণ ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন নিয়েও তখন সমাজে প্রচেষ্টা চলছিলো। রক্ষণশীলরা এ দু'টোকেই দেখতেন ঘৃণার চোখে। এখানে গবেশ-বাবু ও অন্যান্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

বহু বিবাহ নিবারণী সভা সম্বন্ধে:

গবেশ। '‥‥ স্ত্রী পুত্র সত্তেব কি বিবাহ কর্তে পারা যায় না?

বিধর্ম্ম। কেন পারা যাবে না? স্বচ্ছন্দে। বিবাহ ওটা রাগপ্রাপ্ত বৈত নয়, ইচ্ছা হলেই বিয়ে করা যেতে পারে।

গবেশ। তবে ঐ যে গ্রামে একটা কি সভা হচ্চো।

বিধর্ম্ম। রেখে দিন সভা, যত বেটা ভন্ড একত্র হয়েছে। কৈ কোন শাস্ত্রেতো তার নিষেধ নাই।'

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে:

সুধীর। 'বাবু (গবেশ) দেশের ধর্ম্ম রক্ষা কচ্চোন একি সঙ্গত কথা?

বিধর্ম্ম। তা নয়? তুমি বলো কি? ‥‥ গ্রাম মধ্যে যে একটা অধর্ম্মের অংকুর স্বরূপ স্ত্রী বিদ্যালয় হচ্ছিল, তাহলে এতদিন যে একার্ণব

www.pathagar.com

হয়ে উঠ্‌তো, ভাগ্যে বাবু সে বিষয়ে লেগেছিলেন তাতেই তো হতে পেলে না।

সুধীর। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধকতা করায় কি দেশের ধর্ম্ম রক্ষা হয়েছে ?

বিধর্ম। 'স্ত্রীজাতি লেখাপড়া করবে এইটেই বুঝি তোমার মতে ধর্ম্ম ?' (১ম অংক)

দম্ভাচার্যের মতো স্বার্থান্বেষী দলপতিরা সেদিন এই সুযোগে সমাজের মধ্যে এক হীন দলাদলির রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। দম্ভাচার্য নিজেই তাঁর সেই রাজত্বের পরিচয় দেন এভাবে ঃ

'যখন আপন পক্ষ সব এসে যোটে।
বিষয় বুঝিয়া তবে কথা কই চোটে।।
যেমন গরুর পাল চল্যে যায় গোঠে।
কত শত অনুচর হুকুমেতে ছোটে।।
মুখের কথায় মোরা রাজা উজির মারি।
কি আছে এমন কর্ম্ম না করিতে পারি।।' (৩য় অংক)

দম্ভাচার্যের পিতা পাশের বাড়ির একটি শিশুকে, পুকুরে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সে জন্য দম্ভাচার্য অত্যন্ত মর্মাহত। সুধীর বলেন, এটাতো তাঁর পিতা মন্দ কাজ করেন নি, সুতরাং তা নিয়ে দুঃখ পাবার কি আছে। দম্ভাচার্য উত্তর করেন ঃ

'দম্ভ। ...আরে তুমি জান না শোন না... .. তারা যে আমার শত্রু পক্ষ, মর্চ্ছিল, বেশ হচ্ছিল, তাকে বাঁচানো ?

সুধীর। ও'রা আপনার শত্রু পক্ষ কেন ?

দম্ভ। দলাদলিতেই শত্রুতা আর শত্রুতা কিসে হয় ?

সুধীর। বহুবিবাহ নিবারণী সভা লয়ে যে দলাদলি ?

দম্ভ। হাঁ হাঁ, তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে, জান না কিছু? সত্যশীল মুখয্যে ঐ পাপ সভার অধ্যক্ষ, পুরান বাড়ির ওরা সেই সত্যশীলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ গে খেয়েছে, আমাকে অপমান করেছে, দেখি না চুনোপুঁটি কে কোথা যাবে, গবেশবাবু আমার পক্ষে আছেন, আমি কি ছাড়বো ?' (৩য় অংক)

কিন্তু এই দলপতিরাই আবার অর্থ পেলে সুর বদলিয়ে ফেলতেন—শতো অন্যায় আর পাপকেও তাঁরা তখন ভেবে দেখতেন অন্য নিরিখে। এই প্রসঙ্গে সুধীর ও দম্ভাচার্যের সংকেতপূর্ণ কথাবার্তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেয়া যায় ঃ

'সুধীর। ...ঐ ঢোলওয়ালা বিটোলের বৌ বাজারে যাওয়ার কথাটা ?

১১—

www.pathagar.com

দম্ভ। হাঁ হাঁ বুঝিছি, বৌ বাজারে গিছিল বটে, তা টেঁকশাল দেনা এলে তো পার পেতো না ?

সুধীর। পশ্চিম পাড়ার গর্ভ ?

দম্ভ। তাতে তো গর্ভে লোকসান নাই।

সুধীর। মানিকের বিষয় ?

দম্ভ। মানিক লোক বড় ভাল,.....এই দেখ, সেই দিন এই এত বড় একটি নদীর গাড়ু, আর দুইটি টাকা আমাকে দিলে, তা—তাও বলি, মেয়েটা ছেলেটা কোথায় কি কচ্চো ও সকল তোমাদের অনুসন্ধান করা অতি অন্যায়, তা বল্যে কি এখন বহুবিবাহ নিবারণী সভায় যাবো—না খানা খাবো ?

সুধীর। ... আপনাকে কিছু দিলেই আর দোষ থাকে না ?

দম্ভ। তা থাক্‌বে কেন ? আমি যে দলপতি, প্রায়শ্চিত্ত হলেই পাপ গেল।' (৩য় অংক)

পরে বহুবিবাহ নিবারণী সভা থেকেও সুধীর দম্ভাচার্যকে কিছু প্রাপ্তির আশ্বাস দেন ঃ

'দম্ভ। দেবে বৈকি, তুমি বেঁচে থাক,- এই দেখ বহুবিবাহ নিবারণী সভা যাতে খুব জেঁকে উঠে তাই কর, ওতে বিস্তর উপকার আছে।

সুধীর। এতো আপনি ভাল বুঝেছেন ?

দম্ভ। ভাই, বুঝি সব, কেবল অভিমান বৈ ত নয়।' (৩য় অংক)

নির্মলা বুঝি দম্ভাচার্যের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, "......দম্ভাচার্য, ঐ বিট্‌লে বামুন মরণও নেই, পোড়া যমের অরুচি—হুঃ ঃ দলাদলি করে বেড়াচ্চোন। ঐ যে কথায় বলে্‌ 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁছোর কেত্তন' তাই উনি অবার লোকের জাত্‌ মারেন।" (২য় অংক)

তখনকার সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘিরে একদল চাটুকারও বেশ সুবিধে লুটছিলেন। বিধর্মবাগীশ ও চিত্ততোষের মতো চাটুকাররা ছিলেন যথার্থ অর্থেই 'হস্তি মুখ' এবং 'যে-আজ্ঞা—উপজীবী' মাত্র। কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"গবেশ। শরীর পক্ষে বেড়ানো বিলক্ষণ উপকারী।

বিধর্ম্ম। হাঁ তা বটে, 'শ্রমাদগ্নিস্তুতো বলং'।

চিত্ত। বাবু যা আজ্ঞা কর্‌লেন, তার আর সন্দেহ কি ? বেড়ানোতে শরীর একেবারে নীরোগ হয়, কত শত কানা কুটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আরাম হয়ে গেল আমি চখে দেখিছি মোশাই।

www.pathagar.com

গবেশ। কিন্তু তাও বলি বেড়ানোতে আবার পিত্তিবৃদ্ধি করে।
চিত্ত। আজ্ঞে···। আমি সেদিন একবার ও পাড়ায় বেড়াতে গিছিলাম, বাড়িতে এলে কম বেশ একসের পিত্তি আমার মুখ দে উঠলো। ও কি ভদ্রলোকের কর্ম্ম মোশাই?……

বিধর্ম্ম। অধিক কিছুই ভাল নয় 'সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং।'

অন্যত্র ঃ

গবেশ। আমার এ পুষ্করিণীর জলটুকু বড় মিষ্ট।
চিত্ত। মিষ্ট কেমন, এতে চিনি দিতে হয় না।
বিধর্ম্ম। আপনার পুষ্করিণীর জল ভাল না হবে কেন?
'পুত্ত্রেযশসি তোয়েচ নরানাং পুণ্যলক্ষণং'।

গবেশ। …… মিত্রদের পুষ্করিণীর জলও মিষ্ট বটে কিন্তু বড় ভারি।
চিত্ত। বিলক্ষণ ভারি। ওর এক ঘটী জল কার সাধ্য তোলে?
(সকলের মৌনাবলম্বন ও শোভাদর্শন)।" (১ম অংক)

তখনকার দিনে ইংরেজী শিক্ষা ছিলো অর্থকরী বিদ্যা। আর সেজন্য, অনেক অভিভাবকেরই একমাত্র ইচ্ছে থাকতো তাঁদের পুত্র সন্তানদের ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা। গ্রাম্যের কথার জবাব দিতে গিয়ে নাগর বলেন, 'বিদ্যাকে ভাই? সেই গুরু মোশাহের পাঠশালে শট্‌কে পড়্যেই শট্‌কে পড়িছি, বাবা বললেন আর কেন — বাঙ্গলায় কাজ কি?…… ইংরাজিতে পয়সা আছে, বল্যে ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন।' (৩য় অংক) কিন্তু অনেক সময় যে ভর্তি করাই সার হোত, তার প্রমাণ স্বয়ং নাগরই। তবু তিনি যে ইংরেজী জানেন না এ কথা কে বলবে। কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হোল ঃ

'গ্রাম্য। কেহে নাগর নাকি?
নাগর। … … হেল্লো, গুড্ মরনিং।……
গ্রাম্য। .. … এখন তোমার সে পীড়াটা সেরেছে?
নাগর। হাঁ, এখন আমার হেল্‌থ মচ্ ইম্‌প্রুভ্‌ড বটে, কিন্তু অনেক দিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি তাতে তত ষ্ট্রং ফিল্ কচ্যিনে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্ কর, আমার একটী ফ্রেন্ড আসবে দেখি আস্‌চে কিনা … …

গ্রাম্য। (স্বগত) হরি বোল হরি।.. …
নাগর। না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙ্ক করি, তার সে ডেনুঞ্জর এখনো হ্যাং কচ্চে, … …।' (৩য় অংক)

www.pathagar.com

সেকালের ইংরেজ সাহেবদের অদ্ভুত ঢঙে বাংলায় কথা বলার নিদর্শনও রয়েছে প্রহসনটিতে। বসুজো মশাইর বাড়ীতে ধৃত চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে হাকিম সাহেব বলেন, 'তুমি কে আছো, তোমার নাম কি আছে, তোমার ঘর কোথা থাকে, কেন তুমি চুরি করিতে গেলো, তুমি বড় বুরা কাজ করেছে, আমি তোমাকে মেয়াদ দেবে' ইত্যাদি। (৩য় অংক)

চার

রামনারায়ণের শেষ দুটো একাংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার প্রহসন 'উভয় সংকট' ও 'চক্ষুদান' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। উভয় সংকটে বহু বিবাহের সমস্যা এবং চক্ষুদানে লাম্পট্য ব্যাধি ও তার পরিণামের বর্ণনা রয়েছে। এ দুটো প্রহসনও অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৬]

উভয় সংকটের নায়ক 'কর্তা' বাবুর দু' স্ত্রী। প্রাত্যহিক জীবনে একমাত্র কলহই তাঁদের সম্বল। ছোট বউ পাড়ায় কোথাও বেড়াতে বেরোলে, বড়ো বউ তাঁর নামে কুৎসা রটান, বড়ো বউ রান্নার আয়োজন করলে ছোট বউ সবকিছু বাইরে ফেলে দেন। অপরদিকে সুযোগ পেয়ে বড়ো বউও ছোট বউয়ের ডালের পাতিল ভাঙতে ছাড়েন না।

এমতাবস্থায় কর্তার বড়ো দুর্দিন। সারা দিনের কাজ শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে বাড়ী এসেও তিনি খেতে পান না। অনন্যোপায় কর্তা শেষ পর্যন্ত ঘরে যা আছে, তাই দিয়েই কোন রকমে ক্ষুধা নিবৃত্তির আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এনিয়ে শ্রীমতিদের মধ্যে ভীষণ কলহ —বড়ো বউ চান চিড়ে খাওয়াতে, কিন্তু ছোট বউ কোন মতেই স্বামীকে ছাতু না খাইয়ে ছাড়বেন না।

কর্তার অবস্থা ততোক্ষণে সঙিন হয়ে পড়েছে। সব ফেলে, তিনি শুধু এখন একটু বিশ্রাম নিতে চান। শুরু হয় আবার কলহ – দু' বউই সমানে চান কর্তার পা টেপতে, পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করার পক্ষে কেউই নেই। অবশেষে দু' জনেই কর্তার দুটো পা ভাগ করে টেপতে শুরু করেন। কিন্তু তাতে সেই চরণ-সেবা ক্রমে ক্রমে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পেঁাছোয় যে, কর্তার প্রাণ তখন ওষ্ঠাগতই আর কি।

প্রহসনের এ কাহিনীটিতে বহু বিবাহের পরিণাম সতীন—কলহ ও দাম্পত্য জীবনের চরম অশান্তির চিত্র বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠেছে। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন, 'আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে অহেতুক আতিশয্য এবং অবিশ্বাস্য নির্মমতা নাই। রহস্য-মধুর ঘটনার মধ্য দিয়া সমস্যাটির উপর পরিহাস—

www.pathagar.com

স্নিগ্ধ আলোকপাত করা হইয়াছে।...... বড়বৌ ছোটবৌ এবং গয়লানী তিনটি চরিত্রই বাস্তবধর্মিতায় উজ্জ্বল।'[৩৬] প্রহসনটিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে যে, কর্তা কৌলীন্যের আশীর্বাদ নিয়ে নিতান্ত আর্থিক লোভে, অথবা তরুণী ভার্যা গ্রহণের আগ্রহাতিশয্যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। প্রথমা স্ত্রী সুস্থাবস্থায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি নিঃসন্তান—আর সেজন্য, অর্থাৎ একান্তভাবে সন্তান লাভের প্রত্যাশা নিয়েই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু বহু বিবাহ যে বহু বিবাহই, শতো সদিচ্ছা বা মানবিক কারণের কৌলীন্যেও যে তা শুভ্র-সুন্দর হয়ে ওঠতে পারে না, কর্তা-মশাইও তাঁর দু'স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনই এর প্রকৃষ্ট উদারহণ। এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত গোস্বামীর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'দাম্পত্য অংশীদারদের মধ্যে কোনো কু-প্রবৃত্তি না থাকলেও এমন কি সদিচ্ছা থাকলেও শুধুমাত্র অংশীদারের সংখ্যাবৃদ্ধি কিভাবে দাম্পত্য অশান্তি সৃষ্টি করে তার একটি অবকাশ সৃষ্টি করে বহু বিবাহের মৌলিক দিকটির প্রতি লেখকের কটাক্ষপাত প্রহসনটির মধ্যে লক্ষণীয়।'[৩৭]

বৈবাহিক জীবনে সন্তান লাভ করার মধ্য দিয়েই নারী-জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। বড়ো বউয়ের জীবনে সে সার্থকতা আসেনি। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বামীর ভাগ দিতে হবে অন্য কাউকে? গয়লানীকে তিনি বলেন, 'স্বামীর ভাগ দেওয়া বড় কঠিন দিদি আমার ভাগ্যে তাও ঘটেছে।'[৩৮] স্বামী যে নিতান্ত বংশ রক্ষার্থেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন, বড়ো বউয়ের কাছে তার মূল্যইবা কি: 'হুঃ বড় সাধ করে আবার দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করা হয়েছে, বড় আম্মা, ছেলে হবে, বংশ রক্ষা হবে—ওরে পোড়া কপালে, যদি তা হতো তোর অদৃষ্টে থাক্‌তো, তা হলে কি আমার পেটে হতো না?' স্বামীর পরেই নারীর আর এক দুর্বলতা বুঝি গৃহের কর্তৃত্বের প্রতি। কিন্তু সতীনের বিষ-বন্যা যে সব কিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়—বড়ো বউয়ের আক্রোশ সে জন্যও কম নয়। আর ছোটো বউই বা সব কিছু চোখ বোজে সহ্য করবেন কেন? এই সংসারের প্রয়োজনেই তো তিনি এসেছেন—সুতরাং তাঁর মূল্যই বা কম কিসে? বড়ো বউকেই বা সমীহ করে চলার জন্য এমন গরজ তাঁর কি ঠেকেছে। কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'ছোট। ......ওগুলো আবার কি? ওবুঝি গিন্নীর গিন্নীত্ব ছড়ান হয়েছে, গিন্নি পোলা দেখে দেখে আর বাঁচিনে, পোড়া যমের অরুচি, উনি আবার গিন্নী,......

বড়। আমি তরকারীগুলি কুটে রেখেছি দূর করে ফেলে দেওয়া? এত বড় স্পর্দ্ধা মেয়ে মানুষের?

www.pathagar.com

ছোট। তুমি কি মন্দ মানুষ ? তুমি ওকি করলে ?
বড়। ও থোপপড়া ডাল চড়ান হয়েছে কেন ?......আমাকে জিজ্ঞাসা নাই, বাদ নাই।
ছোট। আমাকেই কোন্ তুমি জিজ্ঞাসা করেছ ?...... কাঁচা তেতুল কখানি কতো করে পাড়িয়ে আন্‌লেম বলি ডালদে রাঁদবো, তা বেশ করেছ, ... তেতে পুড়ে আসছেন এসে এখন উনোন থেকে তুলে তুলে খাবেন। ...
বড়। আর আমার উপর আত্তিশ্রদ্ধায় কাজ নাই, ঢের হয়েছে।
ছোট। যেমন কচ্যো তেমনি পাচ্যো, আত্তিশ্রদ্ধা তোমার তো আমার উপরে যথেষ্ট তাঁর উপরেও যথেষ্ট।'

বহু স্ত্রীর এরূপ সংসারে স্বামী বেচারার ভাগ্যে বুঝি যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কর্মক্লান্ত কর্তা দু'স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও 'এক ঘটী পা ধোয়ার জল' পান না।

"কর্তা। ... একি রকম সংসার ? মানুষ টো প্রাণান্ত করে এলো, দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই। বলি ও বড় বৌ, ওকি ও, চুপ্ করে বয়ে রৈলে যে।
বড়। .. .. বল না তোমার সোরাণীকে, পা ধোয়ার জল দিন্, দুটো মিষ্টি কথা বলে তুষ্টু করুন, আমাকেই কেন ?
কর্তা। ... ...ও ছোট বৌ—
ছোট। কি বল্‌বে বল না শুন্‌তে তো পাচ্যি, হুঃ আমার বাপ মা তো আর মেয়ের বে দেবার জায়গা পায় নাই। দাসীপনা করতে করতেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল। আবার পা ধোয়ার জল দিতে হবে ?"

হতাশায় ভেঙে পড়েন কর্তা। এর পর বুঝি আর কাশী যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তাঁর। কিন্তু তাতেও যে নিষ্কৃতি মেলা ভার—

"কর্তা। ... ... এত কাঁচ্য বলি পরিবারগুলো কোন মতে ক্লেশ না পায়; মাথায় মোট করে আন্‌চি বলি ওরা ভাল থাকলেই আমি ভাল থাক্‌বো, তা তোরা অমন করে মরিস্ কেন ? ভগবান কি সুখে থাক্‌তে দেন নাই তোদের। ... ... আমি কাল শ্বকালে হারাধনকে ডেকে বল্‌বো আমার যা আছে বিষয় আশয় বেচে কিনে দিক্, আমি কাশী যাই, ...।
বড়। ঐ যাবে যাবে অনেক দিন্‌তো কচ্যো, যায় কৈ ? গেলে তো বাঁচি, আমি সঙ্গে যাই।
ছোট। হাঁ তা ক্ষতি কি ? আমাকে তবে বনবাস দে যাও, ... ।"

প্রহসনের শেষাংশে বড়ো বউ আর ছোটো বউ কর্তাকে যাঁর যাঁর ঘরে

www.pathagar.com

নেয়ার জন্য, যেভাবে টানাটানি শুরু করে দেন, তাতে নব নাটকের বসুজো মশাইর দুরবস্থার চিত্রটি আর একবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে :

"কর্তা। ওকি ? প্রাণ যায় যে, একি !......গেলেম যে।..... অরে তোরা না হয় আমাকে অর্দ্ধা-অর্দ্ধি করে কেটে ভাগ করে নে।

বড়। সেও বরং ভাল।

ছোট। ভাগের ভাতার বিষম জ্বালা।

কর্তা। তাতেও প্রস্তুত, অ্যাঁ ! বলে কি ? এদের শরীরে দয়া ধর্ম নাই। হা ভগবান, আমার অদৃষ্টে এতদূর লিখেছিলে !!!'... ...

কিন্তু এতো কিছুর পরও, কর্তার মতো স্বামীদের দুর্বলতা যে ছোটো বউয়ের প্রতিই বেশি থাকা স্বাভাবিক, তার প্রমাণও মেলে প্রহসনটিতে। ছোটো বউ বড়ো বউয়ের রান্নার সামগ্রী ফেলে দিয়েছিলেন, বড়ো বউ ভেঙে ছিলেন ছোটো বউয়ের ডালের পাতিল। কর্তা মশাই ছোটো বউকে কিছু না বললেও, বড়ো বউকে লক্ষ্য করে বলেন, 'অ্যাঁ এ কি ! এতদূর রাগ। ও এক কর্ম্ম যদি না বুঝেই করে ফেলেছে ; হাজার হোক ছেলে মানুষ—আর দোষই বা কি দিব, মাছ নাই, শুটো তরকারিগুলো যেন ফেলেই দেছে—তা ওর উপর রাগ করে তোমার কি এতদূর করতে হয় ? হাঁ বড়বৌ, ছি ! ছি ! ছি !' বড়ো বউ কর্তাকে চিড়ে খাবার জন্য ধরেছিলেন, ছোটা বউ চাচ্ছিলেন ছাতু খাওয়াতে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে ছাতু আনতে যাওয়ার সময় ছোটো বউয়ের পা লেগে দুধের বাটী পড়ে যায়। কর্তা বলেন, 'দৈবাৎ হয়েছে তা আর কি হবে। বড়বৌ, দুধ পড়ে গেল তবে আর চিঁড়ে এনে কায নাই, ছাতুটাতু যা হয় আনুক।'

গয়লানীর মতো নারীরা সেদিন পাড়ায় ঘুরে, শুধু অন্যের ঘরের কলহকে বাড়িয়ে দিতেই সাহায্যে করতেন। ছোটো বউকে বাড়ীতে না দেখে গয়লানী জানতে চান, তিনি কোথায়। বড়ো বউ বলেন, 'ও খাঁচা ভাঙ্গা সালিক...... কোথায় গে বেরিয়ে বসে রয়েছে, ওর কি ভয় ডর আছে ?' গয়লানী যেনো সুযোগ পেলেন, 'সেকি বড় দিদি ঠাকুরণ ! এ কথাটি ভাল শুনিলেম না, তিনি সমর্থ মেয়ে, তাতে বৌ-মানুষ, তাঁর এখানে ওখানে যাওয়া কি ভাল দেখায় ? ছি ছি ছি !' গয়লানী জানেন, এই সময়ে বড়ো বউয়ের আপনজন হওয়ার মোক্ষম অস্ত্র, একমাত্র এটাই। গয়লানীর আশা যে পূর্ণ হয়েছে, তার প্রমাণ বড়ো বউয়ের কথাতেই মেলে, 'এই দিদি, তোর বেটা এসে হোক, জন্মাইতিহ—এখন আমার মুখে ঝাটা মার, আমি কি অসঙ্গত বলি ?'

সেকালে 'কুলীনে পড়া'র মতো 'সতীনে পড়া'ও প্রায় প্রবাদের মতো হয়ে গিয়েছিলো। এই সতীনে পড়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, সেদিন অনেকেই বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র পড়তেন এবং পুজার্চনাও সম্পন্ন করতেন।

www.pathagar.com

গয়লানীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বড়ো বউ দুঃখ করে জানান, 'ও জন্মান্তরের পাপের ভোগ বৈ ত নয় কত গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা করেছিলেম তারই ফল, নইলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আমি কি কসুর করেছিলাম। শেজুতি পুজো করিছি, আলপনা পুজো করিছি, কত মন্ত্র-তন্ত্র পড়িছি, কত প্রার্থনা করিছি, বলি হে ঠাকুর; আমাকে যেন সতিনের জ্বালায় পুড়তে না হয়,… …কিন্তু আমার কেমন পোড়া কপাল 'যেথায় বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়, … … !'

চক্ষুদানের নিকুঞ্জবিহারী লম্পট ও মাতাল—উপপত্নী আর বেশ্যাদের নিয়েই তাঁর জীবন। স্ত্রী বসুমতীর জীবন চরম দুঃখ আর লাঞ্ছনায় ভরা। মেয়ের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়ায় বসুমতীর মা চিন্তান্বিতা। তিনি নাপ্তে বউকে মেয়ের যাবতীয় খবরাখবর নিয়ে আসার জন্য জামাতার বাড়ীতে পাঠিয়েছেন। নাপ্তে বউ সেখানে গিয়ে ধীরে আস্তে বসুমতীর সমস্ত দুঃখের কথাই অবগত হন।

একদিন বসুমতী আর নাপ্তে বউ নিকুঞ্জবিহারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফন্দি আঁটেন। ঠিক হয়, অনেক রাত্রে নিকুঞ্জবিহারীর ঘরে ফেরার সময় হলে, নাপ্তে বউ পুরুষ সেজে বসুমতীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে থাকবেন, অবশ্য, প্রধান ভূমিকাটি থাকবে বসুমতীরই।

যথা সময়ে নিকুঞ্জবিহারী বাড়ী এলেন। কিন্তু একী, ঘরে যে এখনো আলো জ্বলছে? আতর গোলাপের গন্ধে চারদিক মোহিত। জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখেন নিকুঞ্জবিহারী। বিছানায় ফুলের মালা? সুসজ্জিতা বসুমতী পানও সাজাচ্ছেন যেনো—পাশেই একজন পর পুরুষ আবার অভিমান করে বসে আছেন।

ক্রোধান্ধ নিকুঞ্জবিহারীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই পর পুরুষটি ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করেন। নিকুঞ্জবিহারী স্ত্রীকে ভীষণ ভর্ৎসনা করে এর কারণ কি জানতে চান। বসুমতী সবই অস্বীকার করেন। বিহারী বাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ঘরের কোণের সেই পুরুষটিকে সজোরে চেপে ধরেন। নাপ্তে বউ তখন তাঁর 'পুংবেশ পরিহার' করেন। বিহারীবাবু বিস্মিত : 'এ কি? ব্যাপারটা কি? স্ত্রীলোক যে? সেই মাধবপুর থেকে এসেছিল সেই নাপ্তে-বৌ না? এ কি রে? বসুমতী তখন স্বামীকে সব কথা খুলে বলেন। এতে নিকুঞ্জ-বিহারীর মনে নিজের কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা জাগে—এবং তিনি তখন চক্ষুপ্রাপ্ত হন।

কাহিনীটিতে তৎকালীন সমাজের অন্ততঃ দুটো জিনিস সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে—প্রথমতঃ নিকুঞ্জবিহারীর মতো লম্পটদের যথার্থ স্বরূপ, এবং দ্বিতীয়ত বসুমতীর মতো স্ত্রীদের দুর্বিষহ মর্মযাতনা। নিকুঞ্জবিহারীর অবস্থা 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজ্‌গা'র মতো। তাঁর স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

তিনি শুধু উপপত্নী আর বেশ্যাদের নিয়েই ব্যস্ত। তবু তিনি সাধু থাকতে চান—স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে চান ছল-চাতুরী আর প্রতারণা দিয়ে। একদিন অনেক রাতে নিকুঞ্জবিহারী তাঁর লাম্পট্য-পর্ব শেষ করে বাড়ী ফিরেছেন—স্ত্রী বসুমতী তখন ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে—

'নিকুঞ্জ। (স্বগত) এই যে ঘুমুয়ে পড়েছে. বাঁচা গেল, তিরস্কারের হাত এড়ালেম। আস্তে গিয়ে শুয়ে ঘুমুই, রাত্রি অনেক হয়েছে ··· ।

বসু। ··· কোথা ছিলে এতক্ষণ বল দেখি ?

নিকুঞ্জ। না, আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

বসু। ··· ভেবেছ আমি বুঝি ঘুমুয়িছি ?

নিকুঞ্জ। নানা, ঘুমুবে কেন ? রাত্রিতো এখনো অধিক হয় নাই।

বসু। ···· ঐ ঘড়ি দেখ দেখি, দুটো বেজেছে কি না ?

নিকুঞ্জ। ও ঘড়ি রং।

বসু। ঘড়ি রং না তোমাতেই রং বাড়্চে।

নিকুঞ্জ। কেন কেন ? আমি তো কোথাও যাই নাই, তোমার দিব্যি, আমার আর সে সব দোষ নাই।

বসু। সে সব দোষ নাই তবে আবার কোন্ দোষ ধরেছে।

নিকুঞ্জ। না, দোষ কি, বড় গর্মী তাই বাইরে ছিলেম একটু।

বসু। এই পৌষ মাসের শীতে তোমার এমন গর্মী হয়ে ওঠেছে !

নিকুঞ্জ। না না, তা নয়, আমি যথার্থ কথা বলি, আজ রক্ষাকালী পুজো ও পাড়ায়, তাই যাত্রা শুন্‌ছিলেম।'[৩১]

নিকুঞ্জবিহারীর মতো স্বামীরা অনেক সময় লাম্পট্যপনায় তাঁদের অধিকার রয়েছে বলেও মনে করতেন। কিন্তু সেই অধিকারের প্রশ্নটি, তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে কখনো বিন্দুমাত্র উঠলেও, তাঁরা তখন ক্রোধে কান্ড-জ্ঞানহীন হয়ে পড়তেন—এমনকি স্ত্রী হত্যা করার কথা ভাবতেও দ্বিধা করতেন না। নিকুঞ্জবিহারী অন্য একদিন গভীর রাতে বারাঙ্গনালয় থেকে ফিরেছেন। ঘরে তখন বসুমতী পুরুষ-বেশী নাপ্তে বউয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছেন ঃ

নিকুঞ্জ। (দেখিয়া সক্রোধে স্বগত) কি এত বড় যোগ্যতা। পাপীয়সী কচ্যে কি ? কি কুপ্রবৃত্তি ! অ্যাঁ, একটা পর-পুরুষ ঘরে এনেছে। ওকে এখনিই সংহার করবো—তার পর একেও,··· ··· (নিরীক্ষণ)

নাপ্তে। ভাল, আমি ভাই এট্টি কথা বলি, তুমি যে আমাকে এত আদর কচ্যো এর মধ্যে যদি তোমার স্বামী এসে উপস্থিত হয়।

বসু। ··· ···তায় ভয় কি ? তিনি জানেন।

www.pathagar.com

নিকুঞ্জ। (স্বগত) কি ? পাপীয়সী, দুরাচারিনী বলে কি ? ও কুকর্ম্ম করে আমি জানি ? (১ম অঃ ২য় পঃ) পরে, সব ঘটনা ব্যক্ত হয়ে পড়লে, স্ত্রীর নিকট নিকুঞ্জবিহারীর অভিব্যক্তিটি এরূপ : 'তুমি পরপুরুষ ঘরে এনেছ দেখে আমায় যে ক্রোধান্ধ হয়েছিল আত্মশিরচ্ছেদন তার অকিঞ্চিৎকর, জগত সংসারকে একেবারে সংহার করলেও তার নিবৃত্তি হয় না, .. ।'

লম্পট স্বামীদের একটানা অবিচার-অত্যাচারে তাঁদের স্ত্রীরা যে নরক-যাতনা ভোগ করতেন, তা নিয়েই বুঝি সারাটি জীবন শুধু তাঁদেরকে গুমরে মরতে হয়েছে। যে স্বামী-প্রেম নারীজীবনে একমাত্র কাম্য, যার কাছে অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য অতি তুচ্ছ, সেই স্বামীই যদি লাম্পট্যপনা আর মাতলামি করে স্ত্রীকে ভুলে থাকতে চান, তাহলে আর বেঁচে থাকার অর্থ কি ! নাপ্তে বউয়ের স্বামী তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসেন শোনে বসুমতী বলেন, 'তবে ভাই, তোর চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কে আছে ? এ দানা সোনায় কাজ কি, এঘর বাড়িতেই বা কি দরকার। ভাল খেতে পত্তে চাইলে, দিনান্তে বা (১ম অংক) দুদিন অন্তর যদি শাকান্ন পাই, গাছ তলায় শুই, সেও ভাল কিন্তু যদি স্বামীর সোহাগে থাক্‌তে পাই।' নিকুঞ্জবিহারীর মতো একটি লম্মট আর মাতাল স্বামীর হাতে পড়ে বসুমতী যে কতোটা হতাশ আর অসহায় হয়ে পড়েছেন, আত্মগ্লানির ধিক্কারে তিনি যে কতোটা জর্জরিত, তার প্রমাণ মেনে নিম্নোদ্ধৃত সংলাপগুলোতেও :

"বসু। এই আটপর রাৎ একা পড়ে থাকি, এইদিন, এই কাল, অমনি ফেলে চলে যায়। নাপ্‌তে বৌ, তোর কাছে বেশী কথা বলবো কি ? তুইতো মেয়ে মানুষ, সকলি জানিস, ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দি কি বিষ খেয়ে মরি, আর ভাই যাতনা সইতে পারিনে, কত লোক মরে আমার অদৃষ্টে মৃত্যুও নাই। .. ...

নাপ্তে। ......রেতের মধ্যে আর ঘরে এসেন না ? ... ...

বসু। পূর্ব্বে আদতেই আসা হতো না, এখন দেখতে পাই অনুগ্রহ করে রাত্রি দুটো আড়াইটের পর আসা হয়, তা সে আসায় কাজ কি ভাই, এসে চক্ষু বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে ভোর হয়ে পড়ে।" (১ম অংক)

এরূপ অসহ্য-অসহায় অবস্থায়ই বুঝি কোনো কোনো স্ত্রী স্বামীকে বশে আনার জন্য, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধপত্র ব্যবহারের কথা ভাবতেন। 'মজুমদারদের বৌ' একদিন দুধের সঙ্গে এরূপ ঔষধ মিশ্রিত করেও নারীত্বের দুর্বলতার জন্যই তা আর শেষ পর্যন্ত স্বামীকে খেতে দিতে পারেন নি। সে দুধের বাটীতে নাকি পরে আস্ত একটা কচ্ছপ জন্ম নিয়েছিলো। স্বামী লম্পট হোন আর যাই হোন, হিন্দুনারীর নিকট যে কত পরম গুরু, এই দুর্বলতা

www.pathagar.com

টুকনু চৌধুরী বাড়ীর বউয়ের মতো বসুমতীর মধ্যেও বর্তমান। আর সেজন্যই তিনিও বলেন, 'স্বামী পরম গুরু, মনে মনে জানি, ভক্তিও আছে, কিন্তু যাতনাতে এখন মুখে যা এসে তাই বলি, গালি মন্দ দি, এতেওতো কিছু করতে পারলেম না।...' (১ম অংক) বসুমতীর এই ট্র্যাজেডিই বুঝি উনিশ শতকের সকল লম্পট আর মাতালের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিলো।

তথ্য-নির্দেশ

১ সুশীলকুমার দে, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাহার নাট্য গ্রন্থাবলী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৮, পৃঃ ৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫, ১৭৬ ও ১৮১ দ্রষ্টব্য।
অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৬৭-৭০ দ্রষ্টব্য।

৩ বৈদ্যনাথ শীল কুলীন কুলসর্বস্বের আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু এর কোনোটিকেই স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে—"রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকখানি নাটকও নহে, প্রহসনও নহে, কিন্তু গ্রন্থখানির মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করা হইয়াছে।"—বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৭৫।

৪ সমসাময়িককালের পত্রিকা—হিন্দু প্রেট্রিয়ট (১৯ই মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ) কুলীন কুলসর্বস্বকে প্রহসন বলেই উল্লেখ করেছেন: "Friday, the 13th March......The EDUCATIONAL GAZETTE states that the well-known farce of Koalino Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success."—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী (আলোচনা),' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৮, উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬। জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর 'সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে 'বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত কতকগুলো প্রহসন'-এর আলোচনা করতে গিয়ে, প্রথমেই 'নব নাটক'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯ দ্রষ্টব্য।

৫ তিনি তৎকালীন সমাজে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

৬ সুশীলকুমার দে লিখেছেন 'এই নাটকটি......তৎকালীন সমাজ বিশেষের চিত্র স্বরূপ......। বাঙ্গালা ভাষায় সামাজিক বিষয় লইয়া এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা, ইহা ঠিক নাটক না হইলেও, সামাজিক রঙ্গচিত্র হিসাবে সুন্দর হইয়াছে,।'—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৭ হংসনারায়ণ ভাট্টাচার্য, বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ৩২।

৮ এখানে বিশেষ করে নীলমণি পালের 'রত্নাবলী-নাটিকা' (১৮৪৮ খ্রীঃ), যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস,' (১৮৫২ খ্রীঃ), তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রীঃ), হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্র বিলাস' (১৮৫২ খ্রীঃ)-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রহসনের

www.pathagar.com

মধ্যে 'হাস্যার্ণব' (১৮২২ খ্রীঃ), রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুক সর্ব্বস্ব' (১৮২২ খ্রীঃ) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৩ অথবা ১৮৫৪ খ্রীঃ)-এর নাম জানতে পারা যায়।

৯ আশুতোষ ভট্টচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১০ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-এর প্রথম অভিনয় হয় কোলকাতার চড়কডাঙ্গা স্টীটের জয়রাম বশাকের বাড়িতে—১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। এর তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' (১৩ই চৈত্র, ১২৬৪ সাল) লেখেন: "১০ই চৈত্র গদাধর শেঠের ভবনে, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের তৃতীয়বার অভিনয় হয়। রঙ্গ ভূমি সাতশত লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দর্শক ছিলেন।"—হরিহর শাস্ত্রী, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর,' বঙ্গ সাহিত্য, ১ম বর্ষ, মাঘ-চৈত্র, ১৩২৯, উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৯। এর পরবর্তী একটি অভিনয়ের কথাও সংবাদ প্রভাকরে (৯ জুলাই, ১৮৫৮) প্রকাশিত হয়েছিলো: 'বিগত শনিবার রজনীযোগে চুচুড়া নগরস্থ নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের ভবনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এই উপলক্ষে প্রায় নয়শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন..." —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৪৬, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৯।

১১ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭৫।

১২ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃঃ ৩৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য।

১৩ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃঃ ৩৬।

১৪ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদার কালীচন্দ্র রায় 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি পত্রিকায় 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনার জন্য যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ:

'বিজ্ঞাপন

৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পারিতোষিক

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌরীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সংকল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।'

১৫ রামনারায়ণ তর্করত্ন, 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব,' আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, (গ্রন্থাকারের জীবিতকালীন শেষ সংস্করণ অর্থাৎ পঞ্চম সংস্করণ, ১৮৭৯ খ্রীঃ, হতে মুদ্রিত), কলিকাতা, ১৯৫৯ খ্রীঃ, বিজ্ঞাপন।

১৬ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৩৫ খণ্ড, মাঘ, ১৭৭৬ শকাব্দ, পৃঃ ২৫৭-৬১।

১৭ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।

১৮ "নাট্কে রামনারায়ণ", প্রবাসী, ৩১ ভাগ, ১ম খণ্ড, আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃঃ ৭৫৬।

১৯ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯০।

২০ কুলীন কুলসর্ব্বস্ব, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ১১।

২১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।

২২ পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন, কলিকাতা, ১৩৮২, ভূমিকা, পৃঃ খ-ন।

www.pathagar.com

২৩ প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১৩৫।

২৪ বাংলা সাহিত্য নাটকের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ১১১।

২৫ রামনারায়ণ তর্করত্ন, 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল', দ্বিতীয়বার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১২৭৯ সাল, ১ম অঙ্ক।

২৬ সুশীলকুমার দে, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।

২৭ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৯।

২৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা,' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টত্রিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮, উদ্ধৃত, পৃঃ ২০৭।

২৯ বাংলা ভাষা ও বাংলা সহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩।

৩০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৬।

৩১ 'নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকো বাসিবাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ মাস অভিনয় হয়।'— প্রিয়রঞ্জন সেন, "নাটকে রামনারায়ণ," প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৩।

৩২ সোমপ্রকাশ, ২৮ জানুয়ারী, ১৮৬৭।—উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৭-২০৮।

৩৩ রামনারায়ণ তর্করত্ন, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক, কলিকাতা, ১৭৮৮ শকাব্দ (১২৭৩ সাল), ১ম অঙ্ক।

৩৪ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

৩৫ সুশীলকুমার দে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২ দ্রষ্টব্য।

৩৬ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

৩৭ সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৪।

৩৮ রামনারায়ণ তর্করত্ন, উভয় সঙ্কট, কলিকাতা, ১২৭৬ সাল। প্রহসনটি এক অঙ্কেই সমাপ্ত। সুতরাং উদ্ধৃতির পরে, এর আর উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

৩৯ রামনারায়ণ তর্করত্ন, চক্ষুদান, কলিকাতা, ১২৭৬ সাল, ১ম অঙ্ক।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মাইকেল্ মধুসূদন দত্তকে নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিলো। এই অনুপ্রেরণার সূত্রপাত, রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করা ও তার সাফল্যজনক অভিনয়-দর্শনের মধ্য থেকে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হলো তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক, ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তা অভিনীত হলো মহা সমারোহের সঙ্গে সাফল্যজনকভাবে। নাটকটির ইংরেজী অনুবাদও তাঁকে করতে হলো, এবং সেজন্যও তিনি সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে পেলেন পারিতোষিক এবং প্রচুর আর্থিক সাহায্য।

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠা নাটকের মহড়া চলাকালীন সময়ে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অভিনয়োপযোগী প্রহসনের অভাব অনুভব করেন, এবং ১৮৫৯ খ্রীস্টব্দের ৮ই মে তারিখে তিনি মদুসূদনকে জানালেন, "I am tbinking of some domestic farces to fallow immediately after the first repersentation of the 'Shermistha' and before it is repeated, Just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both the same time and with the same actors.'

মধুসূদন লিখলেন—প্রহসনের নাম 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রহসন দুটো পাইক পাড়ার রাজাদের ব্যয়েই প্রকাশিত হলো। অভিনয়ের প্রস্তুতি হিসেবে শুরু হলো মহড়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অভিনয় আর অনুষ্ঠিত হলো না। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন. "It is true that the two farces 'একেই কি বলে সভ্যতা' and 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' were written by our friend Micheal for the Belgachia Theatre, but they were not acted there...A few of the 'Young Bengal' class getting a scent of the farce 'একেই কি বলে সভ্যতা?' and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry and choosing for thier leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajas, deputed him to dissuade

www.pathagar.com

them from producing the farce on the boards of their Theatre... The Rajas would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce......one farce exposes the faults and failings of 'Young Bengal' and the other those of the old Hindus, and as the Rajas were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their Theatre'[৩] এতে মধুসূদন ভীষণভাবে মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। এর কিছুটা ইঙ্গিত মেলে ঐ বছরের ২৪শে এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা তাঁর এই পত্রাংশে : 'As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but, to tell you the candid truth, I half regred having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre.[৩] ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর কৃষ্ণকুমারী নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই নাটকটির অভিনয়ের ব্যবস্থা করার জন্য, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করতে গিয়েও, তিনি অতীতের সেই মনক্ষুণ্নতাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারেন নি : 'Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at Belgatchia, and the Chota Rajah ought to do it ... ... Mind you, You all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time. I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese !'[৪]

একই সঙ্গে নব্য ও প্রাচীনপন্থীদের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে গিয়ে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার পক্ষে প্রহসন দুটোর অভিনয়, সম্পন্ন করা সম্ভব হোল না—মধুসূদনও মর্মাহত হলেন। কিন্তু 'বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার অন্যতম।'[৫] —এ প্রহসন দুটো মধুসূদনের মতো একটি বৈপ্লবিক প্রতিভার কাছ থেকে আহরণ এবং নিজ ব্যয়ে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে, বেলগাছিয়া নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে 'সমসাময়িক দুই পুরুষের চরিত্রগত সাধারণ দুর্বলতার চিত্র আঁকা হইয়াছে।'[৬] প্রথমটিতে রয়েছে, নব্যপন্থী কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল প্রকৃতির যুবকের বিপথ গমনের চিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্য করা যায় তথাকথিত আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের প্রতি বিদ্রূপ। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "একদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজ অর্থাৎ ইংরেজি নেশাগ্রস্ত অতি-প্রগতিবাদী সে যুগের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়, অপর দিকে রক্ষণশীল সনাতনীদের অন্তর্ভুক্ত যুগে

www.pathagar.com

ধরা প্রবীণ দলের ভণ্ড প্রকৃতির নেতৃসম্প্রদায়, দুইয়ের সমবায়ে প্রায় তদানীন্তন গোটা সমাজেরই ব্যাধি-বিকৃতির চিত্র এই দুটি রচনার সংক্ষিপ্ত আয়তনে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলন যেমন বিশ্বস্ত, ব্যঙ্গাত্মক রচনার ইঙ্গিত-সংকেতও তেমনি বলিষ্ঠ, ব্যাধিদুষ্ট সমাজের সংস্কারে ও কল্যাণকারিতায় যার অবদান অসামান্য।'[৭] অধ্যাপক ভবানী গোপাল সান্ন্যাল বলেন, 'মধুসূদন বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে যে সমাজচিত্র অংকিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত বাস্তব। ইংরেজী শিক্ষিত, ঐতিহ্য-চ্যুত নব্যযুবকগণ তাহাদের অনাচারে ও অসংযত জীবন-যাত্রায় সমাজের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সংকীর্ণমনা, সংরক্ষণশীল, ধর্ম্মধ্বজা প্রাচীন সম্প্রদায়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থের কৌলীন্য ও ধর্মাচরণ ইহাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মধুসূদন ইহার বাস্তব চিত্র অংকিত করিয়াছেন।'[৮] প্রহসন দুটোর চিত্র এতোই বাস্তব—এতোই নিখুঁত যে তা দেখে সেদিন নব্য ও প্রাচীনপন্থীরা একই সঙ্গে চমকে ওঠেছিলেন, প্রহসনকারকে হতে হয়েছিলো এই উভয় সম্প্রদায়েরই আক্রোশের সম্মুখীন। বর্তমান সময়ের একজন সমালোচক ও এজন্য বিরতবোধ না করে থাকতে পারেন নি প্রসহনগুলি লোক শিক্ষার ভান করেছে। এগুলি সেকালের অজস্র নক্শা জাতীয় রচনার ভিড় বাড়িয়েছে। সমাজের অনাচার উদ্ঘাটন করাই যদি এগুলির উদ্দেশ্য হবে, তাহলে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অনাদৃত থাকবে কেন? 'একেই কি বলে সভ্যতা' দেখে ভয় পাবার কারণ কি? সমাজের কুপ্রথার সমালোচনারও একটি সীমা মানতে হবে, যা ডিঙ্গানো চলবে না।[৯] সমালোচকের এই 'সমাজের কুপ্রথার সমালোচনারও একটি সীমা মানতে হবে'—কথাটা কিন্তু আসলে আপেক্ষিক। যে একেই কি বলে সভ্যতা, কোনো কোনো 'ইয়ং বেঙ্গলের' বাধা প্রদানের ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি, সেই প্রসহন সম্বন্ধেই সমসাময়িককালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বলেন, 'বর্তমানের কুপ্রবৃত্তি সকল নাটক দ্বারা সুন্দররূপ তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন।'[১০] রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন, একেই কি বলে সভ্যতায় 'কলিকাতাস্থ এক নব-বাবুর, সভা করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির ছলে, সুরাপানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 'আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এই-খানি সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।'[১১] আবার যে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখলেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত এমন

www.pathagar.com

সুসামাজিক লোক হইয়াও কি জন্য যে এরূপ অসঙ্গত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্ম্মে রত হইলেও জাতি ভ্রংশকর যবনী সংসর্গে কখনই এরূপ ব্যগ্র হন না। ··· পল্লী গ্রামস্থ জমিদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিত রূপ ভক্ত প্রসাদ কয়জন আছেন ? —কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমিদার সচরাচর দেখিতে পান কি ? —ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লী গ্রাম্যস্থ জমিদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।'[১২] সেই একই প্রহসন সম্বন্ধে মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্র নাথ বসুর বক্তব্য হলো, "মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এবং হানিফগাজি, পাঁচী তেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন কোন স্ত্রী পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল।"[১৩] আসল কথা, 'মধুসূদনের বিপ্লবাত্মক প্রহসন দুইখানি বাংলাদেশ সহ্য করিতে পারে নাই।'[১৪] প্রহসন দুটোর নির্মম বাস্তবতাই তখন নব্য ও প্রাচীনপন্থীদের দস্তুর মতো শঙ্কিত করে তুলেছিলো। কিন্তু দর্পণে নিজের মুখ দেখতে না চাইলেও, এক সম্প্রদায়ের কাছে অন্য সম্প্রদায়ের চরিত্রগুলো ছিলো খুবই স্বাভাবিক ও উপভোগ্য।

একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে মধুসূদন সেদিন সমাজের দুটো বিপরীত কোটী-সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের যথার্থ স্বরূপকে উম্ঘাটন করেছিলেন —এ ক্ষেত্রে রেখে-ঢেকে কোনো কথা বলার মানসিকতা তাঁর ছিলো না। শশাঙ্ক মোহন সেন লিখেছেন, "এই দুটি প্রহসনে মধুসূদন যেন একটা 'দোমুখো' করাত হাতে লইয়া, যুগপৎ বিলাতী সভ্যতার 'বাদরামীকে' এবং দেশীয় হিন্দুয়ানীর ভণ্ডামীকে সরলভাবে কাটিয়াছেন।"[১৫] অন্য একজন সমালোচকও এ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'মধুসূদনের অনায়াস সিদ্ধির মূলে রয়েছে তাঁর সর্বস্তর সঞ্চারী নিরাসক্ত দৃষ্টি।'[১৬] কিন্তু সমাজ-সচেতনার এ বলিষ্ঠ ও দরদী অভিব্যক্তি ঘটাবার প্রয়াসে মধুসূদন যে বিশেষ দক্ষতা ও অনুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই তাঁকে একই সঙ্গে নব্য ও প্রাচীনপন্থীদের নিকট বিরাগভাজন করে তুলেছিলো। মধুসূদনের মতো শক্তিমান ও যথার্থ প্রহসনকারদের পক্ষে সমাজের কাছ থেকে এ-ই বুঝি স্বাভাবিক প্রাপ্য। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'প্রহসন লেখক সমাজের দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি ও গ্লানি অনাবৃত করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধন করেন বটে, কিন্তু সমাজের কাছে তিনি চিরকালই নিন্দা ও তিরস্কার লাভ করেন। শোনা যায় জগদ্বিখ্যাত প্রহসনকার মলিয়ের সমসাময়িক সমাজে এত অপ্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পরে তাঁহার সৎকার করিবার লোক জুটে নাই।'[১৭]

www.pathagar.com

দুই

'একেই কি বলে সভ্যতা'র কাহিনীটি উনিশ শতকের বাঙলার যে পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে, তা ছিলো যথার্থ অর্থে রেনেসাঁর যুগ। ইংরেজ শাসন, ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে, সেদিন অন্ততঃ শিক্ষিত বাঙালীরা নতুন করে ভাবতে ও বুঝতে শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্ত দূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।'[১৮] এই আঘাতের ফলে বাঙালীর চিত্ত মুক্তি ঘটেছিলো—আলোড়ন জেগেছিলো উপলব্ধির সার্বিক প্রহরে। কিন্তু, 'যাহারা এই নবজাগরণের অগ্রদূত তাহাদের মধ্যে অনেকেই নূতন জ্ঞানের মত্ততায় আত্মহারা হইয়া গেল। য়ুরোপীয় সভ্যতার অভ্যন্তরে অনেকেই প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাই স্বেচ্ছা-চারকেই বুদ্ধির মুক্তি বলিয়া ভুল করিয়া তাহারা উচ্ছৃংখলতার পাপ পংকে নিমজ্জিত হইল।'[১৯] দুর্দম পানাসক্তির ফলে উন্মত্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা, নৈতিক চরিত্র হোল বিসর্জিত—স্বসমাজ, ধর্ম আর সংস্কৃতি হোল তাঁদের কাছে উপহসিত। হিন্দুকলেজের অনেক ছাত্রই এই ব্যাধিকে সংক্রমিত করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয়—নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘাটনই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদয়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।'[২০] পানাসক্তির ফলে মধুসূদন নিজেও কম বিপর্যস্ত হননি বলে জানতে পারা যায়। তাঁর জীবনীকাররা লিখেছেন, 'কুসঙ্গে পতিত হইয়া, এবং কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তিনি, ছাত্রাবস্থাতেই মদ্যপানে আসক্ত হইয়া-ছিলেন।'[২১] আরো জানা যায়, 'একবার বিশপস্ কলেজে নৈশ ভোজে ছাত্রদিগের ভোজনের প্রাক্কালে য়ুরোপীয় ছাত্রদিগকে মদ্য বণ্টন করিতে মদ্য নিঃশেষ হইয়া গেল। দেশীয় ছাত্রদিগকে সেদিন আর মদ্য দেওয়া হইল না। তেজস্বী মধুসূদন ষ্টুয়ার্ডের নিকট আপনার বরাদ্দ মদের দাবী করিলেন। সেদিন তিনি আর কাহাকেও মদ্য দিতে পারিলেন না। ভাণ্ডারে আর মদ্য ছিল না। মধুসূদন ক্রোধে আহারের পূর্বেই টেবিলের উপর গ্লাস আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন।'[২২] এ সম্বন্ধে অন্য একটি বিবৃতি এরূপ: 'রেভারেন্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী বিদুষী কন্যার সহিত মধুসূদন

www.pathagar.com

পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপ-গুণের পক্ষপাতি হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণি গ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিবিধ সদগুণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরাপান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পানদোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।'[২৩] এসমস্ত খবর আংশিকভাবে সত্য হলেও, দেখা যাচ্ছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমাজে মধুসূদন নিজেও বর্ধিত—আর সেজন্যই তাঁকে তা শুধু কল্পনা করেই নিতে হয়নি।[২৪] জনৈক সমালোচক লিখেছেন, "স্বয়ং 'চণ্ডমুণ্ড' দলের একজন সেরা হইয়া উহার পেটের মধ্যেই সোজাসুজি এইরূপ অস্ত্রচালনা। ইহাতে বিশিষ্টতা আছে।"[২৫] তবে এই সঙ্গে এও আমাদের স্মরণ রাখতে হচ্ছে, 'ইংরাজী সভ্যতা বাঙালীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, বাঙালীকে অন্ধ কুসংস্কার হইতে মুক্তি দিয়াছে। যাহাদের মধ্যে এই মুক্তির জোয়ার আসিয়াছে, তাহারা এই নব্যবঙ্গের যুবক। সেই যুবক সম্প্রদায়েরই একটি বৃহত্তর অংশ জ্ঞানের নামে কি অনাচার এবং দুশ্চরিত্রতায় মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাই মধুসূদন দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া সত্য সত্যই জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, মধুসূদন তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করেন নাই। গণ্ডূষ জলপাত্রে অবগাহন করিয়া যাহারা শফরীর মতো ফর ফর করিতেছিল, মধুসূদনের ব্যঙ্গ তাহাদিগকে লইয়া।'[২৬]

'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রধান নায়ক নববাবু[২৭] বৈষ্ণবভক্ত—বিত্তবান পিতার সন্তান এবং এক নব্য শিক্ষিত যুবক। মদ্যপান ও অসামাজিক বেলেল্লা-পনাই তাঁর জীবনের নিত্য সহচর। কালীবাবু প্রমুখ সমগোত্রীয় বন্ধু, তাঁকে দিয়ে কোলকাতার কোনো এক বারাঙ্গনা পল্লীতে 'জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। সেই সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ঝাড়া হয়—'সংস্কার-মুক্ত' সভ্যরা মদ-মাংস খেয়ে খেমটাওয়ালীদের নিয়ে রঙ্গরস করেন। কিন্তু নব-বাবুর পিতার নিকট এসব অজ্ঞাত। কালীবাবু তাঁকে জানিয়েছেন, 'আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।' তবু বৈষ্ণবভক্ত পিতার মনে সন্দেহ জাগে, 'এই কলিকাতা শহর বিষম ঠাঁই'—ছেলেটা না জানি উচ্ছন্নেই যাচ্ছে। তিনি গোপনে বৈষ্ণব বাবাজীকে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার যথার্থ খবর নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। বাবাজী সেই বারাঙ্গনা পল্লীতে গিয়ে বেশ্যাদের খপ্পরে পড়েন। সেখান থেকে কোনো রকমে নিষ্কৃতি লাভের পর, হঠাৎ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং চার টাকা ঘুষ দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এর পর ক্রমে ক্রমে বাবাজী, জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার

www.pathagar.com

সকল অসামাজিক কাণ্ড কারখানাই প্রত্যক্ষ করেন। নববাবুকে অগত্যা কিছু ঘুষ দিয়েই তাঁর মুখ বন্ধ করতে হয়।

নববাবুর জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার কাজ পুরোদমেই চলছে। কিন্তু এদিকে তাঁর স্ত্রী হরকামিনীর দুঃখের আর শেষ নেই। তিনি ননদদের সঙ্গে গোপনে তাস খেলে সময় কাটান--রাত্রে স্বামীর 'মুখ থেকে প্যাঁজ-আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো' বেরোবার এবং তাঁর মরা মানুষের মতো নাক ডাকার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

হরকামিনী ননদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন—এমন সময় মাতাল নববাবু চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢোকেন। চাকর বৈদ্যনাথকে তিনি' 'রিফর্ম' করতে চান—পিতাকে বলেন, 'ড্যাম কত্তা-ওল্‌ড ফুল'। গৃহিণী এসব দেখে-শোনে যেনো কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁর এ 'দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ খাইয়ে দিচ্ছে নাকি ?' হতাশায় ভেঙে পড়েন কর্তাবাবু। এই কোলকাতায় আর নয়—কালই তিনি সকলকে নিয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করবেন।

প্রহসনের সমগ্র ঘটনাটি পুরো একদিনেরও নয়। কিন্তু এর মধ্যেই উনিশ শতকের বাঙলার একদল নব শিক্ষিত যুবকের অসামাজিক বেহেল্লাপনা সহ অন্যান্য যে সব বাস্তব চিত্র-রেখা ফুটে উঠেছে, তা অনতিরঞ্জিত ও নিখুঁত-সুন্দর বলেই বিশেষ প্রশংসার দাবীদার। নববাবু আর কালীবাবু যেনো উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ ভাঙা জোয়ার—ক্ষণিকের মধ্যেই, আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন সব ঃ

'কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বলব কি। কর্ত্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ। তবে এখন আর এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখছি এবলিশ কত্তো হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে নাকি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ করে থাকে ?...

নব। ..... কর্ত্তা এখন কেমন হয়েছেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তাহলে তখনি তত্ত্ব করেন।...

কালী। .. (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটাকি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তো এলো ? এই নব আমাদের সর্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে।'[২৮]

www.pathagar.com

চলতে থাকে বেপরোয়া মদ্যপান—এ মুহূর্তে কালীবাবু বুঝি সাগর শুকিয়ে ফেলতে পারেন ঃ

'নব। আরে কর কি, আবার ?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড জেনারেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কশুর করে ? হা, হা, হা !' (১অঃ ১গঃ)

কথায় কথায় কালীবাবু নববাবুর পিতার সংগে একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নববাবু জানান যে, সেজন্য আর তাঁকে চিন্তা করতে হবে না। কর্তা বাড়ীর দরজায় তাঁর গাড়ী দেখলে, নিজেই এখানে এসে হাজির হবেন। চমকে ওঠেন কালীবাবু, 'বল কি ? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলতো, আমার গলাটা আবার যেন শুখয়ে উঠছে।' নববাবু থামিয়ে দেন—এমনিতেই একটু নেশা হয়ে পড়েছে কিনা। কর্তা এলে, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্য, কালীবাবুকে তিনি প্রস্তুত থাকতে বলেন। কালীবাবু হাসেন—এবার যেনো তাঁর চারিত্রিক অধোগতির দিকটি ভালো করেই উম্মোচিত হোল ঃ 'তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের-মুখটি-স্বকৃতভংগ-সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর-নানা শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের আগড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা !' (ঐ)

এই 'বি-এর' আর 'ব্রাণ্ডি' নিয়েই সেদিন কালীবাবুর মতে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত লোকদের রঙ্গরসের আসর সরগরম হয়ে উঠতো, বারঙ্গানা-খেমটাওয়ালীরা ধন্য হতেন তাঁদের উষ্ণ প্রসাদ লাভ করে। খেমটাওয়ালী নিতম্বিনী, পয়োধরীকে কালীবাবুর এরূপ একদিনের সঙ্গ লাভের কথা বলেন ঃ 'কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে।' পয়োধরীর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন, সদানন্দ বাবুইরা কম কিসে ইদানিং যে তিনিও 'খুব তোয়ের হয়ে' উঠেছেন। নিতম্বিনীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে পয়োধরী জানান, 'আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। ... ...এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।' (১ম অঃ ২ গঃ) কালীবাবু জাতীয় লম্পট ব্যক্তিরা তাদের জঘন্য নারী মাংস লোলুপতা নিয়ে, সেদিন সমাজের সর্বত্রই চষে বেড়িয়েছেন। নববাবু, তাঁর বৈষ্ণবভক্ত পিতার সঙ্গে কালীবাবুকে পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বে পরণ হাটার কোন একটি বৈষ্ণব পরিবারের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। কালীবাবু এরূপ একটি পরিবারের লোক বলে চালাতে পারলে, সেই মুহূর্তে আর কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না। কিন্তু কালীবাবুকে 'পরণ হাটার প্যারী

www.pathagar.com

আর তাঁর ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও' চেনেন না। নববাবুকে তিনি জানান, 'একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্‌বো।' (ঐ)

এ ধরনের লোকেরাও সেদিন তথাকথিত সমাজ সংস্কার ও দেশোদ্ধারের নাম করে বিভিন্ন সভা-সমিতি নিয়ে মেতে উঠতেন। এতে মদদ যোগাতেন নববাবুর মতো শিক্ষিত নামধারী বিত্তবান যুবকরা—'সব ক্রিপ্‌সন্‌ লিষ্ট'-এ নাম লেখাবার মতো সমগোত্রীয় বন্ধুদেরও অভাব ছিলো না। 'জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা' এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। কর্তাবাবুকে এর পরিচয় দিতে গিয়ে কালীবাবু জানান, 'আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিত জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।' (১ অঃ ১ গঃ) কিন্তু বৈষ্ণববাবাজী এ সভার যথার্থ স্বরূপ স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করেন। 'হোটেল বাক্‌স'-এ করে মুসলমান মুটেরা কি সব দুর্গন্ধময় খাদ্য নিয়ে আসছেন, বরফওয়ালা আর মালীরা নিয়ে আসছেন বরফ আর বেলফুল, সুসজ্জিতা খেমটাওয়ালীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন কারো জন্য। বাবাজী চমকে ওঠেন, 'একি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশ্‌বী দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্ছি কাণ্ডটা কি।' (১ অঃ ২গ)

অপশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফলে সেকালের বাঙলার এ উচ্ছৃংখল যুবকদের মূর্খতা, হীনমন্যতা বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কতোটা চরমে পেঁাছেছিলো, তা জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায়, সভার প্রতিষ্ঠাতা নববাবুর বক্তৃতা ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কার্যকলাপ থেকেই বুঝা যায়ঃ

'নব। জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তাহলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্‌কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশে আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেন্টলম্যেন, ইন্‌ দি নেম্‌ অব ফ্রীডম, লেট্‌ আস এঞ্জয় আওয়ার-সেল্‌ভস্‌। ... ...

সকলে। হিয়ার, ...; হিপ হিপ, হুরে, ... লিবরটি হল্‌-বিফ্রী—লেট অস এঞ্জয় আওর সেল্‌ভস্‌।' (২ অঃ ১ গঃ)

www.pathagar.com

এ 'সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী' হওয়ার বাস্তব নিদর্শন দেখাতে গিয়েই নববাবু একদিন তাঁর যুবতী বোন প্রসন্নময়ীর গালে চুমু খান। নববাবুর স্ত্রী হরকামিনী নৃত্য কামিনীকে জানান, 'সেদিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন, ঠাকুর ঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বলেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?' (২ অ. ২ গ.) এই উচ্ছৃংখল যুবকদের তথাকথিত কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ নবলব্ধজ্ঞানের চোখে, গুরুজনরা সেকেলে—অপদার্থ প্রাণী বিশেষ। কালীবাবুর এক বৈষ্ণব কাকা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বৃন্দাবনে গিয়ে মারা যান—নব্য শিক্ষিত ভ্রাতুষ্পুত্র কালীবাবুর নিকট তিনি 'একটা ওল্‌ড ফুল' ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু নববাবুর বৈষ্ণবভক্ত পিতার সঙ্গে পরিচিত হবার সময় সে ব্যক্তির নামটিই বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কালীবাবুকে নববাবু পরামর্শ দেন, 'তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।' (১অ, ১গ.) প্রয়োজন হলে এধরনের নববাবুরা যে নিজেদের পিতৃ পরিচয়কেও চেপে যেতে দ্বিধা করতেন না, এখানে আরই প্রমাণ মেলে। নববাবুর চোখেও তাঁর বৈষ্ণবভক্ত বৃদ্ধ পিতা একটি 'ওল্‌ড ফুল' মাত্রই। জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার উদ্দাম সম্ভোগ-পর্ব শেষে নববাবুর বাড়ী ফেরে স্বগতোক্তি করেন, 'ড্যাম কত্তা-ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে ?' (২ অ. ২ গ.) নববাবু-কালীবাবুর মতো ব্যক্তিদের নিকট সেদিন ইংরেজী ছিলো প্রাণের ভাষা—মহা পবিত্র ভাষা। বাঙলার সঙ্গে কতোগুলো ইংরেজী শব্দ জুড়ে না দিতে পারলে, তাদের অতি সাধের নব্য শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু যে পরিমাণ ইংরেজী-প্রীতির আত্মম্ভরিতা নিয়ে তাঁরা আস্ফালন করে বেড়াতেন, সে পরিমাণ বিদ্যার অধিকারী তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউ-ই ছিলেন না। নববাবুর বিদ্যার দৌড় তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার পূর্বোক্ত ভাষণেই আমরা দেখেছি। নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যাংশটুকুও লক্ষণীয় ঃ

> 'ট্রাইফ্লীং। ও—আমাকে লাইয়র বল্‌লে—আমার ট্রাইফ্লীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।' (২ অ. ১ গ.)

তাঁদেরকে বাঙলায় মিথ্যেবাদী বললেও কিছুই যায় আসে না, কিন্তু ইংরেজীতে 'লাইয়র' বলা ? এর চেয়ে অপমানের আর কি থাকতে পারে ?

যে নববাবু 'ট্রাইফ্লীং' আর 'লাইয়র'-এর মতো ইংরেজী বলেন, তাঁর চিঠিতে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক লিন্ডলিমরের চরম দুর্দশা ঘটাইতো স্বাভাবিক।'[১] জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সদস্য মহেশ ও অন্যান্যদের বিদ্যার দৌড়ও 'টুরুথ' আর

www.pathagar.com

'ইস্‌পীচ' পর্যন্তই। কালীবাবুর ইংরেজী মিশ্রিত কথাগুলোয় যেনো কিছুটা মুন্সিয়ানার ভাব আছে। নববাবুকে উৎকোচ দিয়ে বাবাজীর মুখ বন্ধ করতে হয়েছে বলে, কালীবাবু ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন: 'নন্‌সেন্‌স। তার চেয়ে শালাকে গোটা কতক কিক্‌ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম দি ব্রুট্‌। ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্‌ আছে?' (১ অ. ২ গ.) কিন্তু তাঁর যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই নববাবুর পিতার সঙ্গে পরিচিত হবার সময়। নিজেকে পরম বৈষ্ণবের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে পরিচয় প্রদানের পরিকল্পনা কালীবাবু 'বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম শেখার প্রয়োজন বোধ করেন। নববাবু অনেক চিন্তার পর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও গীত গোবিন্দের নাম করেন। কালীবাবু তো আকাশ থেকে পড়েন, 'গীত কি? পরে তিনি 'শ্রীমতি ভগবতীর গীত', আর 'বিন্দাদুতীর গীত'—এভাবে নাম দুটো মনে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু যথা সময়ে নববাবুর পিতা যখন জানতে চান, 'ভাল বাপু, তোমরা কোন্‌ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?' —কালীবাবুর তখন শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার অবস্থা আর কি। তিনি বলেন, (স্বগত) আ মলো। এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দাদুতী।' (১ অ. ১ গ.)

এই নব্য শিক্ষাভিমানী উচ্ছৃংখল যুবকদের নিয়ে তাঁদের অভিভাবকদের সেদিন দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। নববাবু কালীবাবুকে জানান, 'কর্তা এখন কেমন হয়েছেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তাহলে তখনি তত্ত্ব করেন।' (১ অ. ১ গ.) তখনকার কোলকাতা ছিলো অভিভাবকদের নিকট দস্তুরমতো একটি আতংক। নববাবু 'জাতীয় ভাষায় চর্চ্চা' ও 'ধর্ম্ম শাস্ত্রের আন্দোলন'-এর জন্য জ্ঞান তরঙ্গিণী সভায় যোগ দিতে গেলেও, কর্তার মনে স্বস্থি নেই--তিনি মনে মনে বলেন, 'এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে, ছেলেটিকে কি এক্‌লা পাঠ্‌য়ে ভাল কল্যেম?' (১ অ. ১ গ.) তাঁর এই সন্দেহ যে অমূলক ছিলো না, তা পরবর্তী সময়ে জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা-ফেরত মাতাল নববাবুকে দেখেই বোঝা গেলো। অনন্যোপায় কর্তাকে তখন স্বপরিবারে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার কথাই ভাবতে হয়: 'এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?' (২ অ. ২ গ) নববাবুর মতো ব্যক্তিদের উদ্দাম চলার পথে এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকরা যেনো একটি বোঝা স্বরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নববাবুর একটি স্বগতোক্তির উদ্ধৃত দেয়া যেতে পারে? 'ড্যাম কর্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্‌ বুঝলে হয়, তাহলে আর আমাকে কোন্‌ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে?' (২ অ. ২ গ.) অনেক সময় তাঁদেরকে

www.pathagar.com

জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার মতো প্রতিষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতির তাগিদে অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়েও বেরিয়ে যেতে হতো। নববাবু জ্ঞান তরঙ্গিণী সভায় চলে যাওয়ার পর, তাঁর বোন প্রসন্নময়ী মা'কে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যা মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?' মা উত্তর করেন, 'ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে— ?' (২ অ. ২ অ.)

নববাবুর মতো কাণ্ড জ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ঘরে, তাঁদের স্ত্রীদেরকে যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হোত, তার প্রমাণ মেলে নববাবুর স্ত্রী হরকামিনীর জীবনে। তিনি ননদদের সঙ্গে তাস খেলে কোনো রকমে সময় কাটান—স্বামী কর্তৃক তাঁর বোনের গালে চুমু খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তামাশা করেন। কিন্তু তাঁর সে তামাশায়-ই সুপ্ত রয়েছে স্বামীর প্রতি প্রবল ঘৃণা, বিদ্বেষ আর অশ্রদ্ধা। তিনি তাঁর ননদ প্রসন্নময়ীকে বলেন, 'ঠাকুর ঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নেনা কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি।' হরকামিনী তাঁর স্বামীকে নিয়ে রাত্রি যাপনের বর্ণনা দেন এভাবে ঃ 'সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো্যে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুনলে্ জেগে উঠে ছি !' (২অ. ২ গ.) এমতাবস্থায়ই বুঝি অসহায় অবলা স্ত্রীরা আত্মহত্যার কথা ভেবে থাকেন—তাঁদের মনেও প্রশ্ন জাগে, 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রসন্নময়ীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হরকামিনীর মনে এই বিক্ষোভ-বেদনা আর জিজ্ঞাসাই জাগে ঃ 'আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুর ঝি। তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি।... হা আমার পোড়া কপাল। মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয় ?—একেই কি বলে সভ্যতা ?' (২ অ ২ গ.)

প্রধানতঃ অপশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফলেই যে তখনকার একদল তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত যুবক অধঃপাতের চরমে গিয়ে পেঁছিছিলেন, একথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। কিন্তু নববাবুর মা'র মতো গৃহিণীরাও সেদিন তাঁদের সন্তানদের অধঃপতনের জন্য কম দায়ী ছিলেন না। জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে মাতাল নববাবু যখন বাড়ীর মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেন, তখন গৃহিণীর কান্না আর থামায় কে ঃ 'একি, এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্ছে ?' তাঁর মনে সন্দেহ জাগে, ' আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি ?' কর্তা কিন্তু সবই বুঝতে পারেন—চরম ঘৃণা আর ক্রোধে নরাধম কুলাঙ্গার বলে গালাগাল দেন ছেলেকে। কিন্তু গৃহিণীও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ঃ 'এ কি ? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় নাকি ? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো্যে বক্‌চো কেন ?' (২ অ. ২ গ.)

www.pathagar.com

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় সেকালের সমাজের অন্যান্য কিছু ছোটো-খাটো চিত্রও বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠেছে। তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত যুবকরাই যে সেদিন অনাচারে লিপ্ত ছিলেন, তাই নয়। বাবাজীর মতো 'পরম বৈষ্ণব ভক্ত' চরিত্রহীন লোকদের অভাবও সমাজে ছিলো না। সিকদার পাড়া স্ট্রীটের বারাঙ্গনাদ্বয়কে দেখে বাবাজী বলেন, 'আহা হা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এ'রা কে ?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।' (১অ. ২গ.) জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার আসল স্বরূপ কর্তার নিকট ব্যক্ত না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নববাবুর কাছ থেকে কিছু উৎকোচও আদায় করে নেন।

বারাঙ্গনা-জীবনের পরিচয়টি লক্ষ্য করার মতো। কোন এক 'গুরুর' জনৈকা বারাঙ্গনার নিয়মিত খদ্দের। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি অন্যত্রও যাতায়াত করেন। বারাঙ্গনাও নাছোড়বান্দা। কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়া মুখোর আক্কেল দেখ্‌লি ? আমাদের সঙ্গে যাচ্ছি বলে আবার কোথায় গেল ?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে্য আস্তে্য পদীয় বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি।' (১ অ. ২ গ.)

এর পরই বারাঙ্গনাদ্বয় বাবাজীর সাক্ষাৎ পান। তাঁদের কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

'দ্বিতীয়। ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়ুয়ে রয়েছে, দেখ ?

প্রথম। ওটা মোল্লা নয় ভাই, রাতেল বৈরিগী ঠাকুর।...আহা হা, মিনষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসী বনের বাঘ।

বাবাজী (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞান তরঙ্গিণী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে ?

প্রথম। আহা বাবাজী, তোমার কি বুষ্টুমী হারয়েচে ? তা পথে পথে কে'দে বেড়ালে কি হবে ? যা হবার তা হয়েছে, ... এখন আমাদের সঙ্গে আসবেতো বল ?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি ?

দ্বিতীয়। পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।' (ঐ)

বারাঙ্গনাদ্বয়ের কথোপকথন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সেকালের বারাঙ্গনালয়-গুলোতে কোনো কোনো সময়ে ধর্মধ্বজ লম্পট ব্যক্তিদেরও যাতায়াত ছিলো।

www.pathagar.com

মুটেদের মধ্য দিয়ে সেকালের বাঙলার শ্রমজীবী ও সাধারণ মুসলমানদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। আর্থিক দুরবস্থা, ধর্মীয় নীতি ও সামাজিক বন্ধনের জন্য তাঁদের নিকট ভোগ-উপভোগের জীবন ছিলো একান্তই দুর্লভ। কিন্তু জ্ঞান তরঙ্গিণী সভার সভ্যদের মতো হিন্দুর, সে বালাই ছিলো না। দ্বিতীয় মুটে আক্ষেপ করে তাঁর মামা প্রথম মুটেকে বলেন, 'দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটার গো কি আরামের দিন, ভাই।' প্রথম মুটে তাকে সান্ত্বনা দেন, 'মর বেকুফ্, ও হারামখোর বেটার গো কি আর দিন আছে ? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।' (১ অ. ২ গ.) আল্লা-দেবতাকে যাঁরা মানেন না, তাঁদের আবার শান্তি কি—জীবনের সকল সুখ আর শান্তিতো রয়েছে একমাত্র পরম করুণাময়ের দরবারেই। বস্তুতঃপক্ষে, ভোগ-উপভোগ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মুটের এই যে মনোভাব, তা হচ্ছে সমাজের সকল সাধারণ মুসলমানেরই প্রাণের কথা।

সেকালের বাঙলার বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের মেয়েরা যে অন্ততঃ গোপনীয়তা রক্ষা করে হলেও, অনেক সময় তাস খেলে অবসর কাটাতেন, তার একটি সুন্দর চিত্রও প্রহসনটিতে ফুটে উঠেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'একটি দৃশ্যে চারিটি যুবতীর তাস খেলার চিত্রটি বড়ই বাস্তব হইয়াছে।——ইহাদের মধ্যে নৃত্যকালী পাকা খেলোয়াড়, কমল একেবারে কিছুই নয়, প্রসন্ন ও হর-কামিনী মাঝামাঝি ; কথাবার্তার ভিতর দিয়া ইহাদের মুখভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহাদের কাহাকেও চিনিতে ভুল হয় না। এই পরি-বারটির কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, পুত্র পাঁড় মাতাল, যুবতী বধূ ও কন্যাগণ তাস খেলিয়া আলস্য সময় অতিবাহিত করে—অপরিসর রচনার ভিতর দিয়াও মধুসূদন ক্ষুদ্র পরিবারটির এই বৈচিত্র্যগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।'[৬৬] প্রহসনের সার্জন-বাবাজী প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত জীবন্ত। সারজন বড়ো সাহেব না হলেও সাদা চামড়াধারী খাঁটি ইংরেজ, সুতরাং বাঙালী বৈষ্ণবকে তাঁর 'ব্লাডী নিগর' বলে গালি দিতে বাধা কিসে। বাবাজীর ও কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীর এ অসীম ক্ষমতার কথা অজানার ছিলো না।' তাই বার বার তিনি শুধু এই বলে রেহাই পেতে চান—'দোহাই কোম্পানীর—দোহাই কোম্পানীর।' কিন্তু সে মুহূর্তে কোম্পানীর দোহাইর চেয়েও বড়ো দোহাই হিসেবে কাজ করেছিলো, তাঁর সঙ্গের টাকা চারটিই। যে সারজন এতোক্ষণ ধরে বেচারা বাবাজীকে থানাতে পাঠাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, টাকা পেয়ে তিনিই বলেন, 'ওয়েল্‌দেন্ হাম ডেক্‌টা ওস্‌কা কুচ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।' এরূপ মোক্ষম সময়ে বুঝি চৌকিদাররাও কিছু পেয়ে থাকেন। বাবাজীকে ছাড়তে গিয়ে চৌকিদার জনান্তিকে বলেন, 'তোম্ হাম্‌কো তো কুচ্ দিয়া নেহি—আচ্ছা যাও—চলা যাও।' (১অ. ২গ.)

www.pathagar.com

'একেই কি বলে সভ্যতা'র এ নিখুঁত সমাজ-চিত্র অংকনে প্রহসনকার যে আন্তরিকতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম যথার্থই বলেছেন, 'একেই কি বলে সভ্যতার বিষয়বস্তু ও তার স্রষ্টার বাস্তব দৃষ্টির দিকে তাকালে, বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য ও মেঘনাদ বধ কাব্য রচয়িতার লেখনী একান্ত হালকা ভাষায় ততোধিক হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে মধুসূদন এমন সার্থক সৃষ্টি করলেন কি করে ? এদিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী।'[৩১]

তিন

সেকালের তথাকথিত অনেক আচারনিষ্ঠ প্রাচীন হিন্দু, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নায়কদের অসামাজিক বেলেল্লাপনার মানদণ্ডে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকেই বিচার করতে শুরু করেছিলেন। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করে মধুসূদন তাঁদের নিজেদের প্রতিও খানিকটা দৃষ্টি ফেরাবার সুযোগ করে দিলেন। যোগীন্দ্র নাথ বসু লিখেছেন, 'কেবল ইংরাজী শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়ের অনাচারে হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, চরিত্রহীন বকধর্ম্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্তী পল্লী সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দু শাস্ত্রসমূহকে উপহাস-মাত্র করিত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের উপর ইহাদিগের মর্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল ; কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলগণ যে সকল পাপ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, ইহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সংকুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই শ্রেণীর লোক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।'[৩২]

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর নায়ক, লম্পট-বকধার্মিক ও অত্যাচারী গ্রাম্য জমিদার ভক্তপ্রসাদ বাবু। তিনি পঞ্চানন বাচস্পতি নামক এক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রভূমি তাঁর বাগানের মধ্যে পড়ায় বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। হানিফ গাজী নামক এক দরিদ্র রায়ত অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তাঁকে পুরো খাজনা দিতে অপারগ। কিন্তু অসহায় রায়তের শতো কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও, জমিদার তাঁকে কিছুদিনের সময় দিতেও নারাজ। উপরন্তু, হানিফ গাজীকে তিনি জমাদারের জিম্বে করে রাখার জন্য তাঁর অনুচর গদাধরকে আদেশ করেন। গদাধর কানে কানে ভক্তপ্রসাদকে জানান যে, হানিফ গাজী এবার যে 'ছুড়ীকে'

www.pathagar.com

ববাহ করেছেন তিনি খুব সুন্দরী, তাঁর বয়স উনিশ বছরের মতো এবং এখনো কোনো সন্তানাদি হয়নি। গধাদর ভক্তপ্রসাদকে এ আশ্বাস প্রদান করেন যে, ইচ্ছে করলে তিনি হানিফ গাজীর স্ত্রীকে তাঁর হাতের মুঠোয়ও এনে দিতে পারেন। ভক্তপ্রসাদ মনে মনে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠেন এবং হানিফের কাছ থেকে বাকী খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁকে মুক্তিদান করেন। হানিফ গাজী খুশী হয়ে বাড়ী ফেরেন—কিন্তু ভেতরের কথা তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

ভক্তপ্রসাদ পথে হাঁটতে হাঁটতে মালা জপেন—মুখে তাঁর রাধেকৃষ্ণ বুলি। এক সময়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ে পিতাম্বরে তেলীর যুবতী মেয়ে পাঁচীর প্রতি। পাঁচী কিছুদিনের জন্য স্বামীর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। নারী মাংসলোলুপ ভক্তপ্রসাদ তাঁকে পাবার জন্যও মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

ভক্তপ্রসাদ গদাধরের পিসী কুটনী পুঁটিকে পঁচিশ টাকা দিয়ে হানিফ গাজীর স্ত্রী ফাতেমাকে হাত করার জন্য নিয়োজিত করেন। পুঁটিরও অভিযান চলে। স্ত্রীর মুখে এ কথা শোনে হানিফ গাজী ক্রোধে জ্বলতে থাকেন, এবং লম্পট ভক্তপ্রসাদকে যথোচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য পঞ্চানন বাচস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করে ফন্দি আঁটেন। হানিফ গাজীর পরামর্শে ফাতেমা কুটনী পুঁটির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন, এবং সন্ধ্যার পরে কোনো এক নির্জন স্থানে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন।

ভক্তপ্রসাদের আনন্দ আর ধরে না। তিনি যথাসময়ে শান্তিপুরী ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো ও মাথায় তাজ পরে এবং গায়ে আতর মেখে গদাধরকে নিয়ে শিব মন্দিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। কুটনী তো আগের থেকেই ফাতেমাকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছেন। হানিফ গাজী আর বাচস্পতি অপেক্ষা করছেন একটু দূরের একটি অশ্বত্থ গাছের ওপরে। উক্ত প্রসাদ গদাধরকে প্রহরায় নিযুক্ত রেখে যখন ফতেমার নিকট তাঁর প্রণয় নিবেদন করতে থাকেন, তখন হানিফ গাজী অন্ধকারের মধ্যে ছুটে এসে ভক্তপ্রসাদের ওপর হুহুংকারে লাফিয়ে পড়েন, এবং কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন। ভক্তপ্রসাদ আর গদাধর ভয়ে কাঁপতে থাকেন—কুটনী পুঁটিতো মুর্ছিতা হয়েই পড়ে যান। এমন সময় বাচস্পতি এসে সেখানে উপস্থিত হন—ভক্তপ্রসাদ লজ্জায় আর মাথা তোলতে পারেন না। অগত্যা তাঁকে বাচস্পতির ব্রহ্মত্র সম্পত্তিটুকুন ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়। একটু পরে হানিফ গাজীও স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর খোঁজে সেখানে এসে উপস্থিত হন। ভক্তপ্রসাদ তাঁকেও দুশ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো রকমে রেহাই পান, এবং সে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন যে, এরূপ কুকর্ম তিনি আর জীবনেও করবেন না।

ভক্তপ্রসাদ বাবু সেকালের বাঙলার প্রজা-পীড়ক, লম্পট ও বকধার্মিক

www.pathagar.com

গ্রাম্য জমিদারের সার্থক প্রতিভূ। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চানন বাচস্পতির ব্রহ্মত্র ভূমিটুকুনও তাঁর বাগানের মধ্যে ফেলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধের দায়ে পড়ে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্যক্তিটিই যখন তাঁর কাছে কিছুটা সাহায্য প্রাপ্তির আশা নিয়ে ছুটে আসেন, তখন তিনি তাঁকে মাত্র পাঁচটি টাকা দিয়েই বিদায় করেন। বাচস্পতিকে তিনি জানান, 'আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।' (১ অ. ১ গ.) দরিদ্র কৃষক হানিফ গাজী অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় 'দশ ছালা ধানও' ঘরে আনতে পারেন নি। এমতাবস্থায় জমিদারের সর্বমোট এগরো সিকে খাজনা দেয়া তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিন সিকে খাজনা দিয়ে, বাকীটুকুন পরিশোধের সময় প্রদানের জন্য তিনি জমিদারের নিকট কতোই না কাকুতি মিনতি করেন। কিন্তু ভক্তপ্রসাদের সোজা জবাব : 'তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল।' (১ অ. ১ গ) শুধু তাই নয়, তিনি এক সময়ে চটে গিয়ে অনুচর গদাধরকে ডেকে বলেন, 'এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।' (ঐ) অসহায় হানিফ গাজী 'দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমিদারের' বলে চিৎকার করে রেহাই পেতে চান। কিন্তু ভক্তপ্রসাদ বড়ো হুশিয়ার জমিদার, এসবের দিকে তাঁর কর্ণপাত করলে চলবে কেনো ? অথচ সেই মুহূর্তেই গদাধর কানে কানে যে 'দোহাই' দিলেন, তাতে বুঝি 'মুনির মন টলে'—ভক্ত প্রসাদতো কোন ছার। এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া গেলো :

'গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন ?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্‌ কিরে ?

গদা। ... ...আপনি তাকে দেখতে চান্‌তো বলুন।

ভক্ত। —মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ্‌ ভক্‌ ভক্‌ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান ! যবন ! ম্লেচ্ছ ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো ?

গদা। —মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি ?

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি ? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপ, এসব তো আমাদের

www.pathagar.com

শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে,—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।' (১অ. ১গ.)

যে ভক্তপ্রসাদ মুসলমানদের 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' বলে জানেন, যার কাছে মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ ভক্‌ করে বেরোয় তা' একান্তই অসহ্য, তিনিই আবার শিব মন্দিরের নিকটে রাতের অন্ধকারে হানিফ গাজীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ মিলনের বাসনা নিয়ে দস্তুরমতো বরের মতোই সাজ-সজ্জা করেন। তাঁর এই সাজ-সজ্জার বহর দেখে গদাধরেরও হাসি পায় ঃ 'ইস্‌! আজ বুড়োর ঠাট্‌ দেখলে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ।' (২অ. ১গ.) শুধু এখানেই শেষ নয়—ভক্তপ্রসাদ মনে মনে ভাবেন, 'একটু আতর গায় দি। নেড়ের আবাল বৃদ্ধ বণিতা আতরের খোসব বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেকে করে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো। (ঐ) আর মাথার তাজটিও তো এ মুহূর্তে বিশেষই উপকারী—ভক্তপ্রসাদ ভাবেন, 'এই তাজ্‌টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরা এই সকল ভালবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে।' (ঐ) শিব মন্দির প্রাঙ্গণে ফতেমাকে পেয়ে তো ভক্ত-প্রসাদের আনন্দ যেনো উপচে পড়ারই উপক্রম—কিন্তু এ মুহূর্তেও তাঁর মনের 'যবন' কুসংস্কারটি বুঝি আর একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়—তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার কাটিয়ে উঠতেও সক্ষম হন ঃ 'আহা, যবনী হলো তায় বয়্যে গেল কি ? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। (২অ. ২গ.) শিব মন্দিরের মধ্যে লাম্পট্যপনায় লিপ্ত হওয়ার কথাটি ভেবেও ভক্তপ্রসাদ একটু হোচট খান। কিন্তু তাতেই বা কি— 'ভগ্ন শিবে তো শিবত্ব নাই' । আর তা ছাড়া, ভক্ত-প্রসাদ, 'এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্‌ ছার ?' (ঐ)

ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পটদের নারী মাংস লোলুপতার ফলে, সেদিন অনেক কুল-কামিনীদের জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের লাম্পট্যপনার শিকার হয়ে, অনেক সময় কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরকেও শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে শুধু বেঁচে থাকতে হয়েছে বারাঙ্গনা বৃত্তিকে অবলম্বন করে। পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চী, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালদের বাড়ীর বউ। কিছুদিন হয় তিনি বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। ভক্তপ্রসাদ প্রতিবেশী সম্পর্কে তাঁর জেঠা। কিন্তু কলসী নিয়ে পঞ্চীকে মায়ের সঙ্গে ঘাটে যেতে দেখে, জেঠা মশাইর আদি রসাত্মক কবিতা—বুলি যেনো আর থামতে চায় না ঃ 'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। —কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।।' (১অ. ১গ.) ভক্তপ্রসাদ এগিয়ে

www.pathagar.com

যান—পীতাম্বরের স্ত্রী ভগীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলাপ করেই পঞ্চী সম্বন্ধে সব কথা জেনে নেন, এমন সুযোগ থাকতেও যদি কিছু না হয় তবে আর কিসে হবে? কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হোল ঃ

'ভক্ত। (স্বগত) ছুঁড়ীর নব যৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি।... ...

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কর্ত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌সে তো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি?— —এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।' (১অ, ১গ)

ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যপনার শিকার হয়ে, ভট্টাচার্যদের মেয়ে ইচ্ছের জীবনেও নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। এ সম্বন্ধে ভক্তপ্রসাদ গদাধরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

'গদা। কর্ত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো?

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্টাচাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে —(অর্ধোক্তি) ...তারপরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ। হাঁ। ছুড়ীটি দেখতে ছিল ভাল বটে... ...রাধে কৃষ্ণ। প্রভো! তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের তখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। '(ঐ)

এরূপ চরিত্রের অধিকারী হয়েও, ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তিরা সেদিন ধর্মের মুখোশ পরে সমাজের মধ্যে নির্বিকার ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফতেমার সঙ্গে অবৈধ মিলনের প্রত্যাশা নিয়ে ভক্তপ্রসাদ দস্তুরমতো বর সাজেই সজ্জিত হন। আরশিতে শ্রীমুখ দর্শন করে বাক্স থেকে তুলে নেন আতরের শিশি, আর এই সঙ্গে ভৃত্য রামকে বলে দেন, 'দেখ্ যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।' (২অ, ১গ,) শিব মন্দিরের কাছে 'অভিসারে' গিয়ে তিনি ফতেমাকে বলেন, 'সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। —তায় লজ্জা কি?' (২ অ, ২ গ,) বকধার্মিকতার এই চূড়ান্ত নিদর্শন দেখে গদাধরও মনে মনে হাসেন ঃ 'আর ও নাম কেন এখন আল্লা আল্লা বলো।' (ঐ)

ভক্তপ্রসাদের ছেলে অম্বিকা হিন্দু কলেজে পড়েন। কিন্তু সেজন্য প্রসাদ অত্যন্ত চিন্তিত। অম্বিকার বন্ধু আনন্দকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা বল দেখি,

www.pathagar.com

অম্বিকাতো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখছে মা ? আনন্দ জানতে চান, 'আজ্ঞে অধর্ম্মাচরণ কি ?' ভক্তপ্রসাদ বলেন, 'এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গা স্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানী মত।' আনন্দ এর কোনো সঠিক জবাব না দিতে পারলেও, ভক্তপ্রসাদ বলেন, 'আমার বোধ হয় অম্বিকা প্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো তুমিই সত্য।' (২অ. ১গ.) এর পর কোলকাতার নৈতিক অবস্থার বিষয় নিয়ে কথা ওঠে। ভক্তপ্রসাদ জানতে পেরেছেন, সেখানে নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে—ব্রাহ্মণ-কৈবর্ত জোলা-তেলী সকলেই একত্রে খান-দান, ওঠেন বসেন। আনন্দ জানান, তিনি যে খুব একটা মিথ্যে শোনেছেন তা নয়। চমকে উঠেন ভক্তপ্রসাদ : 'কি সর্ব্বনাশ। হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না।' (ঐ) এসময়ে গদাধর এসে শিবমন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে ভক্তপ্রসাদকে ইশারা প্রদান করেন—কিন্তু এখনো যে সন্ধ্যা হতে অনেক বাকী :

'ভক্ত। (স্বগত) হঃ আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ। শুনেছি—কল্‌কাতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে ?

আন। ... ...কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু ! থু ! বল কি ? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায় ? রাম ! রাম ! থু! থু ! (ঐ)

বকধার্মিকতা আর কাকে বলে। গদাধরের স্বগতোক্তিটিই বুঝি এখানে মোক্ষম হয়েছে : 'নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না।' (ঐ)

প্রহসনের অন্যান্য চরিত্রগুলোও বাস্তব বলেই জীবন্ত। গদাধরের মতো অনুচররা সেদিন তাঁদের মনিবদের সকল দুষ্কর্ম্মেরই দোসর ছিলেন। অবশ্য, আর্থিক স্বার্থের কারণই সেখানে বিশেষভাবে কার্যকর ছিলো। হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমাকে পাওয়ার জন্য ভক্তপ্রসাদ অস্থির হয়ে ওঠেন —গদাধরকে তিনি বলেন, 'দেখ্, টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।' গদাধর তো এরই জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে তাঁর স্বগতোক্তিটি লক্ষণীয় : 'কর্ত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।' (১ অ. ১ গ.) শিবমন্দিরের কাছে বাচস্পতি আর হানিফের হাতে ধৃত হয়ে ভক্তপ্রসাদের যখন শোচনীয় অবস্থা, সে সময়ে ফতেমাও আবার তাঁকে নিয়ে রসিকতা শুরু করে দেন। ভক্তপ্রসাদ তখন রাগ করে ফতেমাকে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে চলে যেতে বলেন। ফতেমা বলেন, 'সে কি কর্ত্তাবাবু ? এই মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম, আবার এখন মোরে দূর কত্তি

www.pathagar.com

চাও।' ভক্তপ্রসাদ উত্তর করেন, 'কেবল তোকে দূর? এই জঘন্য কম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম।' গদাধরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে—কুটনী পুঁটিকে লক্ষ্য করে তিনি জনান্তিকে বলেন, 'ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো।' (২ অ. ২গ.)।

কুটনী পুঁটির মতো খল চরিত্র প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে অনেক রয়েছে। উনিশ শতকের বাঙলার অধঃপতিত সমাজজীবনেও কুটনীদের ভূমিকা অব্যাহত ছিলো। নৈতিক চরিত্রের অধোগতির পরিণাম ও ব্যক্তি-জীবনের আর্থিক দুর্গতির ফলেই তাঁরা এ জঘন্য বৃত্তিকে অবলম্বন করতেন। পুঁটি এখন বিগত যৌবনা। কিন্তু বয়স থাকতে ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তিদের কাছে তাঁর কদরও কম ছিলো না। আতঙ্কগ্রস্তা ফতেমা শিবমন্দিরের কাছ থেকে চলে আসার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েন—কিন্তু পুঁটির যে ব্যবসা যায়, তিনি তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অনন্যোপায় ফতেমা তখন বলেন, 'তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না।' পুঁটির বুঝি কাটা ঘায়ে লবণ ছিটে পড়েঃ 'আ মর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সেকাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যো আর তাকে কে খেতে চায়?' (১অ. ২গ.) উক্ত ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পটদের কাছ থেকে কুটনীরা তাঁদের দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য আর্থিক সাহায্য লাভ করতেন। কিন্তু এ নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন না—অর্থলোলুপ ভ্রষ্টা নারীদের কাছ থেকেও তারা 'দস্তরি' আদায় করে নিতেন। ফতেমা পুঁটির কাছ থেকে পঁচিশ টাকা গ্রহণ করে, তা গোণে নিয়ে বলেন, 'এ কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।' পুঁটি তখন সহজভাবেই উত্তর দেন, 'ছ টাকা ভাই আমার দস্তরি।' (১ অ. ২গ.) কিন্তু কোনো কোনো সময়ে এনিয়েও বুঝি দরাদরি হোত। ফতেমার আপত্তিতে পুঁটি শেষ পর্যন্ত চার টাকা দস্তুরি নিতেই সম্মত হন। ভক্তপ্রসাদের মতো ব্যক্তিদের লাম্পট্যপনা ও পুঁটির মতো কুটনীদের এই ঘৃণ্য ব্যবসার শিকার হয়ে, সেদিন কতো কুলবালাকেই তাঁদের সতীত্বের জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ফতেমার বাড়ীতে যেতে যেতে পুঁটি মনে মনে বলেন, 'আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই।' (১ অ. ২ গ.) লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এতে অতীতের দুষ্কর্মের স্মৃতি রোমন্থন আছে—কিন্তু অনুশোচনা নেই। শতো লাঞ্ছনা-অপমানের পরেও পুঁটির মতো কুটনীদের মনে বুঝি তা কখনই জাগতো না। শিবমন্দিরের কাছে জ্ঞান ফিরে পেয়ে, পুঁটি তাঁর ভাইপো গদাধরকে বলেন, 'তা চলু, বাছা, আর এখানে নয়, আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে।' (২ অ. ২ গ.)

হানিফ চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেকালের অত্যাচারী জমিদার-শাসিত সমাজে

www.pathagar.com

অসহায় ও দরিদ্র মুসলমান রায়তের দুরবস্থার একটি চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। হানিফের 'এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদা তালার মর্জ্জি।' —এই কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেকালের সকল দরিদ্র মুসলমান কৃষকের আর্তনাদ। জমিদার অত্যাচারি—প্রকৃতিও যদি একই সঙ্গে তাঁদের প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে আর চলে কিসে? সে জন্যই পীরের দরগায় 'ছিন্নি' দেয়া। কিন্তু তাতেও অজম্মার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো না, কি-ই-বা করবেন—সবই যে খোদাতালার মর্জি।

দরিদ্র কৃষকের বাড়ীতে দশ ছালা ধান না এলেও, ভক্তপ্রসাদের মতো জমিদারদের এতে কিছুই যায় আসে না। মোট এগারো সিকে খাজনার মধ্যে, হানিফ তিন সিকে পর্যন্ত পরিশোধ করতে প্রস্তুত, এবং বাকী টুকুর জন্য ভক্ত-প্রসাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করে সময় চাচ্ছেন। কিন্তু নির্দয় জমিদার ব্যবস্থা করেন, বেচারা হানিফকে জমাদারের জিম্বায় দিয়ে দেয়ার। এরূপ একটি পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যই হানিফও 'কাছায় বান্ধ্যে' আরো আট সিকে নিয়ে এসেছিলেন। ভক্তপ্রসাদ ও গদাধরের রহস্যময় কানাকানির ফলে, হানিফকে আর সে লুকোনো টাকা বের করতে হয় না। ডঃ বৈদ্যনাথ শীল লিখেছেন, 'এখানে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হইতেছে,··· হানিফ কৌশলে চোরের উপর বাটপারি করিল।'[৩৩] কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে যে, ভক্তপ্রসাদ আসলে হানিফের কাছে হারেন নি—হেরেছেন গদাধরের লোভনীয় সেই কানাকানির কাছে। ভক্তপ্রসাদের মতো প্রজাপীড়ক জমিদারদের ফাঁকি দেয়ার জন্য দরিদ্র রায়তরা কখনো-সখনো ছল চাতুরির আশ্রয় নিতেন, কিন্তু তাতে যে নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনাই থাকতো বেশি, তার প্রমাণ মেলে হানিফ গাজী কর্তৃক 'কাছায় বান্ধ্যে' টাকা লুকিয়ে রাখার মধ্যেই।

হানিফের মতো দরিদ্র কৃষকদের জীবনে সেদিন আর্থিক দুর্ভোগই ছিলো সম্বল। সেজন্য তাঁরা পীরের দরগায় সিন্নি দিয়েছেন, জমিদারের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছেন— কিন্তু শতো দুর্দিনেও তাঁরা ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পটদের লাম্পট্যপনার কাছে নিজেদের বিকিয়ে বসেন নি। হানিফের অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম আছে—ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পট জমিদারের হাত থেকে স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার মতো শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব নেই তাঁর। ভক্তপ্রসাদ সম্বন্ধে ফতেমাকে তিনি বলেন, 'এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার্যো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। ···বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর

www.pathagar.com

মোর বুন কখনো বারেয়ে গিয়ে তো কসবিগিরি করেনি।' (১ অ. ২ গ.) 'মোর বুন কখন বারয়ে গিয়েতো কসবিগিরি করেনি' কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই ইঙ্গিতটি মনে হয়, ভক্তপ্রসাদের কোনো বোনের প্রতিই করা হয়েছে। দরিদ্র ও মূর্খ কৃষক হানিফের বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকরী করেছেন, তাঁর কোনো বোনও বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেন নি—এ সরল-স্বাভাবিক গর্বের তুলনা কই। বাচস্পতির পরামর্শে হানিফ ভক্তপ্রসাদকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ফন্দি আঁটেন। কিন্তু এতে রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'-এর মতো রসিকতার অবকাশ কম। স্ত্রীর মান-সম্মান সম্পূর্ণ বজায় রেখে 'বেটা কাফের'-কে 'গোরু খাওয়া'র মতো একটি জঘন্য শাস্তি দিতে হবে—এতে যদি প্রয়োজন হয়, হানিফ গাজী নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যেতেও প্রস্তুত। রাতের অন্ধকারে শিবমন্দিরের নিকটস্থ অশ্বত্থ গাছের আড়ালে আত্মগোপন করার সময়, বাচস্পতি হানিফকে তাঁর ইশারা না পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে চুপ করে বসে থাকার জন্য পরামর্শ দেন। হানিফ বলেন, 'ঠাহুরু, তাতো থাক্‌পো; লেকিন্ আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখননি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো। আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।' (২অ. ২গ) হানিফের এ রুদ্র মূর্তি দেখে বাচস্পতিও মনে মনে শিউরে ওঠেন: 'বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়।' (ঐ) বাচস্পতির এ আশঙ্কা মিথ্যে ছিলো না। হানিফ মূর্খ—দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারের দরিদ্র রায়ত। কিন্তু খাজনা পরিশোধ করতে না পেরে তিনি যে ভক্তপ্রসাদের সম্মুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছেন, ধর্ম ও স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করার জন্য, সেই ভক্তপ্রসাদের গায়েই আবার হাত তোলতেও ছাড়েননি। 'যবন' বিদ্বেষী জমিদারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হানিফ শোনালেন 'আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপ্‌নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!' (২ অ. ২ গ.)—এর চেয়ে বড়ো প্রতিশোধ নেয়ার কথা বুঝি কল্পনাও করা যায় না।

ফতেমা চরিত্রটি তৎকালীন সমাজের অত্যাচারী ও লম্পট গ্রাম্য জমিদারের দরিদ্র রায়তের এক সহজ সরল-সতী স্ত্রীর আদর্শ। ফতেমার স্বামী দরিদ্র হতে পারেন—তাঁর গৃহে অন্নের সংস্থান না থাকতে পারে, কিন্তু অর্থের জন্য তিনি ধর্ম ও সম্মানকে, বিসর্জন দিতে পারেন না। বাচস্পতি ও হানিফের পরামর্শে, ভক্তপ্রসাদকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদানের জন্য, রাতের অন্ধকারে পুঁটির সঙ্গে তিনি শিবমন্দির 'অভিসারে' গমন করেন। তিনি জানেন; ভক্তপ্রসাদকে জব্দ করার

www.pathagar.com

জন্য তাঁর স্বামী ও বাচস্পতি শিবমন্দিরের একটু দূরেই কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছেন। তবু সতী নারীর পর পুরুষ সংস্পর্শের ভয় ও স্বাভাবিক লজ্জায় তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন : 'ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে প্যালালি? না ভাই; মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারিনে।' (২ অ. ২ গ.) ভক্তপ্রসাদকে দেখে ফন্দির কথা তিনি ভুলে যান—'অভিসার'—অভিনয়ও তখন ঢাকা পড়ে নিদারুণ আতঙ্কে : 'পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।' (ঐ)

লম্পট ভক্তপ্রসাদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরে ফতেমার আনন্দ আর ধরে না—বিশেষতঃ এই মুহূর্তে স্বামীও তাঁর পাশেই রয়েছেন। 'যবন' বিদ্বেষী লম্পট জমিদারকে নিয়ে খানিকটা তামাশা করার এই মোক্ষম সময় : 'কত্তাবাবু? —নাড়োর মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্ছে না?' (২ অ. ২ গ.) —ফতেমার এই হাসি-মিশ্রিত বিষ-বাণ, সতীত্ব আর ধর্মের নিকট লাম্পট্যপনা ও বক-ধার্মিকতার পরাজয়েরই ইঙ্গিতবাহী।

প্রহসনটিতে সেকালের বাঙলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। মধুসূদন ছিলেন এই দু' সম্প্রদায়েরই বহির্ভূত এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। আর সেজন্যই সম্প্রদায় দুটোর চিত্র আঁকতে বসে, তাঁর দৃষ্টি কখনো কোনো সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। ফতেমা চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতেন; মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার এই মনোভাবের বিরোধী ছিল বলিয়াই, তিনি এখানে নির্বিচারে এই মুসলমান কৃষক নারীর চরিত্রটি আনিয়া যোগ করিয়াছেন।'[৩৪] ভক্তপ্রসাদের চরম লাম্পট্যপনার কাছে এই মুসলমান-বিদ্বেষী সংস্কার হেরে গেছে। কিন্তু বাচস্পতি হানিফের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সরল-সাধু ব্রাহ্মণ। হানিফের প্রতি তাঁর শতো সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও, তিনি 'যবন' সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন না।' হানিফের নিকট ভক্তপ্রসাদের হীন উদ্দেশ্যের কথা শোনে, বাচস্পতি বলেন, 'শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো।' (১অ. ২গ.)

মুসলমানের নাম শোনেই শিউরে ওঠার এ ব্যাধি, শুধু ব্রাহ্মণ সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিলো না—সাধারণ অনেক হিন্দুর মধ্যেও তা যে ব্যাপকহারে সংক্রমিত হয়েছিলো, এর প্রমাণ মেলে পুঁটির মুখের 'তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি' জাতীয় প্রবাদের মধ্যে। হানিফ গাজীর বাড়ীতে কুটনীপনা করার জন্য যেতে যেতেও পুঁটি বলেন, 'থু, থু। পাতি নেড়ে বেটাদের বাড়িতেও আসতে গা বমি করে।' (১অ. ২গ.) পুঁটির কাছে থেকে টাকা গ্রহণের সময়, ফতেমা

www.pathagar.com

তাঁকে সাবধান করে দেন, একথা যাতে কেউ টের না পায়। পুঁটি বলেন, 'আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিন্দু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।' ফতেমা হাসেনঃ 'মোরা রাঁড় হলি্য নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি।' (১অ. ২গ.) এই সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে ডঃ বৈদ্যনাথ শীল লিখেছেন, 'এই নিম্নস্তরের অশিক্ষিত মুসলমান চরিত্রগুলির তুলনায় শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু পরিবাব যে কত জঘন্য, মধুসূদন মাত্র সামান্য কয়েকটি কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেমা পুঁটিকে বলিতেছে,—"মোরা রাঁড় হল্যে নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি।" উক্তিটির মধ্য দিয়া হিন্দু বিধবাদের বাহিরের সংযমের ভড়ং এবং গোপন ব্যভিচারের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।'[৩৫]

হিন্দুদের এই 'যবন-নেড়ে' সংস্কারের পাশাপাশি, সাধারণ মুসলমানদের 'কাফের' সংস্কারও চোখে পড়ে। হানিফ গাজী রাগের চরম মুহূর্তে ভক্ত-প্রসাদকে গালি দেয়ার জন্য 'কাফের'-এর চেয়ে জঘন্যময় কোনো শব্দই বুঝি খুঁজে পাননি। আর এই ধরনের 'কাফের'দের জন্য সবচেয়ে বড়ো শাস্তিই হচ্ছে, 'গোরু খাওয়ায়ে' ছাড়া।

গদা ও রামের ক্ষণিকের জন্য বাবু সাজার মধ্য দিয়ে, সেকালের সামন্ত শ্রেণীর সুখ-ঐশ্বর্যময় জীবনের প্রতি, দরিদ্র প্রজা বা শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের মনেও যে একটি চাপা ঈর্ষা জাগতে শুরু করেছিলো, তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তপ্রসাদের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদাধর বলেন, 'আহা কি আরামের জিনিষ। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের মত্যো সুখী কি আর আছে ?' (২অ. ১গ.)

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতীয় গ্রন্থের আদিরসাত্মক কবিতা যে, সেকালে ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পটদের লাম্পট্যপনারই সহায়ক ছিলো, তার প্রতিও প্রহসনকার ইঙ্গিত দিয়েছেন,—ভক্তপ্রসাদের মুখের 'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া' প্রভৃতি পদ আওড়ানোর মধ্য দিয়ে।

তথ্য-নির্দেশিক

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫২, উদ্ধৃত, পৃঃ ৪০।

২ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬১, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৭৮-৭৯।

www.pathagar.com

৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১০।

৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩৫।

৫ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

৭ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মাইকেল-সমীক্ষা, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ২৫৯-৬০।

৮ ভবানী গোপাল সান্যাল, মধুসূদনের নাটক (সম্পাদনা), কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ২২১।

৯ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩।

১০ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শকাব্দ, ৬০ খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

১১ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

১২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩-৩৪।

১৩ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।

১৪ বাণী রায়, মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৫২।

১৫ শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, ঢাকা, ১৩৭৭, পৃঃ ৫৯।

১৬ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সরস নাটক, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ এগারো।

১৭ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।

১৮ 'কালান্তর', কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ২১০।

১৯ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, মধুসূদন কবি ও নাট্যকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

২০ যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩০২।

২১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১।

২২ নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, পৃঃ ৪৭, উদ্ধৃত, নীলিমা ইব্রাহিম, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৯১।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮, উদ্ধৃত, নীলিমা ইব্রাহিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১-৯২।

২৪ 'মধুসূদনের অন্তর্লোক' সম্বন্ধে ডঃ আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'যা কিছু দেশী তা পেল তাঁর তাচ্ছিল্য এবং যে-কিছু য়ুরোপীয় তা হল তাঁর বন্দ্য। বিয়ে করলেন য়ুরোপীয় মহিলা, পোষাক পরলেন য়ুরোপীয়, বাসা নিলেন সাহেব পাড়ায়, মদ খেলেন তাও সাহেবের মতো, কিন্তু কোনটাই তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা জাত নয়, জীবন রচনার ও সাধনায় সিদ্ধির অবলম্বন মাত্র।' বিচিত চিন্তা, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৩০৫।

২৫ শশাঙ্কমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

২৬ বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

২৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'নববাবু ইয়ং বেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি।' (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮)। এই সম্বন্ধে অজিত কুমার ঘোষ, নীলিমা ইব্রাহিম ও হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের বক্তব্য ও অনুরূপই বলা চলে। (বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭ ও ৯৯, বাংলার কবি মধুসূদন, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ৩০ ও ৩৯, এবং বাংলা

www.pathagar.com

নাট্যসাহিত্য পরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁদের এই বক্তব্যকে মেনে নিতে হলে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি অবিচার করা হবে বলেই আমরা মনে করি। সুরেশ চন্দ্র মৈত্র যথার্থই বলেছেন, তাঁরা ইয়ং বেঙ্গলের প্রকৃত স্বরূপ খতিয়ে দেখেন নি,। (বংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭)। আমাদের স্মরণ রাখতে হয়, নব বাবুর মতো ব্যক্তি 'ইয়ং বেঙ্গলে' কেউ কেউ ছিলেন, কিন্তু সকলেই নব বাবু ছিলেন না। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদনা)

২৮ একেই কি বলে সভ্যতা ? মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী, ঢাকা, ১৯৬৯, ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

২৯ ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৩০ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫০।

৩১ বাংলার কবি মধুসূদন, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ২৯।

৩২ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

৩৩ বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৩৪ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।

৩৫ বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ গর্বের সঙ্গেই একটি কথা দু'জায়গায় বলেছেন—'এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে?' এবং 'এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে?'[১] তাঁর এই নিঃসংশয়িত গর্ববোধের কারণ, একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে সেকালে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩ খ্রীঃ) বিশেষ প্রসিদ্ধি। একালেও তিনি প্রায় তুলনাবিহীনই বলা চলেঃ 'দীনবন্ধু বাংলা নাটকের করাঙ্গুলিগণনীয় দু'একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অন্যতম, কারও কারও মতে দুর্বল বাংলা নাটকের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।'[২] সুশীলকুমার দে লিখেছেন, 'নাট্যকার ও হাস্য-রসিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর একটি উচ্চ ও নিজস্ব স্থান আছে, যেখানে তাঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেই চলে।'[৩]

নাট্যকার হিসেবে দীনবন্ধুর সুখ্যাতি অর্জনের সূত্রপাত তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খ্রীঃ) রচনার মধ্য দিয়ে। 'নীল দর্পণ'-এর পর তাঁর খ্যাতি প্রধানতঃই নির্ভর করে 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসনের ওপর। 'নীল দর্পণ'-এর চরিত্রগুলো নাট্যকারের প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক সহানুভূতির ফলেই জীবন্ত হয়ে ওঠেছে—এবং এর ফলেই নাটকটি সেকালের বাঙালী সমাজ এমন কি তার বাইরেও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। প্রহসনগুলো রচনার সময়, সামাজিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত মধুসূদনের প্রহসন দুটো সম্মুখে থাকায়, দীনবন্ধুর সেই অভিজ্ঞতা-সহানুভূতি আরো ব্যাপক-বিস্তার লাভের সুযোগ পায়।

দীনবন্ধু একান্তভাবেই বাস্তববাদী লেখক। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেন, 'দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অগ্রদূত, এবং বোধ হয় তিনিই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক।'[৪] ভাব-কল্পনার বশবর্তী হয়ে উচ্চ-আদর্শশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে দীনবন্ধু বার বারই হোঁচট খেয়েছেন—আর সে জন্যই এসব চরিত্রের কৃত্রিমতা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। 'কিন্তু যেখানে তিনি উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত মানুষের চিত্র আঁকতে বসেছেন, কিংবা বিকৃত, অধঃপতিত ও ঘৃণিত মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোলতে চেয়েছেন সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দ, সরস ও উল্লসিত।'[৫] বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার

www.pathagar.com

ছিল না। ……কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণ মাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।'[৬] এসম্বন্ধে সুশীলকুমার দে'র বক্তব্যটিও খুবই সুন্দর ঃ 'রোমান্সে বা রোমান্টিকে কবি-কল্পনায় দীনবন্ধুর অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, তিনি চোখ দিয়া যেমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখিতেন চোখ বুজিয়া তেমন পারিতেন না। ‥ যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা আত্মগত কল্পনায় সুন্দর, তাহাতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না; কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত তাহাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য, দীনবন্ধু সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি।'[৭] দীনবন্ধুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তা রূপায়ণের দক্ষতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হোল ঃ 'দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।'[৮]

দীনবন্ধু তাঁর নাটক, বিশেষ করে প্রহসনগুলো ব্যাপক 'সামাজিক অভিজ্ঞতা' ও 'প্রবল এবং স্বাভাবিক স্বর্বব্যাপী সহানুভূতি'[৯] দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন বলেই সেগুলো তখনকার সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলো। 'বাঙালীর জীবন ও জগতের সহিত‥… বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাহাকে নাটকের আলেখ্য-পটে প্রতিফলিত করিবার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়া দীনবন্ধুর নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক রচনা হইয়াছে।……হাস্য-রসের যে অপূর্ব প্রেরণা ও আত্মভাব নিরপেক্ষ বাস্তব চেতনা তাঁহার নাট্য চিত্র-গুলিকে সরস ও জীবন্ত করিয়াছে, তাহা প্রকৃত নাট্য রসিকের উপযুক্ত। ‥ দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, বাঙালী জীবনের বিশিষ্ট রূপটি বোধ হয় আর কাহারো রচনায় এরূপ সুস্পষ্টভাবে মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই।'[১০] প্রধানতঃ দীনবন্ধুর প্রহসনেই সেকালের বাঙলার, বিশেষ করে কোলকাতার অনেক জীবন্ত ব্যক্তির দুষ্কৃতিপনার প্রতিচ্ছবি ও তার পরিণাম-দৃশ্য অত্যন্ত বাস্তব ও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। জনৈক বিদেশী সমালোচক যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, **'Dinabandhu proved his skill in portraying living characters of well-known personalities of the then Calcutta. The main target however, were certain social vices and survivals, in the spirit of the modernisation movement.'**[১১]

দীনবন্ধুর প্রহসন-অভিনয়ের মধ্য দিয়েই কোলকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এবং সে জন্যই গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে 'রংগালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার' করেছেন।[১২]

www.pathagar.com

দীনবন্ধু সর্বমোট চারটি প্রহসন রচনা করেছেন, এগুলো হচ্ছে— 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' ও 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী'কে কেউ কেউ প্রহসন জাতীয় রচনা বলে অভিহিত করলেও, মূলতঃ সেগুলো যে কমেডি-নাটক একথা অস্বীকার করা যায় না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'নীলদর্পণ'-এর পর দীনবন্ধুর খ্যাতি প্রধানতঃ নির্ভর করে তাঁর প্রহসনগুলোর ওপর। প্রহসন রচনার মাধ্যমেই তিনি 'অবিসংবাদিত রূপে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক'[১৩] -এর মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু 'রুচিবাগীশ মহলে' দীনবন্ধুর রুচি-বোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠেছে:[১৪] 'দীন বন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মধ্যে হাস্যরসের নামে......গ্রাম্যতার প্রয়োগই আমরা বেশী দেখিতে পাই। শুধু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' কেন, দীনবন্ধুর কোনো প্রহসনই এই গ্রাম্যতাকে একেবারে, বিসর্জন দিতে পারে নাই।'[১৫]

দীনবন্ধুর রুচি-বোধ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আদি প্রশ্নকর্তা। 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।'[১৬] কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা হয়নি—' ভালই হইয়াছে আমরা "নিমচাঁদ"'কে দেখিতে পাইয়াছি।'[১৭] বঙ্কিম চন্দ্র যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন......তোরাপের সৃষ্টি কালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না।......নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না··· ···তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ··· ···দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, ...ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'[১৮] তা'ছাড়া আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করার মতো। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন; 'আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেট খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।'[১৯] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'দীনবন্ধু প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর হাস্যরসিক।'[২০] সেকালের সমাজে এ প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসিকদেরই কদর ছিলো। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, 'দীনবন্ধুকে বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরস পরিবেশকদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিতে হয়। ··· ··· দীনবন্ধু যখন তাঁহার নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন,

www.pathagar.com

তখন সমাজে মোটা রসিকতার আদর ছিল এবং তিনি যে সকল নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের পক্ষে ঐ মোটা রসিকতার বিকাশ করাই স্বাভাবিক ছিল।'[২১]

দুই

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো"—জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।'[২২] একদিকে প্রহসনকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অপর দিকে তাঁর শিল্পী-মনের সহানুভূতি-স্পর্শ লাভ করে, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র চরিত্রগুলো খুবই জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। প্রাচীনপন্থীরা এতে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে থাকলেও,[২৩] নব্যপন্থীদের নিকট কিন্তু প্রহসনটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। 'বেঙ্গলী' লিখেন, 'Baboo Dinabundhoo Mitter, has favoured us with a copy of his new comedy, which we should have noticed three months earlier but that the book was undergoing a wide tour amongst friends, relatives and acquaintances, from which we have at last succeeded with difficulty in rescuing it. This fact ought perhaps to suffice for a criticism on the work, as it undoubtedly is the best and truest criticism on it.'[২৪]

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কোথাও কোথাও যে কিছুটা অতিরঞ্জিত-দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রহসনের জন্য এটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। কিন্তু 'এই প্রহসনখানির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তরল কৌতুকরসের উদ্দাম স্রোত উন্মুক্ত করে দেওয়া। এ কৌতুক রসের মধ্যে কোনো গভীরতা, কোনো প্রচ্ছন্ন ভাব ও ভাবনা নেই। শুধু কেবল ঠাট্টা, ইয়ার্কি ও রসিকতার আতিশয্যই এ প্রহসনের সর্বত্র দৃশ্যমান।'[২৫] এরূপ মন্তব্য মেনে নিতে কষ্ট হয়। আমাদের মনে হয়, বিষয়টির প্রতি আর একবার দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসন—আনন্দ কৌতুকই এর মূল উপাদান। তবে সে আনন্দ কৌতুক সৃষ্টির পেছনেও প্রহসনকারের বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিলো—এবং সমাজের মধ্যে এক সময়ে তা বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করেছিলো। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র সমালোচনা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ইহার প্রত্যেক চরিত্রেরই এক একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ·· ··· নাট্যকার এই সকল চরিত্র বাস্তব জগৎ হইতে আপনার সহানুভূতির বলে উদ্ধার করিয়া চিরন্তন সৃষ্টি রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।'[২৬]

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র নাট্য-কাহিনীটি এরূপ ঃ গ্রাম্য সমাজের নেতা রাজীব মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়ে পুনরায় বিবাহ করার জন্য অস্থির হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছেন। মাথার ওপর শকুনি উড়তে থাকলেও, দলাদলি আর পরনিন্দায় তিনি সমাজের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি তাঁর বিধবা মেয়ে রামমণি ও গৌরমণির চিন্তার কারণ—গ্রাম্য যুবক নসিরাম, রতা, ভুবন মোহন, গোপাল প্রমুখের উপহাসের পাত্র।

বিবাহের জন্য রাজীব বাবুর চেষ্টা চরিত্রের কসুর নেই—অর্থ সম্পদও সেজন্য কম নষ্ট করেননি। কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নিজেরই বয়স। অবশ্য সেজন্যও তিনি কম সচেতন নন। সুযোগ পেলেই বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর বয়স লুকিয়ে যুবক সাজার চেষ্টা করেন। গ্রামের এক বৃদ্ধা ডুমনী বিধবা পেঁচোর মা বাদ না সাধলে হয়তো সে চেষ্টায় সফলতাও আসতে পারতো। পেঁচোর মা নাকি বলেছেন, রাজীব বাবু তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। সেজন্য রাজীব বাবুর ক্ষোভের অন্ত নেই—পেঁচোর মার নাম শোনলেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। এতে আবার পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেদের তামাশার সুযোগ মিলেছে। তাঁরা রাজীব বাবুকে দেখলেই সমস্বরে বলতে থাকেন—'বুড়ো বামনা বোকা বর, পেঁচোর মারে বিয়ে কর।' রাজীব বাবু দৌড়ে গিয়ে তাঁদের নাগাল পান না বলেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন না।

গ্রামের যুবকরা বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীবকে জব্দ করার জন্য ফন্দি আঁটেন। তাঁদের পরামর্শে এক ব্যক্তি ঘটক সেজে রাজীব বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। ঘটকের নিকট কনের অল্প বয়স আর রূপ-গুণের প্রশংসা শোনে বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। একমাত্র সমস্যা হোল বরের বয়স, কন্যা-পক্ষের কাছে তা ফাঁস হয়ে পড়লে যে সবই ভেস্তে যাবে—তাছাড়া চারদিকে শত্রুরওতো আর অভাব নেই! তাই যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে, এবং সম্পূর্ণ তাড়া-হুড়োর মধ্য দিয়েই বিবাহের দিনক্ষণ-স্থান প্রভৃতি ঠিক করা হয়।

রাজীব বাবু শুয়ে আছেন। আসন্ন বিবাহের দিবা স্বপ্নে, তাঁর চোখের পাতায় নেমে এসেছে সুখ-তন্দ্রা। এমন সময় নসি-রতার দল জানালার বাইরে থেকে তাঁর 'আঙ্গুলের গলিতে' একটি কাঁটা ফুটিয়ে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি সোলার সাপও তাঁর গায়ে ছুড়ে ফেলে, তখনই আবার তা টেনে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। সাপে কামড়িয়েছে মনে করে, চিৎকারে ফেটে পড়েন রাজীব বাবু। এদিকে যুবকদের কেউ কেউ স্বাভাবিকভাবে ফিরে এসে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন, এবং বিখ্যাত ওঝার ছেলে রতাকে ডেকে এনে বিষ নামানোর পরামর্শ দেন। রতা নাপ্তে 'ছোট লোক' হয়েও স্কুলে পড়েন, এবং বিভিন্নভাবে রাজীব বাবুকে জ্বালিয়ে মারেন বলে, তাঁর প্রতি বৃদ্ধের অসন্তোষের অন্ত নেই। কিন্তু বিপদের সময়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে, সেই রতানাপ্তের অসহ্য কিল-চড় ও ঝাঁটা-পেটার অমোঘ মন্ত্রের ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

www.pathagar.com

বিবাহের দিন উপস্থিত। রতা সাজেন কনে এবং দলের অন্যান্যরা কনের বেয়ান-সালাজ প্রভৃতি সাজেন। তাছাড়া আরো কয়েকজন লোককে, কনের কাকা মেসো দাদা প্রভৃতি সাজানো হয়। যথা সময়ে রাজীববাবুও বর সেজে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেও বরের বয়স নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু বরের প্রতি কনের দাদা ও পুরোহিতের সমর্থন থাকায়, 'শুভ' কর্মটি শীঘ্রই সম্পন্ন হয়ে যায়।

বাসর ঘরে বৃদ্ধকে নিয়ে কনের আত্মীয়ারা বিভিন্ন প্রকার তামাশা করেন। যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে, বৃদ্ধ যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন: 'সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুণ কচি পাতা, তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গঙ্গামণ্ডল, তোমার গোলামকে একবার মুখখানা দেখাও, আমার স্বর্গলাভ হক।' এক সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রঙ্গরসের আলাপও জমে ওঠে, এবং এর মধ্য দিয়েই রাত পুইয়ে যায়।

রাজীববাবু স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। রামমণি ও গৌরমণি অনন্যোপায় হয়েই তাঁদের নতুন মা'কে বরণ করে নিতে আসেন। কিন্তু ঘটকের পরামর্শে, রাজীববাবু তাঁদেরকে বউ-স্পর্শ করতে দিতে চান না। গৌরমণি বলেন, 'আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাইনে তুমিই একবার মুখ টো দেখাও।' এ সময়ে পাড়ার ছেলেরাও বলতে শুরু করেন, 'বুরো বামুনা বোকা বর, পেঁচোর মারে বিয়ে কর।' ক্রোধে জ্বলে ওঠেন রাজীববাবু: 'দূর বেটারা পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ্।' কিন্তু একি! 'কনের অবগুণ্ঠন মোচন করেই রাজীববাবু হতাশায় ভেঙে পড়েন— এযে সত্যি সত্যিই পেঁচোর মা!

সেকালের সমাজে রাজীববাবুর মতো বৃদ্ধদের বিবাহ-বাতিক ছিলো একটি দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধি অনেক সময় তাঁদেরকে এতোই কাণ্ড-জ্ঞানহীন করে তুলতো যে, নসি-রতার মতো যুবক, এমন কি বালকরাও সেজন্য কৌতুকবোধ ও তামাশা না করে থাকতে পারতেন না। কিন্তু এতেও যে অনেক সময় বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধদের শুভ বুদ্ধির উদয় হত না, তার বাস্তব প্রমাণ গ্রাম্য সমাজের নেতা—বিয়ে পাগলা বুড়ো রাজীব মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। ষাট বছর বয়সে বিপত্নীক হয়েও তিনি পুনরায় বিবাহ করার জন্য উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু নিজের যুবতী বিধবা মেয়ে গৌরমণির বিবাহ সম্বন্ধে কথা বলায়, তিনি ইন্সপেক্টরবাবুর ওপর ভীষণ চটা। বিধবা বিবাহের প্রতি তাঁর প্রবল আপত্তি যে, সেকালের অনেক প্রাচীন হিন্দুর মতো নীতিগত, তা নয়। বস্তুতঃ বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন ওঠলে তিনি ভয় পান, এবং সে ভয়ের মূলে রয়েছে, তাঁর নিজের বিবাহ-প্রচেষ্টায় অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার একটি গোপন দুর্ভাবনা। তাঁর পক্ষে

www.pathagar.com

বিধবাবিবাহের সমর্থন করার মানেই হচ্ছে, স্বীয় যুবতী বিবধা মেয়ের বিবাহ সমন্ধে চিন্তা করা। কিন্তু সেজন্য তাঁর অবকাশ কই—শতো চেষ্টা চরিত্র করেও যে নিজের বিবাহেরই কোন একটি ব্যবস্থা করে ওঠতে পারছেন না। মেয়েরাও তার জন্য স্বাভাবিক কারণেই কোনরূপ উৎসাহ দেখাতে পারেন না—রাজীব বাবুর চরম দুঃখ এখানেই। কনে-বেশি রতাকে তিনি বলেন. 'প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ হতে ছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল করলে। আমি যে জ্বালা পেয়েছি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না।'[২৭] যে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কথা বলায় তিনি ইন্সপেক্টর বাবুর ওপর চটেছেন, তাঁকে 'ক্রিস্চান ব্যাটা' বলে গালি দিয়েছিলেন, নিজেই বিবাহের সময় কনে পক্ষীয়দের মন যোগাতে গিয়ে, সে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেই তিনি বলেন, 'বিধবাবিবাহ দেওয়া অতি কর্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোশামুদে বুড়বকেরা, বার্ষিক খেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।' (২অ. ১গ.)

রাজীববাবুর বিবাহের প্রধান সমস্যা তাঁর বয়সাধিক্য। কিন্তু এ সমস্যাটিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। পেঁচোর মা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, রাজীববাবুর চেয়ে তাঁর বয়স কম। এতে রাজীববাবু তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন—পাতের ভাতগুলো পেঁচোর মার গায়ে ছিটিয়ে ফেলেন, এবং এঁটো হাতে তাঁকে চড়-চাপড় মারতে শুরু করেন। তামাশা দেখার জন্য লোকের ভীড় জমে উঠে—রাজীববাবুর ক্রোধ কিন্তু তখনও উচ্চগ্রামেঃ 'দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে, বেটী এখন কিনা বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটীকে ঐরূপ দেখিচি।' (১অ. ১গ.) অবসর মুহূর্তেও রাজীববাবু পেঁচোর মার কথা শুনে শিউরে ওঠেনঃ 'পেঁচোর মা বেটীই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রামময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ি গমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—এ কথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে। ··· ··· বেটীকে দেখলে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটীকে বলতে বলি পেঁচো যেবার মরে সেইবার আমি হই—আমার ভারত ছাড়া বেটীর নাম কচ্চি, বেটীর মুখভঙ্গিমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়।' (১অ. ২গ.) কিন্তু পেঁচোর মার চেয়েও বড়ো দুশমন বুঝি অবস্থান করেছে রাজীববাবুর নিজের মনেই। পাড়ার ছেলেরা যখন তাঁকেই দেখলেই 'বুড়ো বামনা বোকা বর, পেঁচোর মারে বিয়ে কর' বলে তামাশা শুরু করেন, তখন আর রাজীববাবুর অসহায়-আক্ষেপের সীমা থাকে নাঃ 'যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মরচে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারিনে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।' (১অ. ১গ.)

www.pathagar.com

দুজন অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ-অতিথি রাজীব বাবুর বাড়ীতে রাত কাটাবার প্রার্থনা জানালে, রাজীববাবু বলেন, 'কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—যা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়ো হাবড়া (জিব কেটে স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা আন্দোলন কত্তে চাইনে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাবড়া" বলে ফেল্যেম।' (১অ. ২গ.) ঘটক এসেছেন রাজীববাবুর বিবাহের কথা বলতে। রাজীববাবু 'কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট। খুলিলে মনের দ্বার, না লাগে কপাট'—জাতীয় আদি রসাত্মক কবিতা আওড়িয়ে নিজের বার্ধক্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু পরে হঠাৎ রামমণির আগমনে সবই বুঝি ভেস্তে যাবার উপক্রম। মেয়ের সঙ্গে রাজীববাবুর সে মুহূর্তের কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'রাম। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো ?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো, পাজী বেটী, ...
ও'য়ার বাবা কেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে নয়, শূলের ব্যথায় মচ্ছেন, দুদ—

রাজী। তোরার সাত গোষ্টির শূল হোক—পাজী বেটী, দূরহ এখান থেকে, কড়ে রাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন ধরে বিয়ে করগে।' (১ অ. ২ গ.)

রাজীববাবু প্রথমে রামমণি যে তাঁর মেয়ে নয়, এবং পরে মেয়েটির জন্ম যে তাঁর বিবাহের পূর্বেই হয়েছিলো, একথা ঘটকের নিকট প্রমাণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। ঘটক প্রশ্ন করেন, 'তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক ফিরেছিলেন ?' উত্তরে রাজীববাবু বলেন, 'কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তাকি আমার মনে আছে। সে কি আজকের কথা—আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলিচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জান্‌লে জান্‌লে, শাশুড়ী ঠাকুরণকে একথা বল না, তোমারে খুশী করবো।' (১ অ. ২ গ.) নসি-রতার পরিকল্পিত বাসর ঘরে রাজীব বাবু অনেক আদি রসাত্মক কবিতা আওড়ান। কিন্তু সেখানেও তাঁর গাওয়া একটি গানের অংশ বিশেষ লক্ষ্য করার মতো ঃ

'মন মজরে হরিপদে.
মিছে মায়া, কেবল ছায়া ভুলনা মন আমোদ মদে।' (২ অ. ২ গ.)

আসল কথা যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও রাজীব বাবুর বার্ধক্যজনিত মানসিক অবস্থা তাঁর নিজের অজান্তেই বার বার ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। বিবাহ-বাতিকের ফলেই তিনি তাঁর বয়স লুকিয়ে যুবক সাজার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু বার্ধক্য

www.pathagar.com

জনিত অসহায়তা থেকে কখনো তিনি নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন নি। প্রধানতঃ তাঁর বিবাহের প্রতি সমর্থন না থাকার ফলেই নিজের বিধবা মেয়ে রামমণিকেও তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু প্রতিটি বিপদের সময়ে, সেই রামমণিকেই তাঁকে স্মরণ করতে হয় অসহায় অবুঝ বালকের মতো। রাতের বেলায় রাজীব বাবু তাঁর বিবাহের দিবাস্বপ্নে মগ্ন। এমন সময় কে যেনো বারবার দরজায় আঘাত করতে থাকেন। রাজীব বাবু বলেন, 'রাত্রিদিন ঠক্ ঠক্—কে-ও, কথা কয় না কেবল ঠক্ ঠক্—দরজাটা ভেঙ্গে ফেল্যে, কে-ও, রামমণিকে ডাকবো নাকি'? (১ অ. ২ গ.) নসি-রতার পরিকল্পিত বাসরঘরে রাজীব বাবুকে নিয়ে তামাশা চলেছে। কিন্তু নারীবেশী বালকদের কানমলা খেয়ে বৃদ্ধ বরের প্রাণ বুঝি ওষ্ঠাগত ঃ 'উঃ বাবা।—লাগে মা...মলেম গিচি ··· মেরে ফেললে—দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।' (২ অ. ২ গ.)—এর চেয়ে সামর্থ্যহীন-অসহায়তা একজন মানুষের জীবনে আর কি-ই-বা থাকতে পারে।

তবু, স্বভাবের দোষেই এ ধরনের লোকেরাও সেদিন বিবাহের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠতেন। মানবিক কারণে, ধর্মীয় জনহিতকর কাজের জন্য যাঁরা একটি পয়সা ব্যয় করতে রাজী হতেন না, বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহের জন্য তাঁরাই প্রচুর অর্থসম্পত্তি অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। যে রাজীব মুখুজ্যে, শতো অনুরোধ সত্ত্বেও কণক বাবুর বাগানের নিকটের ব্রহ্মত্তর সম্পত্তিটুকুন তাঁর নিকট বিক্রি করতে রাজী হচ্ছিলেন না—বিবাহের আশায় তিনিই কনক বাবুর নিকট সে সম্পত্তি বিক্রি করে মনে মনে উৎফুল্লিত হয়ে ওঠেন, অবশ্য সে উৎফুল্লতাও দুশ্চিন্তা-মুক্ত নয়, ঃ 'কনক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কনক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘরদরোজায় আগুন লাগাবো।' (১ অ. ২ গ.) যিনি স্কুলের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে বলেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোথা হতে টাকা দেব ?' (১ অ. ১ গ.) তিনিই ঘটককে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেন, 'তোমারে খুশী করবো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো।' (১অ. ২ গ.) বিবাহ-প্রহসনের দিনে কনে পক্ষীয়রা রাজীব বাবুকে জানান যে, তাঁদের বাড়ীর জামাইকে নাপিত দিয়ে ঘরে তোলার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু উপস্থিত দুর্বল নাপিত বৈকুণ্ঠ, বৃদ্ধ বরকে কোলে করে ঘরে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করায় রাজীব বাবু বলেন, 'ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায় ? এ কথা কেন আগে বলো নাই, আমি একজন বলবান নাপিত আন্‌তেম, না হয় এর জন্যে এক বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যেতো।' (২ অ. ১ গ.) রাজীব বাবু বিধবা বিবাহের প্রবল বিরোধী, কিন্তু স্বীয় বিধবা মেয়ের ব্রত পালনের ব্যাপারে সামান্যতম অর্থ ব্যয় করতে নারাজ। রামমণি অত্যন্ত আক্ষেপ করেই বলেন, 'আমার ব্রতটা

১৪—

www.pathagar.com

পচে গেল তবু বাবা দুটি টাকা দিতে পারলেম না, শুনুচি ঘটক মিনসেকে সাড়ে বারো গণ্ডা টাকা দিয়েছেন।' (১. অ. ৩ গ.)

সেকালের সমাজের রাজীব বাবুর মতো ব্যক্তিদের অর্থ বিত্তের প্রাচুর্যের মূলে অনেক ক্ষেত্রেই থাকতো অপসঞ্চয়। রাজীব বাবু তাঁর দৌহিত্র সুশীলকে বলেন,'কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সে তো বাহাদুর।' কিন্তু সুশীল জানান যে, সকল প্রকার 'প্রবঞ্চনা' আর 'উপরি' প্রাপ্তির ব্যাপারকেই তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন। রাজীব বাবু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন : 'তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়াতে দিয়েচে—কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্হা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম একটা কদুত্তর করে বসলে।' (১ অ. ৩ গ.) কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর বর্তমান আর্থিক-প্রতিষ্ঠার মূলে অতীতের যে কর্ম-জীবন রয়েছে, তারও একটি পরিচয় তুলে ধরেন : 'আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর করতেম তাহলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না,—একবার আমারে চুন কিনতে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখলেম আর বালি মিসুয়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে।' (ঐ)

রাজীব বাবু সেকালের বিশ্বনিন্দুক, নীতিহীন ব্যক্তি ও দলাদলিপ্রিয় গ্রাম্য সমাজের নেতাদের প্রতিভূ। জনহিতকর কাজ বা বিধবা মেয়েদের আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রভৃতির জন্য তিনি সামান্যতম অর্থ ব্যয় না করলেও, দালালির জন্য নিজের বাগান পর্যন্ত বিক্রি করতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি ভুবনের মামাদের একবছর যাবৎ অনর্থকই এক ঘরে করে রেখেছেন, অথচ দোষী কালী ঘোষকে রেখেছেন সমাজভুক্ত করে। তাছাড়া 'চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগুনো দেইনি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না; ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলেন না, দু-শ লোকের ভাত পচালে।' (১অ. ১গ.) জমিদারের নায়েব-মোসায়েবরাও রাজীব বাবুর হাতে। রতাকে তিনি বলেন, 'দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো।' (ঐ) কেশব বাবুকে গ্রামের সকলে ভালো বললেও, রাজীব বাবু বলেন, 'কলেজে পড়ে যখন জল পানি পেয়েছে তখন ওর আর জাত কি? '(ঐ) রতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'নাপতের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে। (ঐ) কলেজের ছেলেরা যে সব সময় সত্যি কথা বলেন, রাজীব বাবু এর পেছনেও কোনো প্রকার যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। সুশীলকে তিনি বলেন, 'তোমাদের একালে কেমন একরকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না. ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন দাঁও পঁ্যাচের দ্বারা অর্থলাভ হয় তখন মিথ্যা বলতে দোষ নাই।' (১অ.৩গ.)

www.pathagar.com

ইংরেজী পড়া বা 'ছোট' জাতের লোকদের লেখাপড়া শেখাতে তিনি সুনজরে দেখেন না সত্যি, কিন্তু রতা যখন তাঁকে 'মহাশয়ের গৃহশূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত'—বলে সান্ত্বনা দেন, তখন তিনি বলেন; 'তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়তে দেব।' (১অ. ১গ.) নসি-রতার পরিকল্পিত বিবাহের আসরে বিশেষ এক সঙ্কটময় মুহূর্তে, কনের ভাইকে তিনি বলেন, 'আমি ··· তোমার ইংরাজি জুতার ফিতে' ইত্যাদি। (২অ. ১গ.)

সেকালের সমাজে রাজীব বাবুর মতো ব্যক্তিরা কথায় কথায় আদিরসাত্মক কবিতা আওড়িয়ে নিজেদের রসিক-মনের পরিচয় ব্যক্ত করতে চাইতেন। ঘটককে দেখে রাজীব বাবু বলেন ঃ

'কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট।
খুলিলে মনের দ্বার, না লাগে কপাট।।'

সে সময়ে তিনি ঘটককে সন্তুষ্ট করার জন্য আরো কয়েকটি কবিতাও আওড়ান ঃ

'পংকজ মূল ভালকি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে।।
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত।।' (১অ. ২গ.)

তাঁর আওড়ানো অন্য একটি কবিতার নিদর্শনস্বরূপ ঃ

'কুচ হতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে,
কাঁদেরে কলংক চাঁদ মৃগলয়ে কোলে—।'

কবিতাটির সংশোধিত পাঠ শোনা যায় ঘটকের কণ্ঠে ঃ

'কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে।।' (১অ. ২গ.)

রাজীব বাবু সে জন্য ঘটকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরেসুরে নেবেন, বলবেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।' (ঐ)

বাসরঘর—প্রহসনেও স্ত্রী-বেশী রতার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজীব বাবু বলেন—

'তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উলটা কড়া সম যোড়া কুচ যোড়ে বুক।'—ইত্যাদি। (২অ. ২গ.)

প্রহসনটির কোনো দৃশ্যেই মদ পান করার বর্ণনা নেই। কিন্তু রাজীব বাবুর মতো ব্যক্তিদের জীবনে যে, অনেক ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতারও অভাব থাকতো না, তার প্রমাণ মেলে রাজীব বাবুর একটি কথাতেই। নসি-রতার পরিকল্পিত

www.pathagar.com

সাপের কামড় খেয়ে রাজীব বাবু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। ওঝা-বেশী রতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসছে ?' উত্তরে রাজীব বাবু বলেন, 'খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে, আমি যেন মদ খেইচি।' (১অ.২গ.) রাজীব বাবুর মতো ব্যক্তিদের নিকট সেকালের প্রসিদ্ধ বাইজীর নাচ ছিলো খুবই উপভোগ্য। বাসরঘরে কনের আত্মীয়া-বেশী মেয়েদেরকে রাজীব বাবু বলেন, 'তোমরা মেয়েমানুষ, বাইনাচ কর আমি শুনি।' (২অ. ২গ.) এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয়েও রাজীব বাবু কুলীন ব্রাহ্মণ—তাঁর গলায় উপবিত, গায়ে নামাবলি। পে'চোর মার কাছে রাজীব বাবুর এ উপবিত ও তিতে ডোমের শুকরের গলার দড়ির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, 'দড়ি থাক্‌লি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না ? তিতে ডোমের এ'ড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লে গেচে।' (১অ. ৩গ.) ভুবনও, রাজীব বাবু স্নান করতে নামলে, তাঁর নামাবলিতে 'পাঁটার নাড়িভুড়ি' বে'ধে রাখার চেয়ে বড়ো তামাশা আর কিছু খ'ুজে পান নি।

তৎকালীন সমাজে নারীদের দুর্দশার কিছু চিত্রও প্রহসনটিতে পাওয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে অনেক সময় মা-বাবা ত'াদের মেয়েদের বৃদ্ধ ও অযোগ্য বরের হাতে তুলে দিতেন। এমনকি অর্থের লোভে পড়ে কোনো কোনো মা বাবা ত'াদের মেয়েদেরকে গণিকালয়ে বিক্রী করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। রাজীব-বাবুর বিবাহের কথা শোনে রামমণি বলেন, 'টাকায় না হয় কি ? টাকা নিয়ে মেয়ে মেচো বাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারেন ?' (১অ ৩গ.) সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় মেয়েরা আনন্দিত—কিন্তু বিধবা বিবাহ আইন পাস হলেও, সমাজের সর্বস্তরে তখন পর্যন্ত তা প্রচলিত হয়ে ওঠেনি বলে মেয়েদের, বিশেষ করে বালিকা বিধবাদের দুঃখের শেষ নেই। গৌরমণি রামমণিকে বলেন, 'আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা, কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্ছে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না।' (১অ. ৩গ.) একাদশীর মর্মান্তিক যাতনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দিদি ! বালিকা বিবাহের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না।' (ঐ) এর চেয়ে বুঝি সহমরণও ভালো ছিলো—গৌরমণি বলেন, 'দিদি বিধবা হওয়ার মত সব্বর্নাশ তো আর নাই, তাতেই আগে সমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।' (ঐ) কোনো কোনো সময়ে বিধবাদের যে পদস্খলনও হোত, তার ইঙ্গিতও প্রহসনটিতে রয়েছে। রামমণি বলেন, 'বাবা পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না।' (ঐ) গৌরমণি বল্লেন, 'বাবা ভাবেন

www.pathagar.com

কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্যে।' (ঐ) শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধান থাকলেও প্রাচীনপন্থীরা এর সমর্থন করতেন না। গৌরমণি অত্যন্ত দুঃখ করেই বলেন, 'সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে আমাদের শাস্ত্রে বিধবা বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, ··· সব লোক মূর্খ কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।'(ঐ) তথাকথিত একদল পণ্ডিত তখন বিধবা বিবাহ প্রভৃতির পক্ষে মত না দিতে পারলেও অর্থ পেলে সকল প্রকার দুষ্কর্মেরই সমর্থন যোগাতেন। রতা নাকি পেঁচোর মাকে জানিয়েছেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ হবার ব্যবস্থা দিয়েছেন। পেঁচোর মার মুখে একথা শুনে রামমণি বলেন, 'নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েছে।' পেঁচোর মা জবাব দেন, 'ট্যাকা পালি তানারা গরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোরবের বস্তা তো তুশ্চু কথা।' (ঐ) জাতপাঁত সমন্ধেও পেঁচোর মার মনে প্রশ্ন জাগে—গৌর-মণিকে তিনি বলেন, 'ডুম্‌নি বাম্‌নিতি তপাতটা কি ? তোমরাও পেট জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও পেট জ্বলে উট্‌লি খাতি চাই'··· 'তোমার বাবা মরিলেও বুকি বাঁশ, মুই মলেও বুকি বাঁশ।' (ঐ)

সেকালে, রাজীব বাবুর মতো মূর্খ-বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও 'বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী' ও 'ভাবিতে উচিত ছিল যখন জাতীয় প্রবাদ আওড়িয়ে নিজেদের 'পাণ্ডিত্ব' জাহিরে চেষ্টা করতেন। পেঁচোর মার স্বামীর নাম রামজি ছিলো—তাঁর 'মিন্‌সের নামে বাদে' বলে তিনি রতার নামও মুখে নেন না। বালিকা বিধবা গৌরমণির স্বপ্নঃ 'কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পাল্‌কিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো." আর পুত্র বলেন 'মা আমি তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্চি।' (১অ. ৩গ.) রাজীব বাবুকে নসি-রতার পরিকল্পিত সাপে কামড়ালে, রামমণি চিৎকার করতে থাকেন, 'ওগো তোমরা এসো গো—আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।' (২অ, ২গ.) সাপের কামড় খেয়ে রাজীব বাবু বাঁচার আশা ছেড়ে দেন। রামমণিকে তিনি বলেন, 'অন্তিমকালে—তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও।' (ঐ)—এ সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজের আচার সংস্কার প্রভৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রকাশনার বছরেই (১৮৬৬ খৃীঃ) দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'সধবার একাদশী'ও প্রকাশিত হয়। 'সধবার একাদশী'—রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; হালকা হাসি

www.pathagar.com

ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ছলে যুগজীবনের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি তিনি ভিন্ন আর কেহ রচনা করিতে পারিতেন না। এই নাটকখানি উচ্চস্তরের সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন।'[২৮] বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাগুলির জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা।'[২৯]

সধবার একাদশী সেকালের একদল উচ্চশিক্ষিত ও তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক অধোগতির বাস্তব চিত্র। মদ্যপান ও লাম্পট্যপনা প্রভৃতির ফলে এ সমস্ত ব্যক্তি, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের শান্তি-সুস্থতাকে কিভাবে বিনষ্ট করেছিলেন, নিমচাঁদ বা অটল বিহারীর মতো চরিত্রের মাধ্যমে দীনবন্ধু সে-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। সুশীল কুমার দে লিখেছেন; 'দীনবন্ধুর হাস্যরস ও নাট্য প্রতিভার চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার সধবার একাদশী নাটকে। সে-যুগের প্রাচীনপন্থী বাঙালী সমাজে রাজীব লোচনের মত ব্যক্তি যেমন গ্রাম্য মূঢ়তা ও দুর্বুদ্ধিতার চরমে পৌঁছিয়াছিল, তেমনি সহরে সভ্যতাভিমানী নব্য শিক্ষিত, অথবা ধনশালী অর্দ্ধশিক্ষিত, সমাজে একটা বিসদৃশ আদর্শ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল—যাহার ফলে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল ও অটল বিহারীর মত নগর-বিহারী ধনীর দুলাল দুলর্ভ ছিল না। এই সাময়িক উপকরণ দীনবন্ধুকে প্রেরিত করিয়াছিল।'[৩০] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, 'দীনবন্ধুর যে অনুভূতিশীল হৃদয় একদিন পল্লীর নীল-চাষীদের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া কাতর হইয়াছিল, তাহাই সমসাময়িক নাগরিক সভ্যতার এক কদর্য রূপ দেখিয়া সেদিন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। 'সধবার একাদশী'র মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে।'[৩১]

দীনবন্ধুর 'রুচিহীনতা'র প্রশ্নটি 'সধবার একাদশী'কে কেন্দ্র করেই বিশেষ-ভাবে উত্থাপিত। বঙ্কিমচন্দ্র যে 'বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে'র দোহাই দিয়ে, দীনবন্ধুকে প্রহসনটি প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, একথা বর্তমান পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন, 'ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ।'[৩২] অথচ সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র দীনবন্ধুর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা একবার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে সন্দেহ নাই।'[৩৩]

'সধবার একাদশী'র গল্প-সংক্ষেপ হোল—অটল বিহারী কোলকাতার এক ধনী ব্যক্তি। জীবনচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। তিনি গৌরমোহন আঢ্য এবং হেয়ার সাহেবের স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেছেন। নিমচাঁদ প্রমুখ মদ্যপ বন্ধুর

www.pathagar.com

প্ররোচনায় অটল মদ পান করতে শুরু করেছেন। এবং তিনি তাঁর সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী কুমুদিনীকে ঘরে রেখে, কোলকাতার সব'চে উঁচুদরের বেশ্যা কাঞ্চনকে রক্ষিতা করে নিয়েছেন। নিমচাঁদ-অটলের বেপরোয়া মদ্যপান ও মাতলামিতে সকলেই অতিষ্ঠ—অসামাজিক বেলেল্লাপনার জন্য সমাজে তাঁরা উপহাসের পাত্র।

গোকুলচন্দ্র অটলের খুড়শ্বশুর। জীবনচন্দ্র অটলকে গোকুল বাবুর হৌসের কাজে নিযুক্ত করে, তাঁর নৈতিক চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ জীবনচন্দ্রকে পরামর্শ দেন—অটলকে নিয়ে কাশিযাত্রার জন্য। কিন্তু অটলের আপত্তির জন্য এর কোনোটিই হয়ে ওঠে না।

অটলের মা পুত্রস্নেহে অন্ধ—তাঁর আস্কারা অটলের উচ্ছন্নে যাবার প্রধান সহায়ক। তিনি অনেক বলে কয়ে তাঁর আদরের ছেলেকে কাঞ্চনের হাতে সঁপে দিয়েছেন। জীবনচন্দ্রও স্ত্রীর নিকট অনেকটা অসহায়। তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে ছেলের রক্ষিতার জন্য অর্থের যোগান দিতে হয়। কিন্তু এতো কিছুর পরও কাঞ্চন শুধু অটলকে নিয়েই সন্তুষ্ট নন—নকুলেশ্বরের বাগান বাড়ীতেও তাঁর যাতায়াত রয়েছে। একথা জানতে পেরে, অটলের আর দুঃখের অন্ত থাকে না—তিনি গলায় রুমাল বেঁধে মোড়া দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কাঞ্চন চিন্তান্বিতা হয়ে পড়েন—অটলের মা কেঁদে ওঠেন, 'ও কাঞ্চন, তুমি আমার ছেলে একেবারে মেরে ফেলেছ ?' কিছুক্ষণের মধ্যেই অটলের জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু কাঞ্চন তখন রাগ করে চলে যান।

কাঞ্চন চলে গেলে, অটল মনে মনে এক ফন্দি আঁটেন। তাঁর খুড়শ্বশুর গোকুল বাবুর স্ত্রী, কাঞ্চনের চেয়েও সুন্দরী। তাঁকে কোনো রকমে ঘরের বাইর করে বাগানে রাখতে পারলেই কাঞ্চন উপযুক্ত শিক্ষা পাবেন। সেদিন জীবন-চন্দ্রের বাড়ীর মেয়ে-কবির লড়াই শোনার জন্য গোকুল বাবুর বাড়ীর মেয়েরাও আসেন। অটল এক হিজড়াকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে, বাড়ীর ভিতর থেকে গোকুল বাবুর স্ত্রীকে কোনো রকমে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। সে-সময়ে নিমচাঁদও এসে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হিজড়া ভুল করে কুমুদিনীকেই ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে আসেন। অটলের মাথায় যেনো বাজ পড়ে। অটলের কাকা রামধন রায় এ অন্যায় কাজের জন্য অটল ও নিমচাঁদকে ভীষণভাবে প্রহার করেন। প্রহার খেয়ে দু'জনেরই মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। নিমচাঁদ অটলের সঙ্গ ত্যাগ করবেন বলে স্থির করেন। অটলের মনেও মদ পান করার জন্য অনুশোচনা জাগে, এবং নিমচাঁদকে আর বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেবেন না বলেও তিনি সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁদের সে মানসিক পরিবর্তন স্থায়ী হয় না। নিমচাঁদকে অটল জানান যে, ব্রান্ডি না পান

www.pathagar.com

করলে তার আর উপশম হবে না। নিমচাঁদেরও 'মৃতদেহে' যেনো প্রাণের সঞ্চার হয়। মদপান করার জন্য তাঁরা দুজনেই তখন বাগানে চলে যান।

মদ্যপান ও লাম্পট্যপনার ফলে সেকালের একদল তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত যুবক এবং অনেক সময় যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তিও যে কতোটা উচ্ছন্নে যেতেন, এবং তাঁদের এই নৈতিক চরিত্রের অধোগতির ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা যে কিভাবে বিঘ্নিত হোত, এর প্রমাণ মেলে, প্রতীকচরিত্র অটল বিহারী ও নিমচাঁদের বেপরোয়া মদ্যপান, অসামাজিক বেলেল্লাপনা ও তার পরিণামের মধ্যে। অটল বিত্তবান পিতার একমাত্র পুত্র। গৌরমোহণ আঢ্য ও হেয়ার সাহেবের স্কুলে লেখাপড়া করে থাকলেও, যথার্থ অর্থে তিনি মূর্খ। তাঁর শিক্ষা প্রসঙ্গে কুমুদিনী বলেন, 'আদরের ঢেঁকি কালেজে নিলে না, তাই গৌরমোহণ আড্ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাতা উলটিচলো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কতক পড়েচলো।' (২অ. ১গ.) তিনি নাকি হেয়ার সাহেবের স্কুলের 'In the Baboos class'—এ পড়েছেন। নিমচাঁদ বলেন, 'Rather in the Kings hell, হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্ মাষ্টার জান্তো বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়বে না. কারো পড়তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ কেলাস ক'রে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল।' (২অ. ২গ) হেয়ার সাহেবের স্কুলে অটলের 'Marchant of Venerials' অনেকবার পড়ার কথা শোনে নিমচাঁদ বলেন, That is blasphemy, I tell you, তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিসনে তোর বাপ ব্যাটা বিষয় করেছে, ব'সে ব'সে খা মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল ?' (২অ. ২গ.) অটলের মেঘনাদ বধ-কাব্য কেনার কথা শোনে নিমচাঁদ বলেন, 'ওর ভালমন্দ তুমি বুঝবে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ. কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেলা দাদ বাঙ্গলার মিলটন।' (৩অ. ৩গ.) গোকুল বাবুর স্ত্রী স্বেচ্ছায় অটলের সঙ্গে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন শোনে, নিমচাঁদ বলেন, 'মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না. সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েছে ?' (ঐ) অটলের প্রতি রাগের চরম মুহূর্তেও নিমচাঁদ ধৈর্য ধরেন: 'তুই যদি কিছু মাত্র লেখাপড়া জানতিস, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়।' (ঐ)

নাম কেনার জন্য অটল 'সহরের প্রধান চিজ্ কাঞ্চন মণি'কে রক্ষিতা রেখেছেন। অটলের বোন সৌদামিনিকে কুমুদিনী বলেন, 'তোমার দাদা ·· শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড় মানুষের ছেলে রেখেচলো, ওমিনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদাও চায় না, কিসে লোকে বাবু

www.pathagar.com

বলবে কেবল তাই দেখে'। (২অ. ১গ.) ইয়ারের দল আর রক্ষিতা কাঞ্চনকে নিয়ে অটল 'সুখ সাগরে সাঁতার' দেন। কাঞ্চনের গান শোনে তিনি বলেন, 'আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে– বেশ গেয়েছ বিবিজান।' (১অ. ১গ.) জীবনচন্দ্র তাঁকে মদপান ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি জানান, 'আমার যদি মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা থাক্‌তো, তাহলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার যক্ষাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে'। (২অ. ৪গ.) অটল কাঞ্চনকে তিনশো টাকা 'মাসয়ারা' দেন, তবু যদি কাঞ্চন সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আরো একশো টাকা বাড়িয়ে দিতেও তিনি প্রস্তুত। নিমচাঁদ বলেন, 'ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড বাড়্‌তে পেলে না, তুই মাস কতকের মধ্যে ফোর্ত গ্রেড করে দিলি, তোর সার্ভিসে প্রমোসান বড় র‍্যাপিড্‌।' (৩অ ২গ.) দশ হাজার টাকা ব্যয় করে অটল কাঞ্চনের গহনা করে এবং তাঁর বাড়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় কাঞ্চনকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসে তিনি মদপান করেন—তাঁকে নিয়ে বারান্দায় নাচেন, আর পাড়ার লোকেরা জড়ো হয়ে তামাশা দেখেন। কাঞ্চন যখন গাড়ীতে ওঠেন, তিনি তখন 'কোঁচা দিয়ে পা পুঁচ্‌য়ে দেন'। একদিন অটলের পাশের বাড়ীর এক কাকা এসে, অটল আর কাঞ্চনকে এ নিয়ে গাল দিলে, অবস্থা বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সৌদামিনী কুমুদিনীকে বলেন, 'সে বেটী কসবি, বড় কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফির্‌যে গাল দিলে, বড় কাকা রাগ করে বেটীকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলেন। বেটী দাদাকে কত গাল দিয়ে গেল, আর বলে গেল, "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা, তানইলে এই পর্য্যন্ত।" '(২অ. ১গ.) অটল কাঞ্চনকে আদর করে 'জানি' বলে ডাকেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি 'গীত' গান 'হায় কি কল্যে মাসী বলে'—ছাড়া বাঁধেন ঃ

'জানি! জানি!
আমি কি জানি ?' (২অ. ২গ.)

কাঞ্চনও বুঝি কখনো সখনো ছড়া কাটতেন। জীবনচন্দ্র যখন অটলের খুড় শ্বশুরকে বলেন, 'ওকে তোমায় দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁসি দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।'—অটল আর তখন চুপ থাকতে পারেন না। তিনি বলেন, 'কাঞ্চন যে বলে—(জিব-কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যায় নয়—

'বের্‌য়ে এলেম্‌ বেশ্যা হলেম্‌ কুল কল্যেম্‌ ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা ধম্‌কে কথা কয়।' (১অ. ২গ.)

গোকুল বাবু অটলকে 'সে বেশ্যা বেটীকে' ত্যাগ করতে বলায়, অটল বলেন, 'কি রসের কথাই বলেন, .. আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভরতি

www.pathagar.com

হন'। (ঐ) ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শে, জীবনবাবু অটলকে নিয়ে কাশী যাওয়ার প্রস্তাব করলে, অটল দশ হাজার টাকা নগদ চেয়ে বসেন এবং সেখানে তিনি ট্রেনে যেতে পারবেন না বলে জানান। জীবনবাবু বলেন, 'রেলের গাড়ীতে গেলে তোর কি হয় ?' অটল গোকুল বাবুকে কানে কানে জানান, 'রেলের গাড়ীতে কাঞ্চনের মাথা ধরে।' (২অ. ৪গ.)

অটলের লাম্পট্যপনা শুধু কাঞ্চনকে নিয়েই শেষ নয়। গোকুল বাবুর স্ত্রীর প্রতিও তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। নিমচাঁদকে তিনি বলেন, 'এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্‌নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।' (৩অ. ২গ.) নারী-বেশী হিজড়া গোকুল বাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় ধরে আনতে গিয়ে, ভুলক্রমে কুমুদিনীকেই নিয়ে ফিরে এলে, অটল সেজন্য তাঁর স্ত্রীকেই দোষারূপ করতে থাকেন—তিনি যদি গোকুলবাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কোমরে না বাঁধতেন, তা হলে তো আর এ ভুলটি হোত না। কুমুদিনী শিউরে ওঠেন: 'ওমা,... তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আন্তে লোক পাঠিয়েছিলে ? ·· ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী।' অটল বলেন, 'তোমার আর লেকচার দিতে হবেনা,··· উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা কত্তে এলেন।' (৩অ. ৩গ.)

জীবনচন্দ্র সেকালের কোনো কোনো ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ ও অপসঞ্চিত বিত্তের বাষ্পে ফেঁপে ওঠা ব্যক্তিদের প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর এ ব্যক্তিত্বহীনতা ও অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে অটল বিহারীর উচ্ছন্নে যাবার প্রধান সহায়ক। মাতাল-প্রায় অটল কাঞ্চনের উদ্দেশে বাগানে চলে গেলে নকুলেশ্বর দুঃখ করেন, 'এ গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে।' নিমচাঁদ পরামর্শ দেন, 'কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক্‌—তুমি দেখবে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্‌ টল্‌ কচ্চেন।' (১অ. ১গ.) সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লেখাবার প্রশ্ন ওঠলে অটল বলেন, 'আমার টাকার কমি নেই—আমার শ্যাম্পেন্‌ কিন্‌বের ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক।' (১অ. ২গ.) তিনি তিনশো টাকা কাঞ্চনকে 'মাসয়ারা' দেন এবং দশ হাজার টাকা ব্যয় করে তাঁর গহনা করে ও বাড়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। জীবনচন্দ্র গোকুল বাবুকে বলেন, 'আলি ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস দুই তিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে !' (ঐ) কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়, অটল তাঁর মায়ের বাক্স ভেঙেও দশ হাজার টাকায় একটি কোম্পানীর কাগজ নিয়ে গেছেন। কাঞ্চনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ঘরের বাইর করে আনার ষড়যন্ত্রেও তাঁর প্রচুর টাকা ব্যয় হচ্ছে। নারী-বেশী হিজড়াকে তিনি বলেন, 'তুমি যদি আন্‌তে

www.pathagar.com

পার, সোনার গহনা দিয়ে, আর যে বারানসীর শাড়ী দিয়ে তোমায় বড় মানুষের মেয়ে সাজয়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না।' (৩অ. ৩গ.)

অটলের নৈতিক চরিত্রের অধোগতির জন্য তাঁর মায়ের আস্কারাও কম দায়ী নয়। গৃহিণীর কাছে জীবনচন্দ্রও প্রায় অসহায়। তাই মাঝে মধ্যে ছেলেকে শাসন করার মতো একটি ইচ্ছে তাঁর মনে জাগলেও, স্ত্রীর জন্যই তিনি তেমন কিছু করে ওঠতে পারেন না। অটলের কাকার গাল খেয়ে কাঞ্চন চলে গেলে, অটল যেনো উন্মাদ হয়ে যান। তিনি আত্মহত্যার জন্য ঘর থেকে বন্দুক বের করে আনেন এবং বলতে থাকেন, 'আমার কাঞ্চনকে এনে দাও, তা নইলে গুলি খেয়ে মর্‌বো, নয় গঙ্গায় ডুবে মর্‌বো, নয় কাশী চলে যাব—"। (২অ. ১গ.) জীবনচন্দ্র তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, 'এমন সোনার শীতে' স্ত্রী ঘরে রেখে তাঁর পক্ষে এরূপ করা উচিত নয়। অটল জবাব দেন, "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।" (ঐ) রাগের মাথায় জীবনবাবু অটলকে পদাঘাত করেন। সৌদামিনী কুমুদিনীকে জানান, 'বাবা রাগ করে দাদাকে একটা নাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদিতে লাগলেন আর বাবারে কত গালাগালি দিলেন। তারপর মার কান্না দেখে আর দাদার চিকরুনী দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাক্‌য়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠ্‌য়ে দিলেন।' (ঐ) শুধু তাই নয়, অটলের মা কাঞ্চনের হাত দুটো ধরে বলেন, "মা, তোমার হাতে ছেলে সঁপে দিলেম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপালহারা হইনে।" (ঐ) হাই-কোর্টের উকিল নকুলেশ্বরের বাগান বাড়ীতে গিয়ে কাঞ্চন একদিন বলেন, 'মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম......আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা ওমনি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত মিনতি করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিয়েছি।' (৩অ. ১গ.) কাঞ্চন অন্যের বাগানে যাওয়ায় অটল বলেন, 'ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো।' মনের দুঃখে এক সময়ে তিনি গলায় রুমাল বেঁধে মোড়া দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে পড়লে, তাঁর মা ও সৌদামিনি ছুটে আসেন। মা ও মেয়ের সে সময়কার কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'সৌদা। ও মা, দাদার পায় যে মদ।
গিন্নি। দূর অবাগি, সর্‌দি গর্‌মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।
সৌদা। গন্ধ যে।
গিন্নি। সর্দি গর্মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি ?' (৩অ. ২গ.)

অটলের জ্ঞান ফেরার পর কাঞ্চন রাগ করে চলে যেতে থাকলে, গিন্নি বলেন, 'যাস্‌নে......ও কাঞ্চন......তোমায় না দেখলে গোপাল আমার গলায় দড়ি দেবে।' (ঐ) কাঞ্চনের তিন শো টাকা 'মাসয়ারা' দিতে হয় বলে জীবনচন্দ্র

www.pathagar.com

গোকুল বাবুর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। অটল তখন বলেন, 'সেটাকা তুমি দাও না আমার মা দ্যায় ?' (১অ. ২গ.) ছেলের অসামাজিক বেলেল্লাপনায় অতিষ্ঠ হয়ে জীবনচন্দ্র যখন বলেন, 'হয় তুই মর, না হয় আমি মরি।'—অটল তখন উত্তর করেন, 'মর্‌ মর্‌ কচ্চো মার কাছে বলে দেব, তখন মজাটি টের পাবেন।'(ঐ) জীবনবাবু এক সময়ে রেগে গিয়ে অটলকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে জানালে, অটলবলেন, 'ওরূপ কিছু নয়—মার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন।' (ঐ) অটলের এ মন্তব্য যে নিতান্ত অমূলক নয়, এর প্রমাণ পূর্বেই পাওয়া গেছে। গোকুল বাবু একদিন জীবন বাবুকে বলেছিলেন, 'আপনি যদি একটু শাসিত করেন, তা হলে মদ ছাড়বার চেষ্টা করা যায়।' (১অ.৪গ.) কিন্তু ছেলেকে এই 'একটু শাসিত' করার মানসিকতা জীবন বাবুর থাকলেও, সে ক্ষমতা তাঁর নেই—গিন্নির কাছে তিনি যেনো অনেকটা বালকের মতোই অসহায়।

প্রধানতঃ বেপরোয়া মদ পান করে সেকালের কোন কোন যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তিও যে কতোটা উচ্ছন্নে যেতেন, তার বাস্তব প্রমাণ নিমচাঁদ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, 'নিমচাঁদ একটা ব্যক্তি বিশেষ মাত্র নয়, একটা সমগ্র যুগের শীল-বৈশিষ্ট্য, একটি বৃহৎ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তাহার মধ্যে সংহত হইয়াছে।'[৩৪]

নিমচাঁদ ও গৌরমহণ আঢ্যের স্কুলে পড়েছেন। কিন্তু অটলের মতো তিনি তথাকথিত শিক্ষিত নন। গোকুলবাবু অটলকে, 'অসৎ সঙ্গ' ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে, অটল গর্বের সংগেই বলেন, 'নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেলতে পারে।' (১অ. ২গ.) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারামকে লক্ষ্য করে নিমচাঁদ নিজেও বলেন, **'I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English** বাবা !' (২অ. ২গ.) মাতাল-প্রায় নিমচাঁদের অল্পক্ষণের কথাবার্তা থেকেই কেনারামও বুঝতে পারেন, 'দত্তজা যদি মদ ছাড়েন, উনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন।' (২অ ২গ.) নিজের সমন্ধে নিমচাঁদের উপলব্ধিটি এরূপঃ 'আমার যেটি প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা করে, আমি র খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি, লোকে মাতাল বলে নিন্দে করে।' (৩অ. ১গ.) অচেতন মুহূর্তে হলেও নিজির প্রতি ধিক্কার জন্মে নির্মমভাবেঃ 'রে পাপাত্মা ! রে দুরাশয় ! ··· তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরলে একটি দেবতা, এখন হয়েছে একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছে।' (৩অ. ৩গ.) কিন্তু একে শুধু অসতর্কিত মনের ক্ষণিকের অনুভূতিই বলা চলে—নিমচাঁদের মতো মাতালের মনে এর স্থায়ী রূপ কল্পনা করা যায় না। নিমচাঁদের পক্ষে জগতে যদি কোন অসম্ভব কাজ থেকে থাকে, সে হচ্ছে, মদ ছেড়ে ভালো মানুষ হওয়া।

www.pathagar.com

নিমচাঁদ তাঁর শালা, শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষের বাড়ীতে থাকেন। মদ্যপ হলেও অটল প্রমুখের মতো অর্থ-বিত্তের প্রাচুর্য তাঁর নেই। তাই মদপান প্রভৃতির জন্য তাঁকে প্রধানতঃ বিত্তশালী বন্ধুদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁর মাতাল-মনের অভিব্যক্তিটি এরূপ : 'আমি অতি দীন, সহায় সম্পত্তিহীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামৃত পান করে মাতাল যাত্রা নির্বাহ করা' (৩অ. ১গ.) গোকুল বাবুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাগুৎ কালেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না— অটল আমার আস্তা বলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি।' (৩অ. ২গ.) গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ঘরের বাইর করতে পারলে তাঁকে নিমচাঁদের 'নামে বেনামি' করে রাখবেন বলে অটল জানালে, নিমচাঁদ বলেন, 'আচ্ছা বাবা, টাকা তোমার, ভোগ আমার—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।' (২অ ৩গ.)

সুরাপান নিবারণী সভা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নকুলবাবুকে তিনি জানান, 'সুরাপান-নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারি অমঙ্গল...... এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।' (১অ. ১গ.) এ সভায় যাঁরা নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে নিমচাঁদ বলেন, 'শূল, পীলে, পাত, অগ্রমাস, কাঁশর ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নেই..... এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেনরির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমক হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই।' (ঐ) যাঁরা মদ পান করলে রোগের সৃষ্টি হয় বলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর বক্তব্য হোল, 'আস্পর্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর্, পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মলনের সুখ পাবি।' (ঐ) রামসুন্দর বাবু সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লিখিয়ে 'বেশ আছেন' জেনে তিনি বলেন, 'তাঁরও সভ্য হওয়া নয়, জাবর কাটা—তিনি বিশ বৎসরে যে কারগো বোঝাই নিয়েছেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে—তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন।' (ঐ)

মাতাল নিমচাঁদের চারিত্রিক অধোগতির চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তার লাম্পট্যপনায়। অটলের মতো বিত্তবান হলে তিনি হয়তো রক্ষিতাও রাখতেন। অটলকে তিনি বলেন, 'তোমার বাবা যে বিষয় করেছেন, অমন বিষয় আমার থাকলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখতেম।' (১অ. ১গ.) অটল যখন জানান, গোকুলবাবু তাঁকে কাঞ্চনকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন, নিমচাঁদ তখন বলেন, 'তুই কেন বল্লিনে, তোমার মাগটিকে দাও, কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্ছি।

www.pathagar.com

(৩অ. ২গ.) গোকুলবাবুর সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীর কথা শোনে তিনি বলেন, 'সুড়ঙ্গ কাটতে পাল্যে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।' (ঐ) কুমুদিনীকে গোকুলবাবুর স্ত্রী মনে করে, নিমচাঁদ অটলকে বলেন, এ বেটী কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখতে পারে না।... ...তুই আলাপচারী কর, আমিও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।' (৩অ.৩গ.) বারাঙ্গনালয়েও নিমচাঁদের যাতায়ত রয়েছে। কেনারাম ঘোষ, মদ ছাড়লে নিমচাঁদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারবেন বলায়, অটল বলেন, 'মদ ছাড়লে কি হবে, ও যে ভারি লম্পট। কেনারাম জিজ্ঞেস করেন, 'মহেশ্বর বাবুর বনু্না বেঁচে আছে ?' উত্তরে অটল জানান, 'আছে বই কি—সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইক্‌নেস্‌, তারে রেখে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।' (২অ. ২গ.) জনৈকা বারবিলাসিনী মাতাল নিমচাঁদকে পথে পড়ে থাকতে দেখে, অপর এক বারবিলাসিনীকে বলেন, 'আমি ভাই একে জানি, সেই বাঙ্গাল বাবুর সঙ্গে একদিন গ্যাচলো।' (২অ. ৩গ.) কাঞ্চনকে নিমচাঁদ 'মাসী' বলে ডাকেন। একদিন মাতাল অবস্থায় অটলকে তিনি তাঁর মাসীর বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য বললে, 'অটল তাঁকে আর এক জাগায় 'নিয়ে যাবেন' বলে জানান। নিমচাঁদ বলেন, 'প্রসন্নর বাড়ী ? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল্‌ কোড্‌, এতে সব ক্রাইম্‌ আছে, আমাদের হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।' (২অ. ২গ.)

নৈতিক চরিত্রের এ অধোগতির মধ্যে থেকেও নিমচাঁদের মনে কখনো-সখনো শুভবুদ্ধির উদয় হতে দেখা যায়। অটলের মুখে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বের করে আনার ফন্দির কথা শোনে নিমচাঁদ বলেন, 'গৃহস্থের মেয়ে বার করবের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোন, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাবকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও'। (৩অ. ২গ.) অটল তাঁকে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে আসার পরামর্শ দিলে, তিনি বলেন, 'একি ভদ্রলোকে পারে ?' (ঐ) রামধনের প্রহার খাওয়ার পর তিনি অটলকে বলেন, 'বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিসনে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস।' (৩অ. ৩গ.) কিন্তু মাতাল নিমচাঁদের সমস্ত কাজের মধ্যে, তাঁর এ সদিচ্ছার কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মদপানের বিষময় পরিণতি সম্বন্ধেও তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে। মদ্যপ ও অপদার্থ ভোলানাথের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েই যেনো তিনি Byron থেকে উদ্ধৃতি দেন ঃ

> **'Man being reasonable must get drunk**
> **The best of life is but intoxication.'**

মাতাল অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থেকেও তিনি ভাবেন, 'মদের কি বিচিত্র গতি। এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির... ...কালে খাঁ কামানের মত পড়ে

www.pathagar.com

আছি।' (২অ. ৩গ.) অটলের বৈঠকখানায় কাঁদতে কাঁদতে তিনি যা ভাবেন, দীর্ঘ হলেও, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করার মতো: 'যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে ... ...আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জীবন আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন... .. সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; .. ...সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না।' (৩অ. ২গ.) কিন্তু এর পর মুহূর্তেই নিমচাঁদের অনুভূতিটি এরূপ: 'মদ কি ছাড়বো। আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়।' (ঐ) শতো সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ জঘন্য নেশার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার বুঝি কোনো উপায় নেই—নিমচাঁদের জীবনের সবচে বড়ো ব্যর্থতা আর ট্র্যাজেডি এখানেই। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন, "নিমচাঁদ আত্মসম্মান হারিয়েছে, ধনীপুত্রের ইয়ার হয়ে নেশার মদ তাকে জোগাড় করতে হয়। নিমচাঁদ নিজেকে ধিক্কার দিতে জানে। নিজের পতনের জন্য কয়েক মুহূর্ত ব্যথা পেতে পারে। .. ...সুসঙ্গত ভাবনা থেকে সে মদের ও আত্ম ধ্বংসের জগতে পালিয়েছে। মদ্যাসক্তি তার পতনের কারণ অথবা মদেই সে খুঁজেছে মুক্তি?

নিমচাঁদ আশ্চর্যভাবে গভীর ব্যর্থতা ও বেদনাবোধের জগতকে মাত্র ছুঁয়ে, তার অস্তিত্ব জানিয়ে ব্যঙ্গ ও হাস্যের রাজ্যে অবিচল থেকেছে।'[৩৫]

সেকালের সমাজের প্রায় সর্বস্তরে মদ্যপান ও লাম্পট্যপনা একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতোই সংক্রমিত হয়ে পড়েছিলো। হাইকোর্টের উকিল নকুলেশ্বর বাবু মদ পান করতে করতে বলেন, 'বাপু আমাদের উদর সমুদ্র বিশেষ—এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্লেও বাড়ে না।' (১অ. ১গ.) নিজে 'কাজের বাড়' হয়ে পড়লেও, 'দেশের মঙ্গলের জন্যে'ই তিনি সুরাপান নিবারণী সভার আদর্শ-উদ্দেশ্য ও কার্যবলীকে সমর্থন করেন। কিন্তু কিছুতেই যে তিনি নিজেকেই সামাল দিতে পারেন না: 'এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।' (ঐ) সুরাপান সভায় নাম লিখিয়ে গোকুল বাবু অবশ্য মদ ছেড়ে দিয়েছেন—অটলকে তিনি বলেন, 'আমি যখন মদ খেতেম, কারো ভয় করে খেতেম না'। (১অ. ২গ.) মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই ভোলাচাঁদ 'গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে' অল্প বয়সেই মদ ধরেছেন। নিমচাঁদের কাছে ভোলাচাঁদ তাঁর নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে: 'সান্ ইন্‌লা সার-স্মেল্

www.pathagar.com

সার্,......বাড়ী থেকে কানট্রি খেয়ে বের্য়েছিলাম, রেলওয়ের......ফ্রেন্ডস্ সার 'ওল্ডো টম্ খাইয়ে দিলে।' (২অ. ২গ.) গ্লাস ভেঙে ফেলে, বোতলের 'কানায়' মদ পান করে নিমচাঁদ যখন বলেন, 'সত্রুর শেষ রাখতে নাই, দেখ বাবা, সব খেইচি'—ভোলাও তখন জানান, 'আই ডু ক্যান সার্, বটল সার্'। —সে মুহূর্তে মাতাল নিমচাঁদের পক্ষেও বুঝি ধৈর্য ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েঃ 'চুপরাও you wicked urchin, গুওটা সার সার্ ক'রে মাতা ধর্য়ে দেছে—ফের যদি সার্ সার্ করবি, এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশী মিত্রের ঘাটে পাঠাব।' (ঐ) বিক্রমপুরের 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্য বিলেতী মদ তেমন পছন্দ করেন না। অটলকে তিনি বলেন, 'আপনারা ত কুলকত্তই—বাঙ্গালের দেনো মদ বলো।' বিলেতী মদ পান করতে বসে তিনি নাকি 'গেলাসের উপর কি মন্ত্র' পড়েন। নিমচাঁদ বলেন, 'ব্যাটা খাবেন ব্রান্ডি, মন্ত্রের ধুম দেখ'। (ঐ) ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। মুসলমানের দোকানের বিস্কিট তিনি মাঝে মধ্যে খেয়ে থাকলেও, হিন্দুদের ভয়ে মদ পান করতে চান না। মদের প্রতি তাঁর এ অনীহার আরো কারণ আছে—এতে যক্ষ্মা জন্মাতে পারে। গোকুল বাবুকে লক্ষ্য করে কেনারাম বলেন, 'আমি মহাশয়, ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই, তাহলে প্রমোসানও পাব না,... ...ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে দু'টাকা দিতেও পারবো না।' (২অ. ৪গ.) নিমচাঁদ প্রমুখের মদের আসরে সেদিন শুধু সামাজিকতার রক্ষার জনাই তিনি 'আঙ্গুলে ক'রে একটু গালে' দিয়েছিলেন—এই যা !

লাম্পট্যপনা-দোষও সেকালের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রেই প্রবেশ করেছিলো। কেশব বাবুর রক্ষিতাকে একদিন নিমচাঁদ বুঝি, কেশব বাবুর নাম করে বাগানে নিয়ে গিয়েছিলেন। (৩অ. ২গ.) নসিরাম বাবু বাইরে রাত কাটান—'দিনের বেলায় বৈঠকখানায় মেয়ে মানুষ নিয়ে' আসেন। এদিকে তাঁর স্ত্রী নাকি 'ভারি জ্বালাতন' হয়েছেন। হিজড়া অটলকে বলেন, 'তুমি যদি তাকে রাখ, আমি তাকে এখনি এনে দিতে পারি'। (৩অ. ৩গ.) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম অবশ্য বারাঙ্গনা কাঞ্চনের বাড়ীতে 'একদিন বই আর' যায়নি। সেদিন কাঞ্চনের দাসী ইচ্ছে 'হাস্‌তে হাস্‌তে শাম্‌লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।' (৩অ. ১গ.) রামমাণিক্যকে সকলে 'বাঙ্গাল' বলায় তিনি ক্ষেপে ওঠেনঃ বাঙ্গাল কউস ক্যান......কুলকত্তার মত না করচি কি ? মাগীবাড়ী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি ..... এতো কর্যাও কুলকত্তার মত হবার পারলাম না।' (২অ. ২গ.) গোকুল বাবুর দারোয়ান অযোধ্যা সিং-এর জীবনের চরম দুঃখঃ 'হামারা ভাইয়া অ্যাছা কাম্ করেগা কভী দেল্‌মে খেয়াল হুয়া নেই—ভাই হোকর ভাইকা রেন্ডি লেকে ভাগ গেই ?' (২অ. ৩গ.)

www.pathagar.com

পুরুষের মদ্যপান ও লাম্পট্যপনার ফলে সেকালের নারী-জীবনে নেমে এসেছিলো চরমতম দুর্ভোগ। কুমুদিনী সৌদামিনীকে বলেন, 'পোড়া কপালের দশা দেখ দেখি ভাই, আজ দশদিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি একদিন তাকে ঘরে দেখতে পেলাম না, এক মরে যায় জানলুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাতদিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।' (২অ. ১গ.) সৌদামিনী তাঁকে সান্ত্বনা দেন: 'দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই সুঁটকো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস তার হাত পাগুনো যেন বাকারি।' (ঐ) মাতাল নিমচাঁদের আত্ম-কথার মধ্য দিয়ে তাঁর স্ত্রীর মর্মান্তিক যাতনার চিত্রটিও ফুটে ওঠে। ব্রাণ্ডির বোতলকে 'ছোটরাণী' কল্পনা করে তিনি বলেন, 'হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? ····· আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। ···বলতে কি, বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থু, থু, খেয়ে মরিচি।' (৩অ. ১গ.) অন্য এক সময়ে স্ত্রীকে তিনি স্মরণ করেন এভাবে: 'আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না।' (৩অ. ২গ.) লম্পট নসিরামবাবুর স্ত্রী সম্বন্ধে হিজড়া অটলকে বলেন, 'আমি নসিরামবাবুর বউকে বার করে আনতে পারি, সে ভারি জ্বালাতন হয়েছে; তার ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলায় বৈঠকখানায় মেয়ে মানুষ নিয়ে আসে।' (৩অ. ৩গ.)

সেকালে জীবনচন্দ্রের মতো অনেক হিন্দুই ব্রাহ্মণদের সহ্য করতে পারতেন না, গোকুল বাবুর হাতে অটলকে সঁপে দিতে গিয়ে জীবন বাবু বলেন, 'আমি তোমার নিন্দা কত্তেম—তুমি জাত মান না, ব্রহ্ম সভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলেনা।' (১অ. ২গ.) তিনি অটলকে সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লেখাবার জন্য চাপ দিলে, অটল বলেন, 'তাহলে আমি ব্রাহ্ম সভায়ও নাম লেখাব।' (ঐ) পিতাকে জব্দ করার জন্য 'ব্রহ্ম সভায়' নাম লেখাবার হুমকির চেয়ে বড়ো কোন অস্ত্র বুঝি অটল আর খুঁজে পান নি। ব্রহ্ম সমাজের সকলেই যে গোকুলবাবুর মতো সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন না, সেখানে যে অনেক সময় অযোগ্য ও বক ধার্মিক ব্যক্তিদেরও ভীড় জমতো. তার বাস্তব প্রমাণ নিপাতগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কেনারাম ঘোষ। তাঁকে নাকি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক করা হয়েছে। নিমচাঁদ প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা বাবা, ব্রাহ্ম ধর্মের তুমি বুঝেছ কি?' কেনারাম বলেন, 'আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝতে পারিনি।' নিমচাঁদ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি একটি রেখেছ'। কেনারাম বলেন, 'আমি

১৫—

www.pathagar.com

কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না।' (২অ. ২গ.) হিন্দুদের নিকট মিথ্যে কথা বলতে হয় বলে, কেনারাম বাবু মদ পান করেন না। তাছাড়া তিনি বলেন, "মদ খেলে লোকে আমায় নিন্দে করবে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্ট শান্ত বলে, 'আমি ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখতে গিয়ে ঝানাং ক'রে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি।' (ঐ)

কেনারাম ঘোষ সেকালের কোনো কোনো অপদার্থ ও চরিত্রহীন বাঙালী হাকিমের প্রতিনিধি। তাঁকে সকলে ঘটিরাম ডেপুটি বলেই জানেন। অটলের এ সম্বন্ধীয় এক প্রশ্নের উত্তরে কেনারাম জানান, 'ভাই, বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি একদিন মুচিরাম ফরিয়াদির নাম পড়তে ঘটিরাম বলেছিলুম, আমার আরদালি, ঘটিরাম ফরিয়াদি হাজির ?··· বলে ফুক্‌রাতে লাগলো, কিন্তু কেউ হাজির হলো না, আমি··· ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ করে দিলুম।' (২অ. ২গ.) এ ঘটনার পর থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় ঘটিরাম ডেপুটি। কিন্তু কেনারাম বলেন, 'আমার সাক্ষাতে কেউ বলতে পারে না ......আমি কাছারিতে ইস্তেহার লট্‌কে দিলেম, যে ঘটিরাম বলবে, তার মেয়াদ দেব।' (ঐ) ঘটিরাম-ঘটনার পর অবশ্য কেনারামের 'মান' বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'ঘটিরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে বল্যে, ইংরিজিতে যারা খুব লায়েক, তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।' (ঐ) উৎকোচ সম্বন্ধে কেনারামের বক্তব্য হোল, 'ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এত আর মদ নয় ?' তবে 'লোকে নিন্দে করবে আর সাহেবেরা কর্ম ছাড়য়ে দেবে' বলে তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেন না। নিমচাঁদ বলেন, 'তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—তুমি সাধু পুরুষ।' (৩অ. ১গ.) কোলকাতার লোকদের নিকট হাকিমের কোনো মর্যাদা নেই বলে কেনারাম দুঃখ করেন : 'এই জন্যে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না।' (২অ. ২গ.) তিনি আরো বলেন, 'মপোস্বালে আমি শামলা মাতায় দিয়ে পাইচালি করি আর মেয়েরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে।' (ঐ) অবশ্য, লোকে 'হাকিম শালা বড় লম্পট' মনে করবেন বলে তিনি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন না। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত সাবধান। নিমচাঁদ কাঞ্চনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিলো কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি বাগানে দেখেছিলেম, সেখানে অনেক লোক ছিল, কিছু বল্‌তে পারিনি, তাইতে একদিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু একদিন বই আর যাইনি।' (৩অ. ১গ.) নিমচাঁদ বুঝি কেনারামকে যথার্থই জেনেছিলেন। এখানে অটলের সঙ্গে তাঁর এ সম্বন্ধীয় কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'নিম। তোমাকে যদি পাঁচ দিন আমি দখলে পাই, তাহ'লে আমি ফরচুন করে নিতে পারি।

www.pathagar.com

অট। কেমন ক'রে ?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তারপর ছাপ্য়ে দিই, মপোস্বাল হতে শাম্লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা ওম্নি।

অট। মেয়েরা ওমনি কেন ?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখতে আসবে ?' (২অ. ২গ.)

প্রহসনটিতে তৎকালীন সমাজের আরো কিছু ছোটোখাটো চিত্রও পাওয়া যায়। স্বামীদের লাম্পট্যপনার পাশাপাশি, অনেক সময় স্ত্রীরাও 'পতিকে গ্লান্টিন্ দেখয়ে উপপতি' রাখতেন। (১অ. ১গ.) নিমচাঁদ বিক্রমপুর গিয়ে 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্যের স্ত্রী ভাগ্যধরীকে নিয়ে আসবেন বলে জানালে, রামমাণিক্য বলেন, 'ইকি তোর কুলকত্থাই মাগ, উমি লোকের লগে খারাপ কাম করবে।' (২অ. ২গ.) জীবন বাবু কাঞ্চনকে তিনশো টাকা 'মাসয়ারা' দিতে হয় বলে আক্ষেপ করায়, অটল বলেন, 'সে টাকা তুমি দাও, না আমার মা দ্যান ?' জীবন বাবু ক্রোধের সঙ্গে বলেন, 'তোমার মা উপপতি করে এনে দেন।' (ঐ) 'এই উপপতি করে এনে দেন' কথাটিতেই সেকালের কোনো নারীর উপপতি রাখার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। নীতিবিগর্হিত এ সমস্ত অসামাজিক কাজের প্রধান সহায়ক হয়তো ছিলেন 'কুটনীরা'—তাই সমাজের মধ্যে তাঁরা ছিলেন নিন্দার পাত্রী। মাতাল নিমচাঁদ যখন কোনো এক দাসীকে বলেন, 'তুই কুটনী হতে পারিস ?'—দাসী তখন দস্তুরমতো তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন : 'তোর মা বন্ গিয়ে হোক্ আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল,..... গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।' (২অ. ৩গ.)

সেকালের সমাজে জাত-পাঁতের প্রশ্নে প্রাচীন ও নব্যপন্থী হিন্দুদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো। একদিকে নিমচাঁদ বলেন, 'মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই ... ... যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্য়ে দিলেম, তাঁতি সোনার বেনে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, ...সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো ?' (১অ. ১গ.)—অপর দিকে বৈদিক বলেন, 'বৈদিককুলে এমন কুল কজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই যে, শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক, পদপ্রক্ষালন করে না--অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে।' (২অ. ৩গ.)

'বাঙ্গাল' রামমাণিক্যের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের আঞ্চলিক ভাষা প্রভৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় ফুটে ওঠেছে। অটল 'বাঙ্গাল' কে

www.pathagar.com

নিয়ে ছড়া কাটতে থাকলে, রামমাণিক্য বলে ওঠেন, 'পুঙ্গির পুত্ কেঁড়া, হিট্ কাইচেন্ আর খ্যাপাইবার লাগ্‌চেন—দ্যাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইরে কর্‌তাম, আর অমাবস্যা দেক্‌তেন—হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বল্লুক, বুত।' (২অ. ২গ.) নিমচাঁদের এক ছড়া কাটা শোনে রামমাণিক্য বলেন, 'আমাগোর হেয়ালী আছে।' কাঞ্চনের অনুরোধে তিনি পূর্ববঙ্গের লোক সাহিত্যের নিদর্শন এ হেঁয়ালীটি সকলকে বলেও শোনান ঃ

"এটুকানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড় তুড়াইয়া নাচে।" (৩অ. ১গ.)

প্রহসনের একটি দৃশ্যে 'মেয়ে কবি'র অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সেকালের সমাজে কবিগান অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। এর মধ্যে আবার মেয়েরাও যে জলসা করে কবি-গান করতেন, এখানে তার প্রমাণ মেলে। অন্য একটি দৃশ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের প্রতি কটাক্ষ আছে। অটল নিজের পাণ্ডিত্ব জাহির করার জন্য নিমচাঁদকে বলেন, 'আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।' নিমচাঁদ অটলের মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে, সুন্দরও হবে।' (২অ. ২গ.)

প্রহসনটির কোনো কোনো অংশ সম্বন্ধে যে অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠেছে, তাও সেকালের সমাজেরই চিত্র—সেজন্য প্রহসনকারকে দোষারূপ করার যৌক্তিকতা নেই।[৩৬]

চার

দীনবন্ধুর পরবর্তী প্রহসন 'জামাই বারিক' প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে। "জামাই বারিকে'......ধনি পরিবারে ঘর জামাই পোষার প্রথাকে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—শোনা যায় এর লক্ষ্য ছিল কলকাতার কোন প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবার।"[৩৭] বিপিন চন্দ্র পাল লিখেছেন, 'Jamai Barik or the Son-in-Laws' Barrack was a burning satire on the practice of some of the richer families in Calcutta, who refused to allow their daughters to go to their husbands' homes and families but had their sons-in-law domesticated in their own homes as more or less dependents on their wives.'[৩৮] যে কৌলীণ্য প্রথা ও বহু বিবাহ সেকালের বাঙালী হিন্দু সমাজে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো, দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক'-এ রঙ্গ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তা-ই চিত্রিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "জামাই বারিকে'র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।'[৩৯] রামগতি ন্যায়রত্নের বক্তব্য হোল, 'কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘর জামাই রাখেন বা ঘর জামাই থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।'[৪০] কিন্তু একান্ত বাস্তব ভিত্তিক রচনা বলেই হয়তো সেদিন 'জামাই বারিক পড়ে অনেকে আবার ভীষণভাবে অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেন '... ... the humour, we are sorry to say, is at times of an offensive kind, and it is here we blame the author."[৪১]

'জামাই বারিক'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি এই : বিজয় বল্লভ কেশবপুরের ক্রোরপতি ভূস্বামী এবং 'জামাই বারিক'-এর মালিক। তিনি 'অদ্যিরস' প্রথার মাধ্যমে তাঁর, এবং তাঁর বাড়ীর সকল মেয়েদেরই বিবাহ দিয়েছেন। বিবাহের পরও মেয়েরা বাপের বাড়ীতেই থাকেন—তাঁদের স্বামীরা সহঅবস্থান করেন বাইর বাড়ীর জামাই বারিকে।

জামাই বারিক বিজয় বাবুর বাড়ীর ঘর জামাইদের জন্য একটি ক্যাম্প জাতীয় আশ্রয়স্থল। সেখানে জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভগ্নি জামাই, নাত জামাই, জামাইয়ের জামাই সকলেই থাকেন। জামাই বারিকে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেখানে তাঁরা 'সাত কান্ড' রামায়ণ শোনে, সখী সম্বাদ, পাঁচালি-পীরের গান গেয়ে, এবং গুলি খেয়ে—গাজা টিপে সময় কাটান।

জামাই বারিকে পাশ সিস্টেমের চালু রয়েছে। অন্তঃপুরে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য, জামাইদের সে পাশের প্রয়োজন হয়। সকলের ভাগ্যে সব দিন পাশ জোটে না। তিন দিন, চার দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর অন্তর পাশ পেয়ে থাকেন। দু' এক সময় না পাশেও জামাইদের কেউ কেউ অন্তঃপুরে ঢোকার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে দারোয়ানের গলা ধাক্কাই তাঁদের ভাগ্যে জোটে। অনেক সময় কিন্তু পাশ পেলেও জামাইদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না—স্ত্রীদের নিকট অপমানিত হয়ে তাঁদের আবার সেই আশ্রয়স্থলেই ফিরে আসতে হয়।

অভয় কুমার বিজয় বাবুর মেয়ে কামিনীর স্বামী জামাই-বারিকের জামাইদের একজন। কিন্তু অন্যান্য জামাইদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য। কামিনীর বা শ্বশুর বাড়ীর কোনো অপমানই তাঁর তেমন সহ্য হয় না—অভিমান করে বাড়ী চলে যান; বিজয় বাবু লোক পাঠিয়ে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। একদিন কামিনীর দুর্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অভয় কুমার বাড়ী চলে গেলে, তাঁকে আর অনেক চেষ্টার পরও ফিরিয়ে আনা গেলো না। তিনি কাউকেও কিছু না

www.pathagar.com

বলে বৃন্দাবনবাসী হন। অভয় কুমার চলে গেলে কামিনীর মনে অনুশোচনা জাগে। তিনি তাঁর মেজদিদির মতো আত্মহত্যা করে, সকল যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি লাভের উপায় খোঁজেন।

বৃন্দাবনে অভয় কুমারের সঙ্গে পদ্মলোচন নামক অন্য এক ব্যক্তি গিয়েছেন। তিনি তাঁর দু'স্ত্রী, বগলা ও বিন্দুবাসিনীর মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতির জন্যই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছেন।

কামিনী লোক মারফৎ অভয় কুমারের বৃন্দাবন-বাসের খবর লাভ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেশী বৃদ্ধ ময়রা দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা মাধব বৈরাগীর আশ্রয়ে থেকে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করেন। ইতিপূর্বে পদ্মলোচনকে লেখা, দেশের এক চিঠি হতে অভয় কুমার তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ভুল সংবাদ লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণবী-বেশী কামিনীর আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অভয় কুমার এক সময়ে তাঁর সঙ্গে 'কণ্ঠি বদল' করেন। বিবাহের পর বৈষ্ণবীর আসল পরিচয় লাভ করে তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকে না। এ সময়ে বিজয় বাবুও বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে মেয়ে-জামাইর পুনর্মিলন দেখে তাঁর মনেও আনন্দ ধরে না। সকলকে নিয়ে তখন তিনি দেশে ফিরে চলেন। পদ্মলোচনও দেশে ফিরবেন বলে জানান। চিঠিতে জানতে পেরেছেন, তাঁর স্ত্রীরা নাকি আর আগের মতো নেই, তাঁদের জীবনেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে।

'জামাই বারিক'-এ প্রধানতঃ সেকালের সমাজে প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা ও বহু বিবাহের পরিণামের চিত্র ফুটে ওঠেছে। কুলাভিমানী বিজয় বল্লভ 'আদ্যিরস' ছাড়া তাঁর বাড়ীর একটি মেয়েরও বিবাহ দেননি। অপদার্থ কুলীন ঘর-জামাইদের জন্য তিনি ক্যাম্পজাতীয় এক আশ্রয়স্থল জামাই বারিক গড়ে তোলেছেন। কোনো এক সুযোগ্য পুত্রের সঙ্গে, বিজয় বল্লভের পৌত্রীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক আসেন। বিজয় বাবুর এতে অমত নেই, কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় আদ্যিরসের ব্যাপারটি নিয়ে। বিজয় বাবু বলেন, 'আমি আদ্যিরস কত্তে চাই—একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটি সম্প্রদান করি, তা ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না।' (১অ. ১গ.) ছেলে যতো ভালোই হোক, আদ্যিরসে সম্মত না হলে, তাঁর সঙ্গে স্বীয় পৌত্রীর বিবাহ দেয়ার কথা বিজয় বাবু কল্পনাও করতে পারেন না। ঘটককে তিনি জানান 'এ বংশে আদ্যিরস ভিন্ন একটিও মেয়ের বিবাহ হয়নি—আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।' (ঐ) ঘটক অগত্যা জঙ্গল বেড়ের কুঁচিল বাবুর কুলীন ছেলের সঙ্গে, বিজয় বাবুর পৌত্রীর

www.pathagar.com

বিবাহের প্রস্তাব করেন। ছেলেটির রূপ-গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঘটক জানান :

'ঠোঁঠ হেরে সারে শোক, যেন দুটি মোটা যোক,
অবশ রুধির করে পান,
অতি লম্বা পদ দুটি যেন গরানের খুঁটি,
কেটে মাটি করে খান খান ;......
গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুন দিয়ে,
খর্সান তামাক সেজে খায়
লেখাপড়া হড়া পোড়া, কিন্তু কুলিনের গোড়া,
কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।' (ঐ)

ছেলের লেখাপড়ার খবর জানাতে গিয়ে পদ্মলোচন বলেন, 'আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "তোমরা কয় ভাই ?" সে বল্যে, "তিন ভাই" ; আমি বল্যেম, "কে কে ?" সে বল্যে, "আমি, কালাকাকা, আর ভগী পিসী", লেখাপড়ায় কেটে জোড়া দেন।' (ঐ) কিন্তু বিজয় বাবুর মন আগের থেকেই সেই কুলীন ছেলের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। জনৈক পারিষদও ভরসা দেন : 'ছেলেটিকে জামাই বারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্যে পাঁচদিনে সংশোধন হবে, আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন।' (ঐ) পারিষদদের বলে, তখনকার মতো সে প্রসঙ্গটিকে বিজয় বাবু চাপা দিতে চান : 'তোমরা আবার ও কথা তুল্যে কেন ? পদ্মলোচন বাবু এসেছেন ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্‌।' (ঐ)

কৌলীন্যের পরাকাষ্ঠা দেখবার জন্যই বিজয় বাবু জামাই বারিক প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু সহায়-সম্পদহীন, অপদার্থ সব কুলীন ঘরজামাইদের এ ক্যাম্প-জাতীয় আশ্রয়স্থল বস্তুতঃপক্ষে মাতালদের আড্ডাখানাতেই পরিণত হয়েছে। জামাই বারিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে অভয়কুমার জানান, 'একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালাবাবুদের বৈঠকখানায় বস্‌লে শালাবাবুদের লজ্জাবোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ার করে দিয়েছেন, সব জামাইরা সেইখানে থাকে'। (২অ. ২গ.) জামাই বারিকে রাতে শোবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভয়কুমার বলেন, 'তিন কুড়ি খাট্‌ আছে—দড়ি দিয়ে ছাওয়া—তিন কুড়ি বালিশ আছে,... .. সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে,... তামাক, টিকে, আগুন এককোণে থাকে, একজন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে, তামাক দেবে; গাঁজাগুলি চরস নিজে নিজে সেজে খাও।' (ঐ) জামাইরা সেখানে আরো অনেক কাজ করে থাকেন : 'কেউ সখী সম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাঁচালির ছড়া বলচেন, কেউ গাঁজা টিপ্‌চেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।' (ঐ) শ্বশুর বাড়ীর শতো লাঞ্ছনা—অপমানেও তাঁদের কিছু যায় আসে না। অন্ততঃ থাকা-খাওয়ার নিরাপত্তা যেখানে রয়েছে, সেখানে এ লাঞ্ছনা-অপমানের প্রশ্নে সহায়-সম্পদ-হীন জামাইদের বিচলিত হলে চলবে কেনো ! একজন জামাই গাঁজায় টান

www.pathagar.com

দিয়ে বাউল সুরে গান করেন ঃ

'মর দন্ কসে গাঁজার কল্‌কে তুলে,...
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।' (৩অ. ১গ.)

অন্য একজন জামাই খেমটা তালের গান ধরেন ঃ

'অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ি,
তাইতে আসি শ্বশুর বাড়ী, করি কাল যাপন।' (ঐ)

বিজয় বাবুর জামাই অভয় কুমারও পদ্মলোচনকে জানান, 'যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হ'লে কি আর সেখানে যাই।' (২অ. ২গ.)

কুলাভিমানী বিজয় বল্লভ হয়তো তাঁর বাড়ীর মেয়েদের আদ্যিরসের মাধ্যমে বিবাহ দিয়ে, এবং জামাই বারিকে সহায়-সম্বলহীন অপদার্থ ঘরজামাইদের আস্তানা গেড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু মেয়েদের নিকট যে তা একটা অভিশাপই মাত্র। কামিনী বলেন ঃ

'আদ্যিরসের দোজ্ বরে
চিরকালটা জাল্‌য়ে মারে।' (১অ. ২গ.)

স্বামী আসার খবর পেয়ে, সুসজ্জিতা কামিনী আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করেন ঃ

'একি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মিলে না,
সাওড়া গাছের কেলে সোনা,
গাঁজার খবর ষোল আনা,
তারি হাতে এই ললনা !' (৩অ. ২গ.)

তিনি ভাবেন ঃ

'এখনি নিকটে বসে, মাথা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িয়ে বসন।...
এমন চাষার কাছে, আমার কি সুখ আছে
কি আছে কপালে কেবা জানে।' (ঐ)

জামাইদের জীবনেও চরমতম দুর্ভোগ আর অশান্তিই সম্বল। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের আশ্রিত ও সহায়-সম্পদহীন-অপদার্থ স্বামীদের ঘৃণা ও করুণার চোখে দেখেন। একদিকে নারী জীবনের চরম ব্যর্থতা, এবং অপর দিকে অশিক্ষিত বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে হওয়ার ফলে, তাঁদের মনে একই সঙ্গে ব্যর্থতাজনিত আক্রোশ ও এক ধরনের গর্ববোধের জন্ম দিয়েছে। অভয়-কুমার রাগ করে চলে গেলে কামিনী বলেন, 'ঘরজামাইয়ের মান আর অপমান

www.pathagar.com

—ঘরজামাইয়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না......অপমানে হুল বেঁধে না'। (১অ. ২গ.) ভবি ময়রাণী প্রশ্ন করেন, 'তোর ভাতারকে যদি তাড়য়ে দেয়।' কামিনী উত্তর করেন, 'ওলাবিবির পুজ দেই।' (ঐ) এরূপ এক মানসিকতা নিয়েই বুঝি তিনি সেদিন অভয়কুমারকে ঘরের বাইর করে দিয়েছিলেন। ভবি ময়রাণীকে তিনি জানান, 'আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারিনে প্রদীপটে নেবে নেবে. বল্লেম প্রদীপটেয় তেল দাও, সে বল্যে তুমি দাও, ... বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়্য়ে দেব—সেও রাগ্‌লো. গদিতে ধপ ধপ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম।··· নরম হয়ে কত ডাকলে, আমি তা শুনেও শুন্‌লেম না।' (ঐ) কথায় কথায় তিনি তাঁর সেজ দিদির স্বামীর কথা বলেন, 'সেজ দিদির ভাতারের দেখেছি—সেজ দিদি যতবার বাইরে যায়, সে ততবার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।' (ঐ) 'সেজ দিদির ভাতারের' মত হতে পারেন নি বলেই অভয় কুমারের জীবনে এই দুর্ভোগ। হাবার মা যখন বলেন ঃ 'বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে পারে না পাছে বড় বাবু জেগে ওঠেন, কি করে ততক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে লাগলো।'—কামিনী তখন রাগের সঙ্গেই এর প্রতিবাদ করেন, 'দূর পোড়া কপালী মিথ্যাবাদী—যদি কাঁদবের ধন, ··· ·· যদি কাঁদতো, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম ··· ··· কথায় কথায় তেজ, ঘর জামায়ে তেজী হয় কে কোথায় দেখেছে।' (ঐ)

অন্য একদিনের কথা। অভয় কুমার ঘরে এলে কামিনী বলেন, 'টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা তোমার গায়ে ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেন্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।' (৩অ. ২গ.) অভয় কুমার বলেন, 'আমি তা করবো না।' কামিনী যুক্তি দেখান, 'অন্য অন্য জামাইরা তো করে।' অভয়কুমার 'তারা জামাই বারিকের' জাম্বুবান তাই করে—ও কথাগুলিন আমি ভাল বাসি না'—বলে যখন কামিনীর চেয়ার ধরে দাঁড়ান, তখন কামিনী নাক টেপে চিৎকার শুরু করেন, 'ও'রে মাঁ গ'ন্ধে মলুম গ'ন্ধে মলুম'। সেই মুহূর্তে অভয় কুমারও একটু তামাশা করতে ছাড়েন না। তিনিও 'পেৎনী' আসার ভয়ে চিৎকার শুরু করে দেন। চিৎকার শোনে বাড়ীর মেয়েরা ছুটে এসে সমস্ত বিষয় জানতে পারেন। সে বাড়ীর বউ বলেন ঃ 'পোড়ামুখী, সব বোনগুলিন এক, গন্ধ গন্ধ করে মরেন—ও'দের গায় পদ্মের গন্ধ আর ও'দের ভাতারদের গায় পচা নর্দমার গন্ধ··· ···গন্ধ গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ মণ গোলাপজল নষ্ট করে।' (ঐ)

বহু বিবাহের করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায় পদ্মলোচনের জীবনে। পদ্মলোচনের দু' স্ত্রী—বগলা ও বিন্দুবাসিনী তাঁর দেহ দু' ভাগ করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

তাঁকে অর্ধেক শরীরে তেল-মাখা অবস্থায় অসহায়ের মতো বসে থাকতে দেখে, অভয় কুমার এর কারণ কি জানতে চান। পদ্মলোচন বলেন, 'আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান দিকে বড় অবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট অবাগীর। ছোট অবাগীর এতক্ষণ তেল মাকাচ্চিল ;......বড় অবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে।' (২অ. ১গ.) অভয় কুমার বলেন, 'আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না।' পদ্মলোচন আপেক্ষের সঙ্গে জানান, 'তাহলে কি আর আস্ত থাক্‌বো ! বড় অবাগী··· ···ঝাঁটা ফিরয়ে ঘাড় ভাঙ্গবে—বলবে...আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখলে না'। (ঐ) 'বড় অবাগীর কিল, ছোট অবাগীর চড়' খেয়েই তাঁর দিন কাটে। তবু টু শব্দটিও করার যো নেই। 'অভয় কুমার ব্যথিত হন এবং স্বামীর গায়ে হাত তোলার জন্য বগলাকে কটাক্ষ করেন। বগলা বলেন, 'গুণের নিধি বলেছেন বুঝি, আমায় নিন্দে না করে জল খান না—আমি তোমার করিছি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি'। (ঐ) পদ্মলোচন বলেন, 'তুমি মারতে পার, আর আমি বল্‌তে পারিনে ?' তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন বগলা : 'আমি তোমারে একা মারি ? আঃ ড্যাকরা ভারত ছাড়া—ছোট রাণীর নাম করতে পার না,... ...কি বল্‌বো ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাংতেম।' (ঐ) কিন্তু অভয় কুমারের উপস্থিতিতেও শেষ রক্ষা হয় না—এক সময় সত্যি সত্যিই বগলা তাঁর স্বামীর মাথায় সজোরে তেলের বাটি ছুঁড়ে মারেন। অভয় কুমার চমকে ওঠেন—কিন্তু এতেও বুঝি পদ্মলোচনের বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার যো নেই :

'অভ। সত্যি সত্যি মারলে বউ।
বগ। আমি বাটি ফেলে মেরেচি, ছোট রাণী হলে ঘটি ফেলে মারতো ·
কিল মারলে ওঁর গায় পুষ্প বৃষ্টি হয়।' (ঐ)

পদ্মলোচনের হাতে বিন্দুবাসিনীর বাবার দেয়া আঙটি দেখে বগলা বলেন, 'ভালাই চাওতো আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেলবো।' অনন্যোপায় পদ্মালোচন আঙটি খুলে দূরে নিক্ষেপ করলে বিন্দুবাসিনী ছুটে আসেন :

'বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তা কুড়ে ফেলে দিয়েছে ?
পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিছি। (প্রকাশে)·· তোমার আংটি ফেলতে পারি, হঠাৎ হাত থেকে···পড়ে গিয়েছে। ···
বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেছ কি ? তুমি মর,
রাত দিন ঝাঁটা খাচ্ছেন, তবু লজ্জা হয় না; কি বল্‌বো ঠাকুর পো রয়েছে, নইলে নোড়া দিয়ে একটি করে দাঁত ভাংতেম,' (ঐ)

www.pathagar.com

বগলার তৈরী 'কুকুরে উজড়ে' রাখার মতো পিঠে খেয়ে নাকি পদ্মলোচনের পেটের অসুখ হয়েছিলো। বিন্দুবাসিনী বলেন, 'বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটি বার ঘটি ছুঁলে না। আমাকে ভাল বাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।' (ঐ) পদ্ম-লোচন নাকি বগলাকে 'বুড়ো হাবড়া' বলেছেন। বগলা সেজন্য ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে প্রহার করতে শুরু করেন: 'বুড়ো বল্‌বি আরো গাল দিবি? হতোচ্ছোড়া এক চকো, পথে পড়া, আঁটকুড়ীর ছেলে····· মরি পোড়ানীর জামাই।' বিন্দুবাসিনীও বগলাকে নিয়ে ছড়া কাটেন:

'ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন্
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দা বন।'

বগলাওকি ছাড়বার পাত্রী? তিনি বলেন, 'দূর আবাগি ভাল থাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়ি ঘাটায় তোর বাপ কাট যোগায়; বিন্দি রাঁড়ি তোর মড়িপোড়া বাবাকে ব'লে দিস, আমি ম'লে কাঠগুলো যেন শুকনো দেয়।' (ঐ) দু' সতীনের এ কলহ অন্য একদিন চরম রূপ লাভ করে। পদ্মলোচনের জীবনেও এর চেয়ে বড়ো দুর্দিন বুঝি আর আসেনি। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতিই দিচ্ছি:

'বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবিনে, আমি এই ভাতারের কাছে বস্‌লেম। ·· ·· ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারিনে।

বিন্দু। ··· .. আমার ভাগ ছুঁবিতো ঝাঁটার বাড়ি খাবি—

বগ। ··· ···এই ছুঁলেম। ···

বিন্দু। আমার পায়ে তুই এক কিল মার্‌লি, আমি তোর পায়ে দুই কিল মারি। ··· ···

বগ। তবে তোর পায়ে তিন কিল··· ···

বিন্দু। তোর পায়ে এই চার কিল। ··· ···

বগ। ··· ···তবে দেখবি নাকি কেমন করে তোকে রাঁড় করি— (বঁটি লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এককোপ।)

পদ্ম। পাটা একে বারে গিয়েছে··· ··· উত্থান শক্তি রহিত।

বিন্দু। আহা পোড়া কপালী মাচ কোটা ক'রে কে'টে ফেলেচে—এস তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।' (২অ. ৩গ.)

প্রহসনটিতে তৎকালীন সমাজ-জীবনের আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কুলীন পিতারা সেকালে তাঁদের অপদার্থ সন্তানদেরও উ'চু দরে বিক্রী করতেন। বিজয় বাবুর জনৈক পারিষদ, জঙ্গল বেড়ের কুঁচিল বাবুর ব্যবসা সম্বন্ধে জানতে চাইলে পদ্মলোচন বলেন, 'ছেলে মেয়ে বিক্রী করা। তাঁর সন্তানগুলির খুব দরে বিক্রী হয়, তাঁর পিলে রোগা গন্নাকাটা কালপে'চা মেয়েটা হাজার টাকায়

www.pathagar.com

হাইন্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে।' (১অ. ১গ.) বিন্দুবাসিনী তাঁর সতীনকে বলেন, 'তোর বাপ পুঁটি মাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল।' (২অ. ১গ.) বিজয় বাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ঘটক বলেন, 'যে কাল দিন পড়েছে, আদ্যরস প্রায় উঠে গেল—রাম কানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েছেন, সেজন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, ভদ্র সমাজে তাঁর হুঁকা বন্দ। (১অ. ১গ.) ঘটকের এই কথায়, তখন যে বহু বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভও জাগতে শুরু করেছিলো, তার প্রমাণও মেলে। এনিয়ে প্রাচীন ও নব্য-পন্থীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো বলেই বিজয় বাবু বলেন, 'একালে ছেলেকি বাপ্‌কে মানে? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন, কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে কত্তে চায় না।' (ঐ) কুলীন বরের নিন্দা করায় তিনি ঘটককে বলেন, 'তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো, ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গেই বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েছে।' (ঐ)

সেকালে বিজয় বল্লভের মতো ব্যক্তিদের সকল কাজের অন্ধ সমর্থন যোগাতেন একদল তোষামোদকারী পারিষদ। ঘটকের মুখে কুলীন বরের নিন্দা শোনে বিজয় বাবু অস্বস্থি বোধ করতে থাকলে জনৈক পারিষদ বলেন, 'ছেলেটিকে জামাই বারিকে এনে ফেলতে পাল্যে পাঁচদিনে সংশোধন হবে, আপনি জামাই-দিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন।' (১অ. ১গ.) পদ্মলোচন বিজয় বল্লভের কাছ থেকে উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে তাঁকে উপমা উদাহরণের মাধ্যমে দু'কথা শোনাতে থাকলে, অন্য একজন পারিষদ বলেন, 'আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন?' পদ্মলোচন বলেন, 'আমি ত আপনার মত ভার হাতে করে আসিনি যে উচিত কথা বল্‌তে সংকুচিত হব।' পারিষদ জবাব দেন, 'জমিদার-দিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বরদত্ত।' (ঐ) পদ্মলোচন বুঝি অভয় কুমারকে যথার্থই বলেছিলেন, 'তোমার শ্বশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোষা-মুদেরা খারাপ করে তুলেছে।' (২অ. ১গ.)

জামাই বারিকের জামাইদের অবসর মুহূর্তের গাওয়া বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়ে, সেকালের সমাজে, বিশেষ করে অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে যে সখী সম্বাদ, পাঁচালি-পীরের গান বেশ প্রিয় ছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সাত কান্ট রামায়ণ বলা'র পর জামাইরা 'পিরের গান' ধরেন ঃ

'কোরানেতে বয়েদ আছে, দুনিয়াটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বো সকলি ঝাক্‌মারি।······
মানীলোকের রাখ্‌বা মান, গোরিব লোককে করবা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।' (৩অ. ১গ.)

www.pathagar.com

সেকালে স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতিও সামাজিক সুস্থতাকে দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় বিষিয়ে তুলেছিলো। পদ্মলোচন বলেন, কোলকাতার 'কোন কোন স্থল বিষময়।' সেখানকার বাবুরা বন্ধুর বাড়ীতে 'ভিজিট রিটারনের' সময় খোড়া হলেও, 'বিলাস কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।' (১অ. ১গ.) পদ্মলোচনকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিজয় বাবু বলেন, 'যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।' পদ্মলোচন বলেন, 'আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।' (ঐ) সতীনের প্রতি বগলার কথা ক'টিও লক্ষ্য করার মতো : 'ওলো পোড়া কপালি, তোকে বিয়ে করেনি,...তোকে রেখেছে—বাবুরা মেগের বয়স হ'লে যেমন রাখে, ...তুই বারেনডায় চিক্ ঝুলিয়ে দে,... ...বাঁধা হুকোগুলো মেজে ঘসে রাখ্, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাৎ,... ...পাছা পেড়ে শাড়ী পর, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর নুক্য়ে নুক্য়ে বাবুর মুখে চুনকালি দে।' (২অ. ১গ.) কামিনী কর্তৃক বিতাড়িত অনন্যোপায় অভয় কুমার বৃদ্ধা হাবার মার ঘরে রাত কাটিয়ে ছিলেন। সে প্রসঙ্গে কথা ওঠায় কামিনী হাবার মাকে বলেন, 'সে যে তোমার নয়নতারা।' হাবার মা উত্তর করেন, 'তাতো তুমিই করে দিয়েছ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়, বড় মানুষের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।' (১অ. ২গ.) জামাই বারিকের পরিচারিকা পাঁচিকে জনৈক জামাই দ্রৌপদী বলে ঠাট্টা করায় পাঁচি বলেন, 'না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হ'তে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ তপন রূপে বিমোহিত মন,
বিবাহ না হতে কুন্তী অর্পিল যৌবন।' (৩অ. ১গ.)

এ সমস্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে, সেকালের সমাজের নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতির প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আমরা 'সধবার একাদশী'র আলোচনা কালে যা বলেছি, তা এখানেও প্রযোজ্য—কামিনী, হাবার মা ও ভবি ময়রাণীর বিশেষ কথোপকথন বা বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কলহ-সংলাপের জন্য প্রহসনকার দায়ী নন—দায়ী তৎকালীন সমাজ। আর তা ছাড়া, বিশেষ চরিত্র, পরিবেশ ও চরিত্রের মানসিকতা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারেও কোনো কোনো সময়ে ভব্যতার আবরণ খুলে ফেলারও প্রয়োজন হতে পারে।

পাঁচ

'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' দীনবন্ধু মিত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। এর একটি পূর্ববৃত্তান্ত উল্লেখ করা যায় : 'দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের বিরুদ্ধে যে মানহানিকর মোকদ্দমায় রেভারেন্ড লং সাহেবের

www.pathagar.com

হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদন্ড হয়, সেই মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬১ সনের ২৭শে আগষ্ট কলিকাতা শোভা বাজারের নাট মন্দিরে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাম গোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং এতদ্দেশীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করিবার জন্য উক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া ইংলন্ডের তদানীন্তন ভারত সচিবের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে কলিকাতার কয়েকজন ইংরেজ বণিক কয়েকজন স্বার্থান্ধ দেশীয় লোকের সহায়তায় এক বিরুদ্ধ সভার অধিবেশন করিয়া তাহাতে উক্ত বিচারপতিকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। মনে হয়, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া দীনবন্ধু 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নামক একখানী ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন।'[৪২] ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেন, 'দীনবন্ধুর অন্যান্য রচনায় নির্মম ব্যঙ্গের নিদর্শন খুব কমই আছে। কিন্তু এই নকসাটির মধ্যে ক্রুদ্ধ লেখক নির্মম ব্যঙ্গের চাবুকটি নিয়ে নির্দয়ভাবে নীচ, স্বার্থলোভী, খোসামুদে মানুষগুলিকে প্রহার করেছেন।'[৪৩]

ভোঁদা, গোমা, গ্যাটা গোঁটা, স্বার্থক দাস, সাত হাতের কানাকড়ি, এবং হুতোম পেঁচার নব প্রতিষ্ঠিত দলের নাম 'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। ভোঁদা এই দলের 'মস্তক' আর গ্যাটা গোঁটা এর 'সাপোর্টকারী সম্পাদক'। তাঁরা বিচারপতি বলদ পঞ্চাননকে অভিনন্দন পত্র দেবার ব্যবস্থা করেছেন—এতে 'প্রায় দুই হাজার সহি'ও হয়েছে। স্বার্থকদাস, হুতোম ও কানাকড়িও স্বাক্ষর করেছেন, কিন্তু তাঁদের এ স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়।'

যথা সময়ে মানপত্রটি প্রদান করা হয়। মনের আনন্দে বিচারপতি বলদ পঞ্চানন বলে ওঠেন ঃ

> 'গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
> কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়।।'

অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের এই প্রহসনটিতে দুর্ব্যবহারী ও পক্ষপাতী ইংরেজ বিচারক এবং স্বার্থান্বেষী, নীতিহীন ও ইংরেজের খোশামোদকারী একদল শিক্ষিত বাঙালীর চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেছে। 'বঙ্গদেশ বিদ্বেষী' ইংরেজ বিচারকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নামে ভোঁদা এক সময়ে কোলকাতার 'বোকা-রাজার' সঙ্গে মিলিত হয়েই কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো অন্যত্র ঃ 'ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশলেম আর ছেলে পিলেগুলোর সহায়

www.pathagar.com

হল।'[৪৪] তাঁর 'দল ভেঙ্গে' বেরিয়ে আসার পেছনেও একই উদ্দেশ্য বর্তমান: 'এই যে বিচারপতি বলদ পঞ্চাননকে অভিনন্দনপত্র দেবার অভিসন্ধি করেছি, এতে আমার কত উপকার, তা আমিই জানি'। (১ দৃঃ) দল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারার জন্য ভোঁদার গর্বও কম নয়। কিন্তু স্বার্থকদাস বলেন, 'আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গ সমাজের শুভ সাধন হয়েছে।' ভোঁদা বলেন, 'এসব এখানে বল্‌চো—বলো, অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো না—আমরা কিসে কম'। (ঐ) তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বলদ পঞ্চাননকে মানপত্র প্রদান করে, ফিরে আসতে আসতে তিনি বলেন:

'চল ভাই ঘরে যাই পালা হল শেষ !
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ।।' (২ দৃঃ)

বলদ পঞ্চাননের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মধ্যে হুতোম পেঁচাও একজন ছিলেন। এখন আবার তিনিই মানপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ভোঁদা তাঁকে, 'ওষ্ঠ ফাঁক কচ্ছেন না' বলায় তিনি বলেন, 'পেঁচা প্যাঁচ পোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেম কল্লেম, এতে ভাল হল কি মন্দ হল, তা যদি আমার বুঝবের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হলে আমি পূর্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আনতে যেতেন না।' (১ দৃঃ) তবে একথাও তিনি বলেন, 'আমার স্বাক্ষর হাতের, মনে নয়।' (ঐ) স্বার্থকদাস ও কানাকড়ি বলেন, 'ডিটো'। স্বার্থকদাস আগেও একবার বলেছেন, 'সেদিন যাকে বঙ্গদেশে বিদ্বেষী বলিয়া বক্তৃতা কল্লে, আজ তাকে কি বলে অভিনন্দন দিতে যাও ? আমি পেটের দায় নাম লিখেছি।' (ঐ) গ্যাঁটা গোঁটা দলের সম্পাদক—তাঁর আবার 'কাগজ'ও রয়েছে। ভোঁদাকে তিনি গর্বের সঙ্গেই জানান: 'মহাশয়, আমার শাদা রাজহাঁসের পাকনার জোরে আমি একা এক সহস্র, বেটার টু রেন্‌ ইন হেল্‌ দ্যান সর্ভ ইন্‌ হেভেন—আমাদের দলের নাম হয়েছে "কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" ভালই আপনাকে এই দলের মস্তক বল্‌চে, আমাকে এই দলের সাপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌চে। মনের কথা বল্‌ব কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ জানতো না; এখন আমার কাগজের নাম দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে।' (ঐ) গোমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেকালের কোলকাতার এসব নীতিহীন, স্বার্থান্বেষী ও তোষামুদে ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ ফুটে ওঠেছে: 'কলিকাতা সুবিবেচক, বিদ্যাবিশারদে, দেশ হিতৈষী লোকের অবস্থান বটে, কিন্তু তা বলে দুটো একটা লম্বোদর স্থূলবুদ্ধি গবারম নাই যে, আমার অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে ? দেখুন, প্রায় দুই হাজার সহি হয়েছে।' (ঐ) বলদ পঞ্চানন তাঁর নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে। 'মুখ—দোষে মুখপানে কেহ নাহি চায়'। (২ দৃঃ) তাঁকে মানপত্র প্রদান করতে গিয়ে ভোঁদা যা বলেন, এর মধ্য দিয়েই

www.pathagar.com

তাঁর প্রতি প্রহসনকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চরম রূপ প্রকাশ পেয়েছে : 'আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুর বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।...... কোকিলের কত দোষ, কালো বর্ণ, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু, পরের সন্তানের প্রতি দ্বেষ, স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালন করে না, তথাপি এই কোকিল সকল জগতের প্রিয়-পাত্র, সেটা কেবল মধুর স্বরের গুণে। আপনি আমাদের চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন, জাল সাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, সাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচ জাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, ··· কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন।' (২ দৃঃ)

তথ্য-নির্দেশিকা

১ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৩ ও ৮২৮।

২ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫২।

৩ সুশীল কুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র, কলিকাতা, ১৩৭৯ সাল, পৃঃ ৭।

৪ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

৫ অজিত কুমার ঘোষ, দীনবন্ধু রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ভূমিকা, আট।

৬ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩১।

৭ দীনবন্ধু মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

৮ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩২।

৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩৩।

১০ সুশীল কুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।

১১ Jan Gonda (Edited), 'The modern drama and Dinabandhu Mitra,' A History of Indian Literature, Ibid, P. 225.

১২ দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৪।

১৪ 'পরিহাস রচনাতেও গুপ্ত কবির মতই রুচির বালাই দীনবন্ধুর বড় একটা ছিল না।'—ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩৩৭।

১৫ বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

১৬ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৮।

১৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৮।

১৮ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩৩।

www.pathagar.com

১৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩১।

২০ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫।

২১ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বাঙ্গালা নাটক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃঃ ৪৯।

২২ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৭।

২৩ Hindoo Patriot, 23 April, 1866.
এবং রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

২৪ Bengalee, 21 July, 1866.

২৫ অজিত কুমার ঘোষ, দীনবন্ধু রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ভূমিকা, বত্রিশ।

২৬ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮১-৮২।

২৭ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা), দীনবন্ধু-রচনা সংগ্রহ, ঢাকা, ১৯৬৮, বিয়ে পাগলা বুড়ো, ২অ. ২গ.।

২৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ১৬৯।

২৯ বঙ্কিম রচনাবলী,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৭।

৩০ সুশীল কুমার দে, দীনবন্ধু মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।

৩১ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৩।

৩২ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

৩৩ রহস্য সন্দর্ভ, ৩য় খণ্ড, ৩য় পর্ব।

৩৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান (সম্পাদনা), দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি পৃঃ (২৯)।

৩৫ ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদনা), দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী, কলিকাতা, ১৯৭৫, ভূমিকা, পৃঃ (v)।

৩৬ 'দীনবন্ধুর নাটকের শ্লীলতা অশ্লীলতা বিচার করিবার পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তৎকালীন সমাজই একরকম অশ্লীল নিন্দিত রুচি সম্পন্ন ছিল।'—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৩৭ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫৫।

৩৮ Bipin Chandra Pal, Memories of My Life and Times; In the Days of my Youth, Calcutta, 1932, PP. 300—301.

৩৯ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৭।

৪০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।

৪১ Hindoo Patriot, I April, 1872.

৪২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০২-৪০৩।

৪৩ দীনবন্ধু রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ একচল্লিশ।

৪৪ কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, ১ম দৃশ্য, দীনবন্ধু রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১ খ্রীঃ) এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিখ্যাত নট, নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকার। জীবনের তিরিশের দশক থেকে লিখতে শুরু করেও তিনি প্রায় শ'খানিক নাটক রচনা করেছেন এবং 'নাট্য সম্রাট' আখ্যায় অভিহিত হয়েছেন।[১]

গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনার সূত্রপাত মূলতঃ উনিশ শতকের আশির দশক থেকে। ঐ সময় থেকেই বাঙলাদেশের হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ও সামাজিক পশ্চাদপসরণ-নীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠতে থাকে। বিপিন চন্দ্র পাল লিখেছেন, '... **the whole decade, 1880 to 1890, was marked by a strong current of religious revival and social reaction, which positively set back the movement of progress not only in Bengal but all over India**।'[২] 'এই পিছু-হটার যুগে বঙ্গীয় নাট্যশালায় যুক্তির বদলে ভক্তি, সামাজিক পরিবর্তনের পরিবর্তে প্রথা-আনুগত্য, বাস্তব জীবনের পরিবর্তে পুরাণ ও রূপকথা, আধুনিককাল অপেক্ষা পৌরাণিক যুগ বা মধ্যযুগ, দেশ-প্রেম অপেক্ষা জাতিগত বা বর্ণগত মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রাধান্য পেতে লাগল।'[৩] গিরিশচন্দ্রের নাটক-প্রহসনগুলোকে প্রধানতঃ এ ধারারই সার্থক বাহক বলা যেতে পারে। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা প্রবলভাবে চলেছিল। গিরিশচন্দ্র এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে মনে-প্রাণে যুক্ত ছিলেন—তার ভাবাদর্শকে তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।'[৪] তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো—'কিরূপে ধর্ম শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি সাধিব।'[৫]

ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকের বাঙলায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে নতুন মূল্যবোধের জন্ম নেয়, তাই ছিলো নব জাগরণের মূলমন্ত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখের প্রচেষ্টায় নবোত্থিত হিন্দু ধর্ম, নবজাগরণের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ক্ষেত্রটিকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করে। নবজাগরণের বাঁধ-ভাঙা

www.pathagar.com

জোয়ারের কালে যে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার তৃণ-রূপ অবলম্বনের মাধ্যমে নিজেদের কোনো রকমে জিইয়ে রাখতে পেরেছিলেন মাত্র, জোয়ার শেষে শুরু হোল আবার তাঁদেরই উল্লাস। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ তাঁদেরই মানসপুত্র। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, 'তখনকার বাঙালীর কেবল চিত্তোৎকর্ষেই নয়—তাদের একান্ত বাস্তব জীবন, যে জীবনে প্রগতিশীলতার পাশেই সংস্কারানুগত্য, মুক্তবুদ্ধির সংগে ধর্মানুরাগ, সূক্ষ্ম রুচির সংগে স্থূল বোধের একাকাকার সেই বৃহত্তর অন্তর্জীবনের বিচিত্র ইতিহাস গিরিশচন্দ্রে আছে।'[৬] ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্কিম যুগে পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি যখন শিক্ষিত-সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট হল, তখন গিরিশচন্দ্র সেই পৌরাণিক ভক্তির আবেগ ও সুলভ তত্ত্বকথাকে নাটকে প্রচার করে বাঙালী মানসের আর একটা দিকের পরিচয় তুলে ধরলেন। যুক্তিবাদী বাঙালীর মনে যেমন ক্ষুরধার মননের অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি আবার ভক্তি করুণ রস, প্রাক্তন, নিয়তি প্রভৃতির প্রতিও তাঁর আকর্ষণ প্রবল। গিরিশচন্দ্র নাটকে সেই ভক্তি ভাব-ব্যাকুল বাঙালী চিত্তের ··· ·· বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুললেন।'[৭]

প্রধানতঃ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই গিরিশ-প্রতিভার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্রের যে উজ্জ্বল আদর্শ তাঁর সম্মুখে ছিলো মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যজনিত কারণেই তাকে তিনি কাজে লাগাননি বা কাজে লাগাতে সক্ষম হননি। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'অধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং ধর্মাদর্শ গিরিশচন্দ্রের মনপ্রাণকে এমনিভাবে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাস্তব রাজ্যে স্থূল বিষয়ে তিনি তাঁহার দৃষ্টি অধিক্ষণ নিবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না।'[৮]

উনিশ শতকের কোঠায় রচিত গিরিশচন্দ্রের সামাজিক প্রহসনগুলো হচ্ছে, 'ভোট মঙ্গল বা সজীব', 'পুতুলো নাচ', 'বেল্লিক বাজার', 'মহাপূজা', 'বড় দিনের বখশিশ', 'সভ্যতার পাণ্ডা', 'সপ্তমীতে বিসর্জন' ও 'পাঁচকনে'। এ-গুলোতে গিরিশচন্দ্রের রক্ষণশীল ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রহসনকারের এ রক্ষণশীল অনুদার মনোভাবের বিশেষ পরিচয় তাঁর প্রবন্ধটিতেও লক্ষ্য করা যায়। বিধবা বিবাহ ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হোল : 'সকলেরই মনের ধারণা হওয়া সম্ভব যে, কুমারীর সহিত বিবাহ হইলেও ভাল হয়। যাহার একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সহিত বিবাহ হওয়া যেন একটা ঘৃণার কথা। ... ... সমাজ-সংস্কারক যদি কেবল দয়ার বশীভূত হইয়া এবং হেথায় হোথায় ভ্রূণ হত্যা দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ অতি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ সমাজ-সংস্কারের আমরা সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

বিরোধী।'[৯] নারীর পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ সমন্ধে তিনি বলেন, 'প্রাচ্য দীক্ষায় বিশেষতঃ হিন্দু-দীক্ষায় এক ধর্ম্ম দীক্ষা আছে, আর সমস্ত দীক্ষাই তাহার অন্তর্গত। পাশ্চাত্য দীক্ষায় বঙ্গ মহিলা কেবল বৈষয়িক দীক্ষাই পান, ধর্ম্ম দীক্ষার অভাব রহিয়া যায়।... ...ধর্ম্ম শিক্ষা বঙ্গ-মহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অনুকরণাদি দোষেরও আশঙ্কা আছে।'[১০]

গিরিশচন্দ্র যে মূলতঃ রক্ষণশীল ও সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন তা বুঝতে পারা যায়।[১১] কিন্তু তাঁর প্রহসনগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির অসামাজিক বেলেল্লাপনা, সংস্কার ও প্রগতিশীলতার নামে বাড়াবাড়ি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধের বিসর্জন প্রভৃতির চিত্রও যে বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠেছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। গিরিশচন্দ্রের প্রহসন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্রের "পঞ্চরং" বা প্রহসনগুলির সামাজিক তাৎপর্য কিছু নেই, শুধুই আমাদের উপকরণ মাত্র।'[১২] ভূদেব চৌধুরীর বক্তব্য হলো ঃ

'গিরিশচন্দ্রের নাট্যশৈলীর সর্বশেষ উপাদান প্রহসন। সংখ্যায় প্রচুর হলেও এদের পৃথক আলোচনা করব না। কেবল সংখ্যাধিক্য ছাড়া, ইতিহাসের কাছে প্রতিষ্ঠা দাবি করবার আর কোনো যোগ্যতা নেই এই শ্রেণীর রচনাবলীর।'[১৩] আমাদের মনে হয়, এরূপ সমালোচনার ওপর নির্ভর করলে প্রহসনকার-গিরিশ-চন্দ্রের প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মূলতঃ রক্ষণশীল-দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও প্রহসনকার সেকালের সমাজকেই নিরীক্ষণ করেছেন, সুতরাং তাঁর প্রহসনগুলোর 'সামাজিক তাৎপর্য কিছু নেই' একথা বলা যায় কি করে ? এবং অন্ততঃ আংশিক ভাবে হলেও সামাজিক উত্থান-পতন বা টানা-পোড়নের বাস্তব-নির্ভর ছবি আছে বলেই ইতিহাসের কাছেও সেগুলো উপেক্ষিত নয়।

দুই

গিরিশচন্দ্রের 'ভোটমঙ্গল বা সজীব পুতুলোনাচ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃস্টাব্দে। প্রহসনকার একে 'সাময়িক ব্যঙ্গ-নাট্য' বলে উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশনার বছরের ৭ই অক্টোবর তারিখে, স্টার থিয়েটারে। প্রহসনকার নিজে 'নাচওয়ালা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[১৪]

লর্ড রিপনের সময় কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসন-প্রথার প্রবর্তন হয়। কমিশনার নির্বাচনোপলক্ষে শহরে তখন ভীষণ হৈ-চৈ। একে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করেই গিরিশচন্দ্র 'ভোট মঙ্গল বা সজীব পুতলোনাচ' প্রহসনটি রচনা করেন। এতে কোন কাহিনী নেই—এবং একটি মাত্র দৃশ্যেই তা সমাপ্ত। 'পুতলোনাচের ঘরে' একজন নাচওয়ালা কয়েকটি পুতোল-চরিত্রের বিচিত্র মনের কথা প্রধানতঃ নিজেই বলে গেছেন। মাঝেমধ্যে পুতুল-চরিত্রগুলোও 'গীতে'র মাধ্যমে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

কমিশনার হতে আগ্রহী ব্যক্তি ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি কটাক্ষ ঃ

একটি 'পুত্তলিকার' গীত—

'না হলে নয় কমিশনার দেখ্‌ছি যে বাজার,......
রেতে দিনে চল্‌বে জলের কল,
আলো হবে গলি, কোথা হোঁচট খাবে বল ?......
নতুন বাড়ী হবে না আর মাঠ,
থাক্‌বেনা জ্বর ওলাউঠো উঠ্‌বে বার্নিং ঘাট... !

নাচ-ও। ওগো, তুমি কে গো ?
পুত্ত। পি-পি-পি।
নাচ-ও। কি ব'ল্লে, তুমি গয়লা-পাড়ার গোপাল,......
কমিসানি নেবেই নেবে, বে-আইনি কল্লে ঘানি দেবে, তোমার সঙ্গে কে ?'

ভুলুয়াও গীত করেন—

'নেহি করেগা মেতরকা কাম লেগা কমিসানি,—
বোলা হামকো মেরা রূপী জানী।......

নাচ-ও। ......তুমি কে গো ?
ভুলুয়া। পি-পি-পি।
নাচ-ও। কি বল্লে, তোমার নাম ভুলুয়া,......এবার কমিসানী নেবে, না ভোট পেলে ঘরে ময়লা দেবে ?'

ভোটের গরম বাজারে উমেদার-দেনাদার সকলেই ব্যস্ত। জনৈক উমেদারকে লক্ষ্য করে নাচওয়ালা বলেন, 'করচো উমেদারী, যদি পাও চাকরী ? এখন বাজার গরম ভারি, যে দিন আনলে, ভোটতো ভাল, নইলে জুতোর চোটে প্রাণ গেল ?' দেনাদারের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তুমি কর্জ্জ ক'রে পড়েছ ভারি ঘোরে, চাই দশটা ভোট, ঘুরে ঘুরে হ'য়েছে দড়া ; বড় কর্তা বলেছে, নইলে সুদ ছাড়বে না এক কড়া ?' ভোটের এ গরম বাজারে বাইজীদের দামও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'২ নাচ। দূর পোড়ামুখো-দিল্লীওয়ালী বাই।
এবার প্রাইস্‌ বড় হাই—
শীগ্‌গির কেউ পাবে না ঘাই।

www.pathagar.com

বাইজী। পি-পি-পি।

নাচ-ও। কি বল্লে, বাগানে নাচ হবে, লোক দেখ্‌তে যাবে; অমনি ভোট লিখে নেবে'? খ্রীস্ট ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজীদেরকে কটাক্ষ করতে গিয়ে নাচ-ওয়ালা জনৈক গুরুকে লক্ষ্য করে বলেন, 'এবার পড়েছ ফেরে, কত ঢেউই তুলছে বাবা! ভোট নিয়ে এলো কে রে? উঠ্‌লো খৃষ্টানী ধাজ, .. ব্রহ্ম-ঢেউ চ'লে গেল,.....এ আবার কি নতুন ধম্ম উঠলো গা?'

খেতাব–পাগলদের প্রতি কটাক্ষ:

'নাচ-ও। ... তোমরা কোন্ দিকে ভাই?

পুত্ত। পি-পি-পি।

নাচ-ও। কারো দিকেই নাই, দুটো পয়সায় একটা টাইটেল চাই?'

জনৈক কানাইকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, '......প্রজার মুখে দিয়ে ছাই, টাইটেল নির্ঘাত চাই?' বিত্তবান-অলস ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'তোমরা বড়লোক, ধ'রেছ ঝোঁক?..... উকীলপাড়ায় যাও, ঘরের খাও; কি করবে ছাই, মিটিংয়ে গে তুল্‌বে হাই।'

তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ও সংস্কারকদের প্রতি কটাক্ষ:

'নাচ-ও। ..... তোমাদের আছে লক্ষণ, আগে বল্‌তে মোচার ঘণ্ট, এখন বল গুন্টন; আগে বলতে কলা, এখন বল কেলা,——ড্যাম কুলি ড্যাম, খেলে কত হ্যাম, তবু হ'লোনা ম্যাম।

পুত্ত। পি-পি-পি।

নাচ-ও। সদাই আঁটা পেন্টুলন, কাজ-কম্ম নাই তেমন, আবল তাবল বক্‌তে পাওনা, যাওনা মিটিংয়ে যাওনা,—কিছু না হোক নামটা হবে।'

তিন

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী প্রহসন 'বেল্লিক বাজার' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। প্রহসনকার এর পরিচয় দিয়েছেন 'বড় দিনের পঞ্চরং' বলে। বড় দিন উপলক্ষে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। পরে ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে এর অভিনয় হয়।[১৫] রক্ষণশীল ব্যক্তিরা প্রহসনটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষায়: 'বেল্লিক-বাজার রুচি বিকারে ফুটিয়াছে। বেল্লিক-বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত। জীবন্ত।

www.pathagar.com

রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।'[১৬]

'বেল্লিক-বাজার'-এ মোটামুটি ধরনের একটি কাহিনী আছে। অপদার্থ ও চরিত্রহীন ললিতের পিতা দয়াল নন্দীর মৃত্যু হয়েছে। দোকড়ি দালাল, মৃত্যু রেজিস্ট্রারের নিকট দয়াল নন্দীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে গেলে, রেজিস্টার ভুল করে সেদিনও দয়াল নন্দীর নাম তাঁর খাতায় লিখে নেন। পঁুটিরাম ডাক্তার ও খুদিরাম উকিল রেজিস্টারকে সান্ত্বনা দেন: 'ও চলে যাবে…… ঐ একটা বুড়ীকে অন্তর্জ্জলি করছে, ও নামটা আর লিখনা, তোমার টোটাল দেখাবে বৈত নয়।'

পিতার শ্রাদ্ধের ব্যাপারে সমস্ত করণীয় ললিত অর্থের বিনিময়ে পুরোহিতের হাতেই সঁপে দেন। হাঁসের ডিম খেয়ে অবশ্যি ললিত হবিষ্যি করতে রাজী আছেন, তবে তিনি খালি পায়ে থাকতে পারবেন না—জুতো-মোজা তাঁকে পরতেই হবে।

দোকড়ির পরামর্শে পুঁটিরাম ও খুদিরাম ললিতের কাছ থেকে কিছু আদায়ের ফন্দি আঁটেন। দয়াল নন্দীর মৃত্যুর পর ললিতের শ্বশুর তাঁর 'একজিকিউটার' নিযুক্ত হয়েছিলেন। পুঁটিরাম ও খুদিরাম তাঁর বিরুদ্ধে মকর্দমা করার জন্য ললিতকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। ওদিকে হেণ্ডনোটে সই দিয়ে দোকড়ির মাধ্যমে ললিত ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ করে 'সাহেবের' মতো হয়ে চলার প্রস্তুতি নেন।

পুঁটিরাম ও খুদিরাম, নসীরাম ও মুক্তারামের মাধ্যমে এক নকল সাহেবি-জলসার আয়োজন করেন। এতে পুঁটিরাম ও খুদিরাম কামিনী ও প্রসন্ন নামে দু'জন বারাঙ্গনাকে তাঁদের স্ত্রী হিসেবে উপস্থিত রাখেন। ললিতের আনন্দ তখন দেখে কে। এমন সময় দোকড়ির চক্রান্তে সেখানে দু'জন গোড়ার হামলা চলে, এবং ভয়ে সকলেই আসর ভেঙে পালিয়ে যান।

'বেল্লিক-বাজার'-এ প্রহসনকার সমাজের বিভিন্ন ধরনের 'বেল্লিক'দের মুখোশ খোলার প্রয়াসী। তবে এ-সঙ্গে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রহসনকারের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়টিও ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

ললিতের মতো অপদার্থ, মদখোর ও লম্পট ব্যক্তিরাই সেকালের সমাজের সুস্থতাকে বিনষ্ট করার জন্য দায়ী। আর পুঁটিরাম ও খুদিরামের মতো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরাই ছিলেন তাঁদের সকল দুষ্কর্মের প্রধান সহায়ক। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই পুঁটি ললিতকে বলেন, তিনি যেনো দোকড়িকে আর বাড়ীতে

ঢুকতে না দেন। ললিত ভাবেন, তাহলে টাকা কর্জের কি উপায় হবে—

'খুদি। টাকা আমি দেব; আপনি হ্যান্ডনোটে ধার করবেন না, আমি কম সুদে মর্টগেজ করিয়ে দেব।

ললিত। কিন্তু লোকটা বড় সারভিস্‌এবেল ছিল, ··· এমন কি লুকিয়ে বৈঠকখানায় আন্‌তো; বাবা একদিন টের পেয়ে কান ম'লে তাড়িয়ে দেন।

পুঁটি। আপনি এই বাজারে নারকেল তেল মাখা পাবলিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে মিক্‌স করেন? আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেব, আপনি যাকে ইচ্ছা বাগানে নে যাবেন।

ললিত। ইংলিশ লেডি?

পুঁটি। ইংলিশ, আরমেনিয়ান, জারম্যান।

ললিত। সত্যি মাইরি? গিভ হ্যান্ড, গিভ হ্যান্ড।' (২ দৃঃ)

ললিত সংস্কার মুক্ত হতে চান—নাম কেনার জন্যই তিনি 'খ্রীস্টমাস' করেন ঃ

'ললিত। নসীরাম, খবরের কাগজে লিখবে?

নসী। লিখবেনা? আমি রিপোর্টারদের টাকা দিয়ে এসেছি।

ললিত। আমি 'রাম বাহাদুর' হব?

নসী। নিশ্চয়; এই রকম দুটো খ্রীষ্টমাস করলেই।'

এ সময়ে পুঁটি তাঁর বারাঙ্গনা-স্ত্রীকে নিয়ে প্রবেশ করেন ঃ

'ললিত। ওয়াইফ এসেছেন,·····আসুন, শ্বশুর শালা আমার মাগ পাঠালেনা, আমি তার নামে টেস্‌পাসের চার্জ্জ আনবো।·····

খুদি। ··· —টেস্‌পাস্‌ হবেনা, হেভিয়াস্‌ করপাস করতে হবে।

ললিত। কেন, মদ খেয়ে আমি একবার একজনের বাড়ী ঢুকেছিলেম, আমায় টেস্‌পাস্‌ ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেছিল।' (৮ দৃঃ)

এরূপ বেল্লিকদের যন্ত্রণায় আত্মীয়রা অতিষ্ঠ না হয়ে পারেন না। অনন্যোপায় ললিতের মা'কে শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই চলে যেতে হয়েছে। যে পিসীর আস্‌কারা পেয়ে ললিতের অতোটা অধোগতি, সে পিসীকেই আক্ষেপ করে বলতে হয়, 'ছেলে, এখন বেঁকে বসেছে, শ্রাদ্ধ করতে চায় না, পুরুতের হাতে টাকা ধ'রে দিয়ে বলে মূল্য ধরে দিলেম, দান সাগর শ্রাদ্ধ হবে, পাঁচজনে তোমরা আমোদ করবে এই সব ভাবনায় ডাক ছেড়ে বিনিয়ে কাঁদতে পাইনি।' (৬ দৃঃ) ললিত তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে 'বড় দিনের সৌগাত' এবং তাঁর স্ত্রী মোহিনীকে দেবার জন্য চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। ললিতের পিসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

চিঠিতে কি লেখা রয়েছে তা তিনি জানতে চাইলে, শ্বশুর বলেন, 'লিখেছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, এই ভেড়া, শোর, গোরুগুলো পাঠিয়েছে, আর মোহিনীকে আজই সেখানে পাঠাতে বলেছে, বলে দশ পিণ্ডিতে বৃষ-উৎসর্গ করবো।' তাঁর পক্ষে বুঝি ধৈর্য রক্ষাই তখন কষ্টকর হয়ে ওঠে। চাকরকে ডেকে তিনি বলে ওঠেন: 'নফরা নেফা, আজ থেকে সে আর জামাই নয়; আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে।' (ঐ)

কোলকাতা শহরে তখন যে পুঁটিরাম ও খুদিরামের মতো লোকের অভাব ছিলোনা তা পুঁটিরামের কথা থেকেই বোঝা যায়। ললিতকে বশ করার উপায় সম্বন্ধে খুদিরামকে তিনি বলেন: 'ওকেওতো একটা আমোদ টামোদ দিয়ে রাখা চাই, খালি আদালতে ঘুরোলেই কি ওর প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে? তা একটু রিফরমড্ ইয়ারকি না ঢোকালে যে আমাদের সোসিয়েল পজিসন্ যাবে। সর্বদা ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে। এ শহরে তো সুধু তুমি আর আমি ছিপ নিয়ে ফিরচিনি, অতবড় কাতলা গা-ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে।' (৩ দৃঃ)

প্রধানতঃ পুঁটিরাম, খুদিরাম, নসীরাম ও 'সংস্কারক'দের মাধ্যমে প্রহসনকার সংস্কারপন্থী—বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজীদের কটাক্ষ করেছেন:

'নসী। নাও বস, এখন স্পীচ আরম্ভ হোক্।
১সংস্কা। না, আগে মঙ্গল-সঙ্গীত।
২সংস্কা। না না পলিটিকেল প্রেয়ার।...
নসী। আমি আর কারুর কথা শুনবোনা, আমার দম ফেটে যাচ্ছে, আমি 'স্পীচ আরম্ভ করি। লেডিস এণ্ড জেন্টেলমেন, না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।
১সংস্কা। প্রেমের কোহেল হে দয়াময়, ডাহ হৃদয়-বসন্তে।
২সংস্কা। **Oh ! Poor India, where art thou, come to your own country.'** (৮ দৃঃ)

অন্যত্র—

'পুঁটি। ...একটা পলিটীক্যাল পার্টি করবো আমরা—বুঝেছ খুদিরাম, যাতে স্ত্রী স্বাধীনতা হয়, বিধবার বিবাহ হয়, খাওয়া দাওয়া রেষ্ট্রীক্‌সন উঠে যায়, ন্যাশনাল এনারজি বাড়ে, এমন সব কাজ করতে হবে।
ললিত। স্ত্রী স্বাধীনতা কি?
পুঁটি। এই আপনার স্ত্রী আমাদের সামনে আসবে, আমাদের স্ত্রী আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।' (৩ দৃঃ)

www.pathagar.com

পুরোহিত চরিত্রটি বাস্তব বলেই সুন্দর হয়েছে। পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় 'ছেলে মানুষ' বলে পুরোহিত ললিতকে জুতো-মোজা পায়ে দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। চামড়ার জুতো সমন্ধে ললিতকে তিনি বলেন, 'তা সাহেব বাড়ী থেকে মৃগ-চর্ম্মের জুতা করে নাওনা, হরিণের চামে দোষ নাই। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যি ব্যবস্থা দিতে পারে, আমি আর পারিনি ? ব্যবস্থার মত পয়সা দেয় কে ?' তিনি চলে যেতে থাকলে ললিত তাঁর টিকি ধরে বলেন ঃ

'ললিত। ঠাকুর, দাঁড়াও, আমি দান সাগর কর্‌বো, হাঁসের ডিম খাবার ব্যবস্থা করে দাও।

ভট্টা। তা আপনার যা ইচ্ছে কর্‌বেন, কিন্তু হ-হ-বিষ্য ভোজন গোপনে করতে হয়—গোপনে করতে হয়।

ললিত। কেন, আমি টেবিলে বসে খাব, যদি পাঁচজন বন্ধুই এলো।

ভট্টা। কি জানেন ললিত বাবু, গরীব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন. আমি আপনার হয়ে নিয়ম পালন করে দেব, আমায় মূল্য ধরে দেবেন; পুরোহিতের উপর সব ভার চলে—সব ভার চলে।'(২ দৃঃ)

চার

গিরিশচন্দ্রের ক্ষুদ্র 'রূপক' প্রহসন 'মহাপূজা' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। এর পাত্র-পাত্রীরা হচ্ছেন. বৃটেনিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভারত মাতা ও ভারত সন্তানগণ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে প্রহসনটি প্রথম স্টারে অভিনীত হয়।

'মহাপূজা'য়ও কোনো কাহিনী নেই। প্রধানতঃ বিভিন্ন রূপক চরিত্রের মাধ্যমে ইংরেজের অসীম ক্ষমতা, পর-নির্ভর ভারতবাসী ও তখনকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির আদর্শকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ভারতীয়দের পর-নির্ভরতার প্রতি কটাক্ষ ঃ

লক্ষ্মী বৃটেনিকাকে বলেন—

'কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত সন্তানগণে,
কোন মতে শিখিল না আপন নির্ভর;—
শিল্প-কার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।...
লবণের প্রয়োজন; নিত্য জানে জনে জনে,
তব পুত্র হতে তাহা ক্রয় করি আনে।'

www.pathagar.com

ইংরেজের খোশামোদকারী, ও ইংরেজকে 'প্রভু' মেনে যাঁরা আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির পক্ষে—তাঁদের প্রতি কটাক্ষ ঃ

'১ ভা-স। ভারতের সন্তান, কর কোলাকুলি,... ...
হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি মুসলমান,
একপ্রাণ আজি সবে;—
প্রজা ধর্ম্মে মোরা, ভিন্ন কভু নহে,
ইংলন্ড নগর প্রভু,... ...
একথা ভুলোনা কভু।... ...

২ ভা-স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বক্তা মশাই উত্তম বলেছেন, আসুন আমরা ভারতে 'পার্লামেন্ট' হ'বার প্রার্থনা করি;......আমরা কি না জানি ?—আমরা বক্তৃতা বিদ্যায় কাহারও দ্বিতীয় নই। তবে পরীক্ষায় পাস হইয়া রাজপ্রতিনিধির পদে পারদর্শী কেন না হইব ? তবে আমরা দুর্ব্বল; বলের কার্য্য ইংলণ্ড করুন,—কিন্তু সিভিল বিভাগ সম্পূর্ণ ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হউক। ...

৩ ভা-স। ......যেরূপ .. ...ব্যবহার শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়া রাজাকে যথাযথ সাহায্য করিতেছি,..... রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া সেই রূপ ইংলণ্ডের উচ্চ রাজকার্য্যের সহকারী হইব। ...

৬ ভা-স। ... .. ভারত-উন্নতি যাঁর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজভক্তি যাঁর হৃদয় উপাস্য, রাজকার্য্যে যাঁর প্রাণপণ, শ্বেতাঙ্গ জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইতে যাঁহার সাধ,... ...তাহাদের পূজা ভারতমাতা গ্রহণ করিবেন। অন্যের ভারতসন্তান নামে পরিচিত হওয়া কেবল ভ্রাতৃহৃদয়ে বেদনা দান।' (২ দৃঃ)

বৃটানিকা জানান ঃ

'আমাতে প্রত্যয় করি, রহে যদি ধৈর্য্য ধরি,
রহিবে না আর দুঃখ লেশ।'

ভারত সন্তানগণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন ঃ

'শুন, শ্বেতাঙ্গিনী-মাতা দিতেছে অভয়,... ...
ভক্তি-ভাবে কর সবে মাতারে বন্দন,... ...
জয় বর—বন্দিনী মা ভারত-আশ্রয়,
জয় জয় ভারত ঈশ্বর জয় জয়।' (৩ দৃঃ)

www.pathagar.com

পাঁচ

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরবর্তী প্রহসন 'বড় দিনের বখশিস্' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রহসনকার একেও 'পঞ্চরং' বলে উল্লেখ করেছেন। এর পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় দিয়েছেন 'রঙ্গদার' বলে। প্রহসনটি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়-বিজ্ঞাপনে, প্রহসনটিকে 'X' MAS PANTOMIME PARADISE OF FOOLS' বলে উল্লেখ করা হয়।[১৭] তৎকালীন সমাজে প্রহসনটি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলো বলে মনে হয়। এর অভিনয় সম্পর্কে 'মিরর' লিখেন, 'The Christmas Presesnts' to which the constituent of the Theatre were treated on Sunday and Monday last, were offered in trays of elaborate workmanships and set with lustrous stones. The gifts themselves if not altogether new, were reasonable enough and seemd suited to the gastric capacities of pantomimic gourmand.'[১৮]

'বড়দিনের বখশিশ্'-এর চিত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত ও পরস্পর অসংলগ্ন হলেও, এতে মোটামুটি একটি কাহিনী আছে।

ধড়িবাজ পুঁটে মিত্র শিকারের অন্বেষণে আছেন। এমন সময় পরীস্থানের নজর ও গুলজারের সঙ্গে তাঁর দেখা। নজর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এদেশে 'উল্লুক' বা 'বেকুব' পাওয়া যাবে কিনা। পুঁটে জানান, 'ক গণ্ডা, ক কুড়ি, ·· এ মুলুকে উল্লুক নেই ! কি রকম বেকুব চাই, হাম্‌কো বাতায়কে দাও !'

এর পর ধীরে ধীরে বেকুবদের আগমন ঘটতে থাকে। প্রথমে আসেন বিলেতী আচার-ব্যবহার প্রিয় যুবক মিঃ হাজরা ও তাঁর বিবি। হাজরা তাঁর স্ত্রীর কথায় ওঠেন-বসেন—তবু তাঁর মন পাওয়া ভার। স্বামীকে তিনি বলেন, '···মটন ছুঁতে চায় না, তোমার বুড়ী মাকে বলো, দুটো কাবাব আমাদের তৈয়ারী করে দেয়··· ··· আর বা পকে বলো, সেই আমাদের টেবিলে দে য়ায়।' এর পর আসেন গয়ারাম, তাঁর ছোটো ছেলে ভুলু বাবা, কন্যা মিসিবাবা এবং তাঁদের শিক্ষক গদাই দাস। তাঁদের কথাবার্তা থেকেও বুঝতে পারা যায়, বাবা যেমনি উল্লুক, তাঁরে ছেলে-মেয়ে ও তাঁদের মাস্টারও তেমনি। এর পর আসেন গয়ারামের বড়ো ছেলে মিঃ ডস। তিনি ফুলওয়ালী ও নেবুওয়ালীকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কোর্টসিপ করে বে করতে পারবে ?' ফুলওয়ালী ও নেবুওয়ালী ভয়ে পালান।

www.pathagar.com

গয়ারাম বিশ হাজার টাকা পণ নিয়ে ঘোষদের বিধবা মেয়ের সঙ্গে ডসের বিবাহ দেবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ডস ফুলওয়ালীকেই বিবাহ করবেন বলে জানান। টাকা হাতছাড়া হতেছে দেখে, গয়ারাম প্রতিবেশী বুড়ো রামচাঁদকে ছেলে সাজিয়ে সে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করার কথা ভাবেন। গদাই পরামর্শ দেন, প্রয়োজনবোধে একজন থিয়েটারের ছোকরাকেও সে সময়ে উপস্থিত করা যাবে। গণ্ডগোল দেখা দিলে ছোকরা কেটে পড়বেন ববং রামচাঁদের সঙ্গেই বিবাহ হয়ে যাবে। গদাই আরো জানান, এবার ক্রস্‌মাসে তিন জোড়া বর কনে বেরুবে। প্রথম জোড়া গদাই ও নেবুওয়ালী, ২য় জোড়া ডস ও ফুল-ওয়ালী এবং ৩য় জোড়া রামচাঁদ ও ঘোষদের বিধবা মেয়ে।

পুঁটে সবকথা শ্যামধন ঘোষকে জানিয়ে দেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেন, তিনি যেনো আগেই স্ত্রীধন বলে গয়ার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা আদায় করবেন। এবং বিবাহের দিনে দাসী-টাসী একটা কাউকে উপস্থিত করেন। ঘোষ প্রেম-দাসী নামক এক বৈষ্ণবীকে সেজন্য ঠিক করে রাখেন।

বিবাহের দিনে ফুলওয়ালী ও নেবুওয়ালীকে পাওয়া যায় না। সেখানে আসেন ফুলকপিওয়ালী এবং ভেটকী মাছওয়ালী। এদিকে পুঁটে এসে ডসকে জানান, আসলে ঘোষদের মেয়েটিই সবচেয়ে আধুনিক, তিনি গাউন পরেন, হিস্টিরিয়া শিখেছেন, ইত্যাদি। ডস বুঝতে পারেন, তাঁর পিতা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ ও উপযুক্ত পাত্রী দুই হাত করতে চাচ্ছেন। তিনি পিস্তল দিয়ে গয়ারামের সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন বলে জানান।

'নজর ও গুলজার' উল্লুকদের সব কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করে তাঁদেরকে পরীস্থানে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে প্রত্যেকে একটি করে গাধার টুপি লাভ করেন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'নূতন ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার নাগরিক জীবন যে কি প্রকার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানির মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।'[১৯] বস্তুতঃপক্ষে, বড়দিনের বখশিশ্‌-এর চিত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত হলেও, পুঁটে গয়া, ডস, গদাই প্রভৃতির মতো ব্যক্তির যে সেকালের সমাজে অভাব ছিলোনা, একথা বলাই বাহুল্য। সংস্কার ও প্রগতির নামে তাঁরা সেদিন যা করেছেন, তা ছিলো অসামাজিক বেলেল্লাপনারই নামান্তর। খানিকটা উদ্ধৃত দিচ্ছি ঃ

'গয়া। গদাই, ছেলে-মেয়েটা সাবান ইউজ করে ?
গদাই। আল্‌বত।
গয়া। টুথব্রুস্‌ দিয়ে টিথ ক্লিন করে ?

www.pathagar.com

গদাই। আফ কোরস্।
গয়া। সকাল বেলা উঠে তিনবার গড নেই বলে ?
গদাই। এভ্রি ডে, বে-ওজোর।' (১ দৃঃ)

পুটে দালাল-ধড়িবাজ হলেও তার কথায় সেকালের কোলকাতার অনেক নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে। গুলজার ও নজরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'মা বাপকে খেতে দেয়না, মাগের বুট খায়, এ উল্লুক যদি দরকার হয়, ফি ঘরে ঘরে পাবে, ... ইংরেজী কোট পেণ্টুলেন-পরা, এদিকেও বিবিয়ানা ধাঁজের সাজগোজ, যদি চাওতো—নম্বরে সেঁধোও।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'বেল্লিক যদি চাও তো এ সহর উঠিয়ে নিয়ে যাও। এ বেল্লিকের নতুন ধরন কি জান? দু'জনেই বাঙ্গালী, দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে চল্ছে, বাঙ্গালী ভারি পাজি। কারুর বোন বিধবা, লেক্চার দিচ্ছে, বাঙ্গালীর বিধবারা সব অসতী। মস্ত টিকি কাটা ভটচাজ মুরগী খাওয়ার বিধান দিচ্ছে, শালগ্রাম ছেড়ে সাহেবের আরতি কচ্ছে—এ রকম বাঁচা বেল্লিকের দরকার আছে কি? টাইটেল নিতে লাক টাকা দেয়, বাড়ীতে এক মুঠি ভিক্ষে পায়না, সম্পাদক, থিয়েটারের ম্যানেজার?' গয়া, গদাই, ভুলুবাবা ও মিসিবাবার আচার-আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'অমন কুল-তিলকে পিতা আর গুণের ধ্বজা শিক্ষাকর্ত্তার জন্যেই তো মুলুকে বেকুব ভরা। বাপ যদি রবিবারে পান চিবুতে চিবুতে স্টিক হাতে ক'রে গার্ডেন-পার্টিতে না যেতেন, তাহ'লে ছেলে কি মাগের চুড়ী খুলে নে, বেশ্যাবাড়ী সরস্বতী পূজা-কর্ত্তো? মাষ্টারের যদি হিতাহিত জ্ঞান থাকতো, যদি হিত শিক্ষা দিত, তাহ'লে কি ছাত্র বল্তো, ড্যাম হিঁদুয়ানি, মা-বাপকে 'ওল্ড ফুল বল্তো?' (১ দৃঃ)

এর মধ্যে দিয়েই প্রহসনকারের বক্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া পরী-মন্ত্রীর কথাগুলোর মধ্য দিয়েও 'উল্লুক'দের চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ ও প্রহসনকারের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যথা:
হাজরাকে দেখে পরী-মন্ত্রী বলেন—

'তোমায় আমরা চিনি, তুমি রাস্তাতেই জাহির করেছ কারদানি, মাগের বুট শুদ্ধ লাথি খেয়েছ।'

ডসকে দেখে বলেন—

'তুমি বাপের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাও, বল দেখি, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি কোথায় পাও? বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, না?'

www.pathagar.com

গয়াকে দেখে বলেন—

'বড় ছেলেটি ক'রেছ মিষ্টার ডস, ·· ··· টাকার জন্য, পরকে বে দিতে গেলে ছেলের কনে, কচি দু'টি ছেলে মেয়ে কচ্চ খুনে, হিন্দুর ঘরে জন্মে রাখবে রাখবে বাপ-পিতামর ধর্ম্ম কর্ম্ম, তোমায় দেখে ছেলেপুলে সব শিখবে, না—তুমি আপনার ছেলে গোল্লায় দেবে।'

হাজরা বিবিকে দেখে বলেন—

'যে হিন্দু রমণী স্বামীর পূজা করে, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে মরে, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে দেবতা জানে,··· ···তুমি সেই হিন্দু রমণী, কিন্তু হিন্দ তোমার কারদানী, শ্বাশুড়ীকে দিয়ে ফাউল রাঁধাও, শ্বশুরকে বাবুর্চ্চী কর, আর স্বামীকে বুট শুদ্ধ চাট মার, বেকুবনার রাণী—।' (৪ দৃঃ)

ছয়

গিরিশচন্দ্রের অন্যতম প্রহসন 'সভ্যতার পাণ্ডা'ও ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়। প্রহসনকার একেও 'পঞ্চরং' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশনার পরদিন (২৫শে ডিসেম্বর ১৮৯৪ খ্রীঃ) প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

'সভ্যতার পাণ্ডায় কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। এর চরিত্র-সীমা নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে ওল্ড ইয়ার, নিউইয়ার, সভ্যতা, বৃষ-গাভী, গাধা, ভেড়া, পরী প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। চিত্রগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত। প্রহসনকারের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় এতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে আত্মভ্রষ্ট সমাজের পাশ্চাত্যকরণের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশ করা'-ই[২০] প্রহসনকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

'সভ্যতা'র প্রতি কটাক্ষ ঃ

সভ্যতার উক্তি—

'আমার মুখে হাসি চোখে ফাঁসি ভুবন মোহিনী।
মাদকতা প্রবঞ্চনা চির সঙ্গিনী।।
অনাচার আমার কণ্ঠ হার,
দাসী হ'য়ে চরণ-সেবা করে ব্যভিচার'।

বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ ঃ

পুরাতন বর্ষ সভ্যতাকে বলে—

'বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ রহিত, কন্‌সেণ্ট অ্যাক্ট প্রভৃতি মহা মহা কীর্ত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন;··· ···আজও যে

www.pathagar.com

আপনার নামে কলঙ্ক অর্পণ করিনি, এতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আনতে পারি বা না পারি, হিন্দুর ডাইভোর্স-অ্যাক্ট সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেছি।'

সভ্যতাও বুঝি ছাড়ার পাত্র নয়। পুরাতন বর্ষের কীর্তিগুলোকে সে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

'আর তুমিই বা কি না করলে ? একি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিন্দুতে মুরগী খাবে ? বামুন খৃষ্টান হবে ? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে ... ... বাপ-ব্যাটায় গার্ডেন-পার্টি করবে, বেশ্যার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করে দেবে ?' (১ দৃঃ)

'আধুনিক সভ্যতাভিমানী উম্মার্গগামী' নারী-পুরুষের প্রতি কটাক্ষ ঃ দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে ভবতারিণী বলেন—

'এই ভোরে ওঠা, টিথ বুরুস দিয়ে দাঁত মাজা··· ··· ছোট হাজরে বড় হাজরে খাওয়া—কর্তার সঙ্গে বসে খেতে হয়, ··· ··· টিফিন, ডিনার, তিনবার ড্রেস করা, তারপর মেয়েকে বৌকে পড়ান।'

বিশ্বেশ্বরী জিজ্ঞেস করেন, 'শিখ্‌ছ কেমন ?' ভবতারিণী জানান ঃ

'মেয়ে আমার পেটের, বিয়ে পাস করেছে। বাইডীং, বক্‌সীং, জিমন্যাসটিক পর্যন্ত শিখেছে। তবে বৌটা মানুষ হ'ল না। ··· ···সেই আইবুড়ীর মতো ঘোমটা দেবে, ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, ঘোড়া চড়বে না, গাউন পরবে না, দু'পাত ইংরেজীও পড়বে না।' (৩য় দৃঃ)

ভবতারিণী তাঁর পুনর্বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি তাঁর বর্তমান—স্বামীকে পাঠিয়েছেন ডেথ রেজিস্ট্রি করতে। স্বামী নিশিকান্ত রেজিস্টারকে ঘুষ দিয়ে ভবতারিণীর ও ডেথ রেজিস্ট্রি করে ফিরে এসেছেন ঃ

'নীল। দাঁড়াও, পুরুৎ ঠাকুর আসুন, তিনি বলেছেন, তোমার মুখ-অগ্নির পর তোমার শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকবে না।

ভব। তুমি কি আমারও ডেথ রেজেষ্ট্রি করে এসেছ নাকি ?

নীল। করলুম বৈ কি। ··· একটা ... মুন্দর দেখিয়ে বল্লুম, 'এই আমার স্ত্রী।'

ভব। ছিঃ, তুমি বড় অসভ্য। ·· আমি কি ওম্‌নি অসভ্য-মরণ মরবো ?

নীল। তুমি আমায় তেম্‌নিই পেলে বটে ! দেখে এসগে, এখনো লাস জ্বলেনি, আগে গাউন পরিয়ে তবে লাস দেখিয়েছি।

ভব। তাইতো বলি, ··· তুমি কি এমন অসভ্য কাজটা করবে।' (৩ দৃঃ)

www.pathagar.com

নসীরাম বাবুও বিবাহ করছেন। পাত্রীটি সম্বন্ধে সর্বেশ্বর বাবু বলেন ঃ 'ইনি বিন্দাবন বিশ্বাসের কন্যা, তিরিশ বছরে বিধবা হন, আজ দশ বৎসর আমার প্রণয়িনী, আজ শুভ দিনে নসিরাম বাবুর হস্তে অর্পণ করবো।' পুরোহিতকে লক্ষ্য করে দিনু বলেন, 'এ রকম বিবাহ আর কটি দিয়েছেন?' পুরোহিত রেগে উঠেন ঃ 'আপনি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছেন? আমায় চেনেন্ না, আমি স্মৃতিরত্ন, নূতন স্মৃতি করেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কন্যা সম্প্রদান করতে পারে, এক বাপ—আর স্বামী।' (৫ দৃঃ)

বাঙালীর পাশ্চাত্ত্যানুকরণ প্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে প্রহসনের পশু-গুলোও কথা বলে ঃ

'গাভী। মাইডিয়ার বুল! তুমি আর ঘাস খেওনা।
বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমি আর দুধ দিওনা।' ··· (৭দৃঃ)
গাভী। এস সেক্‌হ্যান্ড করি।' (৭ দৃঃ)

অন্যত্র—

'কিপার। তুমি লড়বে?
ভেড়া। লড়্‌বো।
কিপার। কার সঙ্গে?
ভেড়া। কারো সঙ্গে না, আপনি আপনি।' (১০ দৃঃ)

মিউনিসিপ্যালেটি ও কমিশনারদের প্রতি কটাক্ষ ঃ

'কিপার। ··· ...পরিচয় দাও... ...।
হাড়গিলে। ··· ...আমি হাড়গিলে।
কিপার। নামটি কোথায় পেলে?
হাড়গিলে। সাহেবদের এ'টো হাড় গিলে গিলে।
কিপার। কোথায় থাক?
হাড়গিলে। টেক্সার বিলে।
কিপার। কেন এয়েছো?
হাড়গিলে। কমিশনার হব বলে।' (ঐ)

www.pathagar.com

সাত

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দেই গিরিশ চন্দ্রের অন্যতম প্রহসন 'সপ্তমীতে বিসর্জন' প্রকাশিত হয়। প্রহসনকার একে 'পূজার পঞ্চ রং' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রহসনটি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

'সপ্তমীতে বিসর্জন'-এ তেমন কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। কোলকাতার নাগরিক জীবনের কতোগুলো বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন চিত্র সংগ্রহ করেই এতে রূপদান করা হয়েছে।

নতুন বাজারে সুদখোর ধনী ব্যক্তি, ধড়িবাজ উকিল ও দালালরা কাপ্তান বাবুদের আশায় ও'ৎপেতে বসে আছেন। খানসামা ঠিকুজী হাতে খোকা বাবুকে নিয়ে সেখানে আসেন এবং খোকা বাবু যে সাবালক হয়েছেন তা প্রমাণ করে, তাঁর জন্য হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার নেয়ার আগ্রহের কথা জানান। দালাল-ধড়িবাজদের চক্রান্তের শিকার হয়ে খোকা বাবু তাঁর ঘড়ি-চেন প্রভৃতি দিয়ে পঁচিশ টাকা গ্রহণ করেন। এ সময়ে আদালতের 'বেলিক' জনৈক ওয়ারেন্টের আসামীকে নিয়ে এসে উপস্থিত হন। আসামী জেলে যাবার আগে তাঁর রক্ষিতার জন্য টাকা ধার করে পূজার বাজারটা করে যেতে চান। গোবর্ধন ও প্যালারাম আসেন। পাওনাদারের ভয়ে প্যালা গণেশের মুখোশ পরে আছেন। গোবর্ধন নতুন মেয়ে মানুষ রেখেছেন, কিন্তু টাকার অভাবে পূজার বাজার করতে পারছেন না। প্যালা তাঁকে দু'তিনশো টাকার জিনিস ধারে কেনার পরামর্শ দেন।

বারাঙ্গনা বিরাজের বাড়ীতে গোঁসাই বসে মদ খাচ্ছেন। বিরাজের জন্য তিনি এক নতুন 'প্রেমিক পুরুষ' নিয়ে এসেছেন। প্রেমিক পুরুষটির পরিচয় শুধু 'মামা' বলেই জানা যায়। কিন্তু মামার চেহারা দেখে বিরাজের মেজাজ সপ্তগ্রামে ওঠে। এমনিতেও বিরাজের মন খারাপ হয়েছিলো। তাঁর মা এবং তাঁর বড়ো ইচ্ছে ছিলো এবারে দুর্গা পূজা করা। কিন্তু সপ্তমীর রাতে বাজারে কোনো ঠাকুরই কিনতে না পেরে সাতকড়ি মাত্র একটি চাল চিত্তির নিয়ে ফিরে আসেন। গোঁসাই বলেন চাল চিত্তির আর কার্তিক হলেই দুর্গোৎসব করা যায়। কিন্তু কার্তিকইবা মেলে কোথায়। অবশেষে ঠিক হোল, সাতকড়ি সাজবেন ময়ূর এবং মামা কার্তিক সেজে তাঁর উপরে চড়ে বসবেন।

যথা সময়ে পূজার কাজ শুরু হয়ে যায়। মদ পান করে গোঁসাই আবোল-তাবোল মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন। মদের নেশায় ময়ূরও এক একবার উড়ে যেতে চায়। কার্তিকের বিপদ দেখে কে। এ সময়ে গোবর্ধন, প্যালা ও তাঁদের

ইয়ারের দল মাতাল অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হন। গোঁসাই পাঁঠা বলি দেয়ার কথা বললে প্যালা এসে ঘাড় পাতেন। একজন ইয়ার বলেন, এবার না হয় কার্তিককেই বলি দেয়া হোক, একটা নতুন কীর্তি থেকে যাবে। কার্তিক পালাতে গিয়েও ধরা পড়েন। শুরু হয় বিসর্জনের পালা। ইয়াররা কার্তিক-ময়ূর বেঁধে গোঁসাইকে সহ নিয়ে চলেন বিসর্জন দিতে। অনন্যোপায় কার্তিক তখন পাহারাওয়ালাকে ডাকেন। পাহারাওয়ালা মাতালদের বন্দী করার জন্য তোড়জোড় করেন। কিন্তু ইয়ারদেরও বিসর্জন-প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

প্রহসনটিতে কিছুটা অতিরঞ্জিত ঘটনা থাকলেও, সেকালের কোলকাতার নারী-পুরুষের জীবনের চরম অধোগতির চিত্রটি বাস্তব হয়েই ফুটেছে। দেনার দায়ে বেলিফ আসামীকে জেলে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আসামীর সেজন্য আক্ষেপ নেই ঃ 'বুঝেছ বেলিফ সাহেব! আমি পালাবার ছেলে নই। অমন কতবার ধার করেছি, কতবার জেলে গেছি। আমার সঙ্গে আসুন—পুজোর বাজারটা ক'রে আমি তোমার সঙ্গে চলে যাচ্ছি; ·· ...কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা শ' চেরেকের কাপড় নেব—এই বডি-টডি জোড়া কতক জুতো, ·· ...দরওয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার ক'রে তোমায় মদ খাইয়ে দেব এখন। ·· আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেবনা।' (১ দৃঃ) প্যালা গণেশের মুখোশ পরে গোবর্ধনের দিদিমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পরও তাঁকে মুখোশ পরাবস্থায় দেখে গোবর্ধন জিজ্ঞেস করেন, 'এখনও মুখোসটা মুখে রেখেছিস্ কেন?' প্যালা যেনো খানিকটা রেগেই ওঠেন ঃ 'কেন, দু' ধারি পাওনাদার জানিস্‌নি? আর বছর কি তুই কাপ্তেনী ক'রিছিলি? আমি সম্বচ্ছরটা চালিয়ে এসেছি, এই ভাদ্দর মাসে গোলাপীর ঝাঁটা খেয়ে বেরিয়েছি বইত নয়?' (ঐ) দিদিমার কাছ থেকে প্যালা যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় করে আনতে পারেননি বলে গোবর্ধন চিন্তায় পড়েছেন ঃ

'গোব। তবে পুজোর খরচ চ'লে কি করে?
প্যালা। আরে, তার জন্যে ভাবিস্‌নি! যখন নূতন মেয়ে মানুষ রেখেছিস, দু'তিন শো টাকার জিনিষ ধারে চ'লবে।
গোব। তা দেখ্, জোগাড় দেখ্।
কাপড়ওয়ালা,... ...বডি-গাউন ওয়ালার প্রবেশ
কাপ-ও। ও গণেশ-মুখো বাবু! কাপড়-চোপড় কিছু কিন্‌বেন কি?
প্যালা। হ্যাঁ, এই বাবুর মেয়ে মানুষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও,—ভাল বেনারসী, ভাল বোম্বাই।
কাপ-ও। ... ... কোন্ ঠিকানায়?

www.pathagar.com

প্যালা। ৩২ নম্বর তাঁবাগাজী পাঠিয়ে দাও, সেই খানেই টাকা পাবে, আবার ব্যাংক বন্ধ হ'য়ে যাবে, নোট ভাঙ্গাতে চল্লুম।' (ঐ)

দুর্গা পুজোর আয়োজনে বিরাজ ব্যস্ত : 'খান্‌কী-বাড়ীতে কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজোই হয়, আমি ঠাউরেছি, দুর্গা পুজো কর্‌বো, তার জন্যে আমার মাথা ঘুরছে।' কিন্তু সপ্তমীর দিনে বাজারে ঠাকুর পাওয়া যায়নি বলে সাতকড়ি ময়ূর ও মামা কার্তিক-সাজছেন :

'সাত। আপনি মদ খান ?
মামা। হুইস্কি খাই।
সাত। পিটে ব'সে খাবেন ?
মামা। কেউ না টের পায় যদি।'

মামা বিরাজের বিরক্তি ভাব লক্ষ্য করে এক সময়ে বড়ো করুণ ভাবে বলেছিলেন, 'বিরাজ, আমি প্রেমিক পুরুষ, তোমাকে প্রেম দিতে এসেছি।' বিরাজ তখন সেকথায় কোনো মূল্য দেননি। কিন্তু এখন যে মামাকেই কার্তিক সাজাতে হচ্ছে :

'বিরাজ। আপনি শুনন, এই পাগড়ী পরুন; শুক্রবারে আপনার সঙ্গে প্রেমের কথা কইব।
মামা। দেখ আমি যখন কার্তিক হ'য়ে ব'সব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িও, ওরির ভেতর দুটো একটা কইব।'

এই সময়ে গোবর্ধন ও প্যালার দল এসে বলতে থাকেন, 'আরতি বাজিয়ে দে, উরুর ঠাকুর বিসর্জন যায়।' গোঁসাই আর বসে থাকতে পারেন না :

গোঁসাই। থাম থাম। বিরাজ, তাড়াতাড়ি আমি পুজোয় বসি; হুইস্কির বোতলটা পাশে রেখো, ফুরুলে আমি চাইবনা, ফের এনে দিও।
মা। বাবা, এই ফুল নাও।
গোঁসাই। তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালায় নমঃ, সোনা গাছায় নমঃ ইত্যাদি। (৩ দৃঃ)

ধর্মধ্বজ লম্পট আর কাকে বলে ! মামার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজীদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে বুঝতে পারা যায়।

প্রহসনটিতে সখের যাত্রাওয়ালাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাও উল্লেখ করার মতো। বিরাজ-গোঁসাই প্রমুখ পুজোর কাজে ব্যস্ত। এমন সময় আসেন সখের যাত্রাওয়ালারা। নবমীর দিনে গাইবার ফরমাস পাওয়ার জন্য, তাঁরা

www.pathagar.com

তখুনি সেখানে খানিকটা অভিনয়-নমুনা দেখিয়ে দেন :

'অধিকারী। ওগো, আমরা যাত্রাওয়ালা, মওলা দেব, নবমীর দিন গাইব।

গোঁসাই। আচ্ছা মওলা দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ ন্যাস করি। ·· ···

যশোদার প্রবেশ

যশোদা। হাঁরে গোপাল, তুই নাকি আবদুলের বাড়ী মটন্ চপ্ চুরী ক'রে খেয়েছিস্ ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা, পেটের জ্বালায় খেয়েছি।

যশোদা। তবেরে পাজী ! (মারিতে উদ্যত)

দোহারগণ। ওমা, কর কি—কর কি, যাত্রা ভেঙ্গে যাবে—যাত্রা ভেঙ্গে যাবে !

যশোদা। রাখ তোমার যাত্রা, না হয় তোমার দলে নেই থাক্‌বো ! তা বলে ছেলে চোর হবে ?

নন্দ। কি কর্‌বে নন্দরাণি, কি করবে বল, একেলে ছেলে ত বশ নয়।

যশোদা। ... ...ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব, তেমন মাতাল যশোদা আমায় পাওনি !

নন্দ। ইস, সখের দলে তুমিই এক্‌লা নেশা করেছ, আর ত কেউ করেনি ! সখের যাত্রা, তুমিও সৌখীন যশোদা, আমিও সৌখীন নন্দ, তোমার ঝাঁট্যাটার কি ধার ধারি বল, দেখি ?

যশোদা। দেখ সেক্রেটারি, আজ একটা খুন-খারাপি এই খানে হ'লো ব'লে। (ভয়ানক গোলযোগ ও যাত্রাওয়ালাগণের প্রস্থান)।' (ঐ)

আট

উনিশ শতকের কোঠায় রচিত গিরিশ চন্দ্রের শেষ সামাজিক প্রহসন 'পাঁচ ক'নে' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। একেও প্রহসনকার 'পঞ্চরং' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশনার দিনেই (৫ই জানুয়ারী, ১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।[২১]

'পাঁচ ক'নে'-তে কেন্দ্রীয় ঐক্যের অভাব থাকলেও মোটামুটি একটি গল্প আছে—

লক্ষ্মীচরণের ছেলে অমূল্য সমাজ-সংস্কারক দলের নেতা ডালহৌসী ইনস্টিটিউটে তিনি পুরুষ ডেলিগেট ও লেডি ডেলিগেটদের নিয়ে সভা করেন। ডেলিগেটরা আধুনিক পদ্ধতিতে পূজা, বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি করার জন্য যাঁর যাঁর দায়িত্ব ভাগ করে নেন। এমন সময় নসীরাম এসে

www.pathagar.com

খবর দেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। 'পলিটিক্যাল কংগ্রেসের সমর্থক খোট্টারা, কিছুতেই রিফরমেশন মেনে নিচ্ছেন না। অমূল্যের দল লাল নিশানধারী, আর খোট্টা ও 'কান্টিট্রম্যান বেঙ্গলি'রা হচ্ছেন সবুজ নিশানধারী। অমূল্য সবুজ নিশানধারীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, সবুজ নিশানধারীরাও 'ঘুসো' লড়ার জন্য প্রস্তুত।

লক্ষ্মীচরণ প্রচুর পণ নিয়ে অমূল্যের বিবাহ দিতে চান। কিন্তু অমূল্য এতে সম্মত নন—তাছাড়া এসব করার তাঁর সময়ই বা কোথায়। কালাচাঁদ নামক এক ব্যক্তি তাঁদের নিয়ে একটু তামাশা করার ফন্দি আঁটেন। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক শান্তিরামের চতুর্দশী কন্যার সঙ্গে অমূল্যের বিবাহ দেয়ার কথা ভাবেন। অমূল্যকে তিনি জানান, যুদ্ধের জন্যতো তাঁদের বীরের প্রয়োজন। শান্তিরামের মতো মস্ত বড়ো বীর এদেশে বিরল। তিনি যদি তার মেয়েকে বিবাহ করেন, তাহলে যুদ্ধের সময় সে বীরের সাহায্য পেতে পারেন। অমূল্য বালিকা বিবাহ করবেন না বলে মেয়ের বয়সটি অবশ্য বাড়িয়ে বলা হয়। নসী বলেন, এ বিবাহ হলে 'প্রাক্টিক্যাল রিফরমেশন' হবে।

অপরদিকে কালাচাঁদ লক্ষ্মীচরণকে গিয়ে জানান, কোনো এক রাজার ছেলেকে একটি মানিক ছড়ানো মেয়ে দিয়ে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। তাঁর কাছে আরো দুটো মেয়ে রয়েছে। তাঁদের তিনি মরিচ শহরে চালান করবেন। একটি মেয়ে হাঁচলে মোহর এবং কাসলে টাকা বেরোয়, অপর মেয়েটি দাঁড়ালে সিকি আধুলি এবং বসলে দু'আনী বেরোয়। তবে দুটো মেয়েই অত্যন্ত সাধারণভাবে পাৎকোর এবং ড্রেনে থাকেন। লক্ষ্মীচরণের তেমন বিশ্বেস হয় না। কিন্তু কালাচাঁদ চলে গেলে একটু পরেই পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী মেয়ের বাবারা লক্ষ্মীচরণের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সিদ্ধেশ্বর বাবু এবং অন্যজন হলেন নিধিরাম বাবু। দুজনই তাঁদের মেয়েদের টাকা-মোহর প্রভৃতি ঝরার কথা বলেন এবং কালাচাঁদ তাঁদের মরিচ শহরে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন বলেও জানান। এমতাবস্থায় একমাত্র লক্ষ্মীচরণই তাঁর ছেলের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিবাহ দিয়ে কুল-মান রক্ষা করতে পারেন। প্রতিবেশী বিশ্বেশ্বর এসেও তাঁর মেয়ে সম্বন্ধে লক্ষ্মীচরণকে ঐরূপ সিকি আধুলি ঝরার খবর শোনান। তবে কালাচাঁদের ভয়ে তিনি মেয়েটিকে গামলার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। গিন্নি লক্ষ্মীচরণকে বলেন যে করেই হোক মেয়ে-গুলো ঘরে আনতে হবে—দরকার হলে তিনি নিজে সতীন হতেও প্রস্তুত। এমন সময় অমূল্য বাড়ী ফেরেন। গিন্নি তাঁকে বিবাহের কথা বললে, অমূল্য জানান এখন তিনি যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত।

এদিকে কালাচাঁদ পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ করে চলেন। চালাকি করে তিনি এক

www.pathagar.com

উড়ের সঙ্গে উড়েনীর ও টহলদারের সঙ্গে কাঠকুড়ুনীর বিবাহ দেন। বীর শ্বশুর লাভের আশায় অমূল্যও শান্তিরামের মেয়ে বনবিহারিণীর সঙ্গে মালা বদল করেন। আর সিকি-আনী-দু'আনীর লোভে লক্ষ্মীচরণ তাড়াহুড়ো করে বিবাহ করেন বিশ্বেশ্বরের গামলায় লুকোনো মেয়েটিকে। আসলে এ পাত্রীটিও ছিলেন একজন বৈষ্ণবী মাত্র। শুভ দৃষ্টি বিনিময়ের সময় লক্ষ্মী নারায়ণ বলে ওঠেন, 'আরে এ কেরে! এ যে ভিখারী মাগী!' কিন্তু তখন যে আর ফেরার পথ নেই। লাল নিশানধারীরা বলে ওঠেন, **'Three cheers for social reformation!'** সবুজ নিশানধারীরা বলেন, **'Three cheers for political agitation!'** এমন সময় একজন সাহেবকে যেতে দেখে সকলেই তাঁর 'স্তোত্র পাঠ' আরম্ভ করেন।

'পাঁচ ক'নে'র এ কাহিনীটি যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য-ধরনের একথা বলাই বাহুল্য। তবে এতে সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা, পণপ্রথা প্রভৃতির প্রতি প্রহসনকারের কটাক্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর মধ্য দিয়েই সমসাময়িক সমাজের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

ডালহৌসী ইনস্টিটিউটে একনম্বর লেডি ডেলিগেটের ওপর পূজা সেকশনের ভার পড়েছে। তিনি বলেন, 'পূজার শাঁক, ঘনটা, কাঁসর বাজাবে না, বাজবে—একটী আরগীন ··· ঢাক-ঢোল বাজাতে পারবে না, গোরার ব্যান্ড বা কন্সার্ট,—অন্য ব্যান্ড আনাতেও বিশেষ আপত্তি নেই ··· ·· যাত্রা, নাচ, তামাসা, থিয়েটার দিতে পারবে না Social, ... Political Meeting, আমাদের ভেতর Lecture. শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীর ওপর রান্নার ভার। তিনি বলেন, 'আধপলা তেলে বেগুন ভাজ্তে হবে...আলু সেদ্ধ খেতে হবে, ভাজ্তে পাবেনা। মাছ—ঝাল হলুদে চচ্চরি—ঝোল নয়, কালিয়া প্রভৃতিতে আপত্তি নেই।' দু' নম্বর ডেলিগেটের ওপর বিবাহের ভার। তিনি বলেন, 'marriageable age thirty marriage-dowry—লাল পেড়ে'সাড়ী, বরণ না, অন্য কোন রকম স্ত্রী-আচার না বাসর ঘর Prohibited।' নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন মনোমোহিনী ঃ 'Entrance না পাশ কল্লে, কেউ কুট্নো কুটতে পাবেনা, এল. এ, না পাশ কল্লে কেউ রাঁধতে পারবেনা, আর বি. এ. পাশ করে রাঁধতেও পাবেনা, কুট্নোও কুট্তে পাবেনা। এম. এ. পাশ কল্লে হাওয়া খেতে যাও আর না যাও, কিন্তু তার আগে হাওয়া খেতেই হবে। বিলেত যাওয়া Compulsory.' মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে, নিস্তারিণীর বক্তব্য হোল ঃ 'Silk chemise, silk body, তার উপর ট্যারচা ঢাকাই......আর কারপেটের জুতো। সিঁতেয় সরু ক'রে একটু সিন্দুর আর সরু ক'রে কেউ তেলক কাটেন

www.pathagar.com

আপত্তি নেই; **Earing bracelet...compulsory**—সধবা, বিধবা কুমারী সকলকেই পরতে হবে।' (৩ দৃঃ)

সবুজ নিশানধারীরা Social Reformation মানতে চান না। অমূল্য তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন—

'অমূল্য।......অন্ততঃ বিবাহ সম্বন্ধে রিফরমেসন্‌টা নিন; **marriageble age** বাড়িয়ে দিন, আর **marriage dowry** টা উঠিয়ে দিন।......শুদ্ধ মালাবদল ক'রে বে, দান সামগ্রী টান-সামগ্রী কিছু না..... আপনারা···রিফরমেসনে যদি সম্মত হন, আমরাও কতক **point yield** করবো।

সবুজ দল। না, পলিটিক্যাল এজিটেশন।
অমূল্য। না, সোসিয়্যাল রিফরমেসন।
সবুজ দল। না!
অমূল্য। তবে ঘুসী লড়বো।
সবুজ দল। আমরাও লড়বো।
অমূল্য। তবে এস!
সবুজ দল। দাঁড়াও, সেজে আসি।

নসীরাম।...তোমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার কর, আমাদের **ladies**-রাও ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে।
লেডী ডেলি। হাঁ, আমরা ওয়ার ডিক্লেয়ার করলুম।' (ঐ)

বনবিহারিণী সোসিয়্যাল রিফর্মেসনের জন্য কথা বলতে পুণা কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়ে যাচ্ছেন। স্বদেশ-স্বধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের শেষ নেই। সেজন্যই তিনি বর্তমানে বিবাহ করতেও রাজী নন। তাঁর এ সম্বন্ধীয় একটি ছোটো-খাটো বক্তৃতা শোনে কালাচাঁদ হাততালি দিলে তিনি বিস্মিত হন।

'বন। ..... কালাচাঁদ বাবু। আপনি করতালি দেবেন না। করতালি দেওয়া ইংরেজী প্রথা, সে প্রথা আমরা তুলে দিয়েছি; যদি প্রশংসাবাদ কত্তে চান, যদি আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন—বলুন 'সাধু সাধু'। পুরাতন হিন্দুমতে প্রশংসা করুন।

কালাচাঁদ। (রোদন) ও হো হো .....।
বন। ও আবার কি কচ্ছেন?
কালাচাঁদ। ওহো হো,···।
বন। চুপ করুন···।
কালাচাঁদ। ..আমি হিন্দু মতে কাঁদিছি।
বন। এ পুরাতন হিন্দু মত, না নূতন সংশোধিত হিন্দু মত?

www.pathagar.com

'ফ্যাসান বেশে' বিপিন কুমারীকে আসতে দেখে শান্তিরাম কালাচাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—

'শান্তি। ঐ দেখ, আমার বিধবা পুত্রবধূ উপস্থিত। বাবা কালাচাঁদ! পারিস্, যদি এ বেটীকে গাঙ্‌পার ক'রে দিস্! ও দোরে খিল-টিলনা, ও বেটী নাচ্‌নাউলী হ'য়েছে।

বিপিনকুমারী। গীত

'......বাংলা বলি, ছেড়ে দিছি ইংরেজী বুলি,
ফের বাঙালী সেজে এবার
সাজাবো হর রঙা সং॥

দিন কত কহিল খৃষ্টানী,
সমাজে চক্ষু বুজে হই বেহ্মজ্ঞানী
আবার ফের হিঁদুয়ানী,
নতুন ঢঙের হিঁদুয়ানী, নয় সেকেলে জবড়জং॥

কালাচাঁদ। কে তুমি?

বিপিন-কু। আমি এঁর পুত্রবধূ, সভা থেকে খেতাব পেয়েছি ফ্যাসান! আমি নূতন হিন্দু রিফর্মেসনের লেডী লিডার!' (৪ দৃঃ)

এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজী ও বিধবাদের প্রতি প্রহসনকারের বিশেষ কটাক্ষ লক্ষণীয়।

প্রহসনটিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগকে দিয়েও 'গীত' করানো হয়েছে। কলিযুগ ছাড়া সকল যুগের গীত শুনেই 'নর-নারী'রা বলেছেন, 'Mad, mad old lady' কিন্তু কলিযুগ এসে যখন গীত করেন—

'পরি মনের মতন বসন-ভূষণ,
হব যার মনের মতন,
চাতুরী হাসে ভাষে, চাতুরী—মাখা নয়ন'।—

তখন নর-নারীরাও উল্লাসের সঙ্গে গীত করেন—

'We are yours,
Guardian Angel, guide our course!' (১ দৃঃ)

প্রহসনের শুরুতেই প্রহসনকারের রক্ষণশীল মনোভাবটি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১ গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার ও সমালোচক শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্র বঙ্গনাট্য সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ইংরাজ জাতি যেমন সেক্‌সপিয়রের গর্ব করিয়া থাকে, ফরাসী যেমন "মলেয়ারের" গর্ব করিয়া থাকে, জার্মানী যেমন "গেটের" গর্ব করে, আমরাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে "গিরিশচন্দ্রে"র গর্ব করিতে পারি।'—গিরিশ-প্রতিভা, কালীঘাট, ১৩৩৫, পৃঃ ৬৩৮।

২ Bipin Chandra Paul, Memories of My life and Times, Ibid, P. 433.

৩ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৫২৯।

৪ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদনা, গিরিশ রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৬৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ একত্রিশ।

৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ত্রিশ।

৬ প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬৫।

৭ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪।

৮ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, : ১৮৭।

৯ 'সমাজ সংস্কার', গিরিশ-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১২-১৩।

১০ 'স্ত্রী-শিক্ষা,' প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১৪-১৮।

১১ সুকুমার সেন বলেন, 'সমাজ-সংস্কারে গিরিশচন্দ্রের মন সম্পূর্ণ অনুদার না হইলেও অনেকটাই সংস্কার বিমুখ ছিল।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫১।

১২ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ২য় পর্ব, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ২৯২।

১৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৭-৮৮।

১৪ গিরিশ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ বিয়াল্লিশ দ্রঃ।

১৫ প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ।

১৬ নববিভাকর-সাধারণী, ১২৯৪।

১৭ See, The Amrita Bazar Patrika, Dec. 23, 1893.

১৮ The Indian Mirror, Dec. 27, 1893.

১৯ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।

২০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

২১ গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ পঞ্চাশ দ্রঃ।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

সমালোচকদের মতে অমৃতলাল বসু বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান এবং রঙ্গরসের বিখ্যাত নাট্যকার।[১] রস রচনার জন্যই তিনি স্বদেশবাসীর নিকট 'রসরাজ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[২] শৈশব থেকেই অমৃতলালের (১৮৫৩-১৯২৯ খৃঃ) মনোভাব শ্লেষাত্মক হয়ে ওঠেছিলো। তিনি লিখেছেন, 'আমার একজন দূরসম্পর্কীয় কাকা ছিলেন ; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু। ......তিনি শ্লেষ রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন ; 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল Parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।... ...তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার সাকরেদ হইয়া উঠিলাম ; ... ...শ্লেষ রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সহজ সরলতা, **native wit**, ছিল ; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।'[৩] মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতার'র অনুকরণে অল্প বয়সেই তিনি 'একেই কি বলে তোদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করা ?' —নামে একটি 'Farce' রচনা করেন। স্যার জন ক্যাম্বেলের শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন 'মডেল স্কুল' নামে অন্য একটি 'নক্শা'। অমৃতলাল জানান, 'ঐ মডেল স্কুলের "নক্শা" বোধ হয় আমার ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি ; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮/১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশ বাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল ; ২/১ খানা বোধ হয় গিরিশ গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে।'[৪]

অমৃতলাল একাধারে নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার ও কবি। কিন্তু স্বভাব ধর্মের বশেই সাহিত্যের রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক অংশের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং সেই জন্য প্রহসন রচনাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফূরণ ঘটেছে।

'সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক,-সমকালীন প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই রসরাজ রসসৃষ্টি করে গেছেন।'[৫] কিন্তু 'রসরাজ'-এর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, এ 'রস-সৃষ্টি' যে অনেক ক্ষেত্রেই 'কস-সৃষ্টিতে' পরিণত হয়েছে একথাও অস্বীকার করার যো নেই। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'অমৃত-লালের হাস্যরস তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের ন্যায় আমাদিগকে আঘাত করে, আঘাতের বেদনায় আমাদের স্বাভাবিক আনন্দময় হাসি কাষ্ঠ হাসিতে পরিণত হয়।'[৬]

www.pathagar.com

বস্তুতঃপক্ষে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার ও রাজনীতিক প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো 'কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদগামী বুদ্ধির দীপ্তি, বাক্‌রীতির মারপ্যাঁচ, কাহিনীর চাতুরী সব কিছুর অধিকারী হয়েও তিনি আগামী যুগের পদধ্বনি শুনতে পাননি ; যা কিছু সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল, শুধু তার মন্দের দিকটাকেই নিন্দা-বিদ্রূপ করেছেন।'[৭] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'অমৃত লালই সাহিত্যের ভিতর দিয়া রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে দিয়া তাঁহার মনোভাবের সংকীর্ণতার যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্যিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। জীর্ণ প্রাসাদের শিথিল ভিত্তি মাত্র অমৃতলালের সাহিত্য সাধনার অবলম্বন হইয়াছিল—যাহা ইতিপূর্বেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, রোধ করিবার আর কোন উপায় নাই, তাহাই তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন।'[৮] তিনি আরো বলেন, 'হাস্যরস রচনায়··· ··· তিনি ঈশ্বর গুপ্তেরই শিষ্য মাত্র, প্রতিভা ছিলনা বলিয়াই গুরুর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা নিজের হাতে লইয়া আরও বিকৃত করিয়াছেন।'[৯] কোনো কোনো সমালোচক কিন্তু অন্যমত পোষণ করেন। ডঃ বৈদ্যনাথ শীল মনে করেন, 'অমৃতলাল ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টা। মলিয়ারের মতো তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষ-ত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই ব্যঙ্গমিশ্রিত আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি সমাজজীবনও ব্যক্তি-জীবনের সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন।'[১০] তিনি আরো বলেন, 'অমৃতলাল ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক ছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি আধুনিকতার অভিশাপের দিক্‌টি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই আঘাত দিয়া বাঙালীকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। অমৃতলাল ছিলেন সত্যকার দেশ-প্রেমিক।'[১১] ডঃ শীলের এ বক্তব্য ভেবে দেখার মতো। অমৃতলাল সমকালীন সমাজও ব্যক্তি-জীবনের দোষত্রুটিগুলোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সংশোধন করতে চাইলেও, অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকার হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আতিশয্য অমৃতলালের দোষ হইলেও তাহা অপেক্ষাও বড় দোষ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রন্থকার অতি প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন।'[১২] অমৃতলালকে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য বলায় যে আপত্তি ওঠেছে, তাও বিবেচনা করে দেখার মতো। উনিশ শতকের বাঙলায় নব জাগৃতির ফলশ্রুতি স্বরূপ যে নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিলো, অমৃতলালের নিকট তাছিলো নিছক উপহাসেরই বস্তু। বিশেষতঃ বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তাকে মনে হয় কোনোক্রমেই ঈশ্বরগুপ্তের অগ্রগামী বলা চলে না। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম

www.pathagar.com

লিখেছেন, 'আদর্শ প্রচার করবার মত নৈর্ব্যক্তিক উদার চিত্তের অধিকারী অমৃতলাল ছিলো না। ... ... এ বিষয়ে একদিক থেকে তাঁকে ঈশ্বরগুপ্তের পন্হানুসারী বলা যেতে পারে। তবে দু'জনের পার্থক্যও কম নয় ; ঈশ্বরগুপ্ত লেখনী ধারণ করেছিলেন সমাজের অবিচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনাকে বিদ্রূপ করতে আর অমৃতলাল লেখনী ধারণ করেছিলেন সে যুগে নব উদ্ভাসিত প্রগতির কণ্ঠরোধ করতে। সুতরাং এক্ষেত্রে গুরুই শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর।'[১৩] অমৃতলালের অধিকাংশ নাটক-প্রহসনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এগুলোতে 'তাঁর উৎকট সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল প্রাদেশিক ও জাত্যাভিমানী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি হিন্দুয়ানীর একজন বড় রক্ষক হিসাবে দেখা দিয়াছেন।'[১৪]

অমৃতলাল দীর্ঘদিন ধরে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে তিনি সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অনেকগুলো নাটক-প্রহসন রচনা করে এক সম্প্রাদায়ের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর নিন্দা-বিদ্রূপ লাভ করেছেন। 'বাংলার পুরাতনের প্রতি অমৃতলালের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা'[১৫] লক্ষ্য করে, রক্ষণশীলরা যেখানে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, নব্যতন্ত্রের প্রতি নির্বিচার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লক্ষ্য করে প্রগতিশীলরা সেখানেই নিরাশ হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই অমৃতলাল যে লক্ষণশীলদের প্রতিভূ হয়েই উলঙ্গ-আত্মপ্রকাশ করেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর এরূপ আত্মপ্রকাশেও একটা কাজ হয়েছে — অন্ততঃ সেকালের বাঙলার প্রাচীন ও নবীনের এ যে সংঘর্ষ, তা তাঁর প্রহসনের মাধ্যমেই বিস্তৃত আকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠলো। প্রহসনগুলোর যেখানে অমৃতলাল সরাসরি বিশেষ পক্ষীয় — প্রচারক না সেজে, তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির অসামাজিক বেহেল্লাপনা, অন্তঃসারশূন্য আন্দোলন, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি, হিন্দুয়ানির মিথ্যে ঠাট ও ভড়ং প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচক হয়েছেন, সেখানে তো তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের দোষত্রুটিগুলো অত্যন্ত বাস্তব ও নিপুণভাবেই উন্মোচিত হয়েছে। অমৃতলালও তাঁর প্রহসন সম্বন্ধে ডঃ অরুণ কুমার মিত্র যথার্থই লিখিছেন, 'সমকালীন সমাজের বিশিষ্ট পুরুষদের বিদ্রূপ করিবার দুঃসাহসে অ্যারিস্টোফেনিসের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। অ্যারিস্টোফেনিস যেমন আক্রমণ করিয়াছিলেন শক্তিধর ক্লেওনকে, বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন বন্ধু সক্রেটিসকে, শান্ত কৌতুকের খোঁচা দিয়াছিলেন নাট্যকার ইউরিপিডিসকে— অমৃতলালও তেমনই রঙ্গে-ব্যঙ্গে—আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজপতি ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের। অ্যারিস্টোফেনিস না পড়িলে

www.pathagar.com

যেমন এথেন্সবাসিদের স্বভাবধর্ম জানা যাইবে না, অমৃতলালের প্রহসনগুলি অপঠিত থাকিলে তেমনই তাঁহার কালের বাঙালীর অন্তঃপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত থাকিবে।'[১৬]

দুই

অমৃতলালের প্রহসন রচনার সময়-সীমা উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে শুরু করে বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে উনিশ শতকের কোঠায় রচিত প্রহসনের সংখ্যাই তাঁর অধিক। বিশ শতকের প্রথম দু' দশকে যে ক'টি প্রহসন তিনি রচনা করেছেন, ভাব বা বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক থেকে সেগুলোকে অনেকটা পূর্ববর্তী প্রহসনগুলোর অনুবর্তনই বলা চলে। আমাদের বর্তমান আলোচনা উনিশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ে রচিত অমৃতলালের প্রহসনগুলো হচ্ছে—'চোরের উপর বাটপাড়ি,' 'তিলতর্পণ', 'ডিসমিশ', 'চাটুজ্যে ও বাড়ুজ্যে', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'সম্মতি সংকট', 'রাজা বাহাদুর', 'কালাপানি বা হিন্দু মতে সমুদ্র-যাত্রা', 'বাবু', 'একাকার', 'বৌমা' ও 'গ্রাম্য বিভ্রাট'।

'চোরের উপর বাটপাড়ি, পুস্তকাকারে মুদ্রিত অমৃতলালের প্রথম প্রহসন—প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে। কয়েক মাস পরেই প্রহসনটির তৃতীয় সংস্করণ (১৮৭৭ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। এবং প্রথম প্রকাশের পূর্বেই এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় (১৮৭৫ খ্রীঃ)। পরবর্তী সময়েও রঙ্গালয়ে দর্শক-উপস্থিতির মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য কেহ কেহ 'চোরের উপর বাটপাড়ি লাগাইয়ে' দেওয়ার পরামর্শ দিতেন।[১৭]

'চোরের উপর বাটপাড়ি' একটি হাল্কা কৌতুক-রস সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত পরিসরের প্রহসন। এর নায়ক অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় অপসঞ্চিত বিত্তের বাষ্পে ফুলে ওঠা ব্যক্তি। লাম্পট্যপনা ও মদ্যপ তাঁর জীবনের নিত্য সহচর। অঘোরনাথের চোরাই কারবারের অংশিদার কাঙ্গালী চরণ, তাঁর সকল দুষ্কর্মের প্রধান সহায়ক। কাঙ্গালী চরণের মাধ্যমে, তিনি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নারায়ণচন্দ্র বসু নামে এক বেকার যুবককেও হাত করে নিয়েছেন।

অঘোরনাথ তাঁর লাম্পট্যের শিকার অনুসন্ধানের জন্য, নারায়ণকে কোনো এক বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে প্রেরণ করেন। নারায়ণ সেই ঠিকানা ভুল করে, অন্য এক বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে পায়চারি করতে থাকেন। সে বাড়ীর গিন্নি বাউলের গান শোনার জন্য জানালায় এসে দাঁড়ালে, নারায়ণের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

www.pathagar.com

গিন্নি তাঁকে খবর দিয়ে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যান। দুজনের মধ্যে যখন প্রেমালাপ জমে ওঠে, তখনই কর্তা এসে গিন্নি বলে ডাকতে শুরু করেন। অনন্যোপায় গিন্নি তাঁর প্রেমিককে টেবিলের নীচে লুকিয়ে রেখে দরজা খোলেন। কর্তার কিছুটা সন্দেহ হয়েছিলো, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাউকেও দেখতে না পেয়ে তিনি আবার কাজে চলে যান। গিন্নির কাছ থেকে একটি অর্থসহ মানিব্যাগ উপহার লাভ করে এক সময়ে নারায়ণও বিদায় নেন।

ফিরে এসে নারায়ণ অঘোর নাথকে হুবহু সব কথা খুলে বলেন এবং মানিব্যাগটিও তাঁকে দেখান। অঘোর নাথ চমকে উঠেন— এ যে তাঁরই মানিব্যাগ। নারায়ণের কাছ থেকে সে প্রেমিকার ঘরের বর্ণনা শোনেও তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার কথা ভাবেন।

পরদিন নারায়ণ আবার সে গিন্নির ঘরে যান। আনন্দের আতিশয্যে গিন্নি তাঁকে নিয়ে মদপান করতে শুরু করছেন। এমন সময় কর্তা এসে কড়া নাড়েন। গিন্নি নারায়ণকে পিপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, অসুস্থতার ভাণ করে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেন। কর্তা টেবিলের নীচে পরীক্ষা করে কিছুই দেখতে পাননা। কিছুক্ষণ পর তিনি গিন্নির জন্য ডাক্তার ডাকতে চলে গেলে, নারায়ণও তাঁর প্রেমলীলা সাঙ্গ করে বিদায় নেন। সেদিনও অঘোরনাথ নারায়ণের নিকট সব কথা শোনে চিন্তিত হন— তিনি ভাবেন, 'বার বার তিন বার কাল এস্পার কি ওস্পার।'

এর পরদিনও যথারীতি নারায়ণের অভিসার চলে। গিন্নির সঙ্গে প্রেমালাপ সবে জমে ওঠেছে, এমন সময় কর্তা এসে ডাকতে শুরু করেন। গিন্নি নারায়ণকে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে দরজা খুলে দেন। কর্তা ঘরে প্রবেশ করেন পরীক্ষা করে দেখেন, কিন্তু সবই যে শূন্য। ক্ষেপে ওঠেন তিনি — গিন্নির মুখে সংসারিক কথাবার্তা শোনে বলে ওঠেন, 'রেখে দাও তোমার ছেনালি, আমি ওসব শুনতে নাই চাতা হ্যায়। বের কর।' গিন্নিরও কড়া জবাবঃ 'বের করা স্বভাব তোমায়, তুমিই বের কর, পরের বউ-ঝী বার করতে তুমিই খুব তয়ের। স্বামী-স্ত্রীর এ কলহ এ সময়ে চরমে ওঠে। কর্তা গিন্নিকে তাঁর বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেই সম্মত হন। লোকজনকে জানাজানি করা ভালো হবে না ভেবে, তিনি গিন্নির বাপের বাড়ী থেকে দেয়া সিন্দুকটিও নিজের মাথায় করে নিয়ে চলেন। পথে সিন্দুক থেকে 'জল' পড়তে থাকায়, গিন্নি বলেন, এটা পবিত্র জিনিস, তারেকেশ্বরের 'চন্নামেত্র'। কর্তা সে 'চেন্নামেত্র'। জিভে চেটে নিয়ে মনে মনে ধন্য হন।

নারায়ণ ফিরে এসে সবকথাই অঘোর নাথের নিকট ব্যক্ত করেন। সেদিনের মতো বিপদে নাকি তিনি আর কখনো পড়েননি— কর্তা তাঁকে সিন্দুকসহ

www.pathagar.com

মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেন, ভয়ের চোটে তিনি 'পেচ্ছাপ'ই করে দিয়েছিলেন। অঘোরনাথ বলে ওঠেন, 'পেচ্ছাপ করেছ, থুঃ। ওয়াক থুঃ। শালা, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ?' নারায়ণ চলে গেলে তিনি মনে মনে ভাবেন, এ শুধু তাঁর সারা জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বই নয়।

মূলতঃ হাল্কা কৌতুক রস সৃষ্টির অতিপ্রায়ে প্রহসনটি রচিত হলেও, সেকালের সমাজের স্ত্রী পুরুষের লাম্পট্যপনা, মদ্যপান ও তার পরিণামের কিছু চিত্রও এতে ফুটে ওঠেছে। লাম্পট্যপনাই অঘোরনাথের জীবনের নিত্যসহচর। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, 'বের করা স্বভাব তোমার,... ...পরের বউ-ঝী বার করতে তুমিই খুব তয়ের।' (৭ দৃঃ) 'কিছু পাইয়ে' দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অঘোরনাথ বেকার যুবক নারায়ণকে 'হরতনের বিবিতে ইস্কাপনের টেক্কা তুরুপ' করতে পাঠান। কিন্তু খবর নিয়ে নারায়ণ যথাসময়ে ফিরে আসছেন না বলে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে তিনি ভাবেন, 'পাছে আমার দেরী হয়, সেই জন্য যে আমি বাড়ীতে জল পর্যন্ত খেলেমনা, গিন্নি কত অনুরোধ কল্লেন, তবুও একদণ্ড দাঁড়ালেমনা।...... ছোকরা চালাক আছে, চেহারাটাও মন্দ নয় ; কাজ যদি গোছাতে পারে, তাহ'লে এবার ফরচুন ফিরে যাবে।' (৪ দৃঃ) অঘোরনাথ কৃপণ নন—মনের মতো শিকার হাতে এলে তিনি কাঙ্গালীকেও বিমুখ করবেন না বলে জানান : 'আচ্ছা লাগে, সিকি তোমার—কেমন হে কাঙ্গালী চরণ ?' কাঙ্গালী উত্তর করেন, 'আজ্ঞে তা হলেই অযথেষ্ট হবেক—ঢেক।' (১ দৃঃ) অঘোরনাথ চলে গেলে, কাঙ্গালী 'টাকা বাজাইবার অভিনয়' করে নারায়ণকে বলেন, 'আমাদের এই হলেই হল।' (ঐ)

অঘোরনাথ মদ্যপ। তাঁর স্ত্রীকেও তিনি মদ পান করতে শিখিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী নারায়ণকে জানান, 'মিন্ষে খায়' আমাকেও শিখিয়েছে, বলে "তোর অম্বলের ব্যায়রামের উপকার হবে।" 'মদ পান করতে করতে তিনি আদিরসাত্মক গান করেন :

> 'কি দিব কি দিব তোমায় মনে ভাবি আমি।
> সকলকারি সকল আছে, আমার কেবল তুমি।'

উৎফুল্লিত নারায়ণ বলেন, 'বাঃ। এযে ব্রান্ডি। চাকরী গিয়ে অবধি যা কাঙ্গালীর কাছে একটু আধটু খাঁটী খেতেম, ব্রান্ডির টেষ্ট তো ভুলেই গিয়েছিলেম।' (৫ দৃঃ) তখন যে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষই মদ পান করতেন এতে তার প্রমাণও মেলে।

অঘোরনাথের ন্যায় লম্পট ও মদ্যপ স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে, ব্যাভিচারিণী হয়ে পড়াটাই বুঝি স্বাভাবিক। কিন্তু নিজে চরিত্রহীন হলেও, স্ত্রীর চারিত্রিক অধোগতিকে অঘোরনাথ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। নারায়ণের নিকট

www.pathagar.com

তাঁর একদিনের অভিসারের বিবরণ শোনে, অঘোরনাথের ধর্মবোধও জাগ্রত হতে দেখা যায়। তিনি ভাবেন, 'বেটা বলে কি। ··· ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে আমারই সর্ব্বনাশ। ধম্ম জানে।' (৪ দৃঃ) সন্দেহ ঘনিভূত হলে বলতে থাকেনঃ 'যাও বাপকা বাড়ী, নেই চাতা হায়, তোমার মত মাগ আমার ঢের ঢের মিলেগা। আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে।' (৫ দৃঃ) স্ত্রীও রাগের সঙ্গেই জবাব দেন, 'আমি যেমন ভাল আছি, আজকের বাজারে এমন কে থাক্‌তে পারে ?' (৭ দৃঃ) এ 'আজকের বাজারে এমন কে থাক্‌তে পারে' কথাটি থেকেই বুঝতে পারা যায়, স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন সেকালের সমাজে কতোটা চরমে পেঁছেছিলো। কাঙ্গালীর একটি গানে সেকালের কুখ্যাত ধর্মধ্বজ লম্পট তারেকেশ্বরের মোহন্তের লাম্পট্যপনা ও তার পরিণামের কিছুটা পরিচয় মেলে।[১৮]

'বানির বিত্তন্ত, জেনেছে মোহন্ত,
থাক্‌তে জীবন্ত, পরনারীর নামটি আনবেনা মুখে।।' (১ দৃঃ)

মোহন্ত-এলোকেশী ঘটনা নিয়ে সেদিন 'অনেকে অনেক পয়সা রোজগার করে, বিশেষ বটতলার বইওয়ালারা আর থিয়েটার ওয়ালারা।' (ঐ) কাঙ্গালীও 'চার আনার এক টিকিস কোরে ব্যাংগোলে মোহন্ত নাটক' দেখতে গিয়েছিলেন। অঘোরনাথকে তিনি জানান, 'এলোকেশীকে কেটে লবীন যা কল্লে, রক্তে রক্তপাত। চরকি ঘুরে পাগল হ'ল, সেইখানটি বাবু আমায় বড় ভাল লেগেছিল।' (ঐ) মোহন্তের নামে ঔষধ বের করে সেদিন কবিরাজরাও বুঝি কম আয় করেননি। জনৈক ছোকরা কাঙ্গালীকে জানান, 'মিস্ত্রী মশাই, একটাকা দিয়ে এক বোতল মোহন্তের তেল কিনে নে গেছলেম, তেলটার যে ঝাঁজ, দু-দিনে বুনুয়ের দাদ আরাম হয়ে গেল।' (ঐ)

সেকালে স্ত্রী ও পুরুষ বাউলরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে দলবেঁধে গান করতেন। পয়সা দিয়ে সে সমস্ত গান শোনার জন্য ছেলে-মেয়েও গিন্নিদের ভীড় জমতো। প্রহসনটিতে বাউলদের এরূপ একটি গান এ সেকালের নারীশিক্ষার অগ্রগতি এবং সে সমন্ধে প্রাচীন পন্থীদের বিরূপ মনোভাবের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠেছে—যা আমাদেরকে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যথা—

''লেখা-পড়ায় রগড়কি।
ইংরাজীতে এলে বি এ, পাশ করেছেন ঠাকুরর ঝী।
মুখুর্য্যেদের শরৎশশী কুসুম কামিনী,
এরা জজের কেরানী, ···

১৮—

www.pathagar.com

আবার লাট-কৌন্সলের মেম্বর হবে গো,—
মিত্তিরদের সেই বিরাজী।...
দাদার কষ্ট করতে নষ্ট, ত্যজে নারীর বেশ,
বউ পরেছেন মিলেটারি ড্রেস,

মেজ দিদি ধর্‌বেন এবার ষ্টেথিস্কেপ,
আবার বগলে দে থারম্‌মিটের গো,—
নোট করিবেন ক' ডিগ্রী।।" (২ দৃঃ)

বাউলদের অন্য একটি গানে সেকালের পণপ্রথা ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শোচনীয় অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠেছে। যথা :

"বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়।
বাঙ্গালার কন্যাদায় ;
যত গৃহস্ত লোকেতে মারা যায়।।
না হ'তে এন্ট্রান্স পাস,
চায়গো রূপোর খাস গেলাস,
বিএ সোনার ঘড়া গাড়ু, এমেতে সর্ব্বস্ব চান।।
ক'নের বাপ বরকর্তারে, কহিছে মিনতি কোরে,

তোমার এ গাঁট—কসার চাপন,
আমার ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়।।" (ঐ)

তিন

অমৃতলালের পরবর্তী বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'তিল-তর্পণ' নাটক, সংক্ষেপে 'তিল তর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। প্রহসনের 'উৎসর্গপত্র'-এ অমৃতলাল লিখেছেন, 'বঙ্গীয় নট, নটী, নাট্যকার নিকর করস্থল পদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায় উপহার প্রদত্ত হইল।' অন্যত্র তিনি 'তিল তর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তখন আমার যৌবন মুক্ত জীবনের বাসন্তী হাওয়া ইতিহাসকে ভাসাইয়া প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্যসাহিত্যের পিতৃ-পুরুষের তিল তর্পণে প্রয়োগ করিয়া ফেলিলাম।[১৯] প্রহসনটি প্রকাশনার বছরের ২১শে সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং অমৃতলাল নিজেও সে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২০] 'তিল তর্পণ'-এর আলোচনা

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে ডঃ বৈদ্যনাথ শীল লিখেছেন, 'বাংলা রঙ্গমঞ্চেও নাটকের নামে অক্ষম অনুকরণজাত উদ্ভট কল্পনা সম্ভূত, বাস্তবতার সম্পর্কবিহীন রাশি রাশি আবর্জনার কি করিয়া সৃষ্টি হইতেছিল, নাট্যকার নিপুণভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। বাংলা প্রহসন-সাহিত্যে তাই তিল তর্পণ নাটকের স্থায়ী মূল্য আছেই।'[২১]

'তিল তর্পণ'-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে থিয়েটাররের কর্মকর্তা ও অভিনেতারা আসছে শনিবারের প্লে-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। এর মধ্যে কেউ মদপান করে মাতলামি করছেন, কেউ একট্রেশদের বাকী বেতন পরিশোধ করার উপায় খোঁজছেন, কেউ ভাবছেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ড্রামাটাইজ করার কথা। এমন সময় একজন নাট্যকার তাঁর নাটক নিয়ে এসে সেখানে উপস্থিত হন। নাটকের নাম 'তিল তর্পণ নাটক'। নাটকটি কমেডি নয়, ট্রাজেডিও নয়—কোনোপ্রকার প্লটও এতে নেই। নাট্যকার জানান, এটি তাঁর এক অদ্ভুত মৌলিক রচনা—'এতে world-এর আহার ঔষধ দুইই হবে।' নাট্যশালার কর্মকর্তারা ভাবেন, এমন দুর্লভ জিনিসটি কোনো মতেই হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

যথাসময়ে থিয়েটার আরম্ভ হয়। চিতর-রাজ রানা বাপ্পারাও, বাঙলার নবাব আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য রাণীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চান। কিন্তু রাণী তাঁকে আলিবর্দির মতো 'বড় দুর্দান্ত দস্যু'র সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য বারণ করেন। তিনি বলেন, তবু যদি বাপ্পারাও একান্তই যুদ্ধে যেতে চান, তাহলে রাজত্বের একটা উইল করে যাওয়াই ভালো। দুঃখের চরম মুহূর্তে রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়লে, বাপ্পারাও প্রম্পটারের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বাপ্পারাওয়ের মেয়ে হেমাঙ্গিনীর মনে বিরহের উদয় হয়েছে। কিন্তু কার জন্য তাঁর এ বিরহ তা তিনি জানেন না। এমন সময় বাগানের মালি অজুকে দেখে হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারেন, তিনিই তাঁর বিরহের কারণ। হেমাঙ্গিনী অজুর কাছে প্রেমনিবেদন করেন। অজু প্রথমে ভড়কে যান—পরে তাঁর মনেও প্রেমভাব জেগে উঠে।

বাপ্পারাও, 'তোমাদের হুহুঙ্কারে সিংহিনীর গর্ভপাত হোক'—জাতীয় বক্তৃতা দিয়ে তাঁর সৈন্যদের 'উৎসাহ কলসী পরিপূর্ণ' করতে চান, আলিবর্দি খাঁও তামাক টানতে টানতে তাঁর সৈন্যদের সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এমন সময় হেমাঙ্গিনীও অজুকে নিয়ে একজন সৈন্য তাঁর দরবারে প্রবেশ করেন। আলিবর্দি তাঁদের পরিচয় নিতে থাকেন। হেমাঙ্গিনীর কথা বলার সময়,

www.pathagar.com

নেপথ্য থেকে প্রম্পটার তাঁর ভুল ভাঙিয়া দেন, ওটা নাকি' দুর্গেশ নন্দিনীর পাঠ হয়ে যাচ্ছিলো। হেমাঙ্গিনীও অজুর পরিচয় জেনে, আলিবর্দী তাঁদেরকে বাপ্পারাওয়ের দরবারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

নাট্যকার, সমালোচক, ও থিয়েটারের ম্যানেজার মদ পান করতে করতে নাটক সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করতে থাকেন। তাঁদের আলোচনা শেষে বাপ্পারাওয়ের অভিনয় শুরু হয়। কিন্তু এবার মঞ্চে এক নারী-বেশী পুরুষকে দেখে তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। প্রম্পটার অনেক বলে ক'য়ে কোনো রকমে তাঁকে শান্ত করেন।

রাজকুমারীর শোকে রাজা ও রাণী যখন উন্মত্ত, তখন হঠাৎ গান করতে করতে নারদ এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদেরকে অজু মালির সঙ্গে রাজকুমারীর পলায়ন করার খবর জানান। রাণী মূর্ছিতা হয়ে পড়েন এবং দুজন প্রম্পটার এসে মঞ্চ থেকে রাণীকে নিয়ে যান। নারদ বলতে থাকেন, 'নবাব আপনাকে কন্যা ফিরিয়ে দিতে আসছে, অজু রাজপুত্র শাপভ্রষ্ট মালী হয়েছে।' এমন সময় ম্যানেজার এসে হঠাৎ মঞ্চে প্রবেশ করেন, তি'নি বলতে থাকেন, 'সব্বনাশ হ'ল, Drop-Scene ফেলে দে। এদিকেও কমিটির বাবুরা একট্রেশ নিয়ে বাগানে চল্লেন, আবার নেতা দর্জ্জি আগাম ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে এখন পোযাকের বাক্‌স লয়ে পালান'। নাট্যকারের মাথায় যেনো বাজ পড়ে—নাটকটির অভিনয় শেষ হোল না বলে আক্ষেপের অন্ত নেই তাঁর। তবু তিনি হাল ছাড়ে না—পরীস্থানের দৃশ্যটি তাঁকে দর্শকদের দেখাতেই হবে। কয়েকজন সজ্জিতা একট্রেশকে এনে তিনি মঞ্চে ছেড়ে দেন—তাঁরা সকলে পরীর গান করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশে নাটক-প্রহসন রচনা ও অভিনয়ের হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তথাকথিত একদল নাট্য-প্রহসনকার, থিয়েটারের কর্মকর্তা ও অভিনেতা-অভিনেত্রী, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে নাটক-অভিনয়ের জগতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছিলো প্রহসনের ঘটনার মতোই এক হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার। 'তিল তর্পণ'-এ সে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির প্রতিই প্রহসনকারের তীব্র বিদ্রূপ ফুটে ওঠেছে।

।৩২৮প্রহক্ত নাট্যকার মঞ্চস্থ করার জন্য যে নাটকটি নিয়ে আসেন, তা 'Tragidy-ও না Comedy-ও না।' থিয়েটারের দেবেন্দ্রকে তিনি জানান, 'আমি মহাশয় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের Original thoughts নিয়ে কাজ করি ; এতে সব আছে, এখানি হচ্ছে Farcial Tragi Commedy de Pantomimic Operetta.' (পূর্ব দ্রঃ) এতে কোনো প্লট নেই—'Plot নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর ; এতে Wit আছে Humour আছে,⋯ ⋯নাচ, গান, পালাগান, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা,⋯ ⋯চিতোর, সাহেব

www.pathagar.com

মারা, সব আছে—অশ্লীল নাই।' (ঐ) দর্শকদের খুশি করতে হলে নাচের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার জানান, 'Audience-কে খুসী করতে হবে, নাচের জায়গা পাইনা—মল্লিকদের মেজেবউকে খিড়্‌কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।' (ঐ) নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার বুঝি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাপ্পারাওকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁর স্ত্রী বারণ করলে, তিনি বলেন, 'প্রাণেশ্বরি। তুমি নিতান্ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় প্রলাপ বকছো ··· চিতোরের বাপ্পারাও বাঙ্গালীর আলীর ভয়ে পলায়ন করেছিল, এ অপবাদ আমি প্রাণ গেলেও সহ্য করতে পারবে না। উঃ' (১অ. ১গ.) সৈন্যদের উত্তেজিত করে তোলার জন্য তিনি বলেন, 'তোমাদের হুহুংকারে সিংহিনীর গর্ভপাত হোক, তোমাদের বীর-হৃদয়ে পবিত্র গোঁয়াররস প্রবল বেগে প্রবাহিত হোক।' (২অ. ১গ.) অগ্নিময় বক্তৃতা প্রদান করে তিনি সৈন্যদের প্রশ্ন করেন, 'কেমন, তোমাদের উৎসাহ-কলসী পরিপূর্ণ হইয়াছে ?' সৈন্যরা বলে ওঠেন, 'টৈ টুম্বল।' (ঐ) হেমাঙ্গিনীর প্রেম নিবেদনের কথা স্মরণ করে অজুমালি বলেন, 'ওফ। ... ... কে জানতো যে আমার হৃদয় কন্দরে এমন গূঢ় প্রেমভাব ঘাপটি মেরে আছে। ··· হৃদয় শীতল হচ্ছে না, জ্বলছে, জ্বলছে ··এ উষ্ণ প্রস্রবণ জ্বলে, কিন্তু ফোস্‌কা পড়ে না।' (১অ. ২গ.) মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর, গীতিকাব্য-মহাকাব্য, পদাবলি-ব্রজবুলি ইত্যাদি সবই যেনো নাট্যকারের নখদর্পণে। বাপ্পারাও রাণীকে বলেন ঃ

'রানাকুলরাণী তুমি, বীর প্রসবিনী,
জনক শ্বশুর তব, বাপ্পারাও স্বামী,
তুমি কি ডরাও প্রিয়ে বিধম্ম নবাবে,
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি',। (১অ. ১গ.)

অজুমালি হেমাঙ্গিনীর রূপের বর্ণনা দেন এভাবে ঃ

'এল চুলে ধনি যবে রচয়ে বিউনি,
কেউটে ভুজঙ্গ যেন ধরে আছে ফণি।। ... ...
(বীর রস আন্‌বো নাকি ?)
উন্নত বিশাল বক্ষ তুষার ধবল।
সুস্বচ্ছ সরেতে শোভে যুগল কমল।।' (১অ. ২গ.)

হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে তাঁর সখি নলিনী বলেন ঃ

'পেখত বারেক নয়ন মেলায়ে
ধাঁধাই নয়ন তরুণ অরুণ
পুকুরে ভাসত ওই।।
(কত) ইলীশ মৃগেল, চিঙ্গড়ি চিতেল
লাফায়ে মারত ঘাই।' (১অ. ১গ.)

www.pathagar.com

স্বর্গ-মর্ত্য থেকে শুরু করে, রূপকথায় রাজ্য পর্যন্ত কোনো কিছুই নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায় না। চিতোর রাজবাড়ীতে উন্মত্ত প্রায় পাপ্পারাওয়ের সম্মুখে নারদ এসে বলেন, 'লাগ, হাড়ির ঝি চন্ডীর আজ্ঞা লাগে, পাগল হয়ত সেরে যাগ।' (২অ. ৩গ.) মঞ্চে ওঠে পরীরা গান করেন :

'আমরা সব পরী
সুর-সুন্দরী।
ডানা ঝরে গিয়েছে উড়তে না পারি।' (ঐ)

নাট্যকারের ঐতিহাসিক জ্ঞানও চমৎকার! বাপ্পারাও তাঁর সৈন্যদের উত্তেজিত করতে গিয়ে বলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধ হয় দুর্দান্ত সেরাজ উদ্দৌলার নৃশংসতার কথা অবগত আছে, পলাশির যুদ্ধে যাহার নিধন হইয়াছে। সেই অপগণ্ড ষণ্ডের মাতামহ যে কত পাষণ্ড দলন তাহা তোমরা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেছ। আজি সেই মৃত সেরাজের মৃত ঠাকুরদা আলিবর্দ্দি খাঁ তোমাদের এত সাধের চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে।... এত সকাল সকাল চিতোর গেলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিগণ কি লয়ে নাটক লিখিবে? (২অ. ১গ.) আলিবর্দি খাঁ তাঁর সভাসদদের বলেন, 'আরংজীব ও আকবর দুই ভ্রাতায় মিলে সিন্ধুনদ পার হয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর আক্রমণ করলে।' (ঐ) সমালোচক ঐতিহাসিক অসংলগ্ন তার প্রশ্ন তোললে নাট্যকার বলেন, 'নাটকের অর্থ হচ্ছে দৃশ্য কাব্য... ...বিভ্রম উৎপাদন হচ্ছে এর জীবন; অঘটন ঘটান, অসম্ভবকে সম্ভব করা ... ...এই হচ্ছে নাটক। ... নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে যে, ন-আটক নাটক, অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নাই।' (ক্রোড়াঙ্ক)

থিয়েটারের কর্মকর্তা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও কোনো অংশে কম নন। নাট্যকার থিয়েটারের ম্যানেজার কে, তা জানতে চাইলে থিয়েটারের প্যালারাম বলেন, 'ম্যানেজার সবাই; তবে ঐ বাবুটির নাম প্লেকার্ডে দেওয়া যায়'। কিছু দিন পর পরই ম্যানেজারের পরিবর্তন হয়। বর্তমান ম্যানেজারের বাড়ী পদ্মার পাড়—তাঁর পূর্বে কোলকাতার ম্যানেজারই ছিলেন। জনৈক অভিনেতা বলেন, 'কলকেতার লোককে বিশ্বাস নাই বলে, যাঁর বদলে এঁকে পদ্মাপার থেকে আনা হয়েছে।' অন্য একজন অভিনেতা বলেন, 'থিয়েটারও সেই দিকে চালান করবার চেষ্টায় এসে জুটেছেন।' (পূর্ব দৃঃ) ম্যানেজার নাট্যকারকে তাঁর নাটকটি রেখে যেতে বলেন—কারণ তিনি তা দেখার জন্য মাইকেলের কাছে পাঠাবেন। নাট্যকার বিস্মিত হন—প্যালারাম বলেন, 'oh no ... ... yes মাইকেলের কাছে oh তাই তাই, মাইকেল সম্প্রতি মারা পড়েছে, এখানে খবর দেয়নি, Thank you.' (ঐ) দেবেন্দ্রনাথ বলেন, ড্রামাখানা রেখে যান, কি রকম কাটতে কুটতে হয়

www.pathagar.com

তা দেখবো।' নাট্যকার বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'বলেন কি মহাশয়, আমার নাটক আপনি কাট্‌বেন?' দেবেন্দ্র বলেন, 'মহাশয় আপনিত আপনি ··· দীনবন্ধুকে কেটিচি, বঙ্কিমকে কেটিচি ··· মাইকেলকে কেটিচি, আমরাও নিজে বই লিখে থাকি, ··· ··· আপনার আগে ··· আমি চিতোরে আগুন জ্বালিয়েছি।' (ঐ) নাট্যকার জানান, তাঁর নাটকটি, নেহাত ছোটখাট বই হয়নি, 'অশ্রুমতীর ডবল হবে।' জনৈক অভিনেতা এতে আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'তাহলে আমার বোধ হচ্ছে বইখানা যেন Attractive হবে, এই শনিবারে লাগিয়ে দাও।' (ঐ) দেবেন্দ্র বসার মধ্যেই একটি Handbill লিখে ফেলেন :

> **The Great Farcial Tragi Comedy—**
> **De-Pantomime Operetta ...**
> **Singing—Dancing—climbling ·· Throughout**; (ঐ)

থিয়েটার চলাকালীন সময়ের কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়েও থিয়েটারের কর্মকর্তা ও অভিনেতা—অভিনেত্রীদের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্ছিতা রাণীকে মঞ্চ থেকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য বাপ্পারাও শশব্যস্ত—কিন্তু তাঁর অনেক ডাকা-ডাকির পরও কেউ রাণীকে ওঠিয়ে নিতে আসছেন না দেখে, প্রম্পটারকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'বই হাতে হাঁ করে দেখ কি, শিগগির একটা পাগড়ি জড়িয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এস না, ষ্টেজ মাটী হয় যে'। (১অ. ১গ.) মঞ্চের মধ্যে হঠাৎ এক পুরুষ-বেশী রাণীকে লক্ষ্য করে বাপ্পারাও ক্ষেপে ওঠেন। প্রম্পটারও পুরুষ-বেশী রাণীর সঙ্গে তাঁর সে মুহূর্তের কথোপকথনের কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'বাপ্পা। তুই কেরে ?
মহি। (কান্দিয়া) প্রাণেশ্বর, আমার হেমা ?
বাপ্পা। (ভ্যাংচাইয়া) প্যানেচ্ছর, আমার হেমা ···
মহি। নাথ —
বাপ্পা। (সক্রোধে) বটে, চালাকি ! আমায় ষ্টেজে দাঁড় করিয়ে মাটী করবার ফিকির আমি বুঝতে পারিনা বটে ? ···
প্রম। (বাপ্পার হাতে ধরিয়া) মশাই, আপনি রাগ করবেন না, একটা কাণ্ড হয়েছে, তা পরে বল্‌বো, এখন আপনি একটু করুন।
বাপ্পা। ··· আমি এর explanation চাই।
প্রম। এত অডিএন্সের সম্‌নে —
বাপ্পা। রেখে দাও তোমায় অডিএন্স, গুঁপো রাণী বার করতে, অডিএন্সের সামনে লজ্জা হয়না।' (২অ. ৩গ)

www.pathagar.com

থিয়েটারের কর্মকর্তা বাবুদের কেউ কেউ একট্রেশদের নিয়ে বাগানে চলে যাওয়াতেই হয়তো প্রম্পটারকে এ বিপদে পড়তে হয়েছিলো। তবু কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে অভিনয়ের কাজ এগুতে থাকে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার ছুটে আসেন : 'সব্বর্নাশ হ'ল, Drop-scene ফেলে দে ! এদিকে ত কমিটির বাবুরা একট্রেশ নিয়ে বাগান চল্লেন, আবাব নেতা দর্জ্জি আগাম ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে এখন পোষাকের বাক্স লয়ে পালাল, সব্বর্নাশ হ'ল আমার।' (২অ. ৩গ.)

নাটক দেখার জন্য একজন সমালোচকও এসেছিলেন। নাট্যকার প্রমুখের সঙ্গে মদ পান করতে করতে তিনি বলেন, 'এই নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার, ··· যেমন মাষ্টার পেন্টারের পেণ্টিং হঠাৎ দেখলে কেবল কালী ন্যাপা বোধ হয়, কিন্তু ভেতরের হয়ত কি ভয়ংকর ব্যাপারই আছে, তেমনি যে লেখা সহজে বুঝতে পারা যায় না তারও ভিতরে অবশ্য কোন গুরুতম ভাব আছে, আর কবিতাগুলি কি মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর একেবারে quite original. (২অ. ক্রো, অ.) দর্শকদের অভিরুচি সম্বন্ধেও বক্তব্য আছে। 'Audience কে খুসী' করার জন্য নাট্যকার জায়গা না পেয়ে 'মল্লিকদের মেজো বউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে' দিলেন। 'তিল তর্পণ'-এর নামকরণ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেন, 'লোকে শুনেই ভাববে এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে, আজকালকার Audience গাল শুন্তে ভালবাসে, ··· দ্বিতীয়তঃ তিল তর্পণের আর একটী ভাব আছে, যেমন চাড্ডিখানি তিল দিয়ে চোদ্দ পুরুষকে খুসি করা যায়, তেমনি আমার এই নাটকখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিস আছে যে, সব Audience কে খুসি করা যাবে।' (পূ: দৃঃ)

চার

অমৃতলালের পরবর্তী কৌতুক রস-প্রধান প্রহসন 'ডিসমিশ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খৃীস্টাব্দে। প্রহসনটির আখ্যা পত্রে লেখা আছে, 'সন ১২৮৯ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।' দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, প্রহসনটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং অমৃতলাল নিজে এর অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২২]

নাট্যকাহিনীটি এরূপ—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমদাকে নিয়ে কৃষ্ণনাথ বাবু অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন। প্রমদা ভারি চঞ্চল—কৃষ্ণনাথের সঙ্গে কথায় কথায় রসিকতা করেন, তাঁকে ক্ষেপাবার জন্য 'টপ্পা' গান, কবিতা আওড়ান। বিশেষ সেজেগুজে, গান শেখা বা তাশ খেলা নাম করে প্রমদা যখন তখন পাড়া

www.pathagar.com

বেড়াতেও ওস্তাদ।' তাঁর এ 'রীত গ্নলো'র জন্য কৃষ্ণনাথ 'লোকের কাছে মুখ দেখাতে' পারেন না। 'কিন্তু প্রমদাও নিজেকে শোধরাবার পাত্রী নন। কৃষ্ণনাথ তাঁকে 'গলা টিপে দূর কোরে দেব' বলে ভয় দেখালে, প্রমদা বলেন, 'গলা জড়িয়ে থাক্‌বো।' অনন্যোপায় কৃষ্ণনাথ অবশেষে ব্যাপারটি তাঁর শ্বশুরের কানে তোলবেন বলেই স্থির করেন।

গান শেখা বা তাশ খেলার নাম করে বেরিয়ে গিয়ে, ধনাঢ্য স্বামীর শিক্ষিতা স্ত্রী প্রমদা আসলে দরিদ্রের সেবা করে বেড়ান। তিনি দুলে বউয়ের অসুস্থ ছেলের জন্য ঝিকে দিয়ে বেদানা কিনে পাঠিয়েছেন, টাকাও দিয়েছেন পাঁচটি। সেখান থেকে ফিরে এসে ঝি বলেন, 'আর আমার কাছে ছাপাবার যো নেই, আমি সব টের পেয়েছি, এর নাম তোমার তাস খেলতে যাওয়া ? গান শিখতে যাওয়া। তুমি কিনা এর ভাত রেঁধে, ওর কাঁথা সেলাই কোরে, ওর মেয়ের চুল বেঁধে, ছোটলোকের ছেলে পড়িয়ে বেড়াও ?' প্রমদা তাঁকে এসব কথা গোপন রাখতে অনুরোধ করেন।

শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পথে কৃষ্ণনাথ তর্কালঙ্কারের সাক্ষাৎ পান। তিনি তাঁর সমস্যার ব্যাপারে তর্কালঙ্কারের পরামর্শ নেয়ার কথা ভাবেন। তর্কালঙ্কার ব্যবস্থা প্রদানের নাম করে, কৃষ্ণনাথের কাছ থেকে দু' টাকা আদায় করেন। কিন্তু কৃষ্ণনাথ তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করলেই, তর্কালঙ্কার 'তুমি বাপু বড় বেশী কথা কও', 'এত বেশী কথা কওয়া তোমার স্বভাব হলো কেমন করে ?' —ইত্যাদি বলে তাঁকে থামিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'পাষণ্ড বেল্লিক' বলে গালি দিয়ে চলে যান। পথেই কৃষ্ণনাথ তাঁর শ্বশুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় সেখানে বরফওয়ালা, মাতাল, ভিক্ষুক প্রভৃতির ভীড় জমে ওঠে। একজন পাহারাওয়ালা এসে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনাথ তাঁদের সকলের অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করতে থাকলে পাহারাওয়ালা তাঁকে থানায় নিয়ে যাবার ভয় দেখান। প্রমদার ঝি দূরে থেকে তা দেখতে পেয়ে প্রমদাকে সব জানাবার জন্য বাড়ীর দিকে ছোটেন।

এদিকে প্রমদা এক ব্যক্তিকে লাম্পট্যপনার উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য ফন্দি এঁটেছেন। রাতের বেলায় ভূত সেজে এসে, কৃষ্ণনাথাক ভয় দেখাবার জন্য সে ব্যক্তিকে তিনি বলে দিয়েছেন।

ঝিয়ের কাছ স্বামীর বিপদের কথা অবগত হয়ে প্রমদা তাঁর বাবাকে খবর দেয়ার জন্য চলে যান। এ সময়ে কৃষ্ণনাথ এসে বাড়ীতে উপস্থিত হন। তিনি ভেতরে থেকে ঘরের দরজা আটকিয়ে দিয়ে, স্ত্রীকে বাইরে কোথায় চলে যাওয়ার উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু প্রমদা

www.pathagar.com

তাঁর বাবাকে নিয়ে ফিরে এলে কৃষ্ণনাথ সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে বুঝতে পারেন, তাঁর স্ত্রীর সতীত্বের তুলনা হয় না। তখন ভূতবেশী লম্পট ব্যক্তিটিও তাঁদের হাতে ধৃত হয়ে ভীষণভাবে অপদস্থ হন।

মূলতঃ হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়েই প্রহসনটি রচিত হলেও, এতে সেকালের নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধোগতি প্রভৃতির কিছু চিত্রও ফুটে ওঠেছে। কৃষ্ণনাথ যে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সুখি হতে পারেছেন না, এর মূলে রয়েছে প্রধানতঃ তাঁর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ। স্ত্রীকে যে তিনি ভালোবাসেন না, তা নয়। তিনি বলেন, 'মুখের সামনে না যেতে হয়, এম্নি তফাৎ তফাৎ থাকি, তাহলে খুব রাগতে পারি, রীতিমত ধমকাতে শাসন করতে পারি। কিন্তু মুখ দেখলেই আর কথা সরে না, কি যে ঐ মুখখানিতে আছে, কেমন ভাবে যে একটু চায়, আমার মুণ্ড ঘুরে যায়।' (২দৃঃ) স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থেকে হলেও রাগতে হবে, তাঁকে ধমকাতে হবে—শাসন করতে হবে। কৃষ্ণনাথের এ মনোভাব, তাঁর অন্তর গহনে লুক্কায়িত সন্দেহেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রমদার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা স্মরণ রেখেও তিনি বলেন, 'কিন্তু তা বলে আর চলছে না, শেষ কি আমি সত্য সত্য ভেড়া হয়ে যাব। আর যে আমার ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে, এই বয়েস, অমন রসিক, ও বাইরে যায় কি করতে? (ঐ) প্রতিবেশীদের মনেও বুঝি একই সন্দেহ। কৃষ্ণনাথ প্রমদাকে বলেন, 'ঐ রীতগুলো ছেড়ে দাও, নইলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনা।' (১ দৃ) কিন্তু প্রমদা সব কিছুকেই রহস্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতে থাকলে, কৃষ্ণনাথ অনন্যোপায় হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'দেখ, আমি মাসে মাসে তোমায় পঁচিশ টাকা খরচ দেব, তোমার বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, সেথা যা ইচ্ছে তাই কর, আমি জ্বালাতন হয়েছি।' (ঐ) প্রমদা এতেও রাজী হচ্ছেন না দেখে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণনাথ বলেন, 'গলা-টিপে দূর কোরে দেব।' (ঐ)

নির্দোষ চরিত্রের অধিকারী হলেও, সেকালের অসুস্থ সমাজ-পরিবেশ, প্রমদাকে তাঁর স্বামী ও প্রতিবেশীদের চোখে সন্দেহের পাত্রী করে তুলেছে। অপরদিকে কৃষ্ণনাথের নিজের চরিত্রই আদৌ কলুষমুক্ত নয়—তবু সে সম্বন্ধে প্রমদাকে অনেকটা নীরবই বলা চলে। তাঁর সঙ্গে রাগ করে কৃষ্ণনাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি ভাবেন, 'গান গাইলে চটে যায়, যাক্, আমি বেশ জানি, ঐ গানে সরস কথায় আর সাজগোজের জোরেই আমার ধন আমার একলার আছে, নইলে গামছাপরা গোবর দেওয়া তামাক পোড়া-মুখী ঠুঁটোর বাঁদরটি হয়ে থাক্‌লে হয়েছিল আর কি! এদিন কোন্ অব্যাগী আমার বরগা-গনার বন্দোবস্ত কোরে দিত।' (ঐ) বাসর রাতের কথা স্মরণ করে তিনি ভাবেন, 'ফুলশয্যা হলো ঝীয়ের সঙ্গে! প্রথম ঘর বসত করতে এসে দেড় মাস রইলুম,—

www.pathagar.com

বাবু ঘরে শুলেন তিন দিন—খাটের তলায় বসিতে মুখ গুঁজড়ে।' (ঐ) এর পর থেকেই কৃষ্ণনাথ বুঝি ভালো হয়ে গেছেন—প্রমদাও হয়তো তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেন না। কিন্তু নিজের প্রতি স্বামীর অহেতুক সন্দেহ লক্ষ্য করে প্রমদা বলেন, 'পাড়া পড়শীর বাড়ী এক আধবার গেলে দোষ কি? তুমি যাওনা?' কৃষ্ণনাথ যেনো আকাশ থেকে পড়েন: 'আমি আর তুমি?' (ঐ) অন্যের বাড়ী যাওয়ার সম্ভাব্য অভিযোগে কৃষ্ণনাথ প্রমদাকে ঘরে প্রবেশ করতে দিচ্ছিলেন না। সুযোগ পেয়ে প্রমদাও এক সময়ে কৃষ্ণনাথের বাইরে রেখে দরজা আটকিয়ে তামাশা করতে থাকেন। এমন সময় কৃষ্ণনাথের শ্বশুর এসে ব্যাপার কি জানতে চাইলে, প্রমদা তামাশা করেই বলেন, 'দেখ না বাবা, মদ খেয়ে এসে আমায় বকছে।' কৃষ্ণনাথ বুঝি এ মিথ্যে অপবাদ সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বলেন, 'আমি মদ খেয়েছি। এই দেখ, গন্ধ শোঁকো, (শ্বশুরের মুখে হা দেওন)'। (৪দৃঃ) কৃষ্ণনাথের এ সমস্ত বক্তব্য ও আচরণে তাঁর নৈতিক চরিত্র অপরিবর্তনের ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতীয় গ্রন্থ সেকালের অনেক 'ছোড়া'রই মাথা খেয়েছিলো। প্রমদার বাড়ীর সামনে এসে তিন কড়ি নামক এক 'ছোড়া' প্রতিদিনই আদি রসাত্মক গান করেন। তাঁর একদিনের গান শোনে প্রমদা ভাবেন, 'ছোড়া তো ভারী পাজী, আমার উপর বাবুর চোখ পড়েছে? জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও।' (৩ দৃঃ) প্রমদা তিন কড়িকে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কথা প্রসঙ্গে প্রমদা এক সময়ে তাঁকে 'বাছা' বলে সম্বোধন করলে, তিন কড়ি জিহ্বা কেটে বলে ওঠেন, 'ওকি কথা! ... ও কথা কেন?' প্রমদা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, কি কথা?' তিনকড়ি বলেন, ঐ যে 'বাছা'। প্রমদা বলেন, 'তা হোক্, ও আদর কোরে বলা যায়।' তিন কড়ি আশ্বস্ত হন: 'আজ কাল হয়েছে বুঝি? বিদ্যাসুন্দরে পড়িনি, যাই বল্ছিলেম।' (ঐ)

মাতাল ও ছোকরা প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের যে সংক্ষিপ্ত দৃশ্যটি প্রহসনে রয়েছে, তাতেও সেকালের সামাজিক অসুস্থতার ছবিই ফুটে ওঠেছে। কৃষ্ণনাথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ করতে থাকলে, জনৈক মাতালের আগমন ঘটে। তাঁর একটানা প্রলাপ ও অবান্তর সব প্রশ্ন শোনে কৃষ্ণনাথ বলেন, 'আমাদের একটু কথা হচ্ছে, ওদিকে যাও।' মাতাল তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর করেন, 'কোম্পানির রাস্তা।' কৃষ্ণনাথ জিজ্ঞাস করেন, 'তুমি যাবে না?' মাতাল তেমনি সংক্ষিপ্তভাবেই জবাব দেন. 'আপাততঃ নয়।' এ সময়ে একজন বরফওয়ালা এসেও কৃষ্ণনাথকে বিরক্ত করতে থাকেন। "গুপ্ত কন্যার গুপ্ত কথা' বিক্রী করতে এসেও এক ছোকরা সেখানে ভীড় জমান। কৃষ্ণনাথ সেজন্য বিরক্ত প্রকাশ করলে ছোকরা বলেন, 'ও বাবা! এ দুষ্ট পাগল, একেও রাস্তায়

www.pathagar.com

ছেড়ে দেয় ?' একজন ভিক্ষুক এসেও কৃষ্ণনাথের নিকট ভিক্ষা চান : 'দেখুন, আমি Gentleman ... ... Circumstanceটা অতি bad হয়ে পড়েছে, তাই something—'। কৃষ্ণনাথ তাঁকে 'নেসা-টেসা' করেন কিনা জিজ্ঞেস করলে, ছোকরা ভিক্ষুককে বলেন, 'ওহে, ও পাগল-বড় কাছে যেও না, কামড়াবে।' (২ দৃঃ)

তর্কলঙ্কার সেকালের ভণ্ড ও মূর্খ ব্রাহ্মণদের যোগ্য প্রতিনিধি। কৃষ্ণনাথ তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, 'ভারী ব্যস্ত'। কৃষ্ণনাথ টোপ ফেলেন,'আজ্ঞে একটা ব্যবস্থা।' তর্কালঙ্কার ঢোক গেলেন : 'ব্যবস্থা ! অধ্যাপকের নিকট ব্যবস্থা নিতে হলে জানতো'। কৃষ্ণনাথের কাছ থেকে দু' টাকা গ্রহণ করে তিনি হঠাৎ বলে উঠেন : 'কি ! আমায় টাকা দেওয়া ? নবদ্বীপের নিধিরাম স্মৃতিরত্নের ছাত্র আমি ... ... আমায় অর্থ পিশাচ মনে করা ?' তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর বয়স কত জানতে চাইলে, কৃষ্ণনাথ উত্তর দিতে গিয়ে, বোধ হয়-আন্দাজ' এতোটুকুন বলতেই তিনি ক্ষেপে ওঠেন : 'বোধ হয় আন্দাজ—দুই সহস্র কথা কয়ে ফেল্লে ?' কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর বয়স আঠারো-উনিশ বছর হবে শোনে তর্কালঙ্কার বলেন, 'আ-ঠা-র উনিশ বিস্তর বয়েস। এ বয়সে আর কিছু হয় না ... ... 'পিতা শত্রু মাতা বৈরী' স্ত্রী নয়, শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, 'সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখতে আর একটা কথা, শয়ন এক সাঙ্গ করো, স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করলে মিত্রতা বর্দ্ধিত হয় না, ... তুমি বিস্তর বাক্য ব্যয় কোরে আমার অনেক সময় পণ্ড করেছ—পাষণ্ড বেল্লিক।' (২ দৃঃ) তর্কালঙ্কা-রের পাণ্ডিত্যের আরো পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণনাথও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে থাকলে, তর্কালঙ্কার গিয়ে বলেন, 'তোমাদের গোলযোগে পৃথিবী হ'তে কি বাস উঠুতে হবে নাকি ?' কৃষ্ণনাথ বলেন, 'আপনাকে কেউ মধ্যস্থ হতে ডাকেনি।' তর্কালঙ্কার ক্ষেপে ওঠেন : 'মধ্যস্থ ? কার মধ্যস্থ আমি ? আমি কার মধ্যে থাকি ? আমি সর্ব্বলোকের উপরস্থ'। (৪ দৃঃ) তিনি প্রমদা নামের ব্যাখা দেন এ ভাবে : 'প্র-ম-দা- এ শব্দের অর্থ কি ? প্রটা তো উৎসর্গ, মদ ধাতু অর্থাৎ প্রমদা হচ্ছে মদের উপসর্গ।' (ঐ)

কৃষ্ণনাথ নাকি বেশী কথা বলেন। তর্কালঙ্কার বলেন, 'এত বেশী কথা কওয়া তোমার স্বভাব হলো কেমন কোরে ? ··· আমার জ্যেষ্ঠতম পুত্রের মধ্যমপুত্র অর্থাৎ আমার মধ্যস্থ ছেলে, ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ঐরূপ বাক্য ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে, একটা মুষ্টিযোগ দেওয়া মানে বাক্‌রোধ ভবেৎ, একবারে বোবা।' (২দৃঃ)

মুখোশধারী তিনকড়ি লাম্পট্যপনা করতে গিয়ে কৃষ্ণনাথের হাতে ধরা পড়লে তর্কালঙ্কার বলেন, 'ধরতো, ... সতীর প্রতি আসক্তি।' কিন্তু

www.pathagar.com

মুখোশ খোলার পর তিন কড়িকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন : 'তিন কড়ি! মদীয় জ্যেষ্ঠম পুত্রের মধ্যম পুত্র? আহা! ছেলে মানুষ। এখানে খেলা করতে এসেছিলে বাবু?' (৪ দৃঃ)

পাঁচ

১৩০৪ সালে অমৃত লালের 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে' প্রহসন প্রকাশিত হয়। এর প্রথম অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে, প্রহসনকার নিজে চাটুজ্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[১৩] রঙ্গ-কৌতুক প্রধান 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে'র গল্প সংক্ষেপ এরূপ—

পুঁটিরাম চাটুজ্যে ও খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে পরস্পরের অজান্তে চক্রবর্তী বাবুর একই ঘর ভাড়া নিয়েছেন চক্রবর্তী 'ছাপোষা মনিষ্যি'—'গতর খেটে রেঁধে ঘর ভাড়া দিয়ে' সংসার চালান। মেসের ঝি ভবতারিনীর পরামর্শেই তিনি একই ঘরে দু'জনের নিকট পরস্পরের অজান্তে ভাড়া দিয়েছেন। চাটুজ্যে রাধা বাজারের এক কাপড়ের দোকানে চাকরী করেন, সারাদিন প্রায় তাঁকে সেখানেই থাকতে হয়। বাঁড়ুজ্যে চাকরী করেন খবরের কাগজের অফিসে, সারারাত তাঁর সেখানেই কাটে। দু'জন ভাড়াটে কখনো একই সঙ্গে মেসে থাকেন না বলে, তাঁদের একজনে সঙ্গে অপরজনের দেখা হয় না, এবং চক্রবর্তীকেও এ নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হয় না।

একদিন ঘটনাচক্রে দু'জনের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। বাঁড়ুজ্যে অফিস থেকে ফিরে এসে দিনের বেলায়ই মশারি খাটিয়ে শুয়ে আছেন। সেদিন কি কারণে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাটুজ্যে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছেন। তাকের ওপর বাড়ুজ্যের রাখা পাওরুটি দেখে চাটুজ্যে ভাবেন, এটা বুঝি ভবতারিণী তাঁর জন্যই এনে রেখেছেন। তিনি নিজের হাতের কলার ছড়াটি ঘরে রেখে পাওরুটি সেঁকার জন্য চলে গেলে, বাঁড়ুজ্যের ঘুম ভাঙে। তিনি ঘরের ভেতর তাঁর পাওরুটির বদলে কলা পড়ে থাকতে দেখে, রাগ করে সেগুলো নর্দমায় ফেলে দেন। এ ভাবে এক সময়ে দু'জনেই মুখোমুখি হন—ঘরের অধিকার নিয়ে দু' ভাড়াটের মধ্যেই শুরু হয় অপ্রিয় কথা কাটাকাটির। শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন, এবং দু'জনেই আপাততঃ একই ঘরে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। এরপর শুরু হয় তাঁদের পরিচয় প্রদানের পালা। নিজের বিবাহের প্রসঙ্গে চাটুজ্যে জানান, কুলীন কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর মেয়ে দিগমবরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। অবশ্য, একবার

www.pathagar.com

তিনি পালিয়ে গিয়ে এ বিবাহ থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। বাঁড়ুজ্যে চমকে ওঠেন—দিগম্বরীর সঙ্গে যে একদিন তাঁরই প্রণয় ছিলো। অনেক ঘটনার পর তাঁর সঙ্গে ও দিগম্বরীর বিবাহ ঠিক হয়েছিলো। পরে তিনিও বিবাহ না করে পালিয়ে যান—কিন্তু 'দুদিন পরে শমন প্রাপ্তি, অন্যপূর্ব্বা যুবতী বালিকা-জাত যাবে, ড্যামেজের নালিস।' অনন্যোপায় বাঁড়ুজ্যে, গঙ্গার ধারে গিয়ে পরনের কাপড়-চোপড় সব খুলে রেখে আত্মহত্যার অভিনয় করেন, এবং সেখান থেকে সকলের অলক্ষিতেই সরে পড়েন। চাটুজ্যে বলেন, এখন তাহলে তাঁর হাতেই তিনি দিগম্বরীকে তুলে দেবেন। বাঁড়ুজ্যে বলেন তিনি তাঁর বাগদত্তাকে নিতে যাবেন কেন? এ নিয়ে দু'জনের কথা কাটাকাটি, শেষ পর্যন্ত অনেকটা কলহেরই রূপ নেয়।

এমন সময় ভবতারিণী একটা চিঠি নিয়ে আসেন। চিঠিতে লেখা আছে, ত্রিবেণীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় নৌকাডুবিতে দিগম্বরীর মৃত্যু হয়েছে। ত্রিবেণীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগেই তিনি একটা উইল করে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর বাগদত্ত স্বামীকেই দিয়ে গেছেন। চাটুজ্যে এবং বাঁড়ুজ্যে দু'জনেই তখন দিগম্বরীকে নিজ নিজ মৃতা-পত্নী বলে দাবী করতে থাকেন। এর পর আর একটি চিঠি পেয়ে তাঁরা জানতে পারেন যে, দিগম্বরী মরেননি। তিনি নিজেই নাকি তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করার জন্য তাঁদের সেখানে আসছেন। চাটুজ্যে এবং বাঁড়ুজ্যের মাথায় যেনো একই সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়ে। কোনো এক মহিলাকে মেসের সামনে গাড়ী থেকে নামতে দেখে, তাঁকে দিগম্বরী ভেবে দু'জনেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। এমন সময় ভবতারিণী এসে কড়া নাড়তে থাকেন, এবং তাঁদের আর একটি চিঠি এসেছে বলে জানান। চিঠি পেয়ে চাটুজ্যে পড়তে থাকেন: 'সম্প্রতি ঠাকুরানীর কুষ্ঠী দেখান হইয়াছিল, তাহাতে জানা গেল, তিনি আপনা অপেক্ষা বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড়—সুতরাং সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া কল্য রাত্রে অন্য পাত্রের সঙ্গে তাঁহার শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।' চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন—আনন্দের আতিশয্যে এক সময়ে তাঁরা কোলাকোলিও শুরু করেন।

দুটো বিদেশী গল্পের অনুকরণে[২৪] নিছক কৌতুক-উপভোগের জন্য প্রহসনটি লিখিত হলেও, তা যে সেকালের বাঙলার সমাজ-সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, একথা বলা চলে না। যে কৌলীন্য প্রথার বিষময় পরিণতি সেকালের সমাজের বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো, দিগম্বরী বা চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের জীবনেও সে সমস্যাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে উভয়েই, দিগম্বরীর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হওয়ার পরেও, পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের, বিশেষ করে চাটুজ্যের এ পালিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার মূলে রয়েছে, অধিক বয়স্কা ও উগ্রমেজাজী এক কুলীন-মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি ভয়। দিগম্বরী সম্বন্ধে বাঁড়ুজ্যেকে তিনি বলেন, 'কুলীনের মেয়ে মেলের ঘরের অভাবে এদিন বিয়ে হয়নি।' তিনি আরো বলেন, 'ব্রাহ্মণ-নন্দিনী চন্দ্র বদনীর মেজাজটা কিছু উগ্রচণ্ডা ধাতের, আমার এই কাহিল অঙ্গে তা যে সহ্য হয়, এমন বোধ হয় না।'[২৫] আর সে জন্যই হয়তো তিনি 'কাশী মিত্তিরের ঘাটে' যেতেও প্রস্তুত—তবু দিগম্বরীকে নিয়ে 'ছাতনা তলায়' যাবেন না। দিগম্বরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাঁড়ুজ্যেও বলেন, 'কুলীন কুমারীর আধা বয়সেও ছটা খানি বেশ জমকাল আছে', চাটুজ্যে বলেন, দিগম্বরীর বয়স 'বছর পঁচিশ' বাড়ুজ্যে বলেন, 'বছর পঁয়ষট্টি'। অবশ্য চাটুজ্যে' 'সে যার যেমন নজর' বলে এর মীমাংসারও চেষ্টা করেন। দিগম্বীর পিতা কমলাকান্তের বাড়ী নিয়েও দুজনে মধ্যে কথা হয়। চাটুজ্যে বলেন, তাঁর বাড়ী চুঁচুড়াতে, বাঁড়ুজ্যে বলেন, নৈহাটীতে। চাটুজ্যে 'হলো-ইস্পার কি ওস্পার' বলে এ সমাস্যারও সমাধান করেন। তাঁদের নিকট ডাকযোগে যে চিঠি এসেছিলো, তাতে চাটুজ্যের নামই লেখা ছিলো, এবং চিঠির ওপর সীল-মোহরও পড়েছিলো নৈহাটীর। কিন্তু এসব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের সময়ও মানসিকতা তখন তাঁদের ছিলো না—কমলাকান্তের মেয়ে দিগম্বরীই ছিলেন তাঁদের প্রধান ও একমাত্র সমস্যা।

চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের কথোপকথন ও তাঁদের ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজের আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যের 'গান টান গাইতে আসে' কিনা জানতে চাইলে, চাটুজ্যে বলেন, 'কখন কখন সখের দলে দোহার কি করেছি।' অবশ্য পরিবারে আপত্তি থাকায় তিনি কখনো থিয়েটার দেখেন না। সেকালে কড়ি দিয়ে 'দশ-পঁচিশ' প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিলো। অনেক সময় চতুর খেলোয়াড়রা নিশ্চিত জয়লাভের আশায় কড়ির ভেতরে সীসে ভরে রাখতেন। বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে বাজী রেখে সুতি' খেলার সময় চাটুজ্যে মনে মনে ভাবেন, 'ঠিক হয়েছে! দোকানের ছোঁড়াটা সেদিন কড়ি খেলছিল, দিব্বি বড় বড় সীসে ভরা কড়ি দেখে ছোঁড়াকে গোটা কতক পয়সা দিয়ে নিয়েছিলেম—ফেল্লেই ছক্কা।' তখন ইংরেজ সাহেবদের মতো করে চুল কাটানো যেনো একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিলো। অনেক সময় গ্রাহকদের অনিচ্ছে সত্ত্বেও নাপিতরা বুঝি সে ফ্যাশনের মূল্য দিতে ছাড়তেন না। চাটুজ্যে বলেন, 'দিব্যি গাল্লেম, কলকেতায় থাকতে আর চুল ছাটচিনি; বেটা করেছে কি, সামনে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখে ঘাড়টা একেবারে মুড়িয়ে দিয়েছে।' তখন সাহেবদের মন যোগাতে গিয়ে কেউ কেউ মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। চাটুজ্যের 'ওয়ার মত' পাগড়ি বাঁধা দেখে বাড়ুজ্যে বিস্ময় প্রকাশ করলে ভবতারিণী বলেন, 'ওনাকে যে সাহেব বিবির সঙ্গে কথা কইতে হয়। রাধা বাজারে সেই

www.pathagar.com

যেখানে সাহেব মেমদের পোষাক বিক্রী হয়, ও সেখানে কাজ করে।' চাটুজ্যের গাঁজার ধোঁয়া সহ্য হয়না জেনে, বাঁড়ুজ্যে ভবতারিণীকে বলেন, 'বটে, গাঁজার ধোঁয়া সয় না। গাঁজার নিন্দে করেছে !... মশাইকে বোলো যে, কলকেতা তার স্থান নয়, 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারানসী সমতুল'—পারে গিয়ে বাসা করুন।' বাড়ুজ্যের এ উক্তির মধ্য দিয়ে তখনকার কোলকাতার সামাজিক ও নৈতিক দুরবস্থার প্রতিই কটাক্ষ করা হয়েছে। তখন বড়ো বড়ো কোম্পানীর মালিকরা দাদনের ব্যবসা করতেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা অনেক সময় তাঁদের নিকট থেকে দাদন গ্রহণ করে নিঃস্ব হয়ে পড়তেন। চাটুজ্যে ও বাড়ুজ্যে উভয়েই আসামের চা-বাগানে কাজ করতে গিয়ে, দাদন গ্রহণ করেছিলেন—এবং সেই জন্য তাঁদের 'মনে বড় ক্ষোভ'ও হয়েছিলো।।

ছয়

'বিবাহ বিভ্রাট' অমৃতলালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক প্রহসন—প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরের ২২শে নভেম্বর প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রহসনকার নিজে এ অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'বিবাহ বিভ্রাট'-এর অভিনয় সেকালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'বিবাহ-বিভ্রাট অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। বইটির অভিনয়ের পর হইতে কৌতুক নাট্যকার রূপে অমৃতলালের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২৬]

'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনকারের বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক রচনা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনখানির ভিতর দিয়া অমৃতলাল পণপ্রথার দোষ কীর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা ও নব্য বঙ্গের কলেজী শিক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একখানি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক রচনা।'[২৭] তবে, সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের বরপণের নৃশংসতাকে কটাক্ষ করলেও, প্রহসনকারের মূল লক্ষ্য যে, 'বেপরোয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া সাহেব সাজিবার উৎকট আগ্রহ'[২৮] প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে জর্জরিত করা, একথা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এত যে জাতীয়তার ভান, এত যে দেশভক্তির ছলনা এমন করিয়া না আঁকিলে ইহার প্রতিশোধ হয় ?'[২৯] যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'বিবাহ বিভ্রাটের তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর ধারাপাত বর্ণ পরিচয়ের মত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।'[৩০]

www.pathagar.com

'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র, বরের পিতা গোপীনাথ সরকারের ঋণের বোঝা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেজন্য তিনি আদৌ মাথা ঘামান না। তাঁর ছেলে নন্দলাল সরকার ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনের কলেজ ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ছেলের বিবাহের যৌতুক দিয়ে, তিনি ধোপা মুদি ও বাড়ীর ঝি থেকে শুরু করে, প্রতিবেশী মহাজন চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত সকলেরই দেনা শোধ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। হোগল কুঁড়ের মন্মথ নাথ মিত্রের মেয়ের সঙ্গে নন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধও শুধু পাকাপাকি হতেই বাকী। মেয়েটি নাকি খুব মোটাসোটা নন। সেজন্য গোপীনাথ একটু সমস্যায় পড়েছেন। মোটাসোটা মেয়ে হলে সুট হিসেবে গয়না নেয়ায় লাভ আছে।

গোপীনাথ প্রথমে ভরি হিসেবে গয়না নেবেন বলেই ঘটককে জানান। পরে কয়েক শো ভরি সোনা-রূপোর গয়না প্রভৃতির মূল্যবাবদ নগদ চার হাজার টাকাই তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন। ঘটককে তিনি জানান, 'আজকালকের বাজারে গহনাও গড়াতে আছে? স্যাক্‌রা ব্যাটারা সব চোর খাদে পানেই সর্ব্বনাশ করবে, ... নগদ টাকার চেয়ে, আর কিছু আছে?' ঘটককেও অগত্যা গোপীনাথের সঙ্গেই একমতে পেঁছিতে হয়।

এল. এ. পড়া ছেলে নন্দলাল কিন্তু এ বিবাহের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নন। তবু তিনি একই সঙ্গে বিলেত যাওয়ার অর্থ সংগ্রহ এবং তাঁর অর্থলোভী পিতা ও সমাজকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিবাহ করতে সম্মত হন। তাঁর বন্ধু বিলেত ফেরত নীলরতন সিংহ ওরফে মিঃ সিং ও মিসেস বিলাসিনী কার ফরমাও তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন।

নির্দিষ্ট দিনে নন্দলালের সঙ্গে মন্মথ মিত্রের মেয়ের বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। গোপীনাথ পরদিন এসে পণের টাকা গ্রহণ করার আশা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। এদিকে নন্দলাল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। শ্বশুরের দেয়া সমস্ত টাকা নিয়ে বিবাহের রাতেই তিনি বাসর ঘর থেকে পালিয়ে যান। গোপীনাথ ও মন্মথ হতাশায় ভেঙে পড়েন।

মন্মথের ভগ্নিপতি লোকনাথ দে নাকি নন্দলালের মতো এক ব্যক্তিকে সাহেবের বেশে হাওড়া স্টেশনে ঘুরাফেরা করতে দেখে এসেছেন। খবর পেয়ে গোপীনাথ ও মন্মথ প্রমুখ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু অনেক চেষ্টা চরিত্রের পরও বিলেত যাত্রী নন্দলালকে সেখান থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়েই তাঁদেরকে চলে আসতে হয়।

সেকালের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অনেকেই তাঁদের ছেলেদের ইংরেজী পড়িয়ে বিবাহের বাজারে উঁচু দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। 'বিবাহ বিভ্রাট'-এর গোপীনাথ তাঁদেরই একজন। এল. এ. পড়া ছেলের বিবাহের পণ দিয়ে

www.pathagar.com

গোপীনাথ তাঁর যাবতীয় দেনা শোধ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন শোনে, চন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'আপনারা তো মৌলিক, কুলীনের মেয়ে আনতে হবে—তাতে এমন কি টাকা পাবেন'? গোপীনাথ তখন গর্বের সঙ্গেই জানান, 'এখনকি আর বল্লালি কুলীন চলে? ... মুখ্যি কনিষ্ঠ উঠে গিয়ে এখন এম. এ. বি. এ, হয়েছে।' (১অ. ১গ.) তাঁর একশো ভরি সোনা ও দেড়শো ভরি রূপো প্রভৃতির মূল্য বাবৎ নগদ টাকা প্রাপ্তির হিসেব-কষা দেখে চন্দ্রনাথ বলেন, 'কচ্ছেন কি? এ যে নেহাত ভদ্রলোকের গলায় ছুরি দেওয়া হয়।' (ঐ) ঘটককেও এ সময়ে চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখে গোপীনাথ বলেন, 'পাঁচ জায়গায় ঘুরে এস, এল-এ পড়া ছেলে এর চেয়ে কোথায় সস্তা পাও, দ্যাখ, কিন্তু এই হিসাবে হয় তো আমার কাছে আসবে স্বীকার করে যাও।' (ঐ) নগদ চার হাজার টাকা পণ না পেলে ছেলের বিবাহ দেবে না শোনে চন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। গোপীনাথ বলেন, 'আজ এই বলছি, আর ছ' মাস বাদে একটি পাশ বাড়লেই দুনো দিতে হবে'। (ঐ)

গোপীনাথের নিষ্ঠুরতার চরম রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় অন্যত্র। বিবাহের দিনে বরকে ছাতনা তলায় বসিয়ে তিনি মন্মথ মিত্রের কাছ থেকে আরো পাঁচশো টাকা আদায় করতে চান। মন্মথ মিত্র এ ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জানালে, গোপীনাথ বলেন, 'আমি ওর একটা পয়সা ছুঁয়েছি? তোমার জামায়ের হাতেই সব, তাকে যাতে সন্তুষ্ট কোত্তে পার, কর। আমি এক পয়সা—গোরক্ত।' (২অ. ১গ.) মন্মথ মিত্র টাকার জন্য বাড়ীর ভেতর চলে গেলে গোপীনাথ ভাবেন, 'আমার ছেলে তো, তায় আবার এলে পড়েছে, ঠিক সময়ে কোট করেছে; বাহবা নন্দলাল।' (ঐ)

গোপীনাথের স্ত্রীও কম নন। চার হাজার টাকা মাত্র নগদ নিয়ে এল. এ. পড়া ছেলের বিবাহ দিচ্ছেন শোনে, গোপীনাথের প্রতি তিনি ভীষণ ভাবে চটে আছেন। গোপীনাথ বলেন, 'কি জান, এই দিতেই তাদের সর্ব্বনাশ হবে।' গিন্নি যেনো আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন না—তিনি বলেন, 'তাদের সর্ব্বনাশ হ'লো তো আমার কি? ... ...মিনষের টাকা খরচ কর্ত্তে হাতে আগুন লেগে যায়।... ... মাগীই বা কেমন? ... ...চোখ-খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়?' (১অ ৩গ.) গোপীনাথ জানান, তিনি নন্দলালকে সম্প্রদানের সময় একটু বেঁকে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন—এতেও কিছু আসতে পারে। গিন্নি বলেন, 'আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর ·· কিন্তু বছরের ভেতর বৌটির যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে, দেখো দেখিন—তখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতালা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গহনা কত্তে পারি কিনা।' (ঐ) গোপীনাথ ও তাঁর স্ত্রীর এরূপ নৃশংস মানসিকতা লক্ষ্য করে তাঁদের বাড়ীর ঝি-এর মনেও প্রশ্ন জাগে: 'এরা কায়েত না কসাই?' (ঐ)

www.pathagar.com

তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার অভিমান নিয়ে কেউ কেউ সেদিন জাতীয়তাকে বিসর্জন দিতে বসতেন--সাহেব সাজার উৎকট আগ্রহ, অনেক সময় তাঁদেরকে রঙ মেখে সঙ সাজার মতোই করে ছাড়তো। স্ত্রী-স্বাধীনতা ও দেশোদ্ধার প্রভৃতির নাম করে সমাজের মধ্যে তাঁরা যা করতেন, তা ছিলো বস্তুতঃপক্ষে অসামাজিক বেলেল্লাপনারই নামান্তর।

কুলটোলার তিতু সিংহের ছেলে নীলরতন সিংহ ওরফে মিঃ সিং বিলেত ফেরত ডাক্তার। দশ মাস বিলেতে থেকে তিনি দস্তুরমতো সাহেব হয়েই দেশে ফিরেছেন। তাঁর অনেক ডিগ্রিঃ 'M. L. R. C. P. L. R. C. S (Edin) late Clinical clerk Rotunda Lying-Hospital··· ...' প্রভৃতি। এ সমস্ত ডিগ্রি নিতে তাঁকে নাকি কোনো 'একজামিন'ই দিতে হয়নি। বিলাসিনীর স্বামীকে তিনি জানান, 'বিলাতে আমাদের মত জেন্টেলম্যানকে এক্‌জামিন দেবার ইচ্ছা না থাকলে Compell করে insult করে না।' (১অ. ২গ.) বিলাসিনী কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'বিলাতে বোধ হয় অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখছেন ?' সিং জানান, 'বিস্তর। ... ... বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে।' (ঐ) বিলেতের পার্লামেন্টের লেডি-মেম্বার আছেন কিনা বিলাসিনী তা জানতে চাইলে, তিনি বলেন, 'তিনজন আমাদের প্রাইম মিনিষ্টারের খুড়ী একজন, আর দু'জন আইরিশ মেম্বার, এ'রা তিন জনেই ইন্ডিয়ার জন্য ভারী লড়াই করেন।' (ঐ) বিলাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'নেটিভ স্ত্রীলোক গেলে সাহেবেরা যত্ন করে বোধ হয় ?' সিং বলেন, 'লুফে নেয়—লুফে নেয়।' বিলেতী পোশাক সম্বন্ধে তিনি গৌরকান্তকে বলেন, 'আমাদের বিলাত-ফেরতদের duty হচ্ছে লোককে এসব বিষয়ে enlighten আলোকিত করা,... ... সময়ে এই ড্রেশ whole world কে ব্যবহার কত্তে হবে।' গৌরীকান্ত তাঁকে পত্রিকার জন্য লেখা দিতে বললে তিনি জানান, 'প্রায় এক বৎসর বিলাতে থেকে বাঙ্গালা এক প্রকার ভুলে গেছি'। নন্দলাল 'বাঙ্গালা কথাটা ভুলে যাওয়া যায় কি করে' জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'That's secret amongst our fraternity ··· প্রাইভেটলি ব'লে দিব।' (ঐ)

মিঃ সিং-এর বন্ধু বিলাসিনী 'স্ত্রীলোকের বিজ্ঞান না শেখাতে আমাদের দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে' বলে এম. এ-তে ফিজিক্স নিয়েছেন। 'পুরুষদমন' প্রভৃতি সভা-সমিতি নিয়েই তাঁকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর স্বামী গৌরীকান্ত কার ফরমা তাঁকে sagu pudding প্রভৃতি তৈরী করে খাওয়ান। কিন্তু কাটলেট ভাজতে গিয়ে প্রায় সময়েই তিনি তা পুড়ে ফেলেন বলে বিলাসিনীর আক্ষেপের অন্ত নেই। মিঃ সিংকে তিনি জানান, 'I half regret my choice in taking him for my partner.' (১অ.২গ.) গৌরীকান্ত 'গ্যানোট' ভালো বুঝতে পারেন

www.pathagar.com

না বলে, তাঁকে একটি বাঙলা বিজ্ঞানের বই কিনে দেয়ার জন্য বিলাসিনীকে অনুরোধ করেন। বিলাসিনী রেগে ওঠেন ঃ' fie গোটা দুই সোজা কথা মনে রাখনা, আর থার্ম্মোমিটারের use টা শিখে নাও, ··· ··· ১২৫ কি ১৩০ ডিগ্রি হ'লেই বেশ ভাজা হয়।··· ·· সায়েন্স শিখলে বরফের জ্বালে বাঁধা যায়।' (ঐ) তাঁর আক্ষেপ ঃ 'আজ বাদে কাল আমি সায়েন্সে এম-এ দেব, আমার husband কিনা heat এর theory বোঝে না।' (ঐ)

বিলাসিনীর নিকট হিন্দুদের চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের কোনো মূল্যই নেই। এক সময়ে তিনি উমাচরণ গুপ্তকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু উমাচরণ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতোই আচারানুষ্ঠান পালন করেছিলেন, এবং সে জন্যই বিলাসিনী তাঁর সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে দেন। সিং এর এ সম্বন্ধীয় এক প্রশ্নের উত্তরে বিলাসিনী বলেন, 'তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী ব'লে কি করে নিই ?' সিং আশ্চর্যান্বিত হন ঃ 'নেংটো গা ? নেংটো পা ? লেডীর সামনে ?' বিলাসিনী বলেন, 'শকিং।' (১অ. ২গ.) নন্দলাল বিবাহ করতে যাচ্ছেন, অথচ 'কিরূপ পাত্রী ইত্যাদি কিছুই তিনি জানে না বলে বিলাসিনী বিস্মিত হন ঃ কিরূপ পাত্রী জানেন না ? ... ... হয়তো কোন অপবিত্র সেকেলে বে-আইনী মতে বিবাহ হবে, এসব না জেনে··· · বিবাহ কত্তে যাচ্ছেন ?' (ঐ)

'চাদর নিবারণী সভা'র পরিচালক, এল. এ পড়া নন্দলালের একমাত্র স্বপ্ন বিলেত যাওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর বাবা সন্তুষ্ট হবেন কিনা, সিং তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বুড়োদের মত আর কোন্ সৎকার্য্যে হয় ?' কথাপ্রসঙ্গে বিলাসিনীকেও তিনি জানান ঃ 'দেখুন ·· ··· ষ্টুপিড বাবা কিনা আমায় একটা ঘ্যানঘেনে মেয়ে জুটিয়ে দিচ্ছেন। ঘোমটা দিয়ে থাকবে, ·· নাচতে জানেনা, গাইতে জানে না'। বিলাসিনী জিজ্ঞেস করেন, 'বাসর ঘর থেকেই তিনি যদি পণের টাকা নিয়ে বিলেত চলে যান, তাহলে 'বালিকার দশা কি হবে ?' নন্দলাল জবাব দেন, 'There are ten thousand bachelors to choose from ··· I will get one milk white wife with a pair of cats eyes.' কথায় কথায় নন্দলাল এক সময় God-এর নাম মুখে এনে লজ্জিত হয়ে পড়েন। বিলাসিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি বলেন, 'রাম। ওটা কথার কথা বল্লেম, যেদিন গ্যানো কিনেছি সেই দিন বুঝেছি, গড নেই।' (১অ. ২গ.)

নন্দলালকে আরো স্পষ্ট করে জানা যায় হাওড়া স্টেশনে। বিলেত-যাত্রী নন্দলালকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মন্মথ মিত্র ও গোপীনাথ গিয়েছেন। কিন্তু নন্দলাল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। অন্যোন্যপায় মন্মথ মিত্র তাঁর মেয়ের

www.pathagar.com

কি উপায় হবে জিজ্ঞেস করলে নন্দলাল ব'লেন, 'বে পুরো হয়নি, ··· ··· তবু আমি স্বীকার করে যাচ্ছি—যে, যদি আপনার মেয়েকে মিসেস কারফরমার মত লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন কত্তে পারেন, তবে ফিরে এসে আইনমত রেজেষ্ট্রী ক'রে আমার স্ত্রী কোত্তে পারি।' (২অ. ৪গ.) ছেলেকে সত্যি সত্যিই চলে যেতে দেখে, গোপীনাথও একান্ত অসহায়ের মতোই অনুরোধ করেন, 'অর্দ্ধেক দে, কিছু দে।' কিন্তু নন্দলালের স্পষ্ট জবাব: 'আমার তাহ'লে চলবে না'! গোপীনাথ ভেঙে পড়েন: 'পাওনাদারেরা কাল যে আমায় জেলে দিবে।' নন্দলাল সান্ত্বনা দেন: 'কুচ পরোয়া নেই· আমি কৌন্সিলি হ'য়ে আসছি—তোমায় ইনসলভেন্ট নিয়ে খালাস ক'রে দেব'। গোপীনাথ তবু সেখানে ঘুর ঘুর করছেন দেখে, নন্দলাল শেষ কথা বলে বিদায় নেন: 'দেখ বাবা, এখানে একটা ঢলাঢলি করোনা, ·· আমিও কলেজে পড়েছি পলিটীক্স বুঝি ··· । কিছু ভেবোনা, টাকা সংকার্যে ব্যয় হবে—তখন তোমাকে আর মাকে বিলাতে পাঠাতে পারবো, বুড়ো বয়সে একটি কীর্তি রেখে মরতে পারবে। নাউ গুড বায়।'(ঐ)

ঘটক চরিত্রটি বাস্তব বলেই সুন্দর। নন্দলালের নিকট নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ঘটক বলেন, 'আমি কে—জাননা? আমিই মূলাধার—প্রজাপতি পাখনা, আমি না হ'লে কি বে হয় বাপু? আমি ঘটক।' নন্দলাল চমকে ওঠেন: 'ঘটক? দালাল? তোমার লাইসেন্স আছে?' ঘটক হাসেন: 'আমার লাইসিনি-ফাইসিনি সব তোমরা।' নন্দলাল গালি দেন: 'Idiot' কিন্তু এসব গালি ঘটককে গায়ে মাখলে চলবে কেনো! নন্দলালের চাদর নিবারণী সভার স্পিচ' শোনে তিনি কনে পক্ষীয়দের বলেন, 'একেবারে অদ্বিতীয় কেশব সেন! ইংরেজী বেরুল যেন তুবড়িতে আগুন দিলে, আর বাঙ্গালাও—কিবা ভানতে।' বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেলে তিনি প্রাণ খুলে হাসেন: 'হাঃ হাঃ হাঃ! ভাল ভাল—দু'পক্ষে থেকে আমার একখানি ছোটখাট কোটা ক'রে দিতে হবে, এবার হরগৌরী মিলন ক'রে দিচ্ছি।' (১অ. ৪গ.)

তখনকার সমাজে প্রাচীনপন্থীরা বাল্যবিবাহেরই সমর্থক ছিলেন। বারো বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই মেয়ে সম্প্রদান না করতে পারলে, পিতার আর দুর্ভোগের অন্ত থাকতোনা। চন্দ্রনাথের সঙ্গে এল. এ পড়া ছেলের বিবাহ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গোপীনাথ জানান, 'হোগল কুঁড়ের মন্মথ মিত্রে, মেয়ে—বারো বৎসর উত্তীর্ণ হয়—আর রাখতে পারেনা, আমার দরেই ঘাড় পাত্তে হবে।' (১অ. ১গ.) অপরদিকে নব্যপন্থীরা ছিলেন বাল্যবিবাহের বিরোধী। নন্দলাল ও মন্মথ মিত্রের মেয়ের বিবাহ প্রসঙ্গে বিলাসিনী লোকনাথকে বলেন, 'একাদশ বর্ষীয়া বালিকার আবার পতি কি? সে প্রণয়ের কি জানে?' (২অ. ৪গ.) বহু বিবাহ সম্বন্ধেও প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা

www.pathagar.com

দিয়েছিলো। অধিক পণ প্রাপ্তির আশায় ছেলেকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেয়ার কথা ভাবতে গিয়ে গোপীনাথ আক্ষেপ করেন, 'আজকালকার ছেলে যে দু' বিয়ে কোত্তে চায় না।' (১অ. ৪গ.)

সাত

অমৃতলালের অন্যতম প্রহসন 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে। এর প্রথম অভিনয় হয় স্টার থিয়েটারে, ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে।

'তাজ্জব ব্যাপার'-এ গল্প বলতে তেমন কিছু নেই। এতে 'স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের ক্রিয়াকলাপ ও অন্তঃপুরচারী পুরুষদের দুর্গতি চূড়ান্ত অতিরঞ্জনে প্রদর্শিত।'[৩১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'নাট্যকার তাঁহার এই রচনাটিকে 'গীতি রঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যাহা রঙ্গ, অন্যের পক্ষে তাহা মৃত্যুতুল্য হইয়াছে। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের এই শ্রেণীর রঙ্গ-রচনা যে ইহার অগ্রগতি সাধারণের মধ্যে কতদূর প্রতিহত করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।'[৩২]

তাজ্জব ব্যাপারই বটে। কোলকাতার পুরুষরা সব অন্তঃপুরচারী—শিশু-পালন, রান্না-বান্নার কাজ ও মেয়েলি অনুষ্ঠানাদি পালনেই তাঁরা ব্যস্ত। অপরদিকে শিক্ষিতা নারীরা সব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁরা ব্যস্ত অফিস-আদালতের কাজ ও বিভিন্ন সভা-সমিতি নিয়ে। তাঁরা আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র থেকে শুরু করে দৈহিক গুণাবলী পর্যন্ত, সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের মতো হতে ইচ্ছুক। কিন্তু শতো চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী হওয়া সত্ত্বেও বুঝি তাঁরা তাঁদের মেয়েলি স্বভাবকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের মতো হয়ে ওঠতে পারছেন না।

'তাজ্জব ব্যাপার'-এর পুরুষ বড়দা 'হাই-আমলা' বটেন। দ্বারিক বলেন, 'বড় দাদা না থাকলে এ সংসার একদিন চলে। ··· অমন গুছোনটি কেউ আর গুছুতে পারবেনা'। কিন্তু সংসারের কর্তা জ্যেঠামশাই অন্য ধরনের লোক। তাঁকে নিয়ে দ্বারিক, মাধব ও শ্রীরাম প্রমুখের যতো বিপদ! দ্বারিক বলেন. 'জ্যেঠামহাশয়ের ভাঁড়ার থেকে জিনিস বার ক'রে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁত লাবার তেল পলা পলা করে ছ বারে দেবেন। ··· এক এক সময় ··· গঞ্জনা কি কম দেন।' তাঁদের বাড়ীতে আবার বিবাহ-কনে বরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মাধব বলেন, 'চল ভাই হাতাহাতি করে পানগুলো সেজে দিইগে, ... এখনই বরণ-টরণ কর্ত্তে হবে।' শ্রীরামের চিন্তার অন্ত নেইঃ 'আমি যে ভাই কি করে বাসর জাগবো, তাই ভাবছি, ও এবাব বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি যে পোড়া ঘুম হয়েছে ঘরে সন্ধ্যাটি দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে, ছোট ছেলেটা এত কাঁদে, আমার সাড়াও থাকেনা।' (১দৃঃ)

গোয়ালা আসেন দুধ নিয়ে। শ্রীরাম তাঁকে তাঁদের সঙ্গে বাসর জাগার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'থাকবার যো কৈ দাদাবাবু, গিন্নী আজ তিন দিন হল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন একটা গাই কিনতে।' (ঐ)

কনে বরণ করে সকলে গান করেনঃ

'আহা কনে কি নয়ান হানে। ...
ও কেমন চায়, মাথা যে ঘুরে যায়,
আমার লাজুক বর ঘোমটা টানে।।' (৩ দৃঃ)

কিন্তু ছোট ভাই বিশ্বম্ভরের অনুরোধ সত্ত্বেও, জেঠোমশাই অনুষ্ঠানের কোনো কাজেই হাত দেননা। তিনি বলেন, 'গিন্নী গিয়েছেন, আমার কি শুভ কর্ম্মের জিনিস ছোঁবার যো আছে ?' (ঐ)

বিবাহ-সভায় অভ্যাগতরা আসেন। ঘটকী তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান। কামিনী গোটা কতক হুঁকো নিয়ে আসার জন্য বলেন। তারপর শুরু হয় পরস্পরের পরিচয়-প্রদানের পালা। কনের মাসী শ্রী মুক্তকেশী বক্সীর পরিচয় দিতে গিয়ে ঘটকী মৃণালিনীকে বলেন, 'আপনার কি হুগলীতে যাওয়া আসা নেই ? উনি সেখানকার জজ কোর্টের সেরেস্তাদার।' নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মৃণালিনী মিত্র বলেন, 'আমি হাইকোর্টের আপিল সাইডে ওকালতি করি।' (১ দৃঃ) অন্যানদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মুক্তকেশীর মেয়ে শ্রী সরসী বালা ভঞ্জ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন। স্বয়ং কনে হাওড়া পুলিশের হেড কন্‌ষ্টেবল।

তাঁরা পুরুষের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন। কামিনী জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা বক্‌সী ঠাকরুন, পুরুষদের লেখাপড়া সমন্ধে আপনার কি মত ? মুক্তকেশী জবাব দেন, 'আমার মতে একটু আধটু শিখলে হানি নাই, ... শুনেছি সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল।' কামিনী প্রমাণ দেন, 'এমন কি, ... বই পর্যন্ত লিখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র।' মুক্তকেশী বলেন, 'বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।' সরসীর আক্রোশ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিঃ 'তাঁর ব'য়ে পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা রাঁধে, পুরুষের জন্য কাঁদে।' এই রকম ঠাট্টা ক'রে লেখা আছে।' (১দৃঃ)

www.pathagar.com

মহিলারা দল বেঁধে গান করতে করতে অফিসে যান। কিন্তু তাঁদের প্রায় সকলেই অন্তঃসত্ত্বা বলে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'পাত খোলা' কিনে খান। একজন মহিলা দুঃখ করে বলেন, 'আমার ভাই আর চলেনা, সাহেবকে বলিছি ছুটির কথা, পেটের ভেতর ঠেলে ওঠে, বিউলে আদ্ধেক বই মাইনে দেবেনা'। অন্য একজন মহিলার কিন্তু বরাত ভালো। তিনি জানান, 'আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই আঁতুড় খরচ পর্যন্ত দেয়।' (৪ দৃঃ)

স্ত্রী স্বাধীনতার সম্পূর্ণতার বিষয় নিয়ে মহিলারা সভা করেন। মহিলাদের গোঁফের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ননীবালা বিদ্যালঙ্কার বলেন, 'এখনো আমাদের স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই: কেবলে গোঁফে স্ত্রী লোকের সোভার হানি করে। ... সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।' ডাক্তার গিরিবালা লাহিড়ি সাহেবী বাঙলায় বলেন, 'আমাদিগের গোঁফ ডারি উঠিটে পারে. ও সন্টান হওয়া বন্ড হয়, এ কটা বিজ্ঞান সম্মট'। বিরাজ মোহিনী কিন্তু এর সঙ্গে একমত হতে পারেন না: 'যত দিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা।' (৫ দৃঃ)

পরদিন মহিলারা বড়দিন উপলক্ষে কর্ণেল নিতম্বিনীর পরিচালনায় গড়ের মাঠে Xmas Parade করেন। মার্চের তালে তালে ভলেণ্টিয়াররা গান করেন:

'আমরা কি ডরি অরি।
নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি।।' ইত্যাদি। (৬ দৃঃ)

'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনকারের বিশেষ এক উদ্দেশ্যমূলক রচনা। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি রক্ষণশীলদের বিকৃত মনোভাবের এ এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

আট

অমৃতলালের 'সম্মতি সংকট' প্রহসন প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরের ২১শে মার্চ তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রহসনটি অভিনীত হয়।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে বাঙলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে। এনিয়ে সারা দেশে তখন এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকও বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন ও আইন প্রবর্তনের বিরোধিতা করে লেখনী ধারণ করেন। 'সম্মতি সংকট' প্রহসন রচনা করে অমৃতলালও সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইন প্রবর্তন বিরোধী, রক্ষণশীলদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রহসনটিতে তিনি

www.pathagar.com

বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে, বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন-কারীদের কটাক্ষ করেছেন।

'সম্মতি সংকট'-এ ধারাবাহিক কোনো গল্প নেই। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টিতে যা ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে—

কৈলাস পর্বতে দুর্গা, জয়া ও বিজয়া বিবাহ প্রথার মহিমা নিয়ে কথা বলেন। নারদ এসে বিবাহ বিষয়ে ভারতের দুরবস্থার কথা দুর্গাকে জানান। সব কথা শোনে দুর্গার আক্ষেপের অন্ত থাকে না—মহাদেবও ক্ষেপে ওঠেনঃ 'সতীর অপমান। ··· কে করে। কারা সে পাষণ্ড ? দক্ষযজ্ঞ কথা কি ভুলে গেছে ?'

ভারতে সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইন প্রবর্তনের উদ্যোগ চলেছে। মানিকের ছেলে তিলক বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী এবং সহবাস-সম্মতি আইনের বিশেষ সমর্থক। তাঁর বোন হিমিকে বারো বছরের আগেই বিবাহ দেয়ার জন্য মানিককে তিনি দোষারূপ করেন। মানিক ইংরেজী জানেন না এবং বামুন বেটাদের পরামর্শে চলেন বলেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সহবাস-সম্মতি আইনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিলক বলেন, 'পণ্ডিতবর নিতাইচাঁদ সাধ খাঁ বলেছেন যে. মনু যা লিখেছেন, সব মিথ্যা আর ভুল. ··· ডাক্তার এণ্ডরু স্মিথ এ মতের পোষকতা করেন, প্রোফেসর—মহাশয় তা সব বলেছেন।' তিলক চলে গেলে মানিক এবং তাঁর স্ত্রী দেশের এ দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন। এমন সময় রামলাল এসে তাঁর দুঃখের কথা জানান। মেয়ের বিবাহ দেয়ার জন্য বাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করে তিনি চার হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মেয়ের বয়স এখনো বারো বছর হয়নি বলে, ছেলের বাবা সম্বন্ধ ভেঙে দেয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। অন্যোন্যপায় রামলাল সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যকে দিয়ে মেয়ের কুষ্ঠি বদল করে, তাঁর বয়স বারো বছর দু'মাস করে দেয়ার জন্য মানিককে অনুরোধ করেন।

স্মৃতি রত্নের চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেও সহবাস-সম্মতি আইন নিয়ে তর্ক চলে। তিলক এসে পণ্ডিতদের জানান যে, যাঁরা সহবাস-সম্মতি আইনের পক্ষে থাকবেন, তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে দেয়া হবে। টাকার লোভে একমাত্র স্মৃতি রত্ন ছাড়া আর সকলেই তিলকের সঙ্গে চলে যান।

এদিকে সহবাস-সম্মতি আইনের প্রতিবাদে সার্বভৌম আমরণ অনশন আরম্ভ করেছেন। তিলক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকেও হাত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সার্বভৌমির যুক্তি ও অটল সিদ্ধান্তের কাছে হেরে গিয়ে, তিলককে অগত্যা হাতি বাগানের ভট্টাচার্য্যিদের উদ্দেশ্যেই চলে যেতে হয়।

সনাতন হিন্দুধর্ম ডুবতে বসেছে দেখে, ধর্ম-প্রেমিক নারী পুরুষরা কালী-ঘাটের কালীমন্দিরে প্রার্থনা জানানঃ 'মা গো জগদম্বে। ··· ··· রক্ষা কর মা, ··· ··· ধর্ম্মশাস্ত্র যায়, কুলবতীর লজ্জা যায়'।

www.pathagar.com

ভারত সরকার কর্তৃক সহবাস-সম্মতি-আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে সেকালের বাঙলায় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিলো, 'সম্মতি সংকট'-এ তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে প্রচীন ও নব্যপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই ছিলো এ আন্দোলনের মূল উপাদান। তবে এ সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ, তদানীন্তন সমাজের বিভিন্ন প্রথা ও আচার-সংস্কার এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি রক্ষণশীলদের মনোভাবের কিছু চিত্রও প্রহসন-টিতে ফুটে ওঠেছে।

সহবাস-সম্মতি-আইনের পক্ষে আন্দোলনকারীদের মুখপত্র তিলক। তিনি ইংরেজী স্কুলের ছাত্র--'ইন্ডিয়ান মিরর' পড়েন এবং আন্দোলনের ব্যাপারে Private conference করে বেড়ান। সহবাস-সম্মতি আইন সমন্ধে পিতাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বড় শক্ত আইন, বারো বছরের আগে, কনের ঘরে বর যেতে পারেনা, গেলে পুলি পোলাও।' (১অ. ১গ.) মানিক বলেন, 'সে কিরে! আর যদি তার আগে কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয়, ... চৌদ্দ-পুরুষ নরকস্থ হবে।' তিলক জবাব দেন, 'ঘোড়ার ডিম হবে, গবেন্দ্র ভট্চাজ্যি বলেছে, ও সব গল্পের কথা, ... গবর্নমেন্ট তার কথা সব শোনেন।' (ঐ) মুখুজ্যে মশাইর পরামর্শে পাঁচ টাকা করে দিয়ে তিলক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মুখ বন্ধ করেছেন। টাকার বিনিময় সার্বভৌমকেও হাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রোফেসার ... মশাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, অন্য লোকেরা পাঁচ পাঁচ টাকা দিয়েছি, আপনাকে ছয় টাকা, আপনি আইনের সপক্ষে মত দিয়ে একটা বচন করে দিন। (২অ. ২গ.) সার্বভৌম তাঁকে উল্টো বাল্যবিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলে, তিনি মনে মনে বলেন, 'ব্যাটা বামুন কথাগুলো যা বল্লে, ঠিক, কিন্তু এ গোড়ে গোড় দিলেত আমাাদের নাম বেরুবে না।' (ঐ)

স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীতে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যাপকের তর্কাতর্কির চিত্রটি বাস্তব বলেই সুন্দর হয়েছে। শাস্ত্রের উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরস্বতী বলেন, 'ষোড়শ বর্ষের পূর্বে যদ্যপি স্ত্রীলোকের সহিত পঞ্চ বিংশতি বর্ষের অনধিক বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হয়, তবেই ঐ বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্র কুলনাশ করে।' বাচস্পতিও শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, 'সৎকুলীন পাত্র পাইলে কন্যা দশ বৎসর অপূর্ণ থাকিতে তাহার বিবাহ দিবে।' বিদ্যারত্ন বলেন, 'বলি, নানাবিধ গণ্ডগোলই তো হইতেছে, কন্যা কালটা কি, তা তো আগে নির্দ্ধারণ হলো না।' বাচস্পতি বলেন ঃ

'অষ্ট বর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্ত অত উর্দ্ধং রজস্বলা।।'

www.pathagar.com

তর্করত্ন বলেন, 'ব্যাখ্যা কর, কোথাকার সব নূতন শ্লোক আবৃত্তি কোচ্ছো'। (১অ. ২গ.)

সহবাস-সম্মতি-আইন প্রবর্তনের ব্যাপারকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সেদিন তাঁদের ধর্মের প্রতি সরকারী হস্তক্ষেপ বলেই মনে করতেন। আইনের সমর্থক-হিন্দুদের প্রতিও তাঁদের আক্রোশের অন্ত ছিলোনা। মানিক বলেন, 'টেক্স নিচ্ছিস নে বাবা, আমাদের ঘরের ভিতর কি হচ্ছে—মেয়ের বে, ছেলের বে, এ সবে বাবু কোম্পানীর হাত কেন?' তিনি আরো বলেন, 'গোটা কতক অকাল-কুষ্মাণ্ড গো-খাদক হিন্দু তার ভেতর জুটেছে'। (১অ. ১গ) মানিকের স্ত্রী তারামনির বক্তব্যও অনুরূপ: 'আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমি আদর করবো, খাওয়া-দাওয়ার, শোওয়ার, তাতে কোম্পানীর কি?' (ঐ) রামলাল বলেন, 'কোম্পানী আর যা তা করুন, এতদিন আমাদের ধর্ম্মে হাত দেন নাই, কিন্তু এখন কতকগুলো ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাট সাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সে কাজ করাচ্ছে।' (ঐ) সার্বভৌম 'মা রক্ষাকালীর নিকট প্রার্থনা করেন: 'হিন্দুর ধর্ম্ম যায়, রক্ষা কর মা রক্ষা কালী! ⋯ ⋯ ব্রহ্ম! তোমায় নাম নিয়ে কতকগুলো পাষণ্ড তোমার প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টির স্থাপন সুসন্তান সৃজন। তাতে বাধা দিচ্ছে, এদের সুমতি দাও'। (২অ. ২গ.)

ব্রাহ্মরা বাল্যবিবাহ প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন না বলে, রক্ষণশীল হিন্দুরা যে তাঁদের প্রতিত অসন্তুষ্ট ছিলেন, প্রহসনটিতে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। জ্ঞানদা হিজড়ের গান শোনার জন্য ঠাকুরঝি শরতকে খোঁজছিলেন। শরত জানান, 'না ভাই এইসব হিজড়ে-টিজড়ের গান শোনাবার আমার মানা।' জ্ঞানদা বলেন, 'কার মানা? ঠাকুর জামায়ের, তিনি কি বেম্মদত্যি হয়েছেন নাকি?' (১অ. ৩গ.) সম্মতি-আইন সম্বন্ধে বিরাজ বলেন, 'আমাদেরও বলে, যাদের হিন্দুরা জাতে ঠেলেছে, তারাই কোম্পানীকে ব'লে এই আইন করবার চেষ্টা করছে।' জ্ঞানদা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তাদের এত মাথা ব্যথা?' বিরাজ জানান, 'তাদের ধেড়ে ধেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখে, না রাখলে সাহেবেরা নিন্দা করে, কাজেই যাতে সবায়ের জাত যায়, তাই তাদের চেষ্টা।' (ঐ)

বাল্যবিবাহ-নিরোধ আন্দোলনে পারসী মালাবারী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের আক্রোশ তাঁর প্রতিও কম ছিলো না। রঙ্গিনীর দু'টো ছড়ার উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> 'আছেন সে' মালাবারি',
> আইন করেছে জারি, "সরকার" পদে ধরি,
> পতির করিতে ক্ষতি সদা আগুয়ান।
> অবলার বল দিতে "বীর জাম্বুবান।।"

www.pathagar.com

এবং—

'জয় সংস্কারের জয়, জয় দেশ উদ্ধারের জয়, ··· ···
কি ভয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয়,
গা'লো গা মকর গঙ্গাজল!
'মালাবারির' পিরিতে সব হরি হরি বল।।" (১অ. ৩গ.)

শেষোক্ত ছড়াটিতে সংস্কারক প্রমুখের প্রতি কটাক্ষও লক্ষণীয়ঃ

তখন যে বরপণের যোগান দিতে গিয়ে অনেক-সময় কনের পিতারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তেন, তার প্রমাণও প্রহসনটিতে রয়েছে। মানিক তাঁর মেয়ে হিমির বিবাহ দিয়েছেন, 'বৌ বাজারের বাড়ীখানা বেচে।' রামলালও তাঁর মেয়ের বিবাহের জন্য বাড়ী বাঁধা দিয়ে চার হাজার টাকা যোগাড় করেছেন।

সেকালে পুনর্বিবাহের প্রচলন ছিলো। মেয়ের পিতা কোনো এক শুভদিনে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে আনতেন, এবং যথেষ্ট ধুমধাম সহকারে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হোত। এ বিবাহ না হলে, মেয়ে পবিত্র হননা, এবং তাঁর সন্তানদেরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা থেকে যায় বলে মনে করা হোত। তারামনি তাঁর মেয়ে হিমির পুনর্বিবাহ প্রসঙ্গে মানিককে বলেন, 'পুনব্বে' না করালে যে মেয়ের পবিত্র হবেনা, তোমার দৌহিত্রেরও যে হানি হবে।' (১অ. ১গ.) সহবাস-সম্মতি-আইন করে সরকার পুনর্বিবাহ-প্রথা ওঠিয়ে দেবেন শোনে, বিরাজের স্বামী নাকি বলেছেন, 'কোম্পানী আইন করে পুনব্বে' উঠিয়ে দেবে। কাল বলবে বে' উঠিয়ে দেবে।' (১অ. ৩গ.)

নয়

অমৃতলালের পরবর্তী বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'রাজা বাহাদুর' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃীস্টাব্দে। প্রহসনকার 'রাজা বাহাদুর'কে 'সং-রং' বলে অভিহিত করেছেন, এবং পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'সঙের তালিকা'। প্রকাশনার বছরের ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখে প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়—এ অভিনয়েও অমৃতলাল নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩৩]

'রাজা বাহাদুর'-এ প্রধানতঃ সেকালের খেতাব-পাগল ব্যক্তিদের প্রতি প্রহসনকারের বিদ্রূপ ফুটে ওঠেছে। প্রহসনের নায়ক, খেতাব-পাগল গাণিক্যধন সম্ভবতঃ সেকালের কোনো বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে রচিত। বৈদ্যনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় লিখেছেন, 'রাজা বাহাদুর লিখিবার পর কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে গুলি করিবার ভয়ও দেখাইতে ছাড়েন নাই।'[৩৪]

www.pathagar.com

'রাজা বাহাদুর'-এর গল্প সংক্ষেপ হচ্ছে—পূর্ববঙ্গের মূর্খ ও লম্পট জমিদার গাণিক্যধন (মণ্ডল) রায়, 'রাজা' খেতাব লাভের জন্য কোলকাতায় এসেছেন। তাঁকে পেয়ে 'সহুরে তুখোড় লোক' কালাচাঁদের আনন্দ আর ধরেনা। তিনি 'দুর্দ্দশাপন্ন সাহেব' ব্লকম্যান ফিশের সহায়তায়, গাণিক্যধনকে প্রতারিত করে অর্থোপার্জনের পরিকল্পনা নেন। গাণিক্যধন এসব কিছুই বুঝতে পারেন না। চাটুকারদের কর্তৃক পরিবৃত হয়ে তিনি বিলাসবহুল জীবনে গা ঢেলে দেন—বাইজী প্রভৃতির সঙ্গে লাম্পট্যপনা করেই তাঁর দিন কাটে।

গাণিক্যধন কোনো এক মৃত জমিদারের দত্তক পুত্র। তাঁর জন্মদাতা পিতা মাণিক্যধনের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। একদিন সামান্য সাহায্য প্রাপ্তির আশায়, মাণিক্যধন কোলকাতায় এলে, গাণিক্যধন তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। মর্মাহত মাণিক্য ধন সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে কয়েকজন মহিলার সাক্ষাৎ পান। তাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। এবং গাণিক্যধনের ঠিকানা খোঁজছেন বলে জানান। কথায় কথায় মাণিক্যধন জানতে পারেন, তাঁদের মধ্যে গাণিক্য ধনের স্ত্রী মনসাঠাকরুণও রয়েছেন।

মাণিক্যধন তাঁদেরকে নিয়ে পাঁচ কড়ি বাইজীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন সম্ভাব্য রাজা হওয়ার আনন্দের আতিশয্যে গাণিক্যধন সবেমাত্র বাইজীকে নিজের গলার মুক্তোহার খুলে উপহার দিয়েছেন। মনসা আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন না। তিনি তাঁর স্বামীর গলায় গামছা লাগিয়ে টানতে টানতে দেশে নিয়ে চলেন।

গাণিক্যধনের মাধ্যমে প্রহসনকার সেকালের খেতাব-পাগল ব্যক্তিদের উপহাস করেছেন। গাণিক্যধন সম্বন্ধে কালাচাঁদ তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'মফস্বলে দেড় কাঠা ভুঁই থাকলেই কল্‌কেতায় এসে অনেকে জমীদার হয়, এ সেই গোছ; দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্ণমেণ্ট মান্য করে, খেতাব টেতাব দেয়, এও তাই খেপেছে'। (১ দৃঃ) গাণিক্যধন 'হাতী পাইরে দুতি' না পরে ঘরের বের হন না। তিনি গিলা করা পাঞ্জাবী, রেশমি ওয়াস কোট, 'কালাপত্তুর কাম করা' ওড়না গায়ে দেন, এবং নেউল মুখো ছড়িতে আতর মেখে ঘুরে বেড়ান।

গাণিক্যধন মূর্খ বলেই নিজের অযোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে খেতাবের জন্য পাগল হয়েছেন—নাম কেনার জন্য চাঁদা-ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকারের চাঁদা দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। কালাচাঁদ হাপসি গঞ্জের মেমদের বড়দিনের পেত্নী নাচের জন্য দু'শ টাকা চাঁদা চাইলে গাণিক্যধন বলেন, 'চাঁদাতো বিস্তর দিলাম, বোজের চাঁদা, ··· নাচের চাঁদা, হাড্ ড্ ড্ খেল্‌বার চাঁদা, সাতার গরের চাঁদা।" শ্রী ক্ষ্যাত্রে জগন্নাথের শ্রীমন্দির বগ্ন অইছে বলেও নাকি কাঁরা তাঁর নিকট চাঁদা

www.pathagar.com

চাইতে এসেছিলেন। কালাচাঁদ বলেন, 'এক পয়সা দেবেন না, নাম বেরুবে ? ... সাহেবেরা খুসী হবে ? খালি বাজে'। গাণিক্যধন বলেন, 'আপনি কইছেন, ... পেত্নী নাচের চাঁদাও দিমু, ... মহারাজ বাহাদুর লিখিত সোনো-ন্দটা আনাইয়ে দ্যান।' কালাচাঁদ বলেন, 'এবার কার সম্বন্ধে শুধু রাজা লেখা থাকবে।' গাণিক্যধন বিস্মিত হনঃ 'কিসের লেগে ? মহারাজ বাহাদুর থাক্‌বানা ?' (১ দৃঃ)

গাণিক্যধন রাজা হতে চলেছেন—কোলকাতার 'বোদ্র' লোক সব তাঁর বন্ধু। মাণিক্যধন তাঁর জন্মদাতা পিতা হলেও, দরিদ্র-'বাঙ্গাল'। তাঁকে তিনি কি করে নিজের বাড়ীতে থাকতে-খেতে দেন। চাকর পোকারামকে তিনি বলেন, 'পাচটা পুইসা দিয়ে বিষ্ণু ঠাহুরের বাতের আড্ডাটা দ্যহায়ে দাওতো।' মাণিক্যধন জিজ্ঞেস করেন, 'ক্যান, তোর সাথেই-দু-মুঠা খালাম, তাতে আর দোষ কি ?' গাণিক্যধন বিরক্ত হনঃ 'আরে কোথাকার ডিমের বাপ ... আমি অ্যাহন রাজা অইছি; অ্যাহনে কোলকত্তার কয়েক বোদ্র আমার সাথে আজ রাতে আহার করবেন, তুমি সেথা রতি পাবানা।' তিনি আরো বলেন, 'তোমার চেহারা অতি নোংরা, ... বদ্দর সমাজে চলবানা।' মাণিক্যধন রাগ করেনঃ 'বাদীর বিটা আমার কি খাপ সুরৎ ?' গাণিক্যধনও গর্বের সঙ্গে জবাব দেন, 'মহারাজ গাণিক্যধনের চেহারা খাপ সুরৎ কিনা, তা কোলকত্তার হক্কল বদ্দরই জানে, পুচ কর যাইয়ে পাচী বাইজীরে, মুচি উমার ছুকরী নিস্তারেরে, হারকাটার সোদোরে, ... হক্কলরে জিজ্ঞাসে আয়।' (৪ দৃঃ)

গাণিক্যধনের মতো ব্যক্তিদের সকল কাজের অন্ধ-সমর্থন যোগাতে তখন চাটুকারেরও অভাব ছিলোনা। তাঁরা সময় বুঝে হাঁচতেন—সময় বুঝে তুড়ি দিতেন। কখনো-সখনো অপেক্ষাকৃত কম-চালাক চাটুকাররা বুঝি হাঁচি দেবেন কি তুড়ি দেবেন, এনিয়ে বেশ সমস্যায়ও পড়তেন। গাণিক্যধনের কোনো এক কথা শোনে কীর্তিবাস বাঁশীমোহনকে বলেন, ও বাশী খুরা, এবার কি করি, হাচি কি তুরি মারি ?' এক সময়ে গাণিক্যধনের রাজা হবার কথা শোনে সকলে হাঁচি দেন—কীর্তিবাস কিন্তু তুড়ি মেরে বসেন। গাণিক্যধন রেগে ওঠেনঃ 'কীর্তিবাস খুরা, তুমি হালা পাজী, র‍্যালের মাশুল লয়ে আজি দ্যাশে রওনা হও।' কীর্তিবাস প্রমাদ গুণেনঃ 'উজুর ! ... নাকের মধ্যি একটা গা অইছে, আবার খোচাখুচি করলে রক্ত বাইর অইতো, তুরিও শুব।' ভট্টাচার্য বলেন, 'হাঁ হাঁ, ডাকের বচন আছে—

হাচি পড়ে তুড়ি মারে কিসের কসুর।
রাজা হবে খাড়া খাড়া ভেবনা শ্বশুর!!' (৪ দৃঃ)

www.pathagar.com

তখনকার কোলকাতায় লম্পট আর প্রতারকদের রাজত্বও গড়ে ওঠেছিলো। আড্ডাবাড়ীর বারান্দায় ভন্ডবেশধারী নর-নারীগণ গান করেন ঃ

'চল চল যুগলে যুগলে যাই।
শীকার ঢুড়িয়ে ফিরি হে সবাই।।'

কালাচাঁদ তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মনে মনে বলেন 'সব পুরোন হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের চাঁদা—পথে পথে কাঁদা, বিজ্ঞাপনের খরচ কুলোয় না; ধর্ম্ম-প্রচার—এক সন্ধ্যা আহার জোটা ভার'। কালাচাঁদের স্ত্রী কালিন্দীও স্বামীর সঙ্গে 'শীকার'-এ যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করলে, কালাচাঁদ বলেন, 'দেখ, এই যে সব ঠাকুরণরা যোড়ে যোড়ে শীকার বেরুলেন, ও ছিপে মাছ ধরা, ওতে আমি বড় রাজী নই ; মাগ টোপ গেলে যে মাছ ধরতে যায়, তার অনেক সময়েই মাছে টোপটি ঠুকরে পালিয়ে যায়'। গাণিক্যধনকে আসতে দেখে, কালাচাঁদ কালিন্দীকে বলেন, 'সরে যাও, সরে যাও।' ব্যাপারটি গাণিক্যের দৃষ্টি এড়ায় না। কালাচাঁদকে তিনি বলেন, 'তা মায়ে মানুষরে সরাইছেন নাহি? আমরাও না অয় দুটা আমোদ করলাম, বিবিডী কেডা?' কালাচাঁদ জানান, 'আজ্ঞা, ও তা নয়।' কিন্তু গাণিক্যধনের তা বিশ্বেস হয় না—তিনি বলেন, 'বর লাজুগ দেহি মাষ্টর বাবু, বুঝি হালে বার কোরে আনছেন, এ্যাহোনে পোষ মানে নাই?' (১ দৃঃ) এ ব্যাপারে গাণিক্যধনই বুঝি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভট্টাচার্য মশাই পঞ্জিকা দেখে তাঁর সে বছরের ফলাফল জানাতে গিয়ে বলেন, 'বৈশাখ মাসে মকরকুম্ভের মহা দুঃখ। গাণিক্য বলেন, 'তা ফ'লে গেছে, উনিশে বৈশাখ শামী ধোপানী মরে, মাগীর সাথে আমার বরই প্রণয় ছিল'। ভট্টাচার্য পুনরায় বলেন, 'জ্যৈষ্ঠ মাসে মকর-কুম্ভ মীনের লাভ।' গাণিক্য সমর্থন জানান ঃ 'অইছে, রাইমোহন সদ্দারের বগ্নীরে ঐ মাসের ষষ্ঠীর দিনেই বার করি, এডারে লাভ কইতি হয়।' (৪ দৃঃ)

স্ত্রী স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মদের প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুদের কটাক্ষের ইঙ্গিতও প্রহসনটিতে রয়েছে। কালাচাঁদ কালিন্দীকে সঙ্গে করে, 'শীকার'-এ যেতে আপত্তি জানালে, কালিন্দী বলেন, 'ছি ভ্রতঃ প্রাণনাথ, তোমার এখনও কুসংস্কার!' কালাচাঁদ উত্তর করেন, 'কি জান ভগ্নি, ··· স্ত্রীকে বাজারে বার করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে।' কালিন্দী বলেন, 'প্রাণেশ্বর, ··· আত্মাবল্লভ।' কালাচাঁদ বলেন, 'ভগিনি, ·· কালিন্দী কল্লোলিনি!' কালিন্দী বলেন, 'ভাতঃ প্রেম দাও, প্রেম দাও!' কালাচাঁদ এগিয়ে আসেন, 'ভগিনি আঁচল পাত, আঁচল পাত।' (১ দৃঃ)

তখনকার কোলকাতার পৌর এলাকাও ধুলো আর নোংড়া-নর্দমায় ভরা ছিলো। মিঃ ফিস মাতাল হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থেকে বলেন, 'I smell

www.pathagar.com

sweet savour sent up from the Municipal drain, and I feel soft things these fine dust and horse droppings'। পৌরসভা ও এর কমিশনারদের স্মরণ করে তিনি আরো বলেন, 'Ah! God bless the Commissioners! How considerate they are for laying such a layer of sweet soft nine inches deep dust for my comport ... Long Live the Corporation! (৩ দৃ)

দশ

অমৃতলালের অন্যতম বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা' ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। তখন বাঙলাদেশে হিন্দুদের সমুদ্র যাত্রার ব্যাপারে প্রবল আন্দোলন চলছিলো। রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব হিন্দুমতে বিলেত যাওয়া যায় কিনা, এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতের কাছ থেকে অভিমত সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর এক পত্রের জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেন, 'শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করিনা। ... সমাজ দেশাচারের অধীন,—শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্তন জন্য মর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ... যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র যাত্রা সাধারণে করিতে পারিবেন না।'[৩৫] 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা' রচনা করে, অমৃতলাল হিন্দুয়ানির ঠাট বজায় রেখে বাঙালীর সাহেব হওয়ার মূঢ় প্রয়াস ও হুজুগ-প্রিয়তাকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেন।

স্টার থিয়েটারে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয় সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'মিরর' লিখেনে, 'The pavilion was filled by an unprecedentedly large audience, the principal attraction being the first rendering of Kalapani, which, as was to be expected, was a thinly veiled fling at some of the leaders of the Seavoyage Movement.'[৩৬]

'কালা পানি বা হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা'য় তেমন কোনো কাহিনী নেই। বিভিন্ন দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একত্র করলে সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়ঃ

কোলকাতার ধনীযুবক দুলাল চাঁদ, তাঁর বন্দু সাধুরাম ও মাখনলাল

www.pathagar.com

নব্যপন্থী। কিন্তু হিন্দুমতের বাইরে গিয়ে তাঁরা কোনো কাজ করতে চান না। পণ্ডিতজী তাঁদের সকল কাজের অন্ধ-সমর্থক।

দুলাল চাঁদ ও তাঁর বন্ধুরা হুজুগপ্রিয়। দেশের মধ্যে তেমন কোনো হুজুগ না থাকায়, আপাততঃ দেশোদ্ধারের নাম করে তাঁরা সপরিবারে হিন্দু মতে বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বিলেত যাওয়া শাস্ত্রসম্মত বা হিন্দুমতেও বিলেত যাওয়া যায়, এরূপ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য অর্থ-লোভী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও অভাব হয় না।

দুলাল চাঁদের প্রতিবেশী, ব্রাহ্মণ তিন কড়ি কিন্তু দুলাল চাঁদ প্রমুখের এ প্রচেষ্টাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন না। তিনি বলেন যে, দেশোদ্ধারের ইচ্ছে থাকলে দেশে থেকে কৃষি কাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করেই তা করা সম্ভব—সেজন্য বিলেত যাওয়ার আদৌ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিলেত যাত্রার পরিকল্পনাকারীরা তাঁর এ সমস্ত যুক্তিকে উপহাস করেই উড়িয়ে দেন।

দুলাল চাঁদ প্রমুখের বিলেত যাওয়ার সব আয়োজনই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় তিন কড়ি এসে তাঁদেরকে জানান যে, 'তোরা দেশ ছেড়ে চল্লি, কিন্তু এখানে একটা বোধ হয় ভাল রকম হুজুগের শ্রাদ্ধ পাকবে, তোরা থাক বিনি, মাতবে কে, তাই ভাবছি।' সকলেই ব্যাপারটা কি জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিন কড়ি জানান, কোনো এক সাহেব নাকি এক ভিখারীকে পুলিশে দিয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন বলে, সাহেব নাকি রেগে গিয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুলাল চাঁদকে অগত্যা বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়—তিনি বুঝতে পারেন, দেশের এ 'ভিখারী নিয়ে গোলযোগ'—এর ব্যাপারটি তাঁদের 'দাতব্য সভার জুরিস-ডিকসানের ভিতর এসে পড়েছে।'

প্রহসনটিতে সেকালের বাঙালী হিন্দুদের 'হিন্দুমতে বিলেত যাওয়া'র আন্দোলন' এবং সাগর পাড়ি দিয়ে বিলেত যাওয়ার প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুদের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

দুলাল চাঁদ সমাজ-সংস্কারক—দেশোদ্ধার ও সমাজ-সেবা মূলক কাজ নিয়েই তাঁকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণের পেছনেও তাঁর এ মানসিকতাই বিদ্যমান। অবশ্য হিন্দুমতের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করাই তাঁর অভিপ্রায় নয়। তর্কচূড়ামণি তাঁর আশ্রিত প্রজা। বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেননি বলে, তাঁকে তিনি তিন দিনের নোটিশে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ দেবার কথা জানান। তাঁর বন্ধু সাধুরাম 'পুলিশে উকীলী' করেন। তিনি বলেন যে, তর্কচূড়ামণিদের সেখানে তিন পুরুষের

www.pathagar.com

বাস, সুতরাং তিন দিনের নোটিশ 'ইল্‌লিগ্যাল' হবে, সেজন্য অন্ততঃ পনর দিনের সময় দেয়া প্রয়োজন। পত্রিকা-সম্পাদক মাখনলাল এরূপ আইনের নিন্দা করেন—ইচ্ছে করলেই যদি প্রজাকে উচ্ছেদ দেয়া না যায়, তাহলে 'আর রাজা-প্রজা সম্বন্ধটা রইল কি?' (১দৃঃ) দুলাল বলেন, 'তবে আর আমি বিলাত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছি কেন? . একবার বিলাতে যেতে পারলে, ষষ্ঠী বাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেকচার ঝাড়াব, আর বিলাতী সাহেবদের হাত করে এখানকার আইন করার কাজটা নিজের হাতে নেব, তাহলে ঝাঁ ঝাঁ করে, কুসংস্কার মূলক যত বদ আইন আছে, সব রদ করে ফেলব।" (ঐ) মাখনলাল তর্কচূড়ান্তমণিকে বাড়ী থেকে ওঠিয়ে দিয়ে সেখানে 'খাঁটি হিন্দুমতে বোকনোয় করে গঙ্গাজলে ফাউল কারি তৈয়ের' করার জন্য কাউকে দিয়ে একটি হোটেল স্থাপনের পরামর্শ দিলে দুলাল বলেন, 'বেশ, সে যদি হিন্দু মতে ইংরাজী হোটেল করে, তা'হলে সে তো একজন দেশহিতৈষী, তাকে যায়গা দেওয়া তো আমার কর্তব্য কার্য্য।' (ঐ) দুলাল 'গোপনে' আর্তের সেবা করে বেড়ান। সেদিনও এক বিধবাকে পাঁচ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর বন্ধু মাখন আবার 'বাঙ্গালা কাগজে' সে খবর ছেপে দিয়েছেন। দুলাল বলেন, 'একটি বিধবাকে আমি লুকিয়ে ফন্ড থেকে পাঁচটি টাকা দান কল্‌লেম, তার পর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই করে মানা করেছি, যেন একথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে।' (ঐ)

বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে দুলাল তিন কড়িকে জানান, 'আমরা যাঁর তার মত যাচ্ছিনে, আমরা আসল হিন্দুমতে বিলাত যাব।' (১দৃঃ) বিলেত যাওয়ায় কোনো পাপ নেই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরকে একথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সুরতিতে [স্মৃতিতে] লেখা আছে যে, বিলাত যাওয়ায় কোন পাপ নাই।… কালিদাস, ভীষ্ম, দ্রোণ …… এরা সবাই বিলাত গিয়েছিলেন।' (৩ দৃঃ) 'হিন্দুর দেবতা জগন্নাথ তো সমুদ্রের ধারেই রয়েছেন, আর শ্রী ক্ষেত্রে অন্ন-দোষও নাই'—পণ্ডিতজীর নিকট একথা শোনে দুলাল বলেন, 'এর একটা কমিটি করছি, তাতে ঝাঁ রেজোলিউসন পাশ ক'রে দিব যে, হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বিলাত যাব, … জগন্নাথ সমুদ্রের ধারেই আছেন, যার-তার ভাত খাচ্ছেন, তাঁর কখনও বিলাত গেলে জাত যাবে না'। (৩ দৃঃ) কিন্তু তাঁর স্ত্রী ন বৌর জাহাজের নাম শুনলেই মাথা ঘুরে। ননদ নিস্তারিণীকে তিনি জানান, 'সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে গেলে আমি তো আর বাঁচবনা। (২ দৃঃ) নিস্তারিনী বলেন, 'নন্দা তোকে বলেনি যে, আমরা হিন্দুর জাহাজে যাব, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে ঢেউ লাগবে না, জাহাজ দুলবে না।' নিস্তারিনীর স্বামীও বলেছেন, তিনি 'কাপ্তেন সাহেবকে ব'লে

www.pathagar.com

জাহাজের খানিকটা জায়গা গোবরছড়া দিয়ে টবে করা তুলসী-গাছ দিয়ে ঘিরে' রাখবেন 'সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না।' (ঐ)

সাধু ও মাখন প্রমুখ দুলালের যোগ্য বন্ধু। তিন কাঁড়কে লক্ষ্য করে সাধু বলেন, 'ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ; এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাতে যেতে চাচ্ছি।' (১ দৃঃ) অন্য এক সময়ে তিনি বলেন, 'পুলিশে উকীলী করি ব'লে অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিস্টারটা হয়ে আসছি।' (৬ দৃঃ) নিজের সম্বন্ধে মাখন বলেন, 'লোকে যা বলুক,...এডি-টোরিয়্যাল-ফেটালিটীর মধ্যে আমার মতো ব্রেভারসনেস খুব কম এডিটরের আছে।' (১ দৃঃ) যাঁরা 'গোল' না করে বিলেত চলে যান, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'তারা ইংরাজী জানেনা, সভাসমিতির মানেই বুঝে না, সভা ক'রে লেকচার না দিলে কি কোন কাজ জমে?' (ঐ) পণ্ডিতজীর নিজের বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও, হিন্দুমতে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রধান সমর্থক। কথায় কথায় তিনি ইংরেজী বলেন। দুলাল তাঁকে পণ্ডিতদের নিকট হিন্দুমতে বিলেত যাওয়ার প্রসঙ্গটি তোলতে বললে, তিনি বলেন, 'ভেরি গুড ... আইটেল ... সেবারে এসিয়াটিক সুসাইটীর মিটিং-এ বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ঐ লণ্ডন. যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল; সীতাকে রামচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়েছিলেন।' (৩দৃঃ) বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর না করলে, পণ্ডিতরা 'বিদায়' পাবেন না, একথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'সাইন নো গিভ ফেয়ারওয়েল নো গেট; ... অ্যানুয়েল স্টপ।' (ঐ) দুলাল তাঁকে নিয়ে বিলেত গেলে খুবই মজা হোত বললে, তিনি বলেন, 'নো নো, আই ক্যাচ ফিস, নো টচ ওয়াটার।' (৬ দৃঃ)

হিন্দুমতে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে মত দিতে গিয়ে পণ্ডিতরা সমস্যায় পড়লেও, অনেকেই 'বিদায়' পেয়ে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। উড়িয়া অর্জুন ঠাকুর বলেন, 'সমুদ্র পাড়, ... পুরুষোত্তম—যাউ, যাউ, দোষ নাস্তি।' পূর্ববঙ্গীয় তর্ক নিধি কিন্তু বিদায়ের লোভে ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজী হননি। তিনি বলেন, 'প্যাচ্ছাব করি তোমার স্বাক্ষরে, আর প্যাচ্ছাব করি তোমার বিদায়ে ... অর্থলোভ দেহায়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও।' (৩ দৃঃ)

বিলেত যেতে ইচ্ছুক ও বিলেত যাওয়ার সমর্থকদের প্রতি রক্ষণশীলদের কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে প্রধানতঃ তিন কড়ির মধ্য দিয়ে। সাধু 'ভারত উদ্ধার' এর জন্য বিলেত যেতে চাচ্ছেন শোনে তিন কড়ি বলেন, 'চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য তো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে? (১ দৃঃ) মাখনকে তিনি বলেন,

www.pathagar.com

'এখনও ঢের কাজ আছে যা, দেশে থেকেই করতে পার ; ··· যেতে হয়, তার জন্য এত মিটিং-ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন ? ··· — সোজা পথ আছে, ঢেউ গ্‌ণতে গ্‌ণতে চলে যাও।' (ঐ) বিলেত ফেরতদের একঘরে করে রাখার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন ধ্‌চ্‌নী মাথায় দে গ্যাড্‌ ম্যাড্‌ করে। ভাত হ'ল ঘাসকা বীচি, মোচা হ'ল কেলেকা ফ্‌ল. ··· বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়।' (ঐ) প্রহসনের কতোগ্‌লো ছড়াগানেও অন্‌র্‌প কটাক্ষ ব্যক্ত হয়েছে। যথা—

নারীগণ—

'ভক্ত নাই আমাদের কর্তাদের মতন।
হিংদ্‌মতে সাহেব হ'তে সতত যতন।
যদি খাবে বিলাতী বিস্কুট,
আগে দেবে হরির ল্‌ট।' (১ দ্‌ঃ)

কুল-নারীগণ—

'কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা।···
তরী নাকি ভারী দোলে,
কার গায়ে কে পড়ে ঢলে,
লাজে যে যাব ম'রে।' (২য় দ্‌ঃ)

এগার

অম্‌তলালের অন্যতম বিদ্র্‌পাত্মক প্রহসন 'বাব্‌' প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে। ১৮৯৪ খ্‌ীস্টাব্দের ১লা জান্‌য়ারীতে স্টার থিয়েটারে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কয়েকমাস পরের 'অন্‌সন্ধান' লিখেন, "বাব্‌'র অভিনয় প্‌র্বের ন্যায় সতেজে চলিতেছে। ··· এর্‌প বর্ষার সময় স্টার রঙ্গমঞ্চে যে প্রতি অভিনয়-রাত্রিতেই লোকে লোকারণ্য হয়, ইহা থিয়েটার কোম্পানীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।"[৩৭]

'বাব্‌' বিশেষ উদ্দেশ্যম্‌লক রচনা। প্রহসনকার একে 'সামাজিক নক্সা' বলে অভিহিত করেছেন। সেকালের সমাজে বিভিন্ন বেশে 'বাব্‌'দের আত্মপ্রকাশ এবং তার হাস্যকর পরিণতির প্রতিই লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্র্‌প পরিস্ফ্‌ট।[৩৮] 'অন্‌সন্ধান' বলেন, 'কি বাব্‌ই আঁকিয়াছেন তিনি ! সজীব জীবন্ত রঙবেরঙের বাব্‌—বড় স্‌ন্দরই আঁকা হইয়াছে।'[৩৯] অবশ্য, এর দ্‌ই এক স্থলে রঙের

www.pathagar.com

চটক বেশী মাত্রায়' পড়া, 'এক আদ স্থল অতিরঞ্জিতও' হওয়া, এবং 'স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাবেরও ছায়া' পড়ার কথাও 'অনুসন্ধান' অস্বীকার করেন নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে, 'অমৃতলাল তাঁহার 'বাবু' প্রহসনের ভিতর দিয়া দেশের প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের জনক ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে তীব্রতম বিষউদ্গার করিয়াছেন। এই সঙ্গে ভণ্ড দেশহিতৈষী, অপরিপক্ক-জ্ঞান বৈজ্ঞানিক, হুজুগপ্রিয় সংস্কারক, স্বার্থপর সম্পাদক, কপট ধর্মধ্বজ সকলের বিরুদ্ধেই একযোগে ··· ব্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছেন।'[৪০] ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেন, 'অমৃতলালের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এখানে শুধু কঠোর নয়, হিংস্র ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না।' ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রহসনকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ ঘোষ বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে কৃত্রিমতা বা আতিশয্য ছিল, কিন্তু ইহা যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনেক কুপ্রথা এবং কুসংস্কার দূর করিতে সহায়ক হইয়াছিল সেই বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারেনা। ব্রাহ্মদের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার-আন্দোলন চালিত হইয়াছিল। সেইগুলি সম্বন্ধেও আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে উপহাস করা হইয়াছে।'[৪১]

'বাবু'তে তেমন কোনো ধারাবাহিক কাহিনী নেই। বিভিন্ন দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর মোটামুটি সারাংশ এরূপ—

`ফটিক চাঁদ চক্রবর্তীর ভগ্নিপতি ষষ্ঠী কৃষ্ণ বটব্যাল ওরফে এম. কে. ভ্যাটা ভ্যাল দেশহিতৈষী বাবুও পত্রিকার সম্পাদক। গ্রাম্যমণ্ডল ভজহরি বাবু তাঁর এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় ষষ্ঠীর শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ষষ্ঠী যেনো তাঁর পত্রিকায় গ্রামের অবস্থাটা 'জোর কলমে দু'এক ছত্র লেখেন, তা হ'লে গভর্নমেন্ট হ তে সাহায্য হ'তে পারে'। ষষ্ঠী ভজহরিকে তাঁদের গ্রামের জন্য দশটি কাগজও নিজের একডজন ছবি কিনতে এবং তাঁর উদ্ধার ভাণ্ডারে একান্ন টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে জানান। তাছাড়া ভজহরিকে তিনি ট্রেনের ফাষ্ট ক্লাশে যাওয়া-আসা, কেল্‌নারের হোটেলে বন্ধুদের নিয়ে খাওয়া এবং রাজশাহী, ঢাকা, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে টেলিগ্রাম করার টাকা প্রদান করতেও বলেন। ভজহরি নিরাশ হয়ে বাড়ী ফেরেন। ষষ্ঠীরও ভীষণ তাড়া। কাল তাঁর 'ওখানে Conversation হবে, বিস্তর লেডিস এণ্ড জেণ্টলমেন একসঙ্গে মিলবেন, রাজনৈতিক, সামাজিক তর্ক হবে।'

সজনীকান্ত চাকি, বাঞ্ছারাম সাধু খাঁ, দামোদর ও কন্দর্প কান্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিরা ধর্মসংস্কার, বিধবা বিবাহ-প্রবর্তন ও নারীদের স্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতির ব্যাপারে আন্দোলন করছেন। বৈজ্ঞানিক বাবু অশনি প্রকাশও তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। সজনী কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ হেসে ফেলে জিভ কাটেন—

www.pathagar.com

অশ্লীল হাসি হেসেছেন বলে অনুতাপ করেন। তিনি পৌত্তলিক ভাইয়ের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' করাকে মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তাঁর মতে পরোপকারই পরম ধর্ম, 'আত্মীয়ের উপকার করা কিছু ধর্ম্ম নয়'। বাঞ্ছারামের অশ্লীলতার পরিধি আরো ব্যাপক। অশ্লীলতার জন্যই তিনি তাঁর 'সাকার পিতা'র নাম মুখে নেন না। তাঁর নিজের বংশ পরিচয় (ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের পূর্বের) দিতে গিয়েও তিনি বলেন, 'একটা অশ্লীল পৌত্তলিক জাতি ছিল বোধ যে, সে হিসাবে আমরা সূর্য্য বংশ।' বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করতে গিয়ে তিনি নিজেই তাঁর সমাজ-ভগ্নি বৃদ্ধা ক্ষমা সুন্দরী পালধিকে বিবাহ করেন। দামোদর ভ্রাতা-ভগিনীদের' প্রেম দেবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন—পৌত্তলিক ভাইকে বাড়ী থেকে বে-দখল দেয়ার জন্যও তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। কন্দর্প তাঁর বিধবা মাতামহীর বিবাহ দেয়ার জন্য ব্যস্ত। 'অশ্লীল' মেয়ে লোকের দিকে তাকালে তাঁর 'চিত্তবিকার' দেখা দিতে পারে বলে তিনি চোখ বেঁধে পথে বেরোন। অশনি কিন্তু বিজ্ঞানের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে চান। বিধবাদের বৈধব্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্য তিনি একধরনের গ্যালভানিক ব্যাটারী তৈরী করার কথা ভাবেন। তাঁর 'ম্যাগনেটিক তেল মাখিয়া' রাখলে নাকি মৃত দেহ পাঁচ বছরেও নষ্ট হয় না।

ষষ্ঠীর মা'র মাথার চুল পেকে গেছে, ময়লা কাপড় পরেন—সর্বোপরি তিনি 'স্বাধীন' হননি বলে ষষ্ঠীর দুঃখের অন্ত নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী নীরদাকে স্বাধীন করার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একদিন তিনি সুসজ্জিতা নীরদাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে স্বাধীনভাবে বেড়াতে যান। সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি ও 'স্বাধীন' মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ এক মদ্যপ গোরা মাতাল অবস্থায় নীরদার পথ রোধ করে দাঁড়ান এবং তাঁকে ষষ্ঠীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চান। 'ভারত উদ্ধার কারী' ষষ্ঠী ও অন্যান্যরা ভয়ে পালাতে থাকেন। এমন সময় সেখানে তিনকড়ি মামা এসে উপস্থিত হন। ষষ্ঠীর অনুরোধে তিনি মাতাল গোরাকে আক্রমণ করলে, গোরা তখন হাসতে হাসতে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করেন। সকলেই ক্ষেপে ওঠেন, এ যে ফটিক চাঁদ—বাঙালী হয়ে এতোটুকু? আগে জানলে তাঁরা তাঁকে নিশ্চয়ই একহাত দেখাতেন। কিন্তু তিনকড়ি ও ফটিকের ভর্ৎসনা খেয়ে সকলকেই তখন বাড়ী ফিরতে হয়।

নবজাগৃতির ফলশ্রুতি স্বরূপ, উনিশ শতকের বাঙলার শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্বদেশ-স্বভূমের প্রতি একটি অকৃত্রিম মমত্ববোধ জাগে, এবং ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সামগ্রিক জরা-বন্ধ্যাতার হাত থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করে একে সত্য, সুন্দর ও সৃজনশীল-প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাঁদের অনেকেই সেদিন বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এ সুযোগে ষষ্ঠীর মতো কোনো কোনো স্বার্থপর, ভণ্ড ও তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিও দেশহিতৈষীর মুখোশ পরে মঞ্চে এসে দাঁড়ান। 'বাবু' প্রহসনে প্রহসনকারের তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য প্রধানতঃ তাঁরাই।

ষষ্ঠী ইংরেজীতে ছাড়া কথা বলেন না। দায়ে পড়ে বাঙলা বলতে শুরু করলেও সাহেবি-ঢঙ বজায় রাখার চেষ্টা করেনঃ 'কি তোমার দরখাস্ত, কি নাম আছে তোমার গ্রামের।' (১অ. ১গ.) ভজহরির গ্রামে দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সে গ্রামের চাষাভুষা লোকগুলো তাঁর ইংরেজী কাগজে পড়তে পারে না বলে তিনি চমকে ওঠেনঃ 'এ্যা, ইংরেজী জানে না। তবে সে গ্রাম থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি ?' তিনি আরো বলেন, 'আর ধরতে গেলে, তারা ম'লে দেশের উপকারও বটে ... লেখাপড়া জানা সভ্যলোকের চেয়ে ··· ... মূর্খ চাষা লোকদেরই মরা কর্তব্য।' ভজহরিদের জমিদার সীতানাথ সিঙ্গি প্রজাপীড়ক না হলেও, ষষ্ঠীর মতে তাঁর মতো অত্যাচারী আর নেই। তিনি তাঁর কাগজ রাখা বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং উদ্ধার ভাণ্ডারের জন্য মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চাঁদা দিয়েছেন। ষষ্ঠী বলেন, 'I owe him a grudge ; বেশ হয়েছে, একটা প্লিট পাওয়া গিয়েছে, লেখা যাবে যে জমীদারের পীড়নে প্রজারা মারা যাচ্ছে।" ভজহরি বলেন, 'আজ্ঞে, জমীদারের ত কোন অত্যাচার নাই।' ষষ্ঠী জানানঃ 'তৈয়ারি ক'রে নেব, অত্যাচার তৈয়ারি ক'রে নেব, সে জন্য তোমাকে কোন ভাবতে হবেনা।' (ঐ)

ষষ্ঠী 'ভারত-সন্তান।' ভারতের জন্যেই তাঁর সব 'ভক্তি শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, য়্যাজিটেসন, চাঁদা—রোজগার।' তাঁর মা'কে তিনি বলেন, 'হঠাৎ আমায় পেটে ধরেছিলে, জায়গা না দেবার তোমার এক্তারই ছিলনা, এই হিসাবে তোমাকে মা বলা যায়, তা বলে দিবারাত্রি আপনার মার ভাবনা গেলে ভারত-মাতার কাজ হয় না।' বাঙালী বাপ মার প্রতি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি তাঁর মাকে আরো বলেন, 'আমার কাছে খোরাকি নিতে তোমার লজ্জা করেনা ? বাঙ্গালী বাপ-মার মনে একটু সেলফ্-রেস্পেক্ট নাই।' তাঁর মতে 'বাঙালীর ঘরের মা-গুলো—Sources of all evils সকল অনিষ্টের মূল nature-এর accident-এ পেটে ধ'রে একেবারে মাথায় চড়ে বসে।' (২অ. ১গ.)

স্ত্রী নীরদাকে নিয়েও ষষ্ঠী সমস্যায় পড়েছেন। নীরদা তাঁকে 'ওগো' বলে সম্বোধন করায় তিনি বলেন, 'ইংরেজের স্ত্রীরা তাদের হজব্যাণ্ডকে যেমন করে ডাকে—হেনরিকে হ্যারি ... ...তোমায় কতবার তা শিখিয়ে দিয়েছি, আমাকে ... ... কখনও ষণ্ঠে বল্লে, কখনও ··· ··· ডিয়ার ব্যাটা বল্লে, দেখ তুমি উন্নতি পেয়েও পাচ্ছ না।' নীরদা জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, ঘোমটা তুলে দিয়েছি ... ... জুতো-মোজাও পরি, ... তোমার ইয়ারদের সামনে বেরুই,

www.pathagar.com

আর কি করতে হবে?' ষষ্ঠী জানান, 'একেবারে পুরো স্বাধীন হ'তে হবে, যেমন আমি, তেমনি তুমি।' তিনি উদাহরণও দেখান, 'মিস্টার দাম্‌ পোদ্দারের স্ত্রী ঐ রকম লজ্জা করতে, স্বাধীন হ'তে চাইতনা, তারপর একদিন তিনি এমন জুতোর বাড়ী দিয়েছিলেন যে, স্ত্রীলোকটি সেই দিন থেকেই পুরো স্বাধীন হয়ে গেল।' (২অ. ১গ.) নারী-স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে ষষ্ঠী নীরদাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যান। মাতাল গোরাকে দেখে নীরদা ভয় পেলে ষষ্ঠী বলেন, 'ডারলিং, তুমি আমার ওয়াইফ হ'য়ে একটা সামান্য গোরা দেখে ভয় কর? তুমি জান, আমি এই হাতে ভারত উদ্ধার করবো'। কিন্তু গোরা তাঁর স্ত্রীকে আটকে রাখলে তিনি ভয়ে পালাতে থাকেন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বলেন, 'য়্যাজিটেসন করবো ... ... সমস্ত কাগজে করেসপণ্ডেন্স লিখব, শেষ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যাব, দেখি, আমার স্ত্রী আদায় হয় কিনা।' (২অ. ৩গ.)

অশনি বিজ্ঞান দিয়ে দেশোদ্ধারের জন্য ব্যস্ত। 'হিঁদুরা যেমন দশ হাত, পাঁচ মাথা ... ... এই রকম সব পুতুল গড়ে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি বলে, তা তিনি 'স্বীকার' করেনা। তবে. তাঁর মতে ব্রাহ্মরা যে নিরাকারের পূজা করেন সেটা ও ভুল। সজনীকে তিনি বলেন, 'মাইক্রসকোপের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হচ্ছে, ... শীঘ্রই এমন একটা যন্ত্র তৈয়ার হবে যে, ঈশ্বর যদি থাকেন—তাঁকে সকলেই এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে দেখতে পাবে।' (১অ. ৩গ.) ইলেকট্রিসিটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইলেকট্রিসিটির ক্ষমতাটা দিন দিন কত বাড়ছে ... ... আমি রোজ দুবেলা খানিকটা করে ইলেকট্রিসিটী খাই, ... এই ইলিকট্রিসিটীর দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব।' (ঐ) তিন কড়িকে তিনি চুল পাকা বন্ধ করার জন্য 'নেগেটিভ আংটী' ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তাছাড়া তিনি জানান, 'হালফিল ছারপোকা থেকে একটা ভাল গন্ধওয়ালা এসেন্স তৈয়ার করেছি।' (ঐ)

ব্রাহ্মদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে গিয়ে প্রহসনকার সজনী, বাঞ্ছারাম দামোদর কন্দর্প প্রমুখ চরিত্রকেও এক এক আজব প্রাণী রূপেই সৃষ্টি করেছেন।

দেশহিতৈষী হিসেবে সজনী ষষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী। দামোদরকে নাড়াজোলে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'যেমন করে হোক, আমাদের দলে শীঘ্রই যত অধিক পারা যায়, "ভ্রাতা ভগিনী" আনতে হবে, ... আমরা বাপ-মা ছেড়ে জাত খুইয়ে এত বিধবা বার করে ... ভারত উদ্ধার করতে পারব না ... ষষ্ঠী আর তার চেলারা ... নামটা কিনে নেবে, ... ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয়ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক।' (১অ. ৩গ.)

www.pathagar.com

না ড়াজোলে যেতে দামোদরের আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি তাঁর পৌত্তলিক ভাইকে বাড়ী থেকে বে-দখল দেয়ার জন্য হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছেন, তার তদ্বির করবার কেউ থাকছেন না বলেই তিনি চিন্তিত। সজনী বলেন, 'ভ্রাত, তার জন্য চিন্তা কচ্ছো কেন ? ·· পৌত্তলিক ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এ মহৎ কার্যে ··· বাইরের লোক না পাওয়া যায়, আমি স্বয়ং সাক্ষী দেবো, তারপর না হয় দুদিন বেশী করে অনুতাপ করবো।' 'হিন্দু' ও 'হিন্দুয়ানীর' প্রতি সজনীর প্রবল আক্রোশ। তাঁর 'সম্পূর্ণ' বিশ্বাস যে, হিন্দু মাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণী পীড়নকারী, তারা সকলেই নরকে যাবে।' তিন কড়িকে তিনি বলেন, 'আপনাদের মত লোক ফিরে হিন্দু-য়ানীর ভিতর ঢোকায় আমাদের মহা অনিষ্ট হচ্ছে। ··· যাদের একেবারে আমাদের কাছে আসার কথা, তারা, তারা পর্যন্ত কিনা বাপ-মার পিণ্ডি দিতে আরম্ভ করেছেন'। কিন্তু কথায় কথায় তিনি নিজেই 'রামচন্দ্র' বলে ফেলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তা তিনি শোধরে নেবারও চেষ্টা করেন :' না না "নিরাকার, নিরাকার।" (১অ. ৩গ.) 'দৌড়ন-টৌড়নে'-এ নীরদার অভ্যাস নেই শোনে সজনী বলেন, 'ভগিনী, দৌড়ুতে শিখতে হবে, প্রাণপণে দৌড়ুতে হবে— দৌড় দৌড়, কেবল দৌড়. দৌড় ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।' (২অ. ৩গ.)

বাঞ্ছারাম নিজেকে 'ভাই-বাঞ্ছারাম' বলে পরিচয় দেন। কথায় কথায় তিনি কেঁদে ওঠেন—অন্যকেও পরামর্শ দেন শুধু কাঁদার জন্য। তিন কড়িকে তিনি বলেন, 'আর হাসবেন না, ক্রন্দন করুন, উচ্চরবে ক্রন্দন করুন ...আহা ! কতদিনে এই পৃথিবী ক্রন্দনপূর্ণ আনন্দধাম হবে ?' কথাপ্রসঙ্গে তিন কড়ি তাঁকে পিতার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমাদের সম্প্রদায় নূতন, সকলেই "ভ্রাতা" আছেন, · ভ্রাতা-ভাগিনী মিলিত হয়েছেন, বিশেষ উন্নতিশীলগণ শীঘ্রই "পিতা" হবেন বোধ হয়। (১অ. ৩গ.) বীরভূমের দুর্ভিক্ষ দমনের কাজ করতে তিনি 'একটি বিধবাকে উদ্ধার' করেছেন সজনী ব্যাপারটি স্পষ্ট করে জানতে চাইলে, তিনি বলেন, ভগ্নীর নাম ক্ষমা সুন্দরী পালধি, ··· আমার সঙ্গে পবিত্র পলায়ন করে আসেন, ... এক্ষণে ভগ্নী আমার ভার্য্যা।' (ঐ) কিন্তু 'ভার্য্যা'র সঙ্গে বাঞ্ছারামের কলহ প্রায় লেগেই থাকে—আর 'ভগ্নী' বলেই তিনি সব সহ্য করে যান, 'হিন্দুর স্ত্রী হলে ... জাট-পেটা' করে ছাড়তেন। ক্ষমা সুন্দরীও বার পাত্রী নন। তিনি বলেন, 'তবে রে ছোটলোক কলু, বামুনের মেয়ের হাত তুলতে চাও ? তোর সঙ্গে একত্তরে ঘর করছি তোর বাবার ভাগ্যি, তোর চৌদ্দ পুরুষ আমার পাদকজ্জল পেলে উদ্ধার হয়ে যায়।' (ঐ)

বাঞ্ছারাম 'শান্তি' ও 'প্রেমের' আদর্শ। গোরা কর্তৃক নীরদা আক্রান্ত হলে

www.pathagar.com

তিনি দূর থেকে বলেন, 'ওরে আয় মহাপাতকী ইংরেজ। আমি, তোকে প্রেম দিব, ... ওরে সরে আয়, অজস্র প্রেম নিয়ে যা।' (২অ. ৩গ.)

দামোদর 'আঁস্তাকুড়ে পাইতে ফেলে' দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজী হয়েছেন। কিন্তু একমাত্র পৌত্তলিক ভাইয়ের জন্যই তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'ভগিনী' করতে পারেন নি। সজনীকে তিনি বলেন, 'ঐ পাপাত্মা ভাইয়ের জোরেই সে হিন্দু হয়ে বাড়ীতে বসে রইলো. যে ভাই হয়ে আমার স্ত্রীকে আমার ভগিনী হতে দিলে না, তার আর মুখ দর্শন করতে আছে ?' (১অ. ৩গ.)

'বাঙ্গাল' কন্দর্প বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি তাঁর মাতামহী 'আজি মা'কে বলেন, 'আজিমা' আমার মাথার কিরা, উন্নতি সমাজে আমার মান রইক্ষা কর, তুমি বিবাহ করতে স্বীকার অও।' (১অ. ৪গ.) কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। সজনীকে তিনি বলেন, 'আজি মায়ের এত বুঝাইলাম, বিবাহের সমস্ত যোগাড় করলাম, আর অল্পপায়ে বুরী কিনা রাত্র শ্যাষে আমার বার্য্যা সুবদ্রা বগিনীরে লইয়া দ্যাশে পলাইছে।' (২অ. ৩গ.) 'মাইয়া-মানুষ দ্যাগবা মাত্রই মনে কুভাব অয়' বলে কন্দর্প সব সময়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় পথ চলেন। এরূপ বিশেষ সময়ে তাঁকে হাতে ধরে সাহায্য করেন ভৃত্য নদের চাঁদ। চোখ বাঁধা কন্দর্পকে নিয়ে পথে যেতে যেতে নদের চাঁদ আওয়াজ করতে থাকেনঃ 'হুস্যার, হুস্যার, গাছের ওপর পা দিবেন না, ওহানে লাল মুখ্য কাষ্টপিল খারাইয়া আছে, য়্যাহানি আইয়ে রোলের গুত্তা লাগাইব।' (ঐ)

প্রহসনের 'নান্দী' ও কয়েকটি 'গীত' এও ব্রাহ্ম সমাজীদের আচার-ব্যবহার, বিধবা বিবাহ ও নারী-স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। যথা—

'পতি ম'লে হাতের বালা খুলব না লো খুলব না। ...
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোসরা পতি, ...
কেন চল্‌ব নালো চলব না।।' (১অ.২গ.)

অথবা—

'ছুঁড়ী বুড়ী বঙ্গে আর রাঁড়ী নাহি রবে রে।
উড়াব উন্নতি-ধ্বজা কত মজা পাব রে।' (১অ. ৪গ.)

তথাকথিত সংস্কারক ও দেশহিতৈষীর প্রতি প্রহসনকারের চূড়ান্ত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তিন কড়ি মামার কথায়ঃ 'বুঝতে পাচ্ছ কি, সাম্য, স্বাধীনতা ... এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পেঁছায়নি, ... আত্মোন্নতি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি... ... এসবের ছায়াও তোমাদের প্রাণে নাই;—কেবল হুজুগ, কেবল সস্তায় নাম বাজান; কেবল নীচ, সঙ্কীর্ণ, আত্মস্বার্থ সিদ্ধির নামান্তর মাত্র।' (২অ. ৩গ.)

www.pathagar.com

বার

অমৃতলালের বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'একাকার' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। এ প্রহসনে 'হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ সম্পর্কিত অমৃতলালের নিতান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়'।[৪২]

উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাঙলায় জাতিভেদ-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জাতিভেদের গোড়া সমর্থক। 'একাকার' প্রহসনটি তাঁকে উপহার প্রদান করতে গিয়ে অমৃতলাল একটি পত্রে লিখেন, 'দেবদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, কিন্তু অতি পাপীরও দেবপূজায় অধিকার আছে। ··· ··· 'দাসী' নামক একটি পত্রিকা খুলিয়াই দেখিলাম যে আপনার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাগলপুরে পূজনীয় রামতনু বাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাশয়ের তর্ক। যে ঘেঁটু পুষ্পের কথা বলিয়াছি তাহা সেবক-প্রণীত একখানি কৌতুক-নাট্য, নাম 'একাকার'-উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।'[৪৩]

প্রকাশনার বছরের ২৫শে ডিসেম্বর 'একাকার' স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। চাকরী সম্বল বাঙালীর করুণ অবস্থা লক্ষ্য, করে 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকা মন্তব্য করেন, 'চির পদানত চাকুরে বাঙ্গালী প্রত্যহ আপীষে বসিয়া হয়তো এরূপ অভিনয় দেখিতেছেন। গ্রন্থকার কি সেই অসাড় প্রাণে চৈতন্য জম্মাইতে পারিবেন ? তবে আমাদের সমাজ কলঙ্ক অকীর্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকা আবশ্যক।'[৪৪]

'একাকার'-এও ধারাবাহিক কোনো কাহিনী নেই বললেই চলে। বিভিন্ন দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন প্রায় ঘটনাগুলো একত্রিত করলে এই দাঁড়ায়—

গন্ধর্বলোকে গন্ধর্বরাজ, রাণী ও অপ্সরীরা উপস্থিত। মর্তের বাঘ-বানর প্রভৃতি প্রাণী সেখানে গিয়ে নিজ নিজ স্বভাব পরিবর্তন করে অন্যান্য প্রাণী, এমনকি মানুষের মতো হতেও আবেদন জানায়। গন্ধর্বরাজ প্রাণীদেরকে নিজ নিজ স্বভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দিয়ে, মর্তের কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করার জন্য রাণীকে নিয়ে সভাস্থান ত্যাগ করেন।

বাঙলাদেশে জাতিভেদ ভেঙে গিয়ে সব কিছু একাকার হতে চলেছে। 'ছোট জাতের' লোকেরা এখন ইংরেজী পড়ে, এবং ইংরেজ সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করে, অফিসের বড়ো সাহেব সেজে বসেছেন। সমাজে তাঁদেরই কৌলীন্য—বামুন

www.pathagar.com

কায়েতরা জীবিকার জন্য তাঁদের মুখাপেক্ষী। কলুবংশের 'মধ্যে' নাম মাত্র ইংরেজী বিদ্যা সম্বল করেও, সাহেবের সুনজরে পড়েছেন। তিনি এখন অফিসের বড়ো বাবু—মধু বাবু। প্রেমচাঁদ চক্রবর্তী, বেচারাম ঘোষ ও উমাচরণ মিত্র প্রমুখকে চাকরী রাখার গরজে প্রতিদিনই তাঁকে খোশামোদ করতে হয়। মধুর স্ত্রী, কলু-বৌকে খোশামোদ করতে হয়, ব্রাহ্মণী বিশুর মা'র। কলু বৌয়ের মনে তবু শান্তি নেই। এতো অর্থ বিত্ত থাকা সত্ত্বেও কাঁরা নাকি তাঁদেরকে 'ছোট লোক' বলে উপহাস করেন। কলু বৌ তার স্বামীকে পৈতে কিনে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য চাপ দেন।

কানফুঁড়ী মিস্ত্রীর মস্ত বড়ো জুতোর কারখানা। গদাধর দত্ত ঠিক সময়ে কারখানায় আসেননি বলে, মিস্ত্রী তাঁকে ছাঁটাই করবেন জানান। সুযোগ বুঝে অনেকেই সে পদে চাকরী করার জন্য ভীড় করেন। একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণও তাঁর এল. এ. পড়া ছেলেকে সে পদে নেয়ার জন্য মিস্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

ধোপা বংশের রাজকৃষ্ণ মুন্সেফ হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, রাখালের মাকে সঙ্গে করে গঙ্গার ধারে হাওয়া খান—কলু বৌকে তিনি উপহাস করেন 'ছোট লোক' বলে। নিমতলার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে বামুন গিন্নিও আক্ষেপ করেন। তাঁর বাপের বাড়ীতে এককালে যে নাপতিনী কাজ করতেন, তাঁর ছেলেই 'এখন কোথাকার জজ।' বামুন গিন্নি নিজের ছেলের চাকরীর জন্য সে জজের কাছে গিয়েই অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

অপর দিকে বেকার সমস্যার অন্ত নেই। যাদবচন্দ্র পাল কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে এম. এ পাস করেও চাকরী খুঁজে পান না। কর্মকারের ছেলে রাধানাথও ইংরেজী পড়েছেন। কিন্তু সরকারী চাকরী না করে তিনি জাত-ব্যবসার পথই বেছে নিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, 'আমাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাত ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া।'

সাহেবদের আশীর্বাদপুষ্ট মধুবাবু একদিন হাকিম হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সেদিন তাঁর শ্বশুর নীলমণি, তেলে ভেজাল দেয়ার এক মামলার আসামী হিসেবে পুলিশ কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ছিলেন। হাকিমের আসনে জামাইকে দেখতে পেয়েই তিনি উৎফুল্লিত হয়ে ওঠেন। আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ বলেও ফেলেন : 'বাবাজী আমার হাকিম হয়েছে ?' মধুর আসল পরিচয় ব্যক্ত হয়ে পড়ে। কলু হাকিমের সঙ্গে বসে মামলা করতে তখন অন্যান্য হাকিম ও আমলারা আপত্তি জানিয়ে কোর্ট ছেড়ে চলে যান। শ্বশুরের প্রতি মধুর আক্রোশ তখন আর দেখে কে। শ্বশুরও নাছোরবান্দা : 'তো ব্যাটার

www.pathagar.com

মন ছোট, না হইলে কলু ছোট কিসের ব্যাটা ?' মধুও তখন 'বেহ্ম জ্ঞানী' হয়ে শ্বশুর 'জেতের খোটা' দেখিয়ে দেবেন বলে জানান।

দীর্ঘ দিনের ইংরেজ-শাসন, ইংরেজী-শিক্ষা ও নতুন আর্থনীতিক পরিস্থিতি সেকালের বাঙলার বর্ণাশ্রমী বাঙালী হিন্দুর জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিলো। তখন একদিকে নব্যপন্থীদের অনেকেই যেমন জাতিভেদ তুলে দেয়ার জন্য আন্দোলন করছিলেন, অপরদিকে প্রাচীনপন্থীদের অনেকেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জাতিভেদে সংরক্ষণের জন্য। একদিকে তদানীন্তন ভারত সরকার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারী ইংরেজ সাহেবরাও, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষিত ব্যক্তির মর্যাদা দিতেন, অপরদিকে নব্য পন্থীদের অনেকেই আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়েই ইংরেজের খয়েরখা হয়ে নিজেদের ভাগ্য পবিবর্তনের চেষ্টা চালাতেন। রক্ষণশীল কুলীন হিন্দুরা অনেক ক্ষেত্রে এ দুটো ব্যাপারেই ব্যথিত হন। অমৃতলাল 'একাকার'-এ মূলতঃ তাঁদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে এ সঙ্গে জাতিভেদ-বিরোধী নব্য পন্থীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তখনকার বাঙলার অর্থনীতিক সংকটের চিত্তও প্রহসনটিতে ফুটে ওঠেছে।

মধু জাতে কলু হয়েও অফিসের বড়ো বাবু। তোষামোদের গুণে তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত হয়েছেন। উমাচরণ মিত্র তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধ করার জন্য বড়ো সাহেবের নিকট ছুটি চাইলে, সাহেব নাকি মধুকে বলেছিলেন, 'ওর মার শ্রাদ্ধ কি এর পরে কল্লে হয় না।' মধু নাকি জানিয়েছিলেন, 'পুজোর ছুটীর সময় সারলেও সারতে পারে।' মিত্র বিস্মিত হন: 'আদৌ শ্রাদ্ধ স্থগিত থাকতে পারে ?' মধু বলেন, 'আমিত ভাই তোমাদের মতন ইয়ং বেঙ্গল নই যে, সাহেবের সঙ্গে ...... কথা কাটাকাটি করবো, ... আমরা সাহেবকে দেবতা বলে জানি।' (১অ. ১গ.)

অধস্তন কর্মচারীরা বামুন-কায়েত বলেই বুঝি মধুকর্তৃক বার বার নিঃগৃহীত হোন। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানকে নির্মম ভাবে উপহাস করে যেনো তিনি জাতিভেদেরই প্রতিশোধ নিতে চান। বড়ো সাহেবের পরামর্শেই তিনি নাকি বেচারামকে চাকরী থেকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ভৃত্য সোনা বলেন, 'তোমার উপর বাবু কবে থেকে চটেছে জান, বুঝেছ ঘোষজা মশাই বাবু, মার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে যে পুকুর পিতিষ্ঠে হয়েছিল, তার দরুন এখানে খাওয়া-দাওয়া হলনা ? সেদিন তুমি কেন এলেন বাবু ?' (ঐ) স্ত্রী কর্তৃক মার খাওয়ার কথা অন্য কেউ শোনলেও মধুর তেমন চিন্তা নেই--তাঁর বড়ো ভাবনা—'ঐ চক্করবত্তী-টক্কোরবত্তী ক'জন ছিল, ওরা শুনে গেল।' (ঐ) পীতাম্বর মুখুজ্যেকে মধু বলেন, 'পরের চাকরী কত্তে গেলে

এত বামনাই পোষায় না, পুজো আহ্নিক ফাহ্নিক গুলো রবিবারের কল্লেই হয়।' (২অ. ৩গ.)

জাতিভেদের বিরুদ্ধে মধুর স্ত্রীর বিদ্রোহ অন্য ধরনের। তাঁর স্বামীর ন্যায় কুলীন হিন্দুদের শুধু পরোক্ষ উপহাস করেই তিনি সন্তুষ্ট নন। মধুকে তিনি যেকোনো উপায়ে পৈতে সংগ্রহ করে, সরাসরি কোলীন্য অর্জনে জন্য চাপ দেন। তিনি বলেন, 'বামুনের কি চারটে হাত আছে ? গলায় গাছ দুচ্চার সুত দিয়ে তো বামুন ; ... ... ভট্টাচার্য্যি মটচার্য্যি দিয়ে একটা শাস্তর বের কর, পৈতে নাও।' তাঁর দৃঢ় সংকল্প : 'তেরাত্তিরের মধ্যে যদি পৈতা না নিতে পার, তাহলে আমি তোমার ঘর সংসার চুলোয় দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব।' সোনাও পরামর্শ দেন : 'বাবু, তুমি পৈতে লাও, কলু অমন্দ জাত লয়, তবু বামুন হলে আরও মজা হবে।' (১অ. ১গ.)

'ছোট জাতের' লোকদের ইংরেজী পড়ে 'সাহেব' হওয়ার ব্যাপারটা ছিলো কুলীন হিন্দুদের নিকট অসহ্য। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, একমাত্র ইংরেজী পড়েই তাঁরা বড়ে হয়ে ওঠছেন—আর সেজন্যই, জাতিভেদ ওঠে গিয়ে সমাজের মধ্যে সব 'একাকার' হয়ে যাচ্ছে। 'ছোট লোকের' ইংরেজী শেখার আগ্রহের প্রতি কুলীন হিন্দুদের কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে নন্দুচামার, রাধানাথ প্রমুখের উক্তির মধ্য দিয়ে গদাধরকে লক্ষ্য করে নন্দু বলেন, 'হামাকে কিছু ইংরাজী পড়াবে ? ... ... দুটো ইংরেজী পড়লে ইয়েস নো বুলি বোলে ভদ্দর হোয়ে যাবে, আর কেউ চামার বোলবেনা।' (১অ. ২গ.) জাতিভেদ সংরক্ষণের সমর্থক, কুলীন হিন্দুদের মুখপাত্র রাধানাথ 'ছোট জাতের' লোকদের ইংরেজী পড়ে সাহেব হওয়াকে, কাকের ময়ূর পুচ্ছ ধারণের মতো একটি ব্যাপার বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, 'কাক কাকের মধ্যেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূর পুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রী দাঁড় কাকচন্দ্র রায় তাঁকে একটু ঠোকরাব। কেন তিনি দুটো রংচঙে পাখার লালচ করেন ?' (১অ. ৩গ,) 'বংশগত জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'বংশগত জাতিভেদের বন্দোবস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমি এই জাতিভেদই সাম্য।' (ঐ)

ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে 'ছোট জাতের' লোকেরা বড়ো হয়ে ওঠলেও, কুলীন হিন্দুদের নিকট তাঁর 'ছুতোর ডাক্তার', 'ধোপা উকীল' বা 'নাপিত এডিটর' প্রভৃতি বলেই নিন্দিত ও উপেক্ষিত হোতেন। বামুন গিন্নি একান্ত অনোন্যপায় হয়েই, তাঁর ছেলের চাকরীর একটি ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য, কোনো এক জজের নিকট গিয়েছেন। কিন্তু জজসাহেব নাকি, বামুন গিন্নির 'বাপের বাড়ীতে ছেলেবেলা যে নাপতানী কাজ করতো', তাঁরই ছেলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেও ছেলের চাকরীর জন্য যেতে হয়েছে বলে বামুন গিন্নির আক্ষেপের অন্ত নেই : 'পেটের জন্য কি আর জাত-জন্ম রইল।,' (২অ. ১গ.)

www.pathagar.com

ধোপাবংশের রাজকৃষ্ণ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী, কলু বৌকে দেখে, রাখালের মা'কে বলেন, 'ওর ভাতার কোথায় কি একটা আপিসে কেরানীগিরী করে না কি করে।' রাখালের মা বলেন, 'তা মা, কলুর ঘরে আর কত হবে, এ কি মা তোমাদের রজকের ঘর যে, হাকিম হবে?' (২অ. ১গ.) গোলা ঝাড়ুনীদের একটি গানেও 'ছোট লোকদের' ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের প্রতি কুলীন হিন্দুদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ঃ

'(আমরা) ভাসিয়ে দেব কুলো।
ইঞ্জিরিতে হয়েছে হনুর আমাদের ভুলো।।
ভুলোর তিন তিনটে পাশ,
দেশে তুলে দেব চাষ,
কোন্ শালী আর বুন্‌তে দেবে
ধান সরষে তিসি তামাক তুলো।' (১অ. ৪গ.)

প্রহসনটিতে সেকালের বাঙলার বেকার সমস্যা ও চাকরী-সম্বল বাঙালীর করুণ অবস্থারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বিলম্বে অফিসে আসার অজুহাতে কানফুঁড়ী গদাধরকে তাঁর চাকরী থেকে বাদ দেবার কথা জানালে, জনৈক বেকার কেরানী সে পদে চাকরী করার জন্য মিস্ত্রীকে খোশামোদ করতে থাকেন। গদাধর বিল লেখার কাজ করতেন। বেকার কেরানীটি নিজে জুতো পর্যন্ত সেলাই করতে পারবেন বলে জানালে, গদাধর তাঁকে 'ব্রাহ্মণ' বলে প্রণাম জানান। কেরানী বলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ নই।' গদাধর বলেন, 'আপনার কথায় ধরা পড়েছেন।' কেরানী জিজ্ঞেস করেন, 'কি রকম?' গদাধর জানান, 'মশায় আমি দত্ত, কায়েতের ছেলে হয়ে জুতোর বিল লেখা চাকরী পর্যন্ত স্বীকার করেছি, আর মশায় যখন শেলাই পর্য্যন্ত ওঠেছেন, তখন ফুলের মুখটি না হয়ে যান কোথায়?' (১অ. ২গ) একজন ব্রাহ্মণও তাঁর এল. এ. পড়া ছেলেকে সে পদে নিয়োগ করার জন্য মিস্ত্রীকে অনুরোধ জানান। অন্যান্য চাকরী-প্রার্থীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, অন্যত্র তোমরা চাকরীর চেষ্টা কর, এটি আমার পুত্রের জন্য ছেড়ে দাও।' এমন সময় কয়েকজন উমেদার'ও সেখানে এসে ভীড় করেন। তাঁদের মধ্যে একজন 'চাকরী আছে? চাকরী আছে?'—বলে দস্তুর মতো চেঁচাতে থাকেন। অন্য একজন চাকরী হলে 'অ্যাপ্রেন্‌টিস' হিসেবে বাড়ী থেকে টেবিল-চেয়ার নিয়ে আসতে পারবেন বলেও মিস্ত্রীকে জানান। (ঐ) মিঃ জে. সি. পাল বিজ্ঞানে এম. এ. পাস করেও চাকরী খুঁজে পাচ্ছেন না। অবশেষে একদিন তিনি কানাই সেন বাবুর সুপারিশ পত্র সহ মধুর অফিসের বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখতে পান,

www.pathagar.com

দরজার গায়ে লেখা রয়েছে ঃ 'No Vacancy Application not received.' (২অ.৩গ.) উচ্চ শিক্ষিত রাধানাথও চাকরীর জন্য কম চেষ্টা করেন নি। যাদবকে তিনি জানান, 'ভদ্রলোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কত্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাসীর খিচুনি খেয়ে এসেছি'। (১অ. ৩গ)

পুলিশ-কোর্টের বিচার-প্রহসনে সেকালের কোনো কোনো-অনুপযুক্ত হাকিম ও ইন্টারপ্রিটার প্রমুখের মুখোশ খুলে পড়েছে। আসামীদের স্পষ্ট-বাদিতায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভণ্ডামী, নৈতিক অধোগতি ও তখনকার কোলকাতার পৌরসভার দুরবস্থার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুলসী ঘোষ ইন্সপেকটর বাবুর শ্বশুরদেরকে টাকায় দশ সের করে খাঁটি দুধ দিতে পারেননি বলে, দুধে ভেজাল দেয়ার অভিযোগে ইনসপেকটর কর্তৃক ধৃত হয়েছেন। মদ্যপ-আসামী গোকুল রায় বলেন, 'সবাই এদিক্ ছেড়ে দিয়ে গাঁজা ধরেছে, দলের মধ্যে আমি হুজুর এখনও কোম্পানীর মান রেখেছি, ··· গাঁজার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা দেওয়া যায়; ··· আমায় একটা খেতাব দেওয়া উচিত।' অন্য একজন আসামী, উমাচরণ, হাকিমদের সম্মুখে হাজির হয়ে বলেন, 'মিউনিসিপালিটী মশাইরা ··· আমার বাড়ীর সামনে ... একটি পাঁজা খোয়া ঢেলে রেখেছেন, ... এক চাকায় গাড়ীখানি তো ছেলেদের পড়বার জানালার নীচে বরাবর থাকে, এর উপায় কি ?' (২অ. ৫গ.)

তখন সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনমনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিলো। কিন্তু একদল লোক ইংরেজ-শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীর বেকার-সমস্যা প্রসঙ্গে যাদব বলেন, 'আমাদের দেশ আমরা বসে থাকবো, কর্ম্ম পাবনা, খেতে পাবনা, আর কোথা থেকে ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে বসে এখানকার মোটা মোটা চাকরী গুলি দখল করে আমাদের দেশের টাকা গুলি ঘরে নে যাবেন।' রাধানাথ যুক্তি দেন, 'ইংরেজের চাকরী' ইংরেজ কচ্ছে, এটা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা ? ··· ওরা যদি ... ওদের জাত ভাইকে বঞ্চিত করে, তাহলে কি ধর্ম্মে সবে ?' (১অ ৩গ.) যাদব সরকার কর্তৃক টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কথা তোললে, রাধানাথ বলেন, 'দিন কতক বাদে দেখছি, গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত পর্য্যন্ত পাঠাবার জন্য দরখাস্ত করা হবে'। (ঐ) রাধানাথের মতো ব্যক্তিদের কটাক্ষ সেদিনের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতিও কম ছিলোনা। উমাচরণ বলেন, 'স্বাধীন বাবুদের কংগ্রেস আর চাকরে বেচারীদের ডিশগ্রেশ একই লগ্নে শুরু হয়েছে।' (২অ. ৩গ.)

www.pathagar.com

তের

অমৃতলালের "বৌমা" প্রহসন প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে। একেও প্রহসনকার 'সামাজিক নক্সা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকাশনার বছরের ১৩ই পৌষ তারিখে প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 'স্টেট্‌সম্যান' লিখেন, 'It is certain to be a success, and it is a pity that the house cannot accommodate a much larger audience.'।[৪৫] অন্য একটি পত্রিকা লিখেন, 'The wife was for the first time put on the stage before an exceptionally crowded audience।'[৪৬]

'বৌমা' প্রহসনে প্রহসনকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য বাতিকগ্রস্ত নব্য যুবক-যুবতী, ভণ্ড সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ, স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি প্রভৃতি। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'ইহাতে শিক্ষাদীক্ষা ও তিতিক্ষার অনেক জিনিস আছে। ইহা নব্যবঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, সাহেব পুচ্ছধারী বিকৃত মস্তিষ্ক বাঙ্গালী নরনারীর মানসিক তত্ত্ব, আর ভণ্ড সমাজ-সংস্কারক' 'অবলা বান্ধব রূপী' একটি অদ্ভুত জীবের নিখুঁত ফটো।'[৪৭]

এ প্রহসনটিতেও ধারাবাহিক কোনো কাহিনী নেই বললেই চলে।

বাবুরাম নব্য যুবক। তিনি নিজেকে 'ভারত সন্তান' বলে জাহির করেন। ভারতের বিবিধ দুঃখ দুর্দশা দূর করাই তাঁর একমাত্র কাম্য। ইংরেজ সরকারের চাকরী করাকে তিনি গোলামির নামান্তর বলেই মনে করেন। সেজন্যই মায়ের কাছ থেকে কয়েকবার করে টাকা নিয়ে তিনি একটি কাগজ বের করেছেন। নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে স্বদেশের সেবা করার জন্য এ এক মোক্ষম অবলম্বন। প্রতিবেশী মতিলাল বাবুরামকে 'আপনার ঘরের মঙ্গল চেষ্টা' করার জন্য পরামর্শ দেন। বাবুরাম বলেন, 'পাব্লিক ম্যান হবার আমার বরাবর সখ, যদি একটা নামই না রেখে গেলেম, তবে পৃথিবীতে এলেম কেন ?'

বাবুরামের স্ত্রী কিশোরীও বিশেষ এক ধরনের শিক্ষিতা মহিলা। তিনি শুধু রাতদিন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়েন, এবং নিজে সব দিক থেকে উপন্যাসের নায়িকাদের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। স্বামী তাঁর কথায় ওঠেন-বসেন এবং শাশুড়ীও তাঁর কাছে একান্তই অসহায়।

ব্রাহ্ম সমাজী বামাদাস এবং তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বার কাছ থেকেও বাবুরাম ও কিশোরী বিভিন্ন ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। বামাদাস স্ত্রী সর্বস্ব পুরুষ, আর হিড়িম্বা 'পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা।' বিবাহের পূর্বে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো কাকা-ভাইঝি। হিড়িম্বা এখনো সে সম্পর্ক ভুলতে

www.pathagar.com

পারেন নি—তাই মাঝে-মধ্যে স্বামীকে বামা কাকা বলেই সম্বোধন করেন। বামাদাসের আত্মীয় যুবক সুচারুর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক। সুচারু তাঁকে 'বামা কাকী' বলে ডাকেন এবং বামাদাস ও হিড়িম্বার অতীত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে হাসাহাসি করেন।

বাবুরামের বাড়ীতে বামাদাস, কিশোরী, হিড়িম্বা ও তাঁদের সহচরীরা কানামাছি খেলছেন। এমন সময় বাবুরামের মা এসে খবর দেন যে, নকল ঔষধ বের করার দায়ে পুলিশ বাবুরামকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। 'অ্যাঁ প্রাণনাথ বন্দী' বলে কিশোরী অজ্ঞান হয়ে পড়ার অভিনয় করলে সকলে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যান। একটু পরে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ'—গান করতে করতে কিশোরী তাঁর সহচরীদের নিয়ে পুলিশের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। এরূপ লজ্জাহীনতার জন্য মতিলাল তাঁদের ভর্ৎসনা করেন। সহচরীদের এক জন কান্না, জবাব দেন, 'যখন একজন প্রাণনাথ বন্দী, তখন আমাদের লজ্জা কি ?'

পুলিশ বাবুরামকে থানায় নিয়ে চললে, কিশোরীও সঙ্গে যাবেন জানান। মতিলাল সেজন্য সকলকেই তিরস্কার করতে থাকলে মেয়েরা জিভ কেটে বাড়ীর ভেতর চলে যান। বাবুরামের মনে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জাগে।

বাবুরাম সেকালের ভণ্ড দেশপ্রেমিক ও একধরনের বাতিকগ্রস্ত নব্য যুবকের প্রতিনিধি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কোথাও একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর, কোথাও এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী, কোথাও ডেপুটি ট্রেজারার, কোথায়ও ভাইস প্রেসিডেন্ট।' (১অ. ১গ) তাঁর কাজেরও অন্ত নেই; 'হিন্দুদের বিষম কন্যা-দায়, বর-কর্তাদের ভয়ানক অত্যাচার, এর জন্য আমি কামস্কাটকার প্রাইম মিনিষ্টার ... টর্কীর সুলতান, এদের সকলকেই চিঠি লিখেছি।' (ঐ) তিনি আরো বলেন, 'ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, বিধবার ক্লেশ, বম্বের প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটি --উঃ ··· আমায় কত দেখতে হচ্ছে।' (ঐ) মতি মামাকে তিনি এও জানান, 'তুমি জান, আমাদের সেই আলুলায়িত কেশা, বিগলিত বেশা, কটাক্ষ-লোচনা, অবলা সরলা কুলী-রমণীদের প্রতি কি ভয়ংকর অত্যাচার হয় ?' (ঐ)

কাগজ বের করার নামে বাবুরাম তাঁর মা অন্নপূর্ণার কাছ থেকে কয়েক বার টাকা নিয়েছেন। অন্নপূর্ণা তাঁকে একটি চাকরী-বাকরী করার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, 'তুমি আমায় চাকরী করতে বল, ইংরাজের চাকরী, ছি ছি ছি।' (ঐ) তিনি গর্ব করেন, 'জান আমি ভারত-সন্তান।' অন্নপূর্ণা বিস্মিত হন। বাবুরাম বুঝিয়ে দেন : 'ভারত সন্তান কাকে বলে বুঝতে পাল্লে না ? তোমার বৌকে জিজ্ঞাসা কর, তার কাছে বসে এই সব একটু শিখে নিও।' ঐ) অন্নপূর্ণা বাবুরামের 'পাঠশালে' যাবার কথা শোনেও বিস্মিত হন। বাবুরাম এসম্বন্ধেও

www.pathagar.com

বুঝিয়ে বলেন, 'পোলিটীক্যাল পাঠশালা। ...... রাজনীতিতে আমরা শিশু কিনা, তাই পোলিটীকাল ট্রেনিং দিবার জন্য একটা পাঠশালা হয়েছে।' কাগজ বের করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতিলালকে তিনি বলেন, 'নিজের হাতে কাগজ, বিজ্ঞাপনের খুব সুবিধা, ... ঝড়া ঝুঝড় পেটেন্ট মেডিসিন সব চালিয়ে দিব।' (ঐ) কিন্তু বাবুরামের নসীব মন্দ। বন্দী অবস্থায় তাঁকে লক্ষ্য করে মাধবচন্দ্র বলেন, 'এমন কাজটি আপনি করলেন? খবরের কাগজ লিখছিলেন—মস্ত পদ, এখন দেখছি, কাগজ-টাগজ আপনার সব মিছে, কেবল এই জুচ্চুরি ঔষধের বিজ্ঞাপন দিবার একটি ফন্।' (২অ. ৪গ.) মতিলালও তাঁকে জাল ঔষধ বের করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। বাবুরাম বলেন, 'ঠিক তো আমি সেই নাম রাখিনি, লালমোহন সার "সর্ব্বজ্বর-গজ-সিংহ", আমি করেছি, "সর্ব্বজ্বর হরগজ-সিংহ।" (ঐ)

'শিক্ষিতা' কিশোরী বাবুরামের উপযুক্ত স্ত্রী। তিনি তাঁর নতুন নাম রেখেছেন, 'উলাঙ্গিনী'। বাবুরামকে এ নামের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'উলাঙ্গিনী মানে হচ্ছে, উল—ছিল—অঙ্গিনী উলাঙ্গিনী। উল কিনা পশম, যা আমরা বুনি, সেই পশমের মত অঙ্গ যার—অর্থাৎ নরম।' (১অ. ৫গ.) বেলা ন'টার পরেও ঘুম ভাঙছে না দেখে শাশুড়ী তাঁকে ডাকলে তিনি বলে ওঠেন, 'মরি মরি, আমি কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলেম, কর্কশকণ্ঠে আহ্বান ক'রে কেন আপনি তা ভঙ্গ কল্লেন?' (১অ. ৫গ.) কথায় কথায় তিনি জানান, 'তুমি যদি মা লেখাপড়া জান্তে তাহলে বুঝতে যে, পতির হাত ধরে বনে বনে বেড়ান কত সুখ—কত প্রেম।' অন্নপূর্ণা তাঁকে একটু আধটু রান্না ঘরে যেতে বললে, তিনি যেন রেগেই ওঠেন: 'আলমারি খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে, তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কে হেঁসেলে গিয়েছিল?' (ঐ) মেয়েদের সন্তান হওয়া প্রসঙ্গে মতিলালকে তিনি বলেন, 'আপনি কি জানেন না যে, সন্তান হওয়া কত বড় কুরুচি, কি ভয়ংকর অশ্লীল।' বাবুরামের বন্দী হওয়ার খবর শোনে কিশোরী তাঁর সহচরীদের নিয়ে উপন্যাসের নায়িকার মতোই উন্মাদ-বেশ ধারণ করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর, মতিলাল প্রমুখের সম্মুখে হাজির হয়ে কায়া বলেন, 'শত্রু সৈন্য আসবে, আমরা চুল টুল এলো করে ঠিক হয়ে আছি, কঙ্কন ছুড়ে মারবো, যুদ্ধ করবো, বীর রস হবে, তার পর 'জ্বল জ্বল্ চিতা' গেয়ে আগুনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। (২অ ৩দৃ.) কিশোরী বলেন, 'এদিকে আমি কতলু খাঁর সভায় নেচেটেচে তার পর গোপনে কারাগারে যাব ... জগৎসমীপে বল্‌বো—স্বামিন, প্রাণেশ্বর আর কেউ না—বাবুরাম—।' (২অ. ৪ গ.)

ব্রাহ্ম সমাজীদের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রহসনকার বামাদাস ও হিড়িম্বাকেও এক অদ্ভুত প্রাণী রূপেই সৃষ্টি করেছেন। সখিদের নিকট

www.pathagar.com

হিড়িম্বা তাঁর স্বামী বামাদাসের পরিচয় দেন এভাবে ঃ 'তিনি পুরুষ বটে, ভদ্রলোকের সভায় বীর বলে পরিচয়ও আছে, কিন্তু অবলাদের সামনে এলে তিনি অতি কোমল হয়ে পড়েন; তাকে পুরুষ বলে কিছুতেই চেনা যায় না।' (২অ. ৩গ.) হিড়িম্বার নিকট নিজের সম্বন্ধে বামাদাস বলেন, 'প্রেয়সি আমি যখন হিন্দু ছিলেম, দেশে আমায় লোকে ধড়ীবাজ-বামা বল্‌তো।' (১অ. ৩গ.) 'অবলাদের' কাছে গেলে তাঁর মানসিক অবস্থায় পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আমি সম্প্রদায়ের ভিতর কান্না অনুতাপ তুলে দিয়ে বীরভাব প্রবেশ করিয়েছি বটে, অসভ্য পৌত্তলিকদের সঙ্গে আমি সদা সর্ব্বদা ঘুষাঘুষী করিতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু অবলাদের কাছে আমার কোন পৌরুষ নাই।' (১অ. ৩গ.) হিড়িম্বা-কিশোরীদের সঙ্গে চোখ বেঁধে কানামাছি খেলার সময় ঝি'র চড় খেয়ে তিনি বলেন, 'চাপড়ে জ্বলেও যাচ্ছে, মিষ্টিও লাগছে, ভগ্নীগণ মারুন ঠকাঠক্ ঠোক্-কর, চটাচট চাপড় মারুন।' কিন্তু এমন সময় পুলিশ বন্দী বাবুরামকে নিয়ে এসেই বামাদাসের আমোদে বিঘ্ন ঘটান। হিড়িম্বা কিশোরীর দলকে চুপে চুপে কথা বলতে শোনে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'প্রিয়ে, খেলা বন্ধ হলো কেন ? ফিস্ ফিস্ শব্দ হচ্ছে কেন ? কোনরূপ প্রণয় হচ্ছে নাকি ?' পুলিশের ভর্ৎসনা খেয়ে তিনি রেগে ওঠেন ঃ 'ভ্রাতা হেড কন্‌স্টেবল, তুমি আর আমায় স্ত্রীলোকের সম্মানের শিক্ষা দিও না, মাতৃভাব হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ভাব, —আমি সমস্ত সুন্দরী জাতিকে পবিত্র ভগিনীভাবে দেখি।' (২অ. ৩গ.)

হিড়িম্বা 'স্বাধীন' মহিলা। তিনি তাঁর স্বামীকে 'প্রেম-শকটে জুড়ে দাম্পত্য-চাবুকের জোরে সংসার ক্ষেত্রে চালাচ্ছেন। সুচারুর সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয়। সুচারু বলেন, 'বামা কাকাকে বিয়ে করবার আগে তুমি ... কাকা বলতে।' হিড়িম্বা উত্তর করেন, 'ঐ তোমারি মতন ... সম্পর্কে কাকা, আমার বাবার কাছে সদা-সর্ব্দা যেত-আসত কিনা, দুজনে প্রায় এক বয়সই হবে, যদি বামাদাস-কাকা এক আধ বছরেরর ছোট হয়।' (১অ. ৩গ.)

সুচারু তাকে সুগন্ধি তৈল উপহার দেন ঃ

> 'সুগন্ধি অলোকা তৈল দিলে এলোচুলে।
> প্রাণেশ পড়িবে লুটে প্রিয়া পদমূলে।।'

হিড়িম্বা জবাব দেন ঃ

> 'আদরে এনেছ ভাই স্নেহ-উপহার।
> দিব প্রেম-প্রতিদান শুধিব না ধার।' (ঐ)

প্রেয়সীর কাছ থেকে সুচারুও কম পাননি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কিনা তুমি আমায় দিচ্ছ ? টাকা কড়ি, ছড়ি-ঘড়ি, ...শুভক্ষণে

www.pathagar.com

বামা-কাকাকে তুমি দাম্পত্য-জালে আবদ্ধ করেছিলে, তাই এমন ভগ্নী-স্নেহ ভরা বামা কাকী পেয়েছি।' (ঐ)

'বৌমা'তে প্রহসনকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মতিলাল। বামাদাস-হিড়িম্বার অসামাজিক বেল্লেল্লাপনা লক্ষ্য করে মতিলাল ইন্সপেক্টরকে বলেন, 'এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনিষ্ট হয়েছে, অধর্ম্ম নিজ মূর্ত্তিতে তার লক্ষ অংশের এক অংশও করতে পারেনি।' (২অ. ৪গ) বন্দী বাবুরামের সঙ্গে কিশোরী ও তাঁর সহচরীরাও জেলে যেতে চাইলে তিনি বলেন, 'স্ত্রীকে কি শিক্ষাই দিয়েছ। ... এটি শেখাতে পারনি যে, রমণী জন্ম শুধু প্রেয়সী হবার জন্য নয়—তাকে কন্যার কর্তব্য, ভগিনীর কর্তব্য—মাতার কর্তব্য, গৃহস্বামীর মহিষীর কর্তব্য—আর সকল সংসারের প্রতি স্নেহময়ী, করুণাময়ী, দেবতার কর্ত্তব্য পালন করতে হয়।' (২অ. ৪গ.) বাবুরামও বুঝি শিক্ষা পেলেন : 'চল মামা, চল, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও। খুব গালও দিলে, আক্কেলও দিলে বাবা।' (ঐ)

চৌদ্দ

অমৃতলালের অপর বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'গ্রাম্য বিভ্রাট' প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। 'গ্রাম্য বিভ্রাট'-এ সেকালের বাঙলার গ্রামে মিউনিসিপ্যালেটি প্রবর্তনের অসারতা দেখাতে গিয়ে প্রহসনকার তথাকথিত একদল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের বাকসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতির ফলে নিরুপদ্রব গ্রাম-জীবনের শান্তি কি করে বিনষ্ট হোল, তার প্রতিও ইঙ্গিত রেখেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'নাটক কিংবা প্রহসন হিসাবে ইহার কোনই মূল্য নাই, ইহা সামাজিক নক্সাও নহে, ইহা সাময়িক একটি গ্রাম্য উত্তেজনার চিত্র।'[৪৮] ডঃ বৈদ্যনাথ শীল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন : 'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকে অমৃতলাল মলিয়ারের কাছাকাছি গিয়েছেন বলিয়া আমার মনে হয়। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা।'[৪৯] আমাদের মনে হয়, 'গ্রাম্য বিভ্রাট' সম্বন্ধে এ দু'টো বক্তব্যই পুনরায় ভেবে দেখা যেতে পারে। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' রচনা করে অমৃতলাল 'মলিয়রের কাছাকাছি' না যেতে পারেন, বা এটা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ রচনা'ও না হতে পারে, কিন্তু প্রহসন হিসেবে এর যে 'কোনই মূল্য নাই' বা এটা যে একটি 'সামাজিক নক্সাও নহে'-এ কথাও মনে হয় বলার অবকাশ কম।

১৮৯৮ খৃীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এর সাফল্যজনক অভিনয় ও জনপ্রিয়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে

www.pathagar.com

একটি ইংরেজী পত্রিকা লিখেন, **'Grammya Bibhrat, the latest farcical production of Mr. Amrita Lal Bose, was produced at this theatre on Sunday, when the house was unusually crowded, and as a satire it was fairly well put on.'**[৫৫]

'গ্রাম্য বিভ্রাট'-এর সংক্ষিপ্ত, নাট্য-গল্প হচ্ছে—ম্যাড়াপাড়া গ্রামের হুজুগ-প্রিয় যুবক উপেন্দ্র, মানিক, নেপাল প্রমুখ দেশোদ্ধার ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের নামে সর্বদা ব্যস্ত। গ্রামে তাঁরা একটি লাইব্রেরী করেছেন। সেখানে বসেই তাঁরা হরিসভা ও ব্রাহ্মসভার আসন্ন 'অ্যানিভারসারি'কে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ম্যাড়াপাড়ায় মিউনিসি-প্যালেটি হতে যাচ্ছে শোনে তাঁদের আর আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু প্রত্যেকেই চাচ্ছেন কমিশনার হতে অথবা নিজের মতের লোককে কমিশনার করতে। এ নিয়ে তাঁদের তর্কাতর্কি এক সময়ে দস্তুরমতো কলহেরই রূপ নেয়। রামনাথ স্মৃতিরত্ন মিউনিসিপ্যালেটি গঠন বা এর কমিশনার নির্বাচনের ব্যাপারে যুবকদের হৈ চৈ-এর কোনো যৌক্তিকতাই খুঁজে পাননা। কিন্তু পলিটিক্যাল মাস্টার ই. এফ. ম্যাকপোল ও পলিটিক্যাল গুরু পীতাম্বরের শিষ্য ম্যাড়াপাড়া গ্রামের উক্ত যুবকদের কাছে, তিনি উপস্থিতই হোন। স্মৃতিরত্নও তাঁদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করবেন বলে জানিয়ে দেন।

অপরদিকে, রাজা বাবু ও পঞ্চুর অনুরোধে গ্রামের প্রভাবশালী জমিদার বরদা ও তারিণী কমিশনার হওয়ার জন্য নির্বাচন করতে রাজী হয়েছেন। স্মৃতিরত্ন উৎফুল্লিত হয়ে এ খবর যুবকদেরকে জানান। যুবকরা বিস্মিত হোন। এধরনের ইংরেজী শিক্ষায় অপটু ও সেকেলে লোকদের দিয়ে কি দেশের কোনো মঙ্গল হতে পারে ?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসে। হাবুল কমিশনার হবার কথা দিয়েও, কাজের সময় তাঁর স্ত্রী কর্তৃক ঘরের মধ্যে আটকা পড়ায়, চিকিৎসা ব্যবসায়ী সত্যচরণ ভেঙে পড়েন। কিন্তু তাই বলে বিজয় বা নেপালকেও নির্বাচিত হতে দেয়া যায় না। অপরদিকে প্রজাদের সঙ্গে বসে পঞ্চায়েত করতে পারবেন না বলে, বরদা ও তারিণীও কমিশনার হবেন না বলে জানান। কিন্তু স্মৃতিরত্ন হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত লবধন মাঝি ও গোফুর সর্দারকে দিয়েই কমিশনার হওয়ার জন্য দরখাস্ত করান। জমিদারদের সমর্থনও তাঁদের প্রতিই। সত্যচরণও তাঁদের পক্ষ সমর্থন করবেন বলেই জানান।

'বিচিত্র সজ্জিত' লবধন ও গোফুরকে গরুর গাড়ীতে ওঠিয়ে যুবকরা টেনে নিয়ে চলেন। চৌকিদার পরান বলতে থাকেন, 'হিলিক্‌সন, ··· ··· সুটকীরত্ন

www.pathagar.com

[স্মৃতিরত্ন] মোচ্ছব ? হিলিকসন,-গফুর লবাই হিলিকসন। বালকরা এসেও যোগ দেন ঃ

'হাকিম হলো লবাই ধন।
করবে গোফুর কমিশন।।'

সেকালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা গ্রামে মিউনিসিপ্যালেটি প্রবর্তনের সূচনায়. প্রাচীনপন্থীদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রহসনটিতে অনেকটা মুখ্য। এ সঙ্গে সেকালের একদল তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত গ্রাম্য যুবকের দেশোদ্ধার প্রভৃতির নামে বাকসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার চিত্রও প্রহসনটিতে ফুটে ওঠেছে।

ম্যাড়াপাড়ার যুবকরা তাঁদের গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছেন। গ্রামে মিউনিসিপ্যালেটি হবার কথা শোনে তঁাদের আনন্দ আর দেখে কে। উপেন বলেন, 'আঁ। ম্যাড়াপাড়ায় আলাদা মিউনিসিপ্যালিটি হ'ল। কত দিনে ইলেকসন হবে ?' গোপাল জানান, 'অতি শীঘ্রই, ••• .. গারল স্কুল, হরিসভা, ব্রাহ্মসমাজ, .. এইবার মিউনিসিপ্যাল টাউন হল। ··· হিপ্ হিপ্ হুররে।' (১অ. ১দৃঃ) তাঁরা 'লোক্যাল সেলফ-গবর্ণমেণ্ট' ও 'লেফটেনেণ্ট গবর্ণর'-এর নামে 'থ্রি চিয়াস' দেন, 'নোবল ভাইশরয়'-এর 'লংলিভ' কামনা করেন এবং 'গড সেভ দি কুইন এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' বলে প্রার্থনা করেন। যুবকরা ভালো করে 'লয়েলটি' দেখানো এবং 'রাইট রয়াল রিসেপসন'-এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এন্ট্রাস ফেল নেপাল স্মৃতিরত্নকে দেখে বলেন, 'আপনাকে শীগ্গির একটা সংস্কৃত কবিতা বেঁধে ফেলতে হবে।' স্মৃতিরত্ন জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের কবিতা হে ?' এল এ. পাশ বিজয় বলেন, 'ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে থ্যাংক দিয়ে।' উপেন কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলেন, 'তার ভিতর লেফটনেণ্ট গবর্ণর, ভাইশরয় আর কুইনেরও মেনসন থাকবে. কবিতাটা খুব যেন লয়াল হয়।' গোপাল বলেন, 'এইবার আমাদের গ্রামের সকল অভাব দূর হ'ল, এইবার মিউনিসিপ্যালিটী হচ্ছে.—কল্কেতার সঙ্গে সামনে টক্কর দিতে পারবো।' (১অ, ২দৃঃ) যুবকরা পলিটিক্যাল মাস্টার ম্যাকপোলের উপস্থিতিতে পলিটিক্যাল গুরু পীতাম্বরের কাছ থেকে সালাম প্রদানের কায়দা কানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গ্রামের উন্নতির জন্য যুবকরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। প্রত্যেকেই চান কমিশনার হয়ে গ্রাম-সেবার সুযোগ লাভ করতে। নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে নেপাল বলেন, 'গ্রামের জন্য আমি কিনা করতে পারি।' বিজয় বলেন, 'আবশ্যক হলে আমি গ্রামের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে

www.pathagar.com

পারি।' উপেন বলেন, 'আমার যদি একশটা প্রাণ থাকতো, তাও গ্রামের জন্য অনায়াসে বলিদান দিতে পারতেম।' (১অ. ৩দৃঃ) কিন্তু একটু পরেই মাতাল মানিক এসে যখন বলেন, 'আজকের আগুনটা যদি জম্‌কে ওঠে, তবেই কতকটা মান বজায় থাকে বটে।' তখনই যুবকদের কমিশনার হবার যোগ্যতা ও গ্রাম-প্রেমের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

'সকলে। - - - - - - - - - কোথায় আগুন ?
বিজয় । - - - - - - - - - আমাদের বাড়ীর কাছে ?
মানিক। না।
বিজয় । - - - - - - - - - তবে যাক,
উপেন । - - - - - - - - - আমাদের বাড়ীর দিকে নয়ত ?
মানিক। না।
উপেন । - - - - - - - - - বাঁচলেম। - - - - -
নেপাল। - - - - - - - - - আমাদের পাড়ায় কি ?
মানিক। নট - - - -তোমাদের- - - -কারুর বাড়ীতে নয় ?
নেপাল। তবে রেখে দাও ওকথা, যেকথা হচ্ছিল, কেন, আমি কি কমিশনের হবার উপযুক্ত নই ?' (১অ. ৬দৃঃ)

পরোপকারী জমিদার বরদা ও তারিণী 'গ্রামের মস্তক' হলেও, কমিশনার হবার মতো কোনো যোগ্যতা তাঁদের নেই বলেই যুবকরা মনে করেন। স্মৃতি-রত্নের কাছে বরদা কমিশনার হতে রাজী হয়েছেন শোনে বিজয় বলেন, 'আপনি পাগল হয়েছেন নাকি ?' সত্য বলেন, 'দশটা ইংরেজী কথা তাড়াতাড়ি বলবার ক্ষমতা নাই, কমিশনার হয়ে উনি করবেন কি ?' বিজয় বলেন, 'একটা লেকচার দিতে হলেই পড় পড় কোরে পালিয়ে আসবেন।' (২অ. ১দৃঃ) অবশেষে তাঁরা বরদা ও তারিণীকে 'জলের কলের' আর 'ড্রেনের ভার' দিতে রাজী হন—গোপাল তাঁদের সে কাজটির একটি সুন্দর নামও বের করেন ঃ 'চৌধুরী ওয়াটার ওয়াকর্স অব ঘোষাল ড্রেনেজ।'

হরিসভা আর ব্রাহ্ম সমাজের 'অ্যানিভারসারি' পালনের জন্য যুবকরা ব্যস্ত। ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানে আচার্য বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রমদা সুন্দরী মুখার্জী— প্রিসাইড করতে আসছেন জেনে যুবকরা বলে ওঠেন, 'থি চিয়ার্স ফর প্রমদাসুন্দরী।' হরিসভার প্রেসিডেন্ট নাকি ঠিক হয়েছেন বাপ্পা স্বামী পিলে। কিন্তু তিনি নাকি আসছেন না। তাঁর পরিবর্তে আসছেন ব্যারিস্টার গোলাম কাদের, তিনি 'বড় অমায়িক জেন্টেলম্যান।' গোপাল জানান, 'প্রিপারে সেনের জন্য তাঁকে একখানা শিশির বাবুর লর্ড গৌরাঙ্গ কিনে দেওয়া হয়েছে।' (১অ. ১দৃঃ) বিপদের দিনে কিন্তু হরিসভার

www.pathagar.com

ভক্ত ও নিষ্ঠাবান' ব্রাহ্ম-সমাজীদের অনেকেরই মুখোশ খুলে যায়। বিজয় বলেন, 'জয় মা কালী। ... আমি মিছি মিছি ব্রাহ্ম, ... আমায় কমিশনার কোরে দাও।' (২অ. ৩দৃঃ) নেপাল বলেন, 'দোহাই বাবা মাকাল ঠাকুর ... ... আমায় বাবা জিতিয়ে দাও।' (ঐ) মাতাল মানিক বুঝি তাঁদের চিনতে ভুল করেন নি। গোপাল তাঁকে অ্যানিভারসারির দিন মদ পান করতে বারণ করলে, তিনি বলেন, 'হরিসভার দিন একটু খাব, তা নইলে আমার চোখ দিয়ে জল বেরুবে না। ..... আর বেহ্ম সমাজের দিন সকাল বেলা খোয়াড়ি ভেঙে রাখবো, বৈকালে আফিং দিও, তাহলে আপনা আপনি চক্ষু বুজে আস্‌বে।' (১অ. ১দৃঃ)

কোনো কোনো যুবকের নৈতিক চরিত্রের অধোগতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যকে লক্ষ্য করে উপেন বলেন, 'তুমি অত সন্ধ্যার পরে ঘন ঘন অনাথ-দের বাড়ির তত্বাবধারণ করতে যেও না, ... গরিব বিধবার একটা কলঙ্ক হয়।' সত্য বলেন, 'আমার চরিত্রের কথা এ গ্রামের কে না জানে ?' উপেন বলেন, 'তা জানেনা, সদু ময়রাণী, মাধাগোদাগার মেয়ে ভামি, সে বার বরদা বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কলকেতা থেকে কীর্তনী এসেছিল; সে—।'(১অ. ৬দৃঃ) প্রমদা সুন্দরীর নামে যুবকদের 'থ্রি চিয়াস' শোনে মানিক বলেন, 'বলি প্রমদা সুন্দরী ... বলে ... থ্রি চিয়াস' পাড়ছিলে, আর আমি এসেছি, অমনি মেয়ে মানুষটি সরালে বাবা।' (১অ. ১দৃঃ)

গ্রামে মিউনিসিপ্যালেটি প্রবর্তনের সূচনায় প্রাচীনপন্থীদের মনোভাব কিরূপ ছিলো, তার প্রমাণ মেলে স্মৃতিরত্নের কথাবার্তায়। যুবকদের লক্ষ্য করে স্মৃতিরত্ন বলেন, 'তোমাদের ইংরেজী মুন্সিপালের সব ব্যবস্থা দেখেছ, আর আমাদের গ্রাম্য মুন্সিপালের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাটা দেখ— টেক্স নাই, অথচ সকল কার্য্য যেন আপনা আপনি নির্বাহ হয়।' তিনি আরো বলেন, 'হিন্দুরাজ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার বিধান ছিলনা ? .. হিন্দুর হিন্দু হওয়া উচিত, হিন্দু হলে আর কোন গোল থাকে না ; স্বাস্থ্য রক্ষা, গ্রামরক্ষার জন্য কোন বিজাতীয়ের দ্বারস্থ হতে হয় না।' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে তিনি উপেনকে বলেন, 'বিজয় তোমার কানপুটী দেবে ? তুমি সত্যকে ধাঁধা কোরে গোটা কতক চড়িয়ে দেবে ? যদু গোপালকে আড়কাটায় ঝুলিয়ে জল-বিছুটী লাগাবে ? আর নেপাল তোমাদের সকলকে এক-ঘরে করবে ? কেমন এইত ?' (১অ. ২দৃঃ)

সেকালের বাঙালী হিন্দুর জাতিভেদ সমস্যার কিছু চিত্রও প্রহসনটিতে রয়েছে। তখন কুলীন হিন্দুদের অনেকেই মনে করতেন ; শূদ্রের বেদপড়ার কোনো অধিকার নেই। পলিটিক্যাল গুরু যুবকদের জানান, 'যেমন শূদ্রকে

www.pathagar.com

বেদ পড়তে নেই, তেমন বাঙালীকেও ঘাড় খাড়া সেলাম করতে নেই।' (১অ. ৪দৃঃ) নেপালচন্দ্র পাঁঠার কমিশনার হবার কথা শোনে বিজয় বলেন, 'এই পল্লীগ্রামে প্রথম ইলেকসনে যদি আমরা একজন কৈবর্তকে কমিশনার করে দেই, তাহলে একটা সোরগোল পড়বে না?' নেপাল যুক্তি দেন, 'কৈবর্ত তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জাত, তা জান? আমরা বৈশ্য। বেদে আমাদের অধিকার আছে। ইচ্ছা কল্লে আমরা পৈতে নিতে পারি। (১অ. ৬দৃঃ) বরদা ও তারিণী কৌলীন্য রক্ষার্থেই নির্বাচন থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। স্মৃতিরত্ন বলেন, 'ওদের সামনে এ অঞ্চলে কেদারা পাবার উপযুক্ত কে আছে যে, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে ও'রা পঞ্চায়েত করতে বসবেন?' (২অ ৩দৃঃ) কুলাভিমানের বসেই স্মৃতিরত্ন লবধন ও গোফুরকে নির্বাচিত করে ম্যাড়া-পাড়ার যুবকদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সত্য লবধন ও গোফুরকে নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নন বলায়, স্মৃতিরত্ন বলেন, 'তোমার আইনে কি লেখা আছে যে, কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ না হলে কমিশনার হতে পারবে না? (ঐ)

উনিশ শতকের শেষ দশকের বাঙলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেও জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিলো। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হওয়ার ফলে কৃষকদের পক্ষে তখন খাজনা পরিশোধ করাই সমস্যা হয়ে পড়েছিলো। নির্বাচনের ব্যাপারে চৌকিদারকে ঢোল পেটাতে দেখে জনৈক গ্রামবাসী বলেন, 'ওরে বুঝি এই দুর্ভিক্ষি হইয়েছে সন দু-সনের খাজনা মাপ হবেক ...... বীচেনের ধানগুলো পর্যন্ত মাগ ছেলেরে খাইয়েছি, খাজনা আর দেব কন্‌তে।' (ঐ) ধান ক্ষেতের পাশের বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে কৃষদের গান করতে দেখে গোপাল বলেন, 'স্ফূর্তি হবে না? কষ্ট কি গেছে কি সোজা। এমন দুর্ভিক্ষ কি কেউ কখন দেখেছে।' (২অ. ১দৃঃ) ভূমিকম্পের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো পূর্ববঙ্গ। মানিক বলেন, 'এতবড় ভূমি-কম্পটা হয়ে গেল; কুচবিহার, রংপুর, মৈমনসিং ... ... সব একেবারে রসাতলে গেল। (১অ. ৬দৃঃ)

তখনকার ইংরেজ সাহেবদের অসীম ক্ষমতা ও দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং আত্মসম্মান বোধহীন বাঙালী তোষামোদকারীদের কটাক্ষ করতে গিয়ে পলিটি-ক্যাল গুরু বলেন ঃ

> সাহেবের আমাদের তুল্য নহে হক।
> সাহেব থাপ্পর-দাতা বাঙ্গালী খাদক। (১অ. ৪দৃঃ)

অন্যত্র তিনি বলেন, কলিযুগে গৌরাঙ্গই দেবতা। কৃষ্ণকান্ত যতই বড় হইল, তিনি উপাসক মাত্র। (ঐ) তখনকার পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'ইংলিস ম্যান', 'মিরার' ও 'বঙ্গবাণী'র প্রতিও কিছুটা কটাক্ষ রয়েছে প্রহসনটিতে।

www.pathagar.com

এতে সেকালের 'খ্যামটা নাচ' ও 'বারোয়ারীতে যাত্রা গাওয়া'র কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বিধবা বিবাহ, বিলেত যাত্রা, নারী শিক্ষা প্রভৃতির প্রতি রক্ষণশীলদের কটাক্ষের পরিচয় মেলে প্রহসনের সূচনার স্ত্রী পুরুষদের গানে।

'পু। বিধবাদের বিবাহের উপায় করি কি ? ... ...
স্ত্রী। ঘরে থুবড়ো মেয়ে চুবড়ি চাপা ... ...
পাড়ায় ঢি ঢি ॥' ... ...
পু। নিদেন ছেড়ে জেনানা, ... বাইরে পাবে যেতে, ...
স্ত্রী। সেটা কখন হবে প্রাণনাথ, দিনে না রেতে ?' (সূচনা)

পনর

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলায় যে অগণিত নাটক-প্রহসন রচিত হয়, তাতে মুসলিম লেখকদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। নাটক. বিশেষ করে প্রহসন রচনার এ হিড়িকের যুগেও মুসলিম লেখকরা কেনো প্রায় নিশ্চুপই থেকে গেলেন, গবেষক মহলে এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। এবং এ সঙ্গে এও জিজ্ঞাস্য, এ সময়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম লেখক কর্তৃক যে ক'টি নাটক-প্রহসনই রচিত হয়েছে. তাতেইবা প্রায় মুসলিম চরিত্র অনুপস্থিত কেনো। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'মুসলিম নাটক-প্রহসনগুলো মুসলিম চরিত্রহীন কেন ? শিল্পে আঙ্গিকে, চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনা-বিন্যাসে, সংলাপ রচনায় এগুলোর দীনতা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এগুলোতে মুসলিম চরিত্রের শূন্যতার কারণ অত সহজে বোঝা যায় না।'[৫১] এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'এ জিজ্ঞাসার সহজ উত্তর জাতির আত্মসংবিত বিস্মৃতি।'[৫২] সমালোচকের এ মন্তব্য আমরাও যথার্থ বলেই মনে করি।

পূর্বেই আলোচনা করেছি, উনিশ শতকের বাঙলার নব জাগৃতির ফল-শ্রুতির প্রায় একচেটিয়া অধিকারী ছিলেন হিন্দুরা। যে কারণে মুসলমানরা এ নব জাগৃতির সার্বিক আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত ঠিক সে কারণেই সে যুগের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা হলেন পশ্চাৎপদ। যে সমস্যার ফলে তাঁরা প্রগতিশীল ও জীবন মুখী চিন্তার পরিবর্তে অতীতের দুর্লভ স্বপ্ন ও আত্ম-বিস্মৃতির জগতে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন, সে সমস্যার ফলেই সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁদের আত্মপ্রকাশ হয় বিলম্বিত। নাটক-প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তাঁদের সে সমস্যা আরো ঘনিভূত হয়ে দস্তুরমতো জীবনের মুখোমুখি এসেই দাঁড়ায়।

যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাটক-প্রহসন গুলো রচিত হয়, মুসলিম সমাজে তার প্রাচুর্য না থাকুক, অভাব ছিলোনা। ধর্মের উৎকট গোড়ামি,, ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনীহা, নারী-শিক্ষার বিরোধিতা ও নারী অবরোধের প্রাবল্য, বহুবিবাহের ফলে সতীন-কলহ ও সাংসারিক অশান্তি, বৃদ্ধের 'তরুণী ভার্যা' গ্রহণ প্রভৃতি সমস্যা নিয়েই ছিলো তখনকার মুসলিম সমাজ। কিন্তু এ সমস্ত সমস্যা তাঁদের নাটক প্রহসনে চিহ্নিত হবার উপায় ছিলো না। প্রধানতঃ 'ধর্ম' ও সামাজিক অনুশাসনই তাঁদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যে 'ধর্ম', যে সমাজ নারীদের অশিক্ষিত ও অবরুদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করে, যার কাছে নাচ গান বাদ্য সঙ্গীত চরম পাপের নিদর্শন, সেখানে নারী-পুরুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বা প্রেম-পরিণয় নিয়ে, নাটক-প্রহসনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা সহজ কথা নয়।[৫৩] একই কারণে তাঁদের পক্ষে মঞ্চস্থাপন বা বা অভিনয় করার ব্যাপারটিও ছিলো একান্তই অসম্ভব। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই মানুষ হাসি-আনন্দকে ভুলে যেতে থাকে, তাঁর মুক্ত বুদ্ধিও বিলুপ্ত হতে থাকে বলে নিছক সমাজ-সংস্কারের গরজটিও চাপা পড়ে যায়।

এরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলিম লেখক নাটক-প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেদের সে 'ধর্ম' ও সমাজ-সংস্কারের বশেই তাঁরা কাহিনী গ্রহণ থেকে শুরু করে চরিত্র-নির্বাচন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই মূলতঃ নির্ভর করেছেন হিন্দু সমাজও হিন্দু পাত্র-পাত্রীর ওপর।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম প্রহসন ও নকশা প্রহসন জাতীয় পুস্তিকা রচয়িতার মধ্যে সর্বাগ্রে মুন্সীনামদারের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর সর্বমোট এগারোটি প্রহসন ও নকশা প্রহসন জাতীয় রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে।[৫৪] ডঃ সুকুমার সেন মুন্সীনামদারের মাত্র পাঁচটি রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং সেগুলোকেও আসলে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বলেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৫৫] এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে ডঃ কাজী আবদুল মান্নান যথার্থই বলেছেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, তিনি অতবড় সন্দেহের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। আমাদের মনে হয়, মুন্সীনামদারের বইগুলি তিনি পড়ে দেখলে, তাঁর মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হোত না।'[৫৬]

মুন্সীনামদারের প্রথম রচনা, 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। এতে রসিক বাবু ও তাঁর স্ত্রী

www.pathagar.com

তারামণির দাম্পত্য কলহ দেখানো হয়েছে। এবং এ কলহের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজে নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধোগতির প্রতিও লেখকের ইঙ্গিত ফুটে ওঠেছে। কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

'তারামণি।	...... কেন জন্ম দোষে ছেলে হয়েছে তা এক দণ্ডও কোলে থেকে ভুঁয়ে নামেনা।
রসিক বাবু।	ছেলের জন্মের দোষ বই আর কি, তা তুমিই জান মেয়ের ঘরে প্রত্যয় কি ? কিনা কর্তে পারে, মনে কল্লে চাইকি দুপাশে দুজন থাকে।
তারামণি।	হেং তা বটে পুরুষের মনটাই বড় ভাল, আমরা তবু পুরুষের বোঝা বুকে করে বই, পুরুষ তো তা পারেনি, যদ্যপিও বয় তবু একটা সুন্দর মেয়ে মানুষ দেখলেই অম্নি ঝুপ করে ফেলে দেয়।'

রসিক বাবুর গানে এক সুন্দরী মেয়ের বর্ণনা শোনেও তারামণির মনে সন্দেহ জাগে, ঐ সুন্দরী মেয়েটিই হয়তো তার স্বামীর রক্ষিতা। রসিক বাবু তাঁর স্ত্রীর মন থেকে এ অমূলক সন্দেহ দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর অসহায়-গলদ-ঘর্ম অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই প্রহসনকার বলেন ঃ

'কলিকালে মেয়েদের খুরে দণ্ডবত।
যেতে কাটে আস্তে কাটে সাঁকের করাত।।'

মুন্সীনামদারের দ্বিতীয় রচনা 'দুই সতীনের ঝগড়া' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খৃীস্টাব্দে। এতে বহুবিবাহের পরিণাম-সতীন কোন্দলের বর্ণনা রয়েছে। 'বড় বৌ' ও 'ছোট বৌ'-এর নিত্যদিনের কলহে অতিষ্ঠ হয়ে 'বাবু' বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাতে টাকা পয়সা না থাকায় অসুস্থ অবস্থায় আবার তাঁকে বাড়ীতে ফিরে আসতে হয়। তাঁকে নিয়ে দু' বউয়ের মধ্যে আবার কলহ দেখা দেয় ঃ

'বড় সতীন।	যানা যানা তোর ছোট বউয়ের কাছে যানা, আমি কোথা পাবো যে খাওয়াবো।
ছোট সতীন।	হ্যাঁ, আমি বুঝি কাটনা কাটা ধন রেখেছি তাকে বসে বসে খাওয়াবার জন্যে, যে তার বেশী রোজগার খেতো তার কাছে যানা।'

www.pathagar.com

মুন্সীনামদার বলেন ঃ

'তাই হাত যুড়ে আমি সবে করি মানা।
এ সংসারে দু সংসার করোনা করোনা।'

মুন্সীনামদারের পরবর্তী দু'টো রচনা 'ননদ ভাজের ঝগড়া' ও 'বাঞ্ছারামের গল্প' ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে একত্রে প্রকাশিত হয়। এ দুটোই উপদেশমূলক রচনা। 'ননদ ভাজ'-এর 'ভাজ' এক বীভৎস স্বপ্ন দেখে সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন, এবং বনে গিয়ে উপাসনা করবেন বলে জানান। ননদ সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন, স্বামীর বিনা অনুমতিতে যে স্ত্রী কোথাও যান, পরকালে তাঁর পা কাটা যাবে, ইত্যাদি। বনে গিয়ে উপাসনা করেও লাভ নেই—কারণ 'এই যে সংসার খানা দেখিতে পাও এ কম নয়, এই স্থানেই স্বর্গমর্ত্য-পাতাল, এই স্থানেই পাপ-পুণ্য।'

'বাঞ্ছারামের গল্প'-এর বাঞ্ছারামের ছেলে দুঃখীরাম মদপান, লাম্পট্যপনা ও চুরি করে বেড়ান। 'গুরু ঠাকুর'-এর 'মদ খাও কিন্তু বাপু দোকানে খেওনা। চুরি কর্ম কর কিন্তু সত্য বলিওনা। লোচ্চামি করিতে কভু প্রভাতে না যাবে।' এরূপ পরামর্শেরও তিনি কোনো মূল্য দেননা। কিন্তু এক সময়ে তাঁর শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। কারণ মদের দোকানে গিয়ে দেখেন, 'হেগে মুতে পড়ে আছে অচৈতন্য হইয়া।' সকালে বেশ্যাবাড়ী গিয়ে দেখেন, বেশ্যাদের সব 'কুৎসিত এবং ছিন্ন ভিন্ন বেশ' এবং তাঁরা 'এলোকেশ, নেকার করিয়া বাসি বিছানায় পড়ে আছে।' চুরি করতে গিয়ে সত্যি কথা বলেও তিনি ভীষণ মার খান।

মুন্সীনামদারের 'নূতন ঝড়' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। এটি মূলতঃ পদ্যে লেখা নীতিকথাপূর্ণ রচনা। তবে গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক কালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রটি বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠেছে। নামদার বলেন ঃ

'একাত্তরে ঝড় করিলে তিয়াত্তরে আকাল দিলে
চুয়াত্তরে ফের মারিলে
হয়েছিলাম মরো মরো।

মুন্সীনামদারের রূপক রচনা 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। এর চরিত্রগুলো হচ্ছে শেয়াল, বাঘ, পেচাঁ, ছুঁচো, বানর, বেড়াল,

www.pathagar.com

প্রভৃতি। শেয়াল রাজা মণ্ডল পেঁচা, ছোঁচো ও বানর বসে সভা করছেন। এমন সময় সেখানে এক খেঁকশেয়ালী এসে উপস্থিত ঃ

'মড়ল। কে হে বাবু তুমি।

খেঁক শেয়ালী। ··· আমি এই গ্রামের ঠক অদ্য শুনা হলো মহাশয়েরা মড়লী ভারাপর্ণ পেয়েছেন তাইতে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছি।

মড়ল। হ্যাঁ বাবু আমাদের তো মন ছিলনা তা রাজা মহাশয় বল্লেন যে আমাদের মতন ভদ্র তো আর কেহ নাই কাকে মড়লী দিব।

খে-ঠক। আহা সে কি কথা মহাশয়, আপনারা তিন জনার মধ্যে কেহতো কম নয়, মহাশয়রা যদি আমার পক্ষে থাকেন তবে ভাবনা কি গো কত বেটাকে হাগুয়ে ছেড়ে দি।'

অথচ খেঁকশেয়ালী গিয়ে উল্টো বাঘকে মোড়লদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এক সময়ে বাঘের হাতে মোড়লরা সব নাস্তা নাবুদ হয়, এবং বাঘই মহা সুখে বনের রাজত্ব করতে থাকে। 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' পুস্তকে মুন্সীনামদার শঠ প্রকৃতির মানুষকে চিত্রিত করেছেন। মনে হয় সে-মানুষ তাঁর চারপাশেই বিদ্যমান ছিল।' ৫৭

মুন্সীনামদারের 'নারীর ষোল কলা' ও 'খেলারাগের গীত' একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। দুটো রচনাই প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। প্রথমটিতে সেকালের সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কারের পরিচয় রয়েছে। যেমন—যাত্রার সময় পেছন থেকে হাঁচি দেয়া, ভরা কলসী নিয়ে হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি ছিলো অশুভের ইঙ্গিতবাহী। একই বছরে প্রকাশিত নামদারের 'মনোহর ফেসড়া' একটি রূপকথা জাতীয় প্রণয়কাহিনী মাত্র।

মুন্সীনামদারের 'খেদের গান' প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে। এতে তখনকার বাঙলাদেশের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের সুযোগে চাউলের কেনা বেচায় মুনাফা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের খেদও কম নয় ঃ

'মাজি। ওরে বাই টোনা গাজি চাউল তো বিক্কনারে বাই।

ভাঁড়ি। ওরে ভাই খি বৈছেন হাপ্নে খোদা নি মারছে, টোনা গাজি চাউল আনছিল দেশে হৈতে হাড়ে পাঁচ টাহা আজনি বেচে দুই টাহা।

মাজি। আহা বাইরে বাই আর কওনারে বাই আমারে মারছে।'

মুন্সীনামদারের 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' (১৮৬৮ খ্রীঃ)-তে বউ কি করে

www.pathagar.com

শাশুড়ীর দুর্নাম করে স্বামীকে নিয়ে সংসার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন তার বর্ণনা রয়েছে। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক গল্প। তবে লেখকের কিছু উক্তির মধ্যে সেকালের সমাজের প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায়। যথা—'হাড়িতে উড়ায় শাল মেতরে আতোর। দিনেতে মোল্লাজী হন রাত্রে নেশাখোর।' বা 'ভদ্রের ভদ্রত্ব গেল ছুঁচো হৈল—বাবু।'

গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই বইটির মুন্সীনামদার প্রণীত 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' রূপে প্রকাশিত হয়। ফলে একে নিয়ে লেখক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেউ মনে করেন, নামদার ও গোলাম হোসেন একই ব্যক্তি।[৫৮] আবার কেউ বলেন, 'হাড় জ্বালানী'র লেখক হিসেবে গোলাম হোসেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়না।[৫৯] ডঃ কাজী আবদুল মান্নান বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে বিভিন্ন প্রমাণাদি সহযোগে একথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, 'মুন্সী নামদার নয়, গোলাম হোসেনই 'হাড় জ্বালানী'র প্রকৃত লেখক এবং তাঁরা এক নন, ভিন্ন লোক।'[৬০] এই ব্যাপারে ডঃ মান্নানের সঙ্গে আমরাও একমত পোষণ করি।

'হাড় জ্বালানী' প্রহসন-জাতীয় রচনা। এতে কোনো চরিত্রের নামকরণ করা হয়নি। 'শাশুড়ী,' 'বউ,' 'কর্তা' প্রভৃতিকে নিয়েই এর কাহিনী গড়ে ওঠেছে। 'হাড় জ্বালানী'তে শাশুড়ীর সঙ্গে বউয়ের কলহ ও স্ত্রীসর্বস্ব ছেলে কর্তৃক লাঞ্ছিতা মায়ের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা রয়েছে। শাশুড়ী-বউয়ের এক দিনের ঝগড়ার কিছু অংশ উদ্ধৃত হোল ঃ

'শাশুড়ী। কেন গো বউ তোর যে আজ কথাগুলো উল্টো ২ লাগচে।
বউ। ··· যারে বাবু তোর আজ গিন্নিপনা মোর গায়ে সহেনা। তুই যত ভালবাসিস তা জানা আছে।
শাশুড়ী। ওমা তুই কি বলিস গো আমি তোকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, আমার এই বৃদ্ধকাল কোনদিন মরি কোন দিন বাঁচি।
বউ। হেঁ তোমাদের এখন মরণ আছে তা মরবে।'

শাশুড়ী রাগ করে বাড়ী থেকে চলে যান। বউয়ের মা আসেন বেড়াতে ঃ

'মাতা। তোর শাশুড়ী কোথা গো দেখিনি যে কোথায় গেছে বুঝি।
ঝি। ···বুড়ো বেটিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।
মাতা। বেশ করেছ ২ আপদ গেছে। ··· ···
ঝি। হেঁ মা বত্তেছি, মাগি সারাদিন বসে খিট ২ কর্তিইছে।

www.pathagar.com

ছেলে বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছেন। কিন্তু মা'র দুঃখের অবসান হোল না। দুঃখিনী মা গান করেন ঃ

'যখন তোমার অসুখ হতো
তখন আমার প্রাণ যেতো
তখন কোথা বউ অভাগী
এখন আমায় খেদাইলে।।'

'সম্ভবত কোন বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নক্সাজাতীয় রচনাটি লিখিত হইয়াছে। এতে কোন চরিত্রের নামকরণ না করার মূলেও ঐ কারণটি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়।'[৬১]

সেযুগের অন্যতম মুসলিম প্রহসন জাতীয়-রচনার লেখক আজীমদ্দীকে নিয়েও কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সে সমস্যা খুব একটা জটিল নয়। 'কি মজার কলের গাড়ী'র (১৮৬৩ খ্রীঃ) রচয়িতা 'মুন্সী আজীমদ্দীন' এবং 'কড়ীর মাথায় বুড়োর বিয়ে'র (২য় মুদ্রণ, ১৮৬৮ খ্রীঃ) রচয়িতা 'সেখ আজিমদ্দী' যে একই ব্যক্তি তা তাঁর আত্মপরিচয় থেকেই বোঝা যায়। 'কি মজার কলের গাড়ী'র আত্মবিবরণীতে তিন লিখেছেন ঃ

'বিরচিত আজিমদ্দীন জেলা বর্দ্ধমানে।
খড়ি নামে আছে ধাম মেমারির দক্ষিণে।'

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'জামাল নামা' কাব্যের আত্মবিবরণীতে লিখেছেন ঃ

'এই হদ্দ পুথি মেরা হইলো তামাম।
মুন্সী আজিমদ্দীন নাম খাঁড়োতে মোকাম।।
জেলা বর্দ্ধমান মধ্যে মেমরির দক্ষিণ।
কাদিমি ফকির খানা জানায় অধীন।।'

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'র শিরোনামায় লেখা আছে, 'শ্রী সেখ আজিমদ্দী প্রণীত।' কিন্তু কবিকারের উক্তিতে লেখক লিখেছেন, 'হীন আমিরদ্দী নাম, কড়েয়া গ্রামেত ধাম।' অন্যত্র লিখেছেন, 'আমিরের নাই কড়ি পাতি, বল কি হইবে গতি।' মনে হয় লেখক 'আজিমদ্দী' ও 'আমিরদ্দী' বা 'আমির' এ দু-তিন নামেই পরিচিত ছিলেন। বর্ধমানের 'খড়ি' বা 'খাঁড়ো' গ্রামেরই তিনি বাসিন্দা ছিলেন, এবং পরে হয়তো 'কড়েয়া' গ্রামে বাস করতে থাকেন।

আজিমদ্দীর 'কি মজার কলের গাড়ী' ও 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' দুটোই প্রহসন জাতীয় রচনা। প্রথমটিতে ইংরেজের কৃপায় দেশে কলের গাড়ী

২২—

www.pathagar.com

বা রেলগাড়ী আসায় লোকের বিশেষ করে গৃহবধূদের অনেক সুবিধে এবং কারো কারোর যে অসুবিধেও হয়েছে, তা নিয়ে লেখক কৌতুক করেছেন।

নিম্নোদ্ধৃত অংশে গাড়ী দেখার ব্যাপারে বউদের আগ্রহ ও শাশুড়ীর বিরক্তি প্রকাশ লক্ষণীয় ঃ

'শাশুড়ী। ··· বয়েরা, তোরা কি পাঁদারে দাঁড়ায়েই থাকবি গা ?··· বাপের বয়সে কখন গাড়ী দেখিসনি নাকি ?
বউ। হে॰ বাবু, আমরাই না হয় দেখিনি, তোমার বাপ বড় দেখেছে।'

'আই বুড়ী' আসেন। বউদের সঙ্গে তাঁর রসালাপ জমে ওঠে ঃ

'বয়েরা। প্রণাম আই আশীর্বাদ করো।
আইবুড়ী। আশীর্বাদ আর কি করবো লো এখন তোদের অদৃষ্ট··· ইংরাজ বাহাদুরেরা কল বানিয়েছেন। সেই কলেতেই সকল কল চলছে।
বয়েরা। হাঁ গো আই, সকল কল চলছে কি গা'।
আই। ...তাও কি আর বুঝতে পারিস নি ! নিত্যি নিত্তি তোদের কত্তা বাড়ীতে আসছে, এর চেয়ে কি আর সুখ আছে।'

কিন্তু এ কলের গাড়ীই 'অসতী' নারীদের বড়ো অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাঁদের পক্ষে উপপতিদের নিয়ে প্রেম বিলাসে মগ্ন থাকা এখন আর অতো সহজ নয় ঃ

'যুবতী। ওহে প্রাণনাথ ! বলি এখন বাড়ী যাও হোথা মাথা খেয়েছে যে, গাড়ী আসচে কি জানি সে মুখ পোড়া যদি এসে পড়ে।'

এখানে, সেকালের সমাজের নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধোগতির প্রতি লেখকের কটাক্ষ লক্ষণীয়।

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'তে 'বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা' গ্রহণ ও তার পরিণামের বর্ণনা রয়েছে। 'পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু দ্বারা...স্বপরিবারের লোকান্তর হওয়াতে' বৃদ্ধ কর্তার মনে শান্তি নেই। তিনি ভাবেন ঃ

'রমণী পরম সুখ যাবৎ জীবন।
তদভিন্ন যত সুখ সব অকারণ।।'

তাঁর এই বিমর্ষ অবস্থা 'বেহাই'রও চোখ এড়ায়না ঃ

'বেহাই। বেহাই কেমন আছ, মুখটা বড় ভারি ২ দেখছি কেন ? মনে খেদ উদয় হইয়াছে নাকি ?

www.pathagar.com

বৃদ্ধ। কে বেহাই যে, এসো ২ অনেক দিবস পরে অদ্য আমার পূর্ণ ভাগ্য ... আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ তা আর বল্লেই বা কি হবে।

সুখিরে দুঃখের কথা বলা অতিদায়।
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে ছুটিয়ে পালায়।।

বেহাই। কি বেহাই আমি তোমার কাটা ঘায়ে নুন দিব, ... যদি স্যাৎ তোমার কারণ আমার দেহ হইতে রক্ত ধারা নির্গত করিতে হয় তাহাও এক্ষণে স্বীকার আছি।'

বৃদ্ধ মনের ভাব ব্যক্ত করেন ঃ

'এক শয্যা থাকি আমি নির্জ্জন পুরীতে। ...
কথার দোসর বিন এ কেবা হবে দুঃখ।
বল দেখি বেহাই এ জীবনে কি সুখ।।'

'বেহানী'র সাহায্যে 'ষোড়সী রূপবতী' সৌদামিনীর সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়। সৌদামিনী তার সঙ্গিনীগণকে বলেন ঃ

'শুনিয়াছি বৃদ্ধ নাকি শক্তি নাই গায়।
ভ্রাতৃগণে ধৃত করি দোতালায় যায়।।
বিধবা হইতে এ কুমারি নারী ভাল।
বদন থাকিতে অনাহারে প্রাণ গেল।।'

'এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা' পণ দিয়ে বৃদ্ধ সৌদামিনীকে বিবাহ করেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি যুবতী স্ত্রীর মন জয় করতে সক্ষম হন না। কিছুদিন পর বৃদ্ধের মৃত্যু হলে সৌদামিনী এক যুবক 'সাধুর নন্দন'কে নিয়ে 'সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।'

মীর মশাররফ হোসেনের প্রহসন 'এর উপায় কি ?' প্রথম কখন প্রকাশিত হয় সঠিক করে বলা যায় না। প্রহসনটির পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু লিখেছেন, '১৮৭৫, ২৫ এ সেপ্টেম্বরের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় বিজ্ঞাপিত।'[৬২] ১২৮৩ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'বান্ধব'-এ প্রহসনটির বিরূপ সমালোচনা হয়।

'এর উপায় কি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে।[৬৩] 'লিখকের কয়েকটি কথা'য় প্রহসনকারের বক্তব্য হোল ঃ 'প্রায় এক যুগান্তর 'এর উপায় কি' পুনরায় প্রকাশ হইল। বিষয়টি ভাল নয়—কিন্তু রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত পরিবারের চক্ষের জল, অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে, কোনও সত্য ঘটনার কতক

www.pathagar.com

সময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি ?' বিষয়টি যতই কেন কদর্য্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,—'আর কেন ? বাবুদিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বার্থক মনে করি।' 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি লিখেছেন, 'মাঝে দুই তিন ছত্র পাঠ করিয়া লিখককে গালাগালি দিবেন না। প্রথম সংস্করণে 'সুলভ প্রভৃতি' কয়েকখানি পত্রিকা বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছিলেন। তাহাতেই সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, এর উপায় কি ? ভাল করিয়া দেখিয়া যাহা বলিবার বলিবেন, সহ্য করিব। কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে, কখনি সঙ্কোচিত হইবনা।'

'এর উপায় কি' সেকালের নাগরিক জীবনের কোনো কোনো সমস্যার এক বাস্তব চিত্রালেখ্য। প্রধানতঃ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি, তার পরিণাম ও মদখোর-লম্পট স্বামীদের নিষ্ঠুর অবিচার-অবহেলা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাঁদের স্ত্রী প্রচেষ্টার চিত্রই এতে অঙ্কিত হয়েছে।

রাধাকান্ত মদ্যপ ও লম্পট। সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী মুক্তকেশীকে ঘরে রেখে ইয়ার মদনকে নিয়ে তিনি বারাঙ্গনা নয়নতারার সঙ্গে লাম্পট্যপনা করে বেড়ান। তাঁর ধারণা, নয়নতারা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও ভালোবাসেন না। কিন্তু নয়নতারা মনে মনে বলেন, 'একখানা ঢাকাই শাড়ী দেখিয়ে পাঁচজনার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। মার বিয়ে হয়েছিল কিনা শুনি নাই। বাবা কেমন চিনিনা, কখন দেখি নাই, সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল বলে, তাতে বেশ দশ টাকা লাভ করেছি।' রাধাকান্তের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য নয়নতারা অভিমানের অভিনয় করেন। সেই অভিমান ভাঙাতে রাধাকান্ত গলদঘর্ম :

'রাধা। ··· তোমার জন্য আমি প্রাণ ত দিয়েই রেখেছি। তার উপরেও যদি কিছু থাক্‌ত, তাও না হয় দিতাম।

নয়ন। ...বড় সক্ করে, এই কাপড় খানা নিয়েছি।··· মার কাছে টাকা চাইতেই ত একেবারে খেউ ২ করে ঝাঁটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার এসে, শেষ বারে কড়া ২ কথা বলে গেছে।

রাধা। বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম বের করোনা। টাকার জন্য তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে ? নয়নের তারাকে কড়া কথা বলে গেছে ? রাধাকান্ত বাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া কথা বলে গেছে ? ··· ··· ধিক্ আমার টাকায়, ধিক্ আমার মায়ায়।।'

www.pathagar.com

কন্‌কনে শীতের সময় নয়নতারার হাতের মদ পান করে রাধাকান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন : 'বাঁচা গেল, সাত খানা লেপ গায়ে দাও যেখানে ফাঁক পাবে সেইখানেই শীত সেঁদবে। আগুন জেলে দাও গায়ের উপকার চামই গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে, ভিতরে, উপরে যেন একেবারে বেলাতী কম্বল মোড়ান হয়। বৌ! আর এক গ্লাস।' যোগ্য ইয়ার মদনের সঙ্গেও এনিয়ে কথা হয় :

'রাধা। মদন বাবু। ··· ··· ব্রান্ডির বাড়ী ব্রান্ডি না খেলে কোন কালে মজা হয় না। ওর শাস্ত্রেই আছে, ব্রান্ডির বাড়ি ব্রান্ডি, এয়ারের বাড়ী বিয়ার, শালার বাড়ী স্যাম্পিন, শিকারে সেরি, আর বোর্টে পোর্ট, এই হোল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। ··· ···

মদন। তবে পালা আরম্ভ করি।

রাধা। ও কথা মুখে এননা, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটি নূতন নাম বেরিয়েছে। 'লেখা-পড়া-করা।'

মদন। বা-বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন লিখাপড়া করি।'

নয়নতারার বাড়ীতে হুগলী কলেজে পড়ো 'ডেপুটী' নগেন্দ্রও আসেন :

'নয়ন। ··· আপনি হলেন বিচারকর্তা হাকিম, ··· এতদিন পরে যে মনে পড়েছে, সেও ভাল।

নগে। এতদিন পরে কি ? গেছে শনিবারেও ত এসেছি ··· ···।

নয়ন। ··· আমরা নাচ্‌তে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাই বলে কি আর দেখা দিতে নেই। ···

নগে। দেখ ভাই, পরের চাকুরী করি, চারদিক নজর রেখে চল্‌তে হয়।'

সন্ন্যাসী দাসও বাবু হয়েছেন। নয়নতারার বাড়ীতে মদনের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি নিজের কৌলীন্য নিয়ে গর্ব করেন :

'সন্ন্যা। আমিও চাষার নন্দন নয় জানিস ? জাতি কৈবর্ত্ত বামুনের ঝাঁক মারি। ··· আমার বাবার বাবা যে চাঁই মাছ ধর্ত্ত, ঠাকুর মার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। ··· নামটাই কি যেমন তেমন নাম—হনুমান দাস। সন্ন্যাসী দাস আসল নাম নয়।

মদন। এতকাল শুনেলেম সন্ন্যাসী দাস, বেটা আজ বলছে হনুমান দাস।

www.pathagar.com

সন্ন্যা। ··· যে সন্ন্যাসী সেই হনুমান। ভিন্ন কিরে বেটা ? ··· আমি সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদি ছেলে—তারেকেশ্বরের মোহন্ত তখন হয় নাই, তাহলে মোহন্তের আশীর্ব্বাদেই হতেম।'

এ কটাক্ষ যে তারেকেশ্বরের মোহন্ত লম্পট মাধব গিরিকে লক্ষ্য করেই, তা বুঝতে পারা যায়।

এদিকে মুক্তকেশীর আর দুঃখের অন্ত নেই। তিনি তাঁর সখী রাইমনীকে জানান : 'চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রইতেম্‌ তাতেও দুঃখ হতনা, থেকে-নেই, আমার আমার নয়, আমি যার সে পরের।' রাইমনী বলেন, 'এখনকার মদখোর আর বেশ্যাখোর স্বামী যে বানর হতেও বাড়া।' এমন সময় মাতাল রাধাকান্ত নয়নতারাকে নিয়ে বাড়ীতে আসেন। মুক্তকেশী তাঁদের দেখে ভয়ে এবং লজ্জায় পালিয়ে গেল, নয়নতারা অপমানবোধ করেন। তিনি রাধাকান্তকে নিয়ে তখনই সেখান থেকে চলে যেতে চান :

'মুক্ত। (নিকটে যাইয়া) দেখ, তোমার দুখানি পায়ে ধরি, একটু দাঁড়িয়ে হতভাগিনীর দুট কথা শুনে যাও।
রাধা। তোর কি কথা শুনবো রে প্রাণ। তুই গাইতে জানিসনে, নাচ্‌তে জানিসনে, মদ খেতে জানিসনে, এমন বদ রসিকের কথা রাধাকান্ত শুন্‌তে পারে না।
মুক্ত। ··· আমি স্ত্রী, আমার একটি কথা শুনে যাও (চরণ ধরিতে উদ্যত) ··· ।
রাধা। (সজোরে পদাঘাত করিয়া) এই শুনি। ···
মুক্ত। এমন করে এদের সামনে অপমান কল্লে ?
রাধা। ··· নয়ন তারা ছেড়ে দেয় না বলে বেঁচে গেলি।' ···

একদিন রাধাকান্ত অনেক রাতে বাড়ী ফিরেন। কিন্তু 'একি ? পুরুষ। মুক্তকেশীর বিছানায় পুরুষ। এক উপপতি। ··· আর ত সহ্য হয় না। আমার স্ত্রী ভ্রষ্টা ··· উপপতি নিয়ে ··· আমার বিছানায় সুয়ে।' রাধাকান্ত ক্রোধে পুরুষটির 'দাড়ী ধরিতে অগ্রসর' হন।

'পুরু। সাবধান। দা দেখছ, ··· আমি ইচ্ছে করে আসি নাই, টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে। ···
রাধা। ··· টাকা দিয়ে উপপতি এনে আমার ঘরে ? ···
মুক্ত। ··· কি করি শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি।' ···

www.pathagar.com

দুঃখ আর হতাশায় ভেঙে পড়েন রাধাকান্ত। পুরুষটি তখন তাঁর 'কৃত্রিম পরিধান পরিত্যাগ' করে আত্মপ্রকাশ করেন। চমকে ওঠেন রাধাকান্ত: 'সৈ-সৈ একি? মুক্তকেশী একি?' রাইমনী তখন ঘোমটা টানেন: 'আর কি! মনে মনে যে সৈয়ের মনের ভাব বুঝেছেন সেই ভাল।' রাধাকান্ত বলেন, 'আর নয়, সৈ আর নয়। আমার ঘাড়ের ভূত আজ নেবে গেছে।' মুক্তকেশীকে লক্ষ্য করে রাইমনীও শেষ কথা বলে বিদায় নেন:' ও সৈ! ... শিখেছো তো, এর উপায় কি?'

মশাররফ হোসেনের অন্য একটি প্রহসন 'টালা অভিনয়' ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা 'হাফেজ'-এ প্রকাশিত হয়। তা সম্পূর্ণ হয়েছিলো কি না বা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিলো কিনা এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছু জানা যায় নি। এ ছাড়া মশাররফ হোসেনের 'ভাই ভাই এইত চাই' (প্রহসন?), 'ফাস কাগজ' (প্রহসন?), 'একি?' (প্রহসন?), 'বাধা খাতা' (প্রহসন?)-এ পুস্তকগুলোর প্রকাশের সংবাদ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'গাজীমিয়ার বস্তানী' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিলো।[৬৪]

তথ্যনির্দেশ

১ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৮।

২ বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রহসন রচয়িতারূপে বাংলা সাহিত্যে উচ্চ-আসন অধিকার করিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় পরে সেই স্থান অধিকার করেন।'—নবযুগের বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ২৫৯।

৩ 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয়, পর্য্যায়, পৃঃ ৮২-৬, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক-চরিত মালা- ৬৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৭, পৃঃ ৪৩।

৪ 'পুরাতন পঞ্জিকা', মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩১।

৫ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৯।

৬ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

৭ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭০।

৮ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩।

১০ বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩।

১১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

১২ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।

১৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।

১৪ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০০।

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

www.pathagar.com

১৬ অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ দশ-এগার।

১৭ 'চোরের উপর বাটপাড়ি'র জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'রঙ্গালয়ে দর্শক সংখ্যার হ্রাস দেখিলে রামচরণ নামে একজন প্লাকার্ডের বেহারা, প্রসিদ্ধ প্রহসনকার শ্রীমান অমৃতলাল বসুকে আসিয়া বলিত, "মহারাজ,...চোরের উপর বাটপাড়ি লাগাইয়ে।" —রঙ্গালয়ে 'নেপেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), গিরিশ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭৫, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫—৩৬।

১৮ তারেকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির লাম্পট্যপনার শিকার হয়ে, এলোকেশী নাম্নী এক গৃহবধূ তাঁর স্বামী নবীন কর্তৃক খুন হয়েছিলেন। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ঘটনাটি বাঙলাদেশে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো।

১৯ 'পুরাতন পত্রিকা', মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩০০।

২০ অরুণ কুমার মিত্র, অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১ দ্রষ্টব্য।

২১ বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

২২ 'অমৃত স্মৃতি', মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

২৩ অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩ দ্রষ্টব্য।

২৪ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ও অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ যথাক্রমে, ৩১৮ ও ২৪৭ দ্রষ্টব্য।

২৫ 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' ক্ষুদ্রাকৃতির প্রহসন। এতে কোনো অঙ্ক বা গর্ভাঙ্ক নেই।

২৬ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৬।

২৭ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯-২০।

২৮ অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩।

২৯ নবজীবন, বৈশাখ, ১২৯২।

৩০ ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৩১ অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৩২ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

৩৩ অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২ দ্রষ্টব্য।

৩৪ 'অমৃত ময় অমৃতলাল, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

৩৫ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২৬।

৩৬ The Indian Mirror, Dec. 27, 1892.

৩৭ অনুসন্ধান, ১৫ই ভাদ্র, ১৩০১।

৩৮ প্রহসনটির অভিনয়-বিজ্ঞাপনে বাবুদের স্বরূপ এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

"The Babu — Political
The Babu — Ultra — Religious
The Babu — Reformer
The Babu — Scientific ... ...
The Babu :— Who doesn't know—what he is."—

The Amrita Bazar Patrika, 4. 1. 1894, উদ্ধৃত, অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ পাদটীকা, ২৬১।

৩৯ অনুসন্ধান, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০০।

৪০ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪।

৪১ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩।

www.pathagar.com

৪২ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫।

৪৩ ১৩৬৯ সালের 'সারদীয় যুগান্তরে' পত্রটি প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত, অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৬।

৪৪ অনুশীলন ও পুরোহিত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২।

৪৫ The Statesman, Dec. 25, 1896.

৪৬ The Indian Daily News, Dec. 29, 1896.

৪৭ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, 'সন্দর্ভ সংগ্রহ,' বৈশাখ, ১৩০৫, উদ্ধৃত, অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।

৪৮ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬।

৪৯ বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭।

৫০ The Indian Daily News, January 11, 1898.

৫১ মুহম্মদ মজির উদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৭০, ভূমিকা, পৃঃ দুই।

৫২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৫৩ P. R Sen বলেন, '... ... during the Muhammadan rule ... ... dramatic performances could not flourish because these as objective shows with abundant music and dancing jarred against the religious doctrines they had so dear.'— Western Influence in Bengali Literature, Calcutta, 1966, PP. 151-52.

৫৪ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল 'প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক : মুন্সী নামদার' নামক প্রবন্ধ লিখে (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭১) সর্বপ্রথম মুন্সী নামদার ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'র লেখক ডঃ কাজী আবদুল মান্নান লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে তাঁর সবগুলো রচনা দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন। তাঁদের এ মূল্যবান আলোচনা আমাদের পরিশ্রমকে অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে।

৫৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭ দ্রঃ।

৫৬ আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২-১০৩।

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

৫৮ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

৫৯ আবু তালিব, হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ)-এর জীবনেতিহাস, ১৯৬১, পৃঃ ১৩৩ দ্রঃ।

৬০ আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে, মুসলিম-সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য।

৬১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৬২ 'মীর মশাররফ হোসেন,' সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

৬৩ ডঃ আনিসুজ্জামান আমেরিকা থেকে ' এর উপায় কি' (২য় সং, ১২৯৯) প্রহসনটির কপি করে এনেছে। এবং ডঃ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'মশাররফ রচনা-সম্ভার', ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রীঃ-এ তা মুদ্রিত হয়েছে।

৬৪ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদনা), মশাররফ রচনা-সম্ভার, প্রাগুক্ত, পৃঃ। দশ। দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

এক

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজকে দু'দিক থেকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথম দিকে রয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ—একে প্রত্যক্ষ করেছি মূলতঃ সংবাদপত্র ও সেকালে রচিত বিবিধ পুস্তক-পুস্তিকা ও নকশাদির আলোকে। দ্বিতীয় দিকে রয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ—একে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি প্রহসনের আলোকে। প্রহসনগুলোতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলা ও বাঙালী সমাজের যে চিত্র ফুটে ওঠেছে, তার ভিত্তিভূমি যে নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, বস্তুতপক্ষে তা প্রমাণ করার জন্যই প্রথম দিকের আলোচনাটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

প্রথমদিকের আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি, সেকালের বর্ণাশ্রমী বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আবহমান কাল থেকে যে সমস্ত কুসংস্কার-দেশাচার সংযুক্ত হয়েছিলো, তার প্রবল প্রতাপের কাছে যুক্তির কোনো ঠাঁই ছিলোনা—জীবনের মূল্যবোধ সেখানে পরিগণিত হয় অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ বলে, তখন ছিলো স্মৃতি-শ্রুতি-দেশাচারের রাজত্ব—মহত্ত্ব ছিলো আত্মনিগ্রহ পরায়ণ, আচার-অনুষ্ঠান পালনেই। ফলে সহমরণ, অন্তর্জলি, নরবলি, চড়কপূজা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতিই হয়ে থাকে বাঞ্ছিত ও বন্দ্য। তখন 'ভক্তি ও সম্ভ্রমের কেন্দ্র হল—গঙ্গা, ব্রাহ্মণ, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, তীর্থক্ষেত্র (নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র' গয়া, কাশী), গুরু ও বিভিন্ন দেবতা ও মোহন্ত মহারাজেরা। পদধৌত উদক, পদধূলি ও গোচনা ও গোবিষ্ঠা পবিত্র ও সম্মানিত বলে পরিগণিত হল। মানুষই সর্বাপেক্ষা হতমূল্য।'[১] তখনকার বাঙালী হিন্দুর চারিত্রিক অধোগতি এবং অন্যান্য দিক থেকে তার জীবনে যে নৈতিকতার বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো, তার স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রধানতঃ মদপান ও লাম্পট্যপনাই ছিলো তার জীবনের নিত্য সহচর। জীবনোপভোগের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাস বহুল—অকর্মণ্য—ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণেই সে থাকলো পরিতৃপ্ত। মনিয়া—বুলবুলির লড়াই আর ঘুড়ির খেলাতেই সে তখনো মগ্ন। তখনো তার নেশা-ভরা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্বপ্নময় 'গানের যুগ। তখনো 'কবি, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন ভক্তিগীতি আর

www.pathagar.com

প্রেম-গীতির একাধিপত্য। ······ কলকাতার হঠাৎ নবাবরা ছিলেন তাঁদের ভাগ্য-বিধাতা। আর এই ভাগ্য বিধাতাদের কাছে জীবন বড় রঙীন। সেই রঙের নেশা জমাতে সেখানে ঢালাও ফূর্তি, ফেনা-ওপচানো পানপাত্র, বাইজির গা গরম করা নাচ আর তারই মধ্যে কবির রসালো গান। বাইরের জগতের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।'[২] পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন থেকে বিকৃত বিলাস-কলা-কৌতূহল চরিতার্থ করার ধারাকে অব্যাহত রেখেই তাঁরা তখনো সন্তুষ্ট। তখনো তাঁদেরকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করছিলো. 'বিদ্যাসুন্দর', 'রস মঞ্জরী', 'রতি মঞ্জরী', 'আদি রস', 'বেশ্যা রহস্য', 'রতিকান্ত', 'রতিবিলাস', 'রতিকেলি' 'সম্ভোগ রত্নাকর', 'রমণী রঞ্জন'[৩] প্রভৃতি আদি রসাত্মক-রুচিহীন গ্রন্থ। যথার্থ নাটক-প্রহসন রচনা বা তাঁর অভিনয়ের সূত্রপাতও তখনো হয় নি। তখনো ছিলো 'কালীয়দমন', 'বিদ্যাসুন্দর', 'নলোপাখ্যান' প্রভৃতি রুচিহীন যাত্রা ও সঙেরই রাজত্ব। এ সমস্ত যাত্রা-সঙ যে সেকালের সমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলো তার প্রমাণ মেলে 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকার খবরে।[৪] ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'মায়া' কবিতায় লিখেছেন ঃ

'বিশ্বরূপ নাট্যশালা দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো সূর্য শশধর॥
স্বভাবে স্বভাবে লয়ে সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র হয়ে সূত্র ধার॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র অখিল পালক।
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লয়ে।
বহু রূপ সঙ সাজি বহুরূপী হয়ে॥ ···
ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ সঙ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও॥
ভাল কোরে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী তুষ্ট হন যায়॥'[৫]

কবিতাটি রূপক হলেও, এতে সেকালের যাত্রা-সঙের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠেছে।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলার এরূপ পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন, বিকৃত বিলাস-কলা-কৌতূহলপূর্ণ অকর্মণ্য জীবনের পাশাপাশি আর একটি উন্নতমনা-প্রগতিপন্থী ও সংস্কারকামী চেতনা-শক্তির উন্মেষও লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ও পাশ্চাত্য সংস্পর্শে এসেই সে শক্তি, বিকাশ-বিস্তৃতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও, তার ভিত্তি-ভূমিটি প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী অনুরাগীদেরই প্রাপ্য।

তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, নকশা জাতীয় রচনা ও পুস্তক-পুস্তিকায় হঠাৎ-বাবুদের বিকৃত বিলাস কলা-কৌতূহল পূর্ণ অকর্মণ্য-উদাসীন জীবনের প্রতি প্রগতিপন্থী ও সংস্কারকামীদের বিশেষ কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ পেতে থাকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষণশীলদের মুখপাত্র হলেও. এ সময়ে হঠাৎ বাবুদের হাস্যকর আচার-আচরণকে বলিষ্ঠ ভাষা ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথার্থই লক্ষ্য করেছেন,' ... ... **Bhabanicaran Bandyopadhyay ·· wrote four books satirising the same class of persons as did the newspaper satires. As compared to the newspaper writing, Bhabanicaran may be said to have taken a broader view of the theme and dealt with the problem more elaborately.**[৬] ফলে তখনকার 'সাহিত্য শুধুমাত্র কবি, পাঁচালি, যাত্রা, উত্তাপহীন মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণের খেউড়, রামায়ণ-মহাভারতের বৈশিষ্ট্যহীন অনুবাদ, আর ভারত-চন্দ্রের আদি রসাত্মক কাব্য কৌতুকের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ রইলনা। তা যাত্রা করল নতুনভাবে, নতুন পথে, তার চরিত্র হয়ে উঠল, **'brilliant, diverse and complex.** সেখানে দেখা গেল গদ্যের চর্চা, সমাজ চেতনার প্রকাশ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়া, সাংবাদিক সুলভ মনোবৃত্তি, যুক্তিতর্ক এইসব। মহৎ কোনো দৃষ্টি দ্বারা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্য চিহ্নিত না হলেও, সব দিক দিয়েই একে শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতি পর্ব বলতে পারি।[৭] এর মধ্য দিয়েই ধর্মের নামে বাঙালী হিন্দুর আচার সর্বস্বতা, কৌলীন্য, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতির বিপক্ষে ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতির পক্ষেও অনেকটা মননশীল ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য উপস্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও এ সময়ে নিশ্চুপ বসে থাকেন নি। তাঁরাও তখন প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের 'সনাতন ধর্ম' ও 'শুচিশুদ্ধ' সামাজিক নীতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হন। একদিকে প্রগতিশীলদের জ্ঞানগর্ভ আত্মসমীক্ষার

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ প্রেরণা, আর অপর দিকে প্রাচীনের প্রতি রক্ষণশীলদের আত্যন্তিক দরদ। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল-প্রাচীনপন্থীদের জীবন বিমুখ চিন্তা—অপরদিকে অনাচার, অধর্ম, দেশাচার-কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নব্যপন্থীদের বাঁধ-ভাঙা বিদ্রোহী-চেতনা। এ অভিঘাতের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের চিত্তবিক্ষোভ থেকেই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত—রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের তুমুল সংঘর্ষ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলায় কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার সূত্রপাত এখানেই। প্রগতিশীলদের মানব হিতৈষণা, সমাজ-কল্যাণবোধ ও সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে রক্ষণশীলদের জীবন বিমুখ—প্রাচীন চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সে সময়কার বাঙলায় গদ্যে-পদ্যে যে কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনার সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাতে হয়তো একটা লড়াইয়ের ভাবই লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের দৃষ্টিতে সেগুলো হয়তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্য-রসহীন, অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাত দুষ্ট-রচনা বলতেও বিবেচিত হবে, কিন্তু এগুলোর মধ্যেই যে সর্ব প্রথম সমসাময়িক বাঙলা ও বাঙালী সমাজের সার্বিক বাস্তবতার স্ফুরণ ঘটেছে, একথা অস্বীকার করার যো নেই। এ সম্বন্ধে ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথার্থই বলেছেন, The satires ... ... reflect all the aspects of ... conflicts between tradition and innovation and for that reason they constitute first hand source material of great importance to the student of Bengali society during this period. They show us the reactions of the citizens of Calcutta to the social, literary and cultural changes through which the city was passing[৮] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত প্রহসনগুলোর ভিত্তি-ভূমি এখানেই—'সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার ধারার সঙ্গে সামাজিক চিত্ররচনার ধারারও ক্রমে সূত্রপাত হয়। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'ই তার প্রারম্ভ। এরূপে নাট্যসাহিত্যের উদ্বোধনে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন প্রধান প্রেরণা যোগায়।"[৯] ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'কলিকাতার ও মফস্বলের ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কদাচার অথবা সমাজের কুৎসিত রীতিকে ভেঙচানো ঊনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশক হইতে বাংলাদেশে লোকচিত্ত বিনোদনের একটা বিশেষ সহজ পদ্ধতি ছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভণ্ডামি, ইংরেজী-শিক্ষিতের অভিমানিতা ও সমাজ-সংস্কার ব্যগ্রতা, মিশনরিদের ধর্ম প্রচার, বিধবা বিবাহ অবশেষে ব্রাহ্ম ধর্ম ও স্ত্রী শিক্ষা এই ধরনের নক্শার বিষয় যোগাইতে লাগিল। গদ্যে-পদ্যে অথবা গদ্যে লেখা এই সব নক্শায় বাঙ্গালা প্রহসনের পূর্বরূপ বিদ্যমান।'[১০]

www.pathagar.com

দুই

আমরা লক্ষ্য করেছি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলায় ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতি পরিবেশ অস্থির-অসুস্থ এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে বিশেষ চঞ্চল ছিলো। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ একই কথা প্রযোজ্য। তবু, এর মধ্য দিয়েই স্ফুরণ ঘটে আত্মচেতনার-আত্মরক্ষার-আত্মআবিষ্কারের, এবং জীবনকে পুনর্গঠন করার প্রয়াসে তা হয়ে হয়ে ওঠে অনেকটা গতিমুখী।

যে অশ্লীল-অবাস্তব সখের যাত্রা বহুদিন যাবৎ বাঙালীর প্রাণের ক্ষুধা নিবারণ করেছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় শুরু থেকেই তার প্রতিই লক্ষ্য করা যায় অবজ্ঞা-অবসাদ আর বিতৃষ্ণার অভিব্যক্তি—তখন যেনো যাত্রা অভিনয়ে ভদ্ররুচি আর তৃপ্তি পাচ্ছিলোনা। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জুনের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ঈশ্বরগুপ্ত লিখেন, '... কালীয় দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রদত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না ...।' যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কীর্তি-বিলাস' (১৮৫২ খ্রীঃ) নাটকের ভূমিকায় লিখেন, '... বঙ্গদেশে যাত্রা নামে এক প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ... যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি, সুতরাং সমস্ত বিরস হয়ে উঠে।' 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খ্রীঃ) নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ শীকদার লিখেন, 'এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গ ভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।' অনুদিত নাটক 'রত্নাবলী' (১৮৫৮ খ্রীঃ)-এর ভূমিকায় রামনারায়ণ লিখেছেন, '... যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে... ।' রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৪৯ খ্রীঃ)-এ যাত্রা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বহু কালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে।' ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, 'তিনি [রাজেন্দ্র লাল মিত্র] ক্রোধের বশে যাত্রাকে 'নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ' বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা নাটকই অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যাত্রাভিনয়ে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মতে, যে পর্যন্ত নাটক আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে, সে পর্যন্ত দেশের চিত্তবিনোদন ব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না।'[১১]

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় শুরু থেকেই এদেশে সামাজিক নাটক-প্রহসন লেখা ও তা অভিনয়ে হিড়িক পড়ে যায়। সামাজিক নাটক বলতেও মূলতঃ তখনকার প্রহসন গুলোকেই বুঝানো হতো। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'সামাজিক নাটক বলিতে সেই যুগে কেবল মাত্র প্রহসন ও সামাজিক অব্যবস্থার চিত্র মাত্র ব্যতীত আর কিছুই বুঝাইত না।'[১২] জনৈক বিদেশী সমালোচক লক্ষ্য করেছেন, **'In the decade 1855-65, altogether eighty original Bengali dramas were written (or atleast are known to have been written), out of which 60, i. e. a full 75%, treated contemporary social themes.'**[১৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রুচিহীন-অবাস্তব সখের যাত্রার পরিবর্তে ব্যাপক হারে বাস্তবতা ভিত্তিক উন্নত মানের প্রহসন রচিত ও তার অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে থাকায়, তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলোতেও সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ১২৭৯ সালের ১৭ই পৌষ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' লিখেন, 'আজি কালি নাটকাভিনয়ের মরসুম পড়িয়াছে। যেখানে অভিনয়কারীর দল না হইয়াছে, সে গ্রাম বিরল। আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা স্থানে স্থানে অভিনয় হইতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ... অভিনয় প্রথা থাকাতে ··· এক এক সভ্য সমাজ এক এক সময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ... এ দেশে বহুদিন অবধি যে একটি যাত্রা প্রথা হইয়াছে, 'উহা এই অভিনয়ের অপভ্রংশ। অপভ্রংশে বিশুদ্ধ ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। উহাতে অনেক গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। উহা সভ্য সমাজের সমুচিত নহে। ঐ প্রথা থাকাতে রুচিবিকার জন্মাবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব উহার উচ্ছেদ হইলেই সমাজের পরম মঙ্গল। উল্লিখিত অভিনয় প্রথা উহার উচ্ছেদ করিবার সুন্দর উপায় হইয়াছে।'[১৪] ১২৮০ সালের ১৯শে ফাল্গুনের 'সোমপ্রকাশ' লিখেন, 'কয়েক বৎসর অবধি দেশে বঙ্গভূমির বড় শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। নানাদিকে নানা সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় নাটক লেখা যেন দেশীয় গ্রন্থাকারদিগের এবং নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন করাই যেন যুবকদিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ··· সম্প্রতি দেশের লোকের চিন্তার ও রুচির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় কার্য্যেরও উৎকর্ষ আবশ্যক হইয়াছে এবং সেজন্য চেষ্টাও হইতেছে। ···বঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনে আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্মনীতিরও উন্নতি হইতে পারে।'[১৫] ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখ এ পত্রিকায় 'কৈস্যচিৎ শিশু হিতৈষিণ'-এর একটি পত্র ছাপা হয়। এতে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করার ফলে অনেক বালকদেরই সর্বনাশ হচ্ছে, একথা বলতে গিয়েও পত্রলেখক

www.pathagar.com

জানান, 'চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধূম পড়িয়াছে। ... ... বৃদ্ধপিতামহ কালের ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী হাফ আখড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা দেখিয়া কেন আনন্দিত হইবেন? সেকালের বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল খেঁউর গান বা ছড়া কাটা-কাটি লইয়া আর বিবাদ করেন না। কবির লড়াই প্রভৃতির আমোদে বঙ্গ-বাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না।'[১৬] অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেক অপকার হচ্ছে, এবং কোনো মতেই নারীদের অভিনয় করা উচিত নয়—একথা বলতে গিয়েও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (পৌষ, ১৭৯৭ শক) লিখেন, 'নট মানব প্রকৃতির আদর্শ, .. উহারা যা কিছু করে যা কিছু ভাবে, সমস্তই নির্দিষ্ট নিয়ম ও শিক্ষার আয়ত্ত। আমরা নিজের অবস্থার প্রতিবিম্ব উহাদিগের মধ্যে দেখি, বর্তমানে আমরা যাহাতে আছি, ভবিষ্যতে যাহাতে থাকিতে ইচ্ছা করি, এবং যাহা আমাদিগের স্পৃহনীয় নয়, আমরা এই সমস্তই তাহাদিগের মধ্যে দেখি।

রঙ্গভূমি জন্মভূমি জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরাও উহার অনুকরণ করি। ... ইহা যে কেবল আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃত করে তাহা নহে, প্রত্যহ আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি শিক্ষা পাই, ইহা মানব জীবনের একটী প্রকৃত ও বিশদ চিত্র। ... ইহা দুষ্প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত করে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণার অধীন রাখে, এবং সুশীলকে প্রশংসা করিতে অবসর দেয়।'[১৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থের বাঙলা মূলতঃ সে শতকের প্রথমার্ধের ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতি জীবন এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারাই ঐতিহ্যবাহী। মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসী ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য জনিত কারণে প্রাচীন ও নবীনের যে সংঘাত সংঘর্ষের ফলে, যে শতকের প্রথমার্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ও নকশা জাতীয় রচনার সৃষ্টি হয়, এবং সেগুলোতে সমসাময়িককালের সমাজ চিত্র-প্রদর্শনীর যে স্ফুরণ ঘটতে শুরু করে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে প্রহসনগুলোতে তা-ই অনেকটা মননশীল, যুক্তিনির্ভর ও বিস্তৃত-বিকাশের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বাঙালীর সমাজজীবন নিয়ে সেকালে কত নাটক-নাটিকা-প্রহসন কৌতুক নাট্য লেখা হয়েছিল, একালের পাঠক তা ধারণাও করতে পারবেন না। নাড়ী চঞ্চল হয়ে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুরাতন কলকাতার সেই চাঞ্চল্য এই এই সমস্ত নাটক-নাটিকায় পাওয়া যেত—তার থেকে সামাজিক উত্তাপটাও ধারণা করা যাবে।'[১৮]

প্রহসনগুলোতে বিধৃত সমস্যার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কৌলীন্য ও জাঁত পাত, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, পণপ্রথা, নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা, ইংরেজী শিক্ষিতের অভিমানিতা, হঠাৎ-বাবু, মদ্য পান, নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি, প্রাচীন-পন্থী রক্ষণশীল মর্যাদার অসারতা, ধর্মের নামে উৎকট গোঁড়ামি, ধর্মধ্বজ-লম্পট, বৃদ্ধের বালিকা বিবাহ প্রভৃতিই মুখ্য। নরবলি, সতীদাহ ও গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জনের মতো বর্বর-পৈশাচিক প্রথাগুলোর উচ্ছেদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই হয়ে গিয়েছিলো বলে, সেগুলোর কোনো চিত্র প্রহসনগুলোতে পাওয়া যায় না। চড়ক পূজার বীভৎসতাও উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বিলুপ্তির পথে ছিলো বলেই এর চিত্রও প্রহসনগুলোতে তেমন চোখে পড়ে না। তবে সে সময়কার সংবাদপত্রের দু' একটি খবর এবং নকশা ও নকশাজাতীয় কিছু রচনা হতে অবগত হওয়া যায়, এর অনেকটা মার্জিত প্রভাব সমাজের কোথাও কোথাও তখনো বর্তমান ছিলো।

আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসজনিত কারণ এবং প্রাচীন রক্ষণশীল মনোভাব ও নবজাগ্রত উদগ্র সংস্কার-পন্থী এষণা এ দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তেজনামুখর চাঞ্চল্যকর পরিবেশেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙলার কৌতুক ও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার জন্ম। সে শতকের দ্বিতীয়ার্ধও যে আত্মস্বচেতন ব্যক্তিদের সংস্কার প্রেরণা ও প্রাচীন-নবীনের এ সংঘাত সংঘর্ষেই মুখরিত ছিলো, তার প্রমাণ প্রহসনগুলো। রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে মীর মশাররফ হোসেন পর্যন্ত সকল প্রহসনকারই মূলতঃ সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের প্রহসনে সমাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করতে, এবং এর মধ্য দিয়েই নিজ নিজ বক্তব্যকেও তুলে ধরে সমাজকেই শিক্ষা দিতে। তখনকার অগণিত প্রহসনকারের মধ্যে, কেউ কেউ যে নিছক আনন্দ প্রদান বা জনগণকে হাসাবার জন্যই প্রহসন রচনা করেছেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য প্রহসন ও প্রহসনকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজকেই শিক্ষা দেয়া—তা প্রাচীন পন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেই হোক অথবা নব্যপন্থীদের মতবাদ-আদর্শের দিক থেকেই হোক। তাঁদের সে সব প্রহসন পাঠ করে বা তার অভিনয় দেখে পাঠক দর্শকরা সেদিন প্রাণ খুলে হেসেছিলেন, সে হাসির প্রকার ভেদও ছিলো। কিন্তু 'জীবনে হাস্য যেমন হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়, সাহিত্যেও তেমনি।'[১৯] উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত প্রহসনগুলোর সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার সময়েও এ কথাটি আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হয়।

কোনো কোনো সমালোচক কিন্তু প্রহসনগুলোর নিছক হাসি-আনন্দের দিকটাকেই বলা চলে একান্তভাবে লক্ষ্য করেছেন। শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

www.pathagar.com

বলেন, রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' হইতে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' এবং তাহার পরে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' হইতে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'-এ সবই আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত।'[২০] তিনি 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-এর অভিনয় প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেন। এ প্রহসনটির অভিনয়-দর্শনের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা 'দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত।'[২১] আমাদের মনে হয় ঘোষ মশাই এরূপ আলোচনার সময় দর্শকের সে হাসির বিশেষ তাৎপর্যের দিকটিই যথার্থভাবে লক্ষ্য করার অবকাশ পাননি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সে যুগের এ প্রহসনগুলো পাঠ করে বা তার অভিনয় দেখে পাঠক-দর্শকরা সেদিন প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে হাসির প্রকারভেদও ছিলো। কখনো বিশুদ্ধ হাসি, কখনো হাল্কা-কৌতুক হাসি, কখনো শ্লেষের হাসি, কখনো অট্টহাসি, কখনো কান্নার হাসি, আবার কখনো বা কাষ্ঠ হাসি প্রভৃতি। বলাই বাহুল্য, হাসির এ প্রকার ভেদের জন্য প্রহসনকাররাই দায়ী। হাসির মধ্য দিয়ে সমাজকে শিক্ষা দেয়াইতো তাঁদের উদ্দেশ্য। Serious সাহিত্য বা সাহিত্যের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের লক্ষ্য জীবনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি—এরই অপর নাম উনিশ শতকের বাঙলার প্রহসন (সামাজিক কথাটা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করলেও চলে)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই লক্ষ্য করেছেন, 'সামাজিক কুপ্রথা, ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণের মোহ, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজের অগ্রগতির পথ সেদিন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই ইহাদের অবসানের জন্য সেদিন যেমন আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন, নিছক শিল্প সৃষ্টির জন্য তেমন উৎসাহশীল হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাই ছিল সেদিনকার প্রহসনগুলোর স্বক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহারা আর কোনও দাবী সেদিন পূর্ণ করিতে যায় নাই।'[২২] ডঃ শীতাংশু মৈত্র লিখেছেন, 'নাটক, প্রহসন বা রসরচনার বেলায় প্রকট হইয়া উঠিল এ যুগের সাহিত্যের প্রচার পরায়ণতা (tendentiousness)। এ সময়ের সাহিত্যিকেরা কলা-কৈবল্য বাদী (art for art's sake) ত ছিলেনই না, এমন কি রসবাদীও ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইহাদের প্রায় সমস্ত রচনাই উদ্দেশ্যমূলক এবং উদ্দেশ্য হইল সমাজ-কল্যাণ, সে অবাঞ্ছিতের সমালোচনা করিয়াই হউক অথবা বাঞ্ছিতের গুণোদ্ঘোষণ করিয়াই হউক।'[২৩] ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ও স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'শুধু হাসাইবার জন্য নহে, সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই এইসব প্রহসনের উদ্ভব।'[২৪]

www.pathagar.com

চার

উনিশ শতকের বাঙলায় প্রহসনগুলো যে নিছক তামাসা বা হাসি-আমোদের জন্যই রচিত হয়নি, বরং অনেকক্ষেত্রেই তার মূলে যে সমাজকে শিক্ষা দেয়ার একটি বাঞ্ছাই বর্তমান ছিলো, তা প্রহসনগুলোর ভূমিকা, চরিত্রের বিশেষ নামকরণ, তার বিশেষ বিশেষ সংলাপ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এমনকি প্রহসনগুলোর নামের প্রতি লক্ষ্য করলেও অনেক ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য-বক্তব্য সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। 'কুলীন কুল সর্বস্ব' (১৮৫৪ খ্রীঃ)-এর বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ তর্করত্ন বলেন, 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।' এর দু'বছর পরেই (১৮৫৬ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক। এখানে এর ইংরেজী ভূমিকার অংশ বিশেষও উল্লেখ করা যেতে পারে: 'Composed originally with a view to aid a good but not a very popular cause, the piece was simply adopted to the circumstances of the time. The author intended in neither for the stage nor for a permanent place in the vernacular library … .'

রামনারায়ণের বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটক' (১৮৬৬ খ্রীঃ)-এর নামকরণেও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রহসনটির বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেন, 'আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহু বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম।' গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রহসনটি উপহার দিতে গিয়ে তিনি লিখেন, 'নব-নাটক স্বরূপ কুসুমমালা মহাশয়কে প্রদান করিলাম। ইহা বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।' প্রহসনটির যবনিকান্তে সূত্রধর বলেন, 'আর কি আপনারা বহু বিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন? ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন? যাতে ঐ নানা দোষাকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না? যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্হকর্তা কৃতার্থ হন।' তাঁর 'চক্ষুদান' (১৮৬৯ খ্রীঃ)-এ নিকুঞ্জবিহারী বলেন, 'বসুমতী, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই চক্ষুদান হলো। (সভাপতি কৃতাঞ্জলি পূর্বক) সভ্য মহাশয়েরা কি বলেন? 'এ আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান।' প্রহসনকারের 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯খ্রীঃ)-এ দু' স্ত্রী দু' দিক থেকে কর্তাকে টানতে শুরু করলে কর্তা বলেন, 'আমি সভ্য মহাশয়দিগের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাত ছাড়ে

www.pathagar.com

না যে, কৃতাঞ্জলি হতে পেলেম না, কি করি সভ্য মহাশয়েরা, একটা কথা বলি, ওরে একটু স্থির হ, অগো মহাশয়েরা, আমার দুর্গতি আপনারা দেখছেন আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ কেহ থাকেন তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না ... জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এইরূপ 'উভয় সংকট।'

মধুসূদনের প্রহসন গুলোতেও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকেনি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০ খ্রীঃ)-য় প্রহসনকারের জিজ্ঞাসা হরকামিনীর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। প্রসন্নময়ীকে লক্ষ্য করে হরকামিনী বলেন, 'বেহায়ারা আবার বলেকি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। ... মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' (১৮৬০ খ্রী)-তে ভক্তপ্রসাদ নিজের সম্বন্ধে বলেন ঃ

'বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্যে খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্লো ধর্ম্ম, 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ॥'

দীনবন্ধুর প্রহসন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খ্রীঃ)-এর উৎসর্গে দীনবন্ধু একে একটি 'নির্দোষ-আমোদপ্রদ' প্রহসন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রহসনকার, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে বিবাহ-বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের নামাবলিতেই শুধু পাঁঠার নাড়ি-ভুড়ি, বাঁধিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, পেঁচোর মাকে দিয়ে তাঁর গায়ে শুয়োরের ছানাও নিক্ষেপ করিয়ে ছেড়েছেন।[২০] প্রধানতঃ রামমণির সে মুহূর্তের উক্তির মধ্য দিয়েই প্রহসনকারের উদ্দেশ্যেরও অভিব্যক্তি ঘটেছে ঃ 'কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শুয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও।' 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬ খ্রীঃ)-এর মলাটে দীনবন্ধু যে সব উদ্ধৃতি ছেপেছেন, তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন ঃ 'O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee—Devil.

অথবা

'Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd?—প্রভৃতি।

'জামাই বারিক' (১৮৭২ খ্রীঃ) প্রহসনটি রাসবিহারী বসুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে দীনবন্ধু লিখেন, 'বহুকাল পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত

www.pathagar.com

দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম "জামাই বারিক।" এই প্রহসনের মলাটের উদ্ধৃতিটিও প্রহসনকারের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যক্ত করছে: 'Of all the blessings on earth the best is a good wife; A bad one is the bitterest curse of human life.

'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'-এও দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকেনি। প্রহসনের শেষে বিচারপতি বলদ পঞ্চানন বলেন:

'গান দিলেম যশ পেলেম মন্দমজা নয়।
কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥'

ভোঁদা বলেন:

'চল ভাই ঘরে যাই পালা হল শেষ।
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥'

রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রহসনে যে একটি উদার-প্রগতিশীল ও সংস্কারকামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালে এসে মূলতঃ তা ভিন্ন খাতেই প্রবাহিত হতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরাও সমাজকে সংস্কার-সংশোধন করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা যে প্রাচীন ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সেজে প্রগতিশীল সমাজের বাস্তবতাকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন এবং নিজেদের রক্ষণশীল চিন্তাধারার জগদ্দল পাথর-চাপা দিয়ে সে সমাজের অগ্রগতির কণ্ঠরোধ করতে প্রয়াসী ছিলেন, এর প্রমাণ মেলে তাঁদের অধিকাংশ প্রহসনেই। এ ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্র নাথের অনুসারীই বলা চলে। তবে যেদিক থেকেই হোক, তাঁদের রচিত প্রহসনগুলোও যে নিছক হাসি বা আনন্দ-কৌতুক প্রদানের উপকরণ নয়, সে গুলোও যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যেরই অভিব্যক্তি মাত্র, তাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিলো, 'কিরূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি সাধিব'। তিনি প্রধানতঃ তাঁর প্রহসনগুলোর পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়েই নিজের আদর্শ-উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তির দায় এড়ানোর জন্য এখানে মাত্র দু' একটি উদাহরণ দেয়া গেলো। 'বড়দিনের বখশিস' (১৮৯৪ খৃষ্টঃ)-এর পুঁটে বলেন, 'অমন কুলতিলক পিতা আর গুণেরধ্বজা শিক্ষাকর্তার জন্যেই তো মূলকে বেকুব ভরা। ··· মাষ্টারের যদি হিতাহিত জ্ঞান থাক্‌তো, যদি হিত শিক্ষা দিত, তা, হ'লে কি ছাত্র বল্‌তো, ড্যাম হিঁদুয়ানি, মা-বাপকে ওল্‌ড ফুল বল্‌তো?' সভ্যতার পাণ্ডা (১৮৯৪ খৃষ্টঃ)-য় পুরাতন বর্ষ সভ্যতাকে বলে, 'বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ রহিত, কন্‌সেণ্ট অ্যাক্‌ট প্রভৃতি মহা মহা কীর্তি'

www.pathagar.com

স্থাপন করে গিয়েছেন, ··· আজও যে আপনার নামে কলঙ্ক অর্পণ করিনি, এতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আনতে পারি বা না পারি, হিন্দুর ডাইভোর্স-অ্যাক্ট সম্বন্ধে উথাপন করেছি।'

অমৃতলাল সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। এখানেও আমরা দু'চারটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই তাঁর রচিত কিছু প্রহসনের উদ্দেশ্যের পরিচয় দেবো। বাঙলা দেশে নাটক-প্রহসন রচনা ও অভিনয়ে প্রভৃতির শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি কটাক্ষ করেই অমৃতলালের 'তিল-তর্পণ' নাটকটি (১৮৮১ খৃীঃ) রচিত। প্রহসনটির প্রতি তথাকথিত নাট্য-প্রহসনকার বা অভিনেতা অভিনেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েই উসর্গ পত্রে তিনি লিখলেন, 'বঙ্গীয় নট, নটী, নাট্যকার নিকর কর স্থল পদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায় উপহার প্রদত্ত হইল।" 'তাজ্জব ব্যাপার' (১২৯৭ সাল)-এর প্রস্তাবনায় রঙ্গনারীরা গীত করেন।

'ফাটকে আটক রবনা।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।।···
আমরা সব কলেজে যাব নলেজ পাব,
··· করবো সুখ বাবুয়ানা,
এখন তোমরা কুটনো কোটো বাটনা বাটো
দাও লক্ষ্মী পুজোর আল্‌পনা।।'

'রাজা বাহাদুর' (১৮৯১ খৃীঃ)-এ কালাচাঁদের উক্তিঃ 'মফস্বলে দেড় কাঠা ভুঁই থাকলেই কল্‌কেতায় এসে অনেক জমীদার হয়, এসেই গোছ, দেখেছে বড় বড় জমীদারদের গবর্নমেন্ট মান্য করে, খেতাব টেতাব দেয়, এও তাই খেপেছে, "এ্যাং যায় ব্যাং যায়, খোলসে বুড়ী বলে আমিও যাই।" 'কালাপানি বা হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা' (১২৯৯ সাল)-এর নামকরণেই উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত। 'একাকার' (১৩০২ সাল)-কে প্রহসনকার বলেছেন, 'একখানি কৌতুক নাট্য, ... উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন। 'বাবু' (১৩০০ সাল) ও 'বৌমা' (১৩০৩ সাল)-তে প্রহসনকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে যথাক্রমে তিনকড়ি ও মতিলালের মাধ্যমে।

অন্য কয়েকজন প্রহসনকারের প্রহসন রচনার একই ধরনের উদ্দেশ্যের দিকেও এখানে খানিকটা দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২ খৃীঃ)-এ বিধুমুখী দর্শকের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

'মিটিল ঝগড়া-ঝাঁটি আর গোলযোগ।
সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ।
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম্ম-ভোগ।
এখন দর্শকগণ খ্যাটে দেও যোগ।'

www.pathagar.com

তাঁর 'এমন কর্ম্ম আর করবনা' (১৮৭৭ খ্রীঃ) পরে (১৯০০ খ্রীঃ) 'অলীক বাবু' নামে প্রকাশিত হয়। দু'টো প্রহসনের নামকরণ থেকেই প্রহসনকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'এর উপায় কি' (১৮৭৫ খ্রীঃ)-এর দ্বিতীয় মুদ্রণের 'লিখকের কয়েকটী কথা'য় বলেন, 'বিষয়টী ভাল নয়—কিন্তু রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজলে যে, না পাওয়া যায় তাহা নহে।...বিষয়টী যতই কেন কদর্য্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,...বাবুদিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বার্থক মনে করি।' 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি লিখেন, 'মাঝে দুই তিন ছত্র পাঠ করিয়া লিখককে গালাগালি দিবেন না। প্রথম সংস্করণে ... কয়েকখানি পত্রিকা বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিবার বলিয়াছেন। ... কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে, কখনি সংকোচিত হইব না।' ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কিছু কিছু বুঝি' (১২৭৪ সাল)-এর 'মুখবন্ধ'-এ লিখেছেন, "কয়লা হাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের" অধ্যক্ষবৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার সংশোধন বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্প বয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটী প্রস্তাবে এই "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম। ... গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী পাঠক মহাশয় মহোদয়েরা এই একটি প্রস্তাবের শব্দগ্রাহী ও রচনা প্রিয় না হইয়া মর্ম্মগ্রহণ করতঃ দেশাচার সংশোধনে দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইব।' 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৭০ খ্রীঃ)-এর ভূমিকায় হরিমোহন রায় (কর্মকার) লিখেছেন, 'প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব, কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ।' গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব' (১৮৭৪ খ্রীঃ)-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ

'বাংলার উন্নতিশীল নব সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতিপ্রেম ডোরের বন্ধনে।
উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ,
গড়লেম্ "বাঙ্গালী সাহেব" নব্য প্রহসন।।
যদি কারো মস্তকেতে টুপি হয় ফিট।
হিন্ট লয়ে শুধ্রে যাও হয়ে পড় টিট্।।'

www.pathagar.com

রামচন্দ্র দত্তের 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪ খ্রীঃ)-এর দৃশ্যারম্ভের পূর্বেই গানের অবতারণা ঃ

'একি প্রাণে সয় কভু একি প্রাণে সয়
সুবর্ণ ভারতভূমি ছারখার হয়।'—ইত্যাদি।

'বারইয়ারী পূজা' (১৮৭৮ খ্রীঃ)-এর ভূমিকায় শ্যামাচরণ ঘোষালের বক্তব্য হোল, 'আমি গ্রন্থকর্ত্তার পদাকাঙ্ক্ষী কিংবা অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ইহা প্রকাশ করিতেছিনা, সমাজে কতকগুলি কুরীতি সংশোধন করাই আমার পুস্তক খানির একমাত্র উদ্দেশ্য।' রাজেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'পাঁচ পাগলের ঘর' (১২৮৭ সাল) প্রহসনের 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন, 'সংসারে নানা প্রকার কুক্রিয়ার অধিষ্ঠান, অতএব যাহাতে কতক পরিমাণে সামাজিক দোষের লাঘব হয়, এই উদ্দেশ্যে কাব্য-নাটক প্রভৃতি অপেক্ষা প্রহসনের আবশ্যকতা জন্মিয়াছে।'

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'চক্ষুস্থির' (১৮৮২ খ্রীঃ)-এর মলাটে লেখা আছে ঃ

'গোলাম অধম যত আর্য্য জাতিগণ
না পারি সহিতে আর পর পদাঘাত।
ভণ্ডামি দেখিয়া কত সহিব যন্ত্রণা।
দেখে শুনে তাই আজি হলো চক্ষুঃস্থির।।'

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ডাক্তার বাবু' (১৮৯০ খ্রীঃ)-এর ভূমিকাংশ এরূপ ঃ 'আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কিনা, আমি সে বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি নাই, আমি কেবল ইহাই দেখিয়াছি যে, আমার নাটকে ঘটনা সকল প্রকৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ··· আমি পাঠকদিগকে চমৎকার করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু উপকার হইতে পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারে।'

আলোচনা আর দীর্ঘ না করেও আমরা মনে হয় আমাদের পূর্বের কথায় ফিরে যেতে পারি—উনিশ শতকের বাঙলার প্রহসনগুলো নিছক তামাশা বা হাসি-কৌতুকের জন্যই রচিত হয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তার মূলে সমাজকে শিক্ষা দেয়ার একটি বাসনাই বর্তমান ছিলো।

পাঁচ

একটি সুস্থ ও স্বচ্ছ সমাজ গঠনে উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত প্রহসন-গুলোর যে বিশেষ অবদান রয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য। মূলতঃ ইংরেজী

www.pathagar.com

শিক্ষার প্রবর্তন ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসারের ফলেই আমাদের সমাজের অনাচার-কুসংস্কারগুলো 'আমাদের চোখের সম্মুখে নগ্নরূপ ধারণ করিয়া অত্মপ্রকাশ করিল।[২৬]

তখন নিষ্ঠার সঙ্গে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সমাজকে শিক্ষা প্রদানের লৌকিক দায়িত্ব নিয়ে বাঙলার প্রহসনকাররাই এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের বিচিত্র অন্যায়-অসঙ্গতিকে তাঁরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নির্মম কশাঘাতে উম্মোচিত করলেন—রামনারায়ণই ছিলেন তাঁদের পুরোধা। তাঁর 'কুলীন কুল সর্বস্ব'ই অনুপ্রেরণা যোগালো সমসাময়িক কালের অনেক প্রহসনকারের, এবং তা আদর্শ হয়েও থাকলো অনেক প্রহসনের।

সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকার আলোচনা-সমালোচনা থেকেই অবগত হওয়া যায়, এ প্রহসনটি সেকালের সমাজে কতোটা প্রশংসিত-সমাদৃত ও এর প্রভাবও কতোটা প্রত্যক্ষ হয়েছিলো। ১৮৫৪ খৃীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেন, 'গৌড়ীয় ভাষায় এতাদৃশ মনোহর নাটক প্রকাশে দেশের অনেক কুনীতি নিমূর্ল হইবে।' ঐ বছরের ২৬শে ডিসেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকর' এ লেখা হয়, 'কোন শাস্ত্রেই কুলীনের কথা লিখিত হয় নাই, কিন্তু দেশীয় প্রথা এমত প্রবল যে কেহই তাহার উচ্ছেদ নিমিত্ত সাহসিক হইতে পারেন না, এ বিষয়ে এই পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।' 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা (৩য় পর্ব, ১৭৭৬ মাঘ, ৩৫ খণ্ড) বলেন, 'আমরা স্বয়ং উপঢৌকন স্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকট প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি ··· বল্লালসেনিয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্য কল্প।' ১৮৫৮খৃীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এ যে বিবরণটি ছাপা হয়, তা আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে: 'The acting of the Koolin-Koolsharobosow Natack at Chinsurah has, it appears given, great offence to the Koolins of the locality.' প্রহসনটির প্রতি রক্ষণশীল-কুলীন সম্প্রদায়ের এ বিদ্বেষী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব, ক্ষয়িষ্ণু ও ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের ওপর যে এক প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এবং এ সঙ্গে প্রহসনকারের উদ্দেশ্যমূলক রচনা-সৃষ্টির চরম সার্থকতার বিষয়টিও এখানেই বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তখনকার বাঙালী সমাজের প্রায় সর্ব-সমাদৃত নাট্যকার রামনারায়ণের অন্যান্য প্রহসনও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক রচনাই। কিন্তু জীবন-ভিত্তিক রচনা

www.pathagar.com

বলেই সেগুলোর প্রভাবেও যে, সেকালের জরা-জীর্ণ-রক্ষণশীল বাঙালী সমাজ আলোড়িত-শিহরিত ও দীক্ষিতও হতে পেরেছিলো, একথাও মনে হয় বলাই বাহুল্য।

উনিশ শতকের বাঙলায় স্বচ্ছ ও সুস্থ সমাজ গঠনে মধুসূদন-দীনবন্ধুর প্রহসনগুলোর প্রভাবের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের প্রহসন দু'টো, 'একেই বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে যথাক্রমে ইংরেজী শিক্ষাভিমানী—অতি প্রগতিবাদী ও অসামাজিক বেলেল্লাপনায় লিপ্ত উচ্ছৃংখল যুবক সম্প্রদায় এবং প্রাচীনপন্থী-রক্ষণশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তিদের চিত্র এতোই নিখুঁত-বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠেছে যে, তা দেখে সেদিন উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাই চমকে ওঠেছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, দর্পণে নিজের মুখ দেখে ভয় পেলেও—এক সম্প্রদায়ের নিকট অন্য সম্প্রদায়ের চিত্রটি ছিলো খুবই বাস্তব—স্বাভাবিক ও উপভোগ্য। অভিনয়ের জন্যই প্রহসন দু'টো রচিত হয়েছিলো। কিন্তু উক্ত দু' সম্প্রদায়ের চাপে বিরক্ত হয়েই শেষ পর্যন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালা কর্তৃপক্ষকে দু'টো প্রহসনের অভিনয়ই বন্ধ রাখতে হয়। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, মধুসূদনের প্রহসন দুটোতে সেকালের ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ কতোটা নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছিলো এবং সেগুলোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নির্মম কশাঘাতে সে সমাজের নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাও কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন।

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত। প্রহসনকারের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র এ প্রহসনটি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'মদিরা রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইল। ··· শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ দেশানুরাগিগণ সেই সময়ে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তদানীন্তন সমাজের দুর্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণ জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন।'[১৭] তিনি আরো জানান, 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হবার পর প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, 'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে এখন আমাদের সোসাইটী উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে'।[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র যে এ প্রহসনের চরিত্রগুলোকে 'জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি' এবং এবং এর ঘটনা-গুলোর মধ্যে 'কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা' রয়েছে বলে লিখেছেন, একথা আমরা

www.pathagar.com

পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অনেকে মনে করেন নিমচাঁদ মধুসূদনেরই ক্যারিকেচর। কিন্তু এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে, দীনবন্ধু জানিয়েছিলেন যে মধু কখনো নিম হয়না।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও অনেকটা মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর আদর্শে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'এ প্রহসনটি জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। 'ব্যধিগ্রস্ত সমাজে প্রহসনটির প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে সত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। ... দীন বন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক ... ... রাজীব মুখোপাধ্যায় ... ... রাজীব জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন।'[২৯] রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামক পুস্তকে, ... স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অধিক বয়সেও পুনর্ব্বার বিবাহ করনেচ্ছু লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৩০] সেকালের সমাজের দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক'-এর প্রভাব সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে। জনৈক পাঠক লিখেছেন, 'দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাই বারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সেই বই তিনি বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে জানাইলাম এ বই আমি পড়িবই।' এক সময়ে সে বই তিনি পাঠ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন, তা-ই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়ঃ 'বই পড়া হইল। তাহার পর চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সে দশা।'[৩১] ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র বলেন, 'এ হাসির বিনিময় হেতু কি? হয়ত বা তাঁদেরই পরিবারের একটা কৌতুককর দিকের উদ্ঘাটন হয়েছে।'[৩২] রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন, 'কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘর জামাই রাখেন বা ঘর জামাই থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।'[৩৩] এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি দীনবন্ধুর প্রহসনের প্রভাব সেকালের ব্যাধিগ্রস্ত বাঙালী সমাজে কতোটা প্রত্যক্ষ ও সর্বব্যাপী হয়েছিলো। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'Dinabandhu Mitra was in those days one of the most favourit of our dramatists. Dinabandhu's dramas were instinct with both a lofty social idealism and a high standard of ethical conduct ......

www.pathagar.com

Those were the days of social reform and political freedom, and the stage fully represented these intellectual and moral currents flowing over the educated Bengalee Community. It was indirectly doing the very work to which the Brahmo Samaj had consecrated itself.'[৩৪]

মধুসূদন-দীনবন্ধুর প্রহসন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ অজিত কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'মাইকেল ও দীনবন্ধু মিত্র, বাংলার এই দুই প্রথম নাটককারের নাট্যগুলির বেশির ভাগই সামাজিক প্রহসন ছিল। ইহার কারণ কি ? কারণ, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে এদেশের প্রাচীন রীতিনীতির যে একটা উল্টাপাল্টা কাণ্ড ও মানুষের চরিত্রের মধ্যে একটা উচ্ছৃংখল উন্মত্ততা দেখা দিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রহসনের বিষয়। ... মাইকেল ও দীনবন্ধু দুজনেই এই জন্য, সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রই তাঁহাদের নাটকের ভিতর দিয়া আঁকিয়াছিলেন। ... ইহা তখন একটা শক্তি এবং সমস্ত দেশময় সেই শক্তির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছিল।'[৩৫] তাঁদের প্রহসনগুলোর অভিনয়ে সমাজের যে কিছু উপকার হচ্ছিলো, তার প্রমাণ সেকালের পত্র-পত্রিকাগুলোতেও পাওয়া যায়। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'ব্যঙ্গ নাট্যাভিনয়' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক পত্রলেখক, 'সোমপ্রকাশ' (১ বৈশাখ, ১২৮১)-এ লিখেন, 'সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য কি ? কেহ কেহ বলিবেন দেশের নিন্দনীয় রীতিনীতি প্রভৃতির অনিষ্টকারিতার অভিনয় দ্বারা লোকের মনে তৎপ্রতি ঘৃণা বা বিরাগ উৎপাদন করা এবং তদসঙ্গে ঐ সকলের সংশোধন স্পৃহার বীজ দর্শকগণের হৃদয়ে নিহিত করাই নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য। ... "একেই কি বলে সভ্যতা" ... 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা এতদুদ্দেশ্য কতকাংশে সাধিত এবং তৎপ্রদর্শিত ঘৃণিত আচারোচ্ছেদের প্রবৃত্ত্যুদ্দীপক হইতে পারে কিন্তু "বিদ্যাসুন্দর নাটক'... প্রভৃতির অভিনয় দ্বারা কোন উদ্দেশ্যকে নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিবনা।'

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল যে মূলতঃ রক্ষণশীল ও সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এবং এই সঙ্গে তাঁও বলেছি যে, তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিতদের সংস্কার ও প্রগতির নামে বাড়া-বাড়ি, মদ্যপান, লাম্পট্যপনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও আত্মসম্মানবোধের বিসর্জন প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও তাঁদের প্রহসন গুলোতে লক্ষ্য করা যায়। এদেশের বিবিধ সংস্কার-আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজীদের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্ম-ফ্যাসন'-ধারণ করে বা ব্রাহ্ম সমাজীর মুখোশ

www.pathagar.com

উনিশ শতকের বাঙলার প্রথমার্ধে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার যে ঘাত-প্রতিঘাত আমরা লক্ষ্য করি, ঐ শতকের পুরো দ্বিতীয়ার্ধেও অনেকটা তারই জের চলতে থাকে। তবে এর মধ্য দিয়েও যে তদানীন্তন সমাজ অনেকটা সুস্থ ও স্বচ্ছ-রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলো একথা অস্বীকার করা যায় না। সমাজের সাধারণ (Common) দোষত্রুটি, অন্যায়-অসংগতি গুলোর প্রতি উক্ত দু' সম্প্রদায়ের কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বরূপ ছিলো মোটামুটি একই ধরনের। ফলে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত ও প্রগতিশীলদের সংস্কার প্রভৃতির নামে বাকসর্বস্বতা, অসামাজিক বেলেল্লপনা, মদ্যপান, লাম্পট্যপনা, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের বিবিধ ভণ্ডামী, ধর্মধ্বজীদের ন্যাক্কারজনক ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব সমাজের মধ্যে বিলুপ্তির পর্যায়ে নেমে না আসুক ঃ অন্ততঃ ব্যাপক হারে কমাতে শুরু করেছিলো। বাঙালী হিন্দুর আচার সর্বস্বতা, কৌলীন্য, জাতপাত, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে এবং বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব, অনেকক্ষেত্রেই রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু তাঁদের প্রহসনগুলোর মধ্য দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন। এবং এর প্রভাবও সমাজে সেদিন কম কার্যকর হয়নি। একমাত্র বহু বিবাহ প্রসঙ্গেই গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল নিশ্চুপ থেকেছেন। অন্যান্য সমস্যাকে তাঁরা যে তাঁদের প্রহসনে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন তথা এক্ষেত্রে তাঁরা যে জীবন বিমুখ-প্রাচীনকেই আঁকড়ে থাকার নীতি গ্রহণ করেছেন একথা পূর্বে একাধিকবারই উক্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টায় সামাজিক অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত হলেও, সামগ্রিকভাবে তা তখনকার মানুষের পরিবর্তিত, গতিমুখী চিন্তা ও জীবনধারাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। সেদিন যে নবোত্থিত হিন্দু ধর্ম, নব জাগরণের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ক্ষেত্রটিকে বিঘ্নিত করলো, লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তাও আসলে জাগরণেরই ফলশ্রুতি। মূলতঃ এর প্রভাবেই হিন্দু পুনর্জাগরণের নেতারা আচার সর্বস্ব, জরা-জীর্ণ ধর্মকে যথাসম্ভব 'যুক্তির' মধ্য দিয়ে পুনর্গঠিত করার জন্য সচেষ্ট হন।

উনিশ শতকের বাঙলার প্রহসনকারদের উদ্দেশ্য যে serious সাহিত্য বা সাহিত্যের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি (art for art's sake)—নয়, বরং তাঁদের যে লক্ষ্য ছিলো জীবনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি (art for life's sake–reform কথাটিও এখানে সংযুক্ত) একথাও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর মধ্য দিয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে সব রচনা সাহিত্যও হয়ে ওঠতে পেরেছে কিনা, সে সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার অবকাশ আমাদের খুবই কম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রচনাগুলো সমকালকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে, তা আমরা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছি। এবং এও আমরা লক্ষ্য করেছি যে শুধু মাত্র সমাজ-চিত্র অংকনেই

www.pathagar.com

পরে কেউ কেউ যে সমাজের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক-অবাঞ্ছিত ও হাস্যকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেছিলেন, একথাও অস্বীকার করা যায় না। গিরিশ-চন্দ্র-অমৃতলাল তাঁদের প্রহসনগুলোতে ব্রাহ্মসমাজীদের বিবিধ সংস্কার (Reform) ও গঠন মূলক আন্দোলন-প্রচেষ্টার প্রতি নজর দেয়ার অবকাশ না পেলেও, তাঁদের কারো কারো দোষ-ত্রুটিগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিশেষ কৌতুকের সঙ্গেই। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মাত্রারিক্ত-অতিরঞ্জনের মাধ্যমে চিত্রিত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। অপর দিকে মূলতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হয়েও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুয়ানীর ভড়ং ও ঠাট বজায় রাখার প্রচেষ্টা, এবং ধর্মধ্বজ হিন্দুর অন্তঃসার শূন্য ক্রিয়াকলাপ ও ভণ্ডামীর চিত্র আঁকতেও দ্বিধা করেন নি। এর প্রভাব সেকালের সমাজে দুদিকে থেকেই প্রতিফলিত হয়েছিলো। একদিকে 'ব্রাহ্ম-ফ্যাসন'ধারী' ব্রাহ্ম সমাজের মুখোশ পরা ব্যক্তিরা সচকিত হলেন, এবং একই সঙ্গে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের সমাজের অসংগতিগুলোকে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ পেলেন। অপর দিকে হিন্দুয়ানীর ভড়ং ও ঠাট বজায় রাখার প্রয়াসী ব্যক্তি, মূর্খ ব্রাহ্মণ ও ধর্মধ্বজ হিন্দুরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুঝতে পেলেন, মূলতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্রদের কাছেও তাঁরা কতোটা নিন্দিত ও উপহাসিত।

মূলতঃ রক্ষণশীল ও সংস্কার-বিরোধী ছিলেন বলেই গিরিশচন্দ্র-অমৃত-লালের প্রহসনে বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ প্রচেষ্টা, নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রচলন, কৌলীন্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন, হিন্দু-পুনরুত্থান ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া[৩৬] ওঠা ব্যক্তি। তাঁদের আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রধানতঃ সেকালের নবোত্থিত হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণাবর্তিত। ফলে জরা-জীর্ণ প্রাচীনের মধ্যেই তাঁরা প্রায় সর্বক্ষণ মহত্ত্বের অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। এবং সেজন্যই বলা চলে, নবজাগরণের সুদূর প্রসারী প্রভাবের ক্ষেত্রটিকে বিঘ্নিত করার জন্য তাঁদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্যই হয়ে থাকলো। 'গিরিশচন্দ্রের 'পঞ্চরঙ' নতুন যুগের প্রতি পুরাতনের ভর্ৎসনা। গিরিশচন্দ্র দলভুক্ত নাট্যকার।'[৩৭] অমৃতলাল সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তাঁরা সামাজিক অন্যায় অনাচার ও অসংগতিগুলোকে কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সমাজকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, সে সব ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনেকটা রামনারায়ণ বা মধুসূদন-দীনবন্ধুর উত্তরসূরীই বলা চলে। তবে এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অমৃতলালই অধিক ক্ষমতার অধিকারী।[৩৮]

www.pathagar.com

তাঁরা সেদিন সচেষ্ট ছিলেন না, সে সঙ্গে সমাজকে শিক্ষা দেয়ার একটি আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিলো। জীবন-সমাজ ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ আহম্মদ শরীফ লিখেছেন, 'দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনের যোগসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ-সংস্কৃতির রূপ এঁকে দেয়া। এ জন্যে বাক্‌জাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টিরও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যাণ প্রসূ দিক উদ্‌ঘাটিত হলেই এ উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হয়।'[৩৯] কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলেও, উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত প্রহসনগুলো যে সে দায়িত্বও পালন করেছে, তা মনে হয়, অস্বীকার করা যায় না।' 'Approximation to life in the novel and the play'তে Georg Lukacs বলেন, 'Drama as the art of public life ... ... presuppose the kind of subject-matter and treatment that will correspond in every respect .. of generalization and intensification.'[৪০] সেকালের বাঙলায় রচিত প্রহসনগুলোর (নাটক বলতেও তখন মূলতঃ এগুলোকেই বোঝানো হোত) আদর্শ-উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্যের আলোচনাকালেও অনেক ক্ষেত্রেই আমার মনে হয় এ-কথাও মিলিয়ে দেখতে পারি।

'সমসাময়িক কোন অনাচার লইয়া প্রহসন লিখিত হয় এবং তাহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যখন আর কোন কৌতূহল থাকেনা তখন তাহা বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়।'[৪১] বলাই বাহুল্য, উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত প্রহসনগুলোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে অগণিত বাঙলা প্রহসন সেদিন রচিত হয়েছিলো, তার অনেকগুলোই আজ বিলুপ্ত। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এ পর্যন্ত কোনো রকমে টিকে থাকা প্রহসনগুলোর দৈহিক অবস্থাও বিশেষ আশঙ্কাজনক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোর আর পুনর্মুদ্রণেরও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবন ও সাহিত্য ধারার ইতিহাস কখনো সেগুলোর অবদানকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারে না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার পর হইতে বাংলার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন যে ভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহার ধারাটি সমসাময়িক বাংলা নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, বাংলার অন্য কোন ইতিহাস লেখকের রচনায় তাহা সেভাবে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সুতরাং এই সামাজিক নাটকগুলিই বাংলার সমাজ-জীবনের দর্পণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কোন

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের যে রূপ বিধৃত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস অপেক্ষাও জীবন্ত।'[৪২]

যে সুস্থ ও স্বচ্ছ সামাজিক পরিবেশে মননশীল ও প্রগতি-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব. বাঙলাদেশে সে পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কৃতিত্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রহসনগুলোরই প্রাপ্য। এগুলো 'সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাজ প্রগতির অবিসংবাদী সাক্ষী। আজিকার প্রগতি সাহিত্যের মূল ইহাদের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।'[৪৩] ট্র্যাজেডির গুণগত দিক বা এর ফলশ্রুতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল যাকে Katharsis বলে অভিহিত করেছেন, উনিশ শতকের বাঙলায় রচিত প্রহসনগুলোর প্রভাবের ক্ষেত্রেও যেনো সে কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে মিলিয়ে দেখার কিছুটা অবকাশ রয়েছে। কলুষিত সমাজ তথা আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের অন্যায়-অসংগতি, গ্লানি-বিকৃতি-গুলোকে অনেকটা অপসারিত করে, যথাসম্ভব একটি রোগ নিরাময় ও প্রশান্তকর অবস্থা আমাদের মনের মধ্যে এনে দিতে প্রহসনগুলো সেদিন কম সাহায্য করেনি।

তথ্যনির্দেশ

১ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা কবিতার নবজন্ম, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ২৭।

২ স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ২০৪—২০৫।

৩ রেভারেণ্ড লং-এর মতে এ জাতীয় বইগুলো হচ্ছে 'beastly equal to the worst of the French School. J. Long, A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1855, P. 676.

৪ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬-১৪২ দ্রষ্টব্য।

৫ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৬ Abu Hena Mostafa Kamal, The Bengali Press and Literary Writing-1818-31, University Press Limited, Bangladesh, 1977, P. 115.

৭ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫-২০৬।

৮ Abu Hena Mostafa Kamal, Ibid, P. 195.

৯ গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃঃ ২০০।

১০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ২৯।

১১ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬০।

১২ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

১৩ Jan Gonda (Edited), A History of Indian Literature, Ibid, P. 252.

১৪ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮৪-৮৫।

www.pathagar.com

১৫ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮৭-৮৮।
১৬ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮৯।
১৭ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৩-৬৪।
১৮ প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ভূমিকা, দশ।
১৯ ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও মূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃঃ ৩৯।
২০ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বাঙ্গালা নাটক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃঃ ১৫৯।
২১ প্রাগুক্ত. পৃঃ ১৫৯।
২২ জয়ন্ত গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ভূমিকা, তেরো।
২৩ শীতাংশু মৈত্র, যুগন্ধর মধুসূদন, কলিকাতা, ১৩৬৫, পৃঃ ৮৯।
২৪ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৪১১।
২৫ মোহিতলাল মজুমদার বলেন, 'প্রহসনের প্রয়োজনে এই গ্রন্থে তিনি [দীনবন্ধু] যে 'পেঁচোর মা' চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন—মনে হয়, প্রহসনের বাহিরেও তাহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে।'—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃঃ ১২৩।
২৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
২৭ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩৫।
২৮ অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পাদটীকা, পৃঃ ১১১।
২৯ বঙ্কিম রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩১।
৩০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১।
৩১ রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, উদ্ধৃত, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৭-৪৮।
৩২ বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৪৪৮।
৩৩ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩।
৩৪ Memories of My Life and Times, Ibid ; pp. 300-301.
৩৫ অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃঃ ২৭২।
৩৬ বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।
৩৭ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮১।
৩৮ অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' সম্বন্ধে হারানচন্দ্র রক্ষিত তাঁর 'ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য'-এ লিখেছেন, 'সমাজ শরীরে তাঁহার তীব্র মধুর কষাঘাত এক সময়ে কম কাজ করে নাই'।—উদ্ধৃত, অরুণ কুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।
৩৯ আহমদ শরীফ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃঃ ৫৩।
৪০ Elizabeth and Tom Burns (Edited), Sociology of Literature and Drama, Penguin Books Ltd., England, 1973, P. 281.
৪১ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, মধুসূদন কবি ও নাট্যকার, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ১৪৮।
৪২ বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।
৪৩ বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ : বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৬৭।
: বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭০।
: (সম্পাদনা) রামমোহন রচনাবলী, কলিকাতা, ১৩৮০।

অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ, ও আবদুল আজিজ আল আমান : (সম্পাদনা) দীনবন্ধু রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭৪।

অজিত কুমার চক্রবর্তী, ডঃ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এলাহাবাদ, ১৯১৬।

অনাথনাথ বসু : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, কলিকাতা, ১৩৫১।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানীচন্দ : ঘরোয়া, কলিকাতা, ১৩৫৮।

অমর দত্ত : ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্স, কলিকাতা, ১৯৭৩।

অমলেন্দু দে, ডঃ : বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলিকাতা, ১৩৮১।

(অমৃতলাল বসু) : অমৃতলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ : উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭১।

অরুণ কুমার মিত্র, ডঃ : অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭০।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৬৩।
: উনিশ বিশ, কলিকাতা, ১৩৭৪।
: ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য কলিকাতা, ১৯৬৫।
: বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩৭৭।

www.pathagar.com

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৩৭৮।
: সমালোচনার কথা, কলিকাতা, ১৯৬৪।
: দুই নারী ও তিন নায়িকা, কলিকাতা: ১৯৭৬।
: (সম্পাদনা) প্যারীচাঁদ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৬১।
: (সম্পাদনা) পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন, কলিকাতা, ১৩৮২।
: (সম্পাদনা) রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, কলিকাতা, ১৯৬০।

আজহার উদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় : (সম্পাদনা) বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, মেদিনীপুর, ১৯৭৪।

আজহার ইসলাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৯৬৯।

আনিসুজ্জামান, ডঃ, : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।
: মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা,১৯৬৯।

আবদুর রাজ্জাক, মুহম্মদ : (অনূদিত) বাংলার মুসলমান, ঢাকা, ১৯৬৮

আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা, ১৯৬৯।
: (অনূদিত) দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আনিসুজ্জামান, ডঃ : (সম্পাদনা) বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ঢাকা, ১৯৬৮।

আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আনোয়ার পাশা : (সম্পাদনা) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, ১৩৭৬।

আবদুল মান্নান, কাজী, ডঃ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৬৯।
: (সম্পাদনা) মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

আবু তালিব : হজরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ)-এর জীবনেতিহাস, ঢাকা, ১৯৬১।

www.pathagar.com

আলী আহসান, সৈয়দ, : কবি মধুসূদন, ঢাকা, ১৯৭০।
আশুতোষ ভট্টাচার্য ডঃ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৮।
: বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৬৪।
: বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭০।
: (সম্পাদনা) কুলীন-কুল-সর্বস্ব, কলিকাতা ১৯৫৯।
আহমদ শরীফ, ডঃ, : বিচিত্র চিন্তা, ঢাকা, ১৯৭৫।
: সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, ঢাকা, ১৩৭৬।
: যুগ যন্ত্রণা, ঢাকা, ১৯৭৪।
ওয়াকিল আহমদ, ডঃ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৭৪।
কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাচার নকশা, নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা, ১৩৬৯।
ক্ষেত্রগুপ্ত, ডঃ : প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও মূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৩৬৬।
: মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প, কলিকাতা, ১৩৭৭।
: (সম্পাদনা) দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী, কলিকাতা, ১৯৭৫।
গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৫
: ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা, ঢাকা, ১৯৭৪।
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩৭৬।
চণ্ডীচরণ সেন, : মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের জীবনী, কলিকাতা, ১৯০৩।
জয়ন্ত গোস্বামী, ডঃ : সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, কলিকাতা, ১৩৮১।
জীবেন্দ্র সিংহ রায় : সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ১ম বর্ষ, কলিকাতা, ১৩৬৬, ২য় পর্ব, কলিকাতা, ১৩৮০।
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য : মাইকেল-সমীক্ষা, কলিকাতা, ১৩৭৯।
দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ : (সম্পাদনা) গিরিশ রচনাবলী, ১-৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪।

www.pathagar.com

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১২৯৬।

নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা, কলিকাতা, ১৯৫৭।

নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক, ঢাকা, ১৯৬৪।

: বাংলার কবি মধুসূদন, ঢাকা, ১৯৭০।

প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, ডঃ : বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭৬।

প্রফুল্ল কুমার সরকার : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, কলিকাতা, ১৩৫২।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩০৩।

: রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৯৭২।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ, চুচুড়া, ১২৯০।

: বঙ্কিম রচনাবলী, ১-২ খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৮০।

বদরুদ্দীন উমর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৪।

: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, ঢাকা, ১৯৭৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৪৬।

: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক রচিত মালা ৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯।

: মধুসূদন দত্ত, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫২।

: দীনবন্ধু মিত্র, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৭।

: (সম্পাদনা) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৪, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪২।

: (সম্পাদনা) কলিকাতা কমলালয়, কলিকাতা, ১৩৪৫।

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য : দুষ্প্রাপ্য রস সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭৯।

www.pathagar.com

বাণী রায় : মধু জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা, কলিকাতা, ১৯৬১।
বিনয় ঘোষ : বাঙলার নব জাগৃতি, কলিকাতা, ১৩৫৫।
: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৬।
: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮।
: (সম্পাদনা) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১-৪ খণ্ড, ১ম সং, কলিকাতা, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬।
বিপিনচন্দ্র পাল : নব যুগের বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৪।
বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০।
বিমল কৃষ্ণ সরকার : ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ণ, কলিকাতা, ১৯৬৩।
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৭২।
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় : (সম্পাদনা) সরস নাটক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, সন ?
বৈদ্যনাথ শীল, ডঃ : বাংলা সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৮।
: বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৭।
ভবানী গোপাল সান্যাল : (সম্পাদনা) মধুসূদনের নাটক, কলিকাতা, ১৯৬৮।
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: নববাবু বিলাস, কলিকাতা, ১৩৪৪।
ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, কলিকাতা, ১৯৬০।
ভুদেব মুখোপাধ্যায় : পারিবারিক প্রবন্ধ, হুগলী, ১২৮৮।
মজির উদ্দীন, মুহম্মদ : বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, ঢাকা, ১৯৭০।
মন্মথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরী চাঁদ মিত্র, কলিকাতা, ১৩৩৩।
মন্মথ মোহন বসু, অধ্যাপক : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।
মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, ডঃ : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, ঢাকা, ১৯৭০।
: (সম্পাদনা) মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী, ঢাকা, ১৯৬৯।
মুনীর চৌধুরী : মীর-মানস, ঢাকা, ১৯৬৮।
মুস্তফা নূরউল ইসলাম (অনূদিত) : বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, ঢাকা, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

মোহিতলাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৩।
যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলিকাতা, ১৯০৫।
যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৩৫২।
: ডিরোজিও, কলিকাতা, ১৯৭৬।
: বাংলার জনশিক্ষা, কলিকাতা, ১৩৬৫।
: বাংলার উচ্চশিক্ষা, কলিকাতা, ১৩৬০।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) : রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পঃ বঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৩৬৮।
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ : বাংলাদেশের ইতিহাস; কলিকাতা, ১৩৫২। ২য় খণ্ড, ১৩৮১।
রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩।
: রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩১৯।
রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, চুচুড়া, ১৩১৭।
রামচন্দ্র দত্ত : বাল্যবিবাহ, কলিকাতা, ১২৯৪।
রামনারায়ণ তর্করত্ন : যেমন কর্ম তেমনি ফল, কলিকাতা, ১২৭৯ সাল।
: বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাবিষয়ক নব নাটক, কলিকাতা, ১২৭৩।
: উভয় সংকট, কলিকাতা, ১২৭৬।
: চক্ষুদান, কলিকাতা, ১২৭৬।
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২।
শশাঙ্ক মোহন সেন : মধুসূধন, ঢাকা, ১৩৭৭।
শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯৫৭।
: আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩২৮।
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ : মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস, কলিকাতা, ১৩৬৯।
শীতাংসু মৈত্র : যুগন্ধর মধুসূধন, কলিকাতা, ১৩৬৫।

www.pathagar.com

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭২।

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় : ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, কলিকাতা, ১৯৭৪।

সত্যজিৎ চৌধুরী ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : (সম্পাদনা) উদ্দালক : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক সংকলন, ভাটপাড়া, ১৯৭৫।

সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী : বঙ্গীয় সমাজ, বরাহনগর, ১৩০৬।

সন্তোষ কুমার অধিকারী : বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩৭৭।

স্বপন বসু : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫।

সাধন কুমার ভট্টাচার্য : এরিস্টেটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৩৭৫।

সুকুমার সেন, ডঃ : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা,১৯৬৫, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৭০।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : (সম্পাদনা) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সমাজ, কলিকাতা, ১৩৪৫।

সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, ডঃ : মধুসূদন কবি ও নাট্যকার, কলিকাতা,১৩৭২।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ডঃ : বাংলা নাটকের বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৭১।

: বাংলা কবিতার নবজন্ম, কলিকাতা, ১৯৬২।

সুশীল কুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র, কলিকাতা, ১৩৭৯।

হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, ডঃ : বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৭৯।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ : বাঙ্গালা নাটক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

Ahmed, Kamaruddin : A Social History of Bengal, Dacca, 1970.

Ahmed, Salauddin, A. F. : Social Ideas and Social Change in Bengal, Netherlands, 1965.

Ali, Yusuf, A. : A Cultural History of India During the British Period, Bombay, 1940.

Andrews, C. F. & Mukhajee, Girija : The Rise and Crowth of the Congress in India, London, 1938.

Basu, Anathnath : Education in Modern India : A Brief Review, Calcutta, 1945.

www.pathagar.com

Basu, B. D., Major : History of Education in India under the Rule of the East India Company, The Modern Review Office, Calcutta. year ?

Baig, M. R. A. : The Muslim Dilema in India, Vikas Publishing House. PVT. LTD. India, 1974.

Buckland, C. E. : Bengal Under the Lieutenant-Governores, Vol. I, Calcutta, 1902.

Bolts, William. : Consideration on Indian Affairs, London, 1772.

Dar, Basir Ahmed : Religious Thought of Sayyid Ahmed Khan, Lahore, 1957.

De, Sushil Kumar : Bengali Literarure in the Nineteenth Century, Calcutta, 1962.

Dutt, Romesh : The Economic History of India under Early British Rule, London, 1908.

Eligabeth and Tam Burns : (Edited) Sociology of Literature & Drama, England, 1973.

Fanny Parkes : Wanderings of a Pilgrim in search of of the Picturesque, during four and twenty years in the East, with Revelation of life in the *Zenana*, Vol. I., London, 1850.

Ganguli, D. N. : Memoir of Raja Rammohun Roy, Poona, 1884.

Ghose, Lokenath : The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc. Part II, Calcutta, 1881.

Gonda, Jan, : (Edited) A History of Indian Literature, Vol. IX, Fasc. 3. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1976.

www.pathagar.com

Havell, E. B. : A Short History of India, London, 1924.

Huque, Azizul, M. : History of Muslim Education in Bengal, Calcutta, 1917.

Islam, Mustafa Nurul : Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press (1901-30), Dacca, 1973.

Kamal, Abu Hena Mostafa, Dr. : The Bengali Press and Literary Writing-1818-31, University Press Limited, Bangaladesh, 1977.

Majumdar, Bimanbehari : History of Political Thought from Rammohun to Dayanand (1821-84) Vol. I, University of Calcutta, 1934.

Majumder, R. C., Dr : British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II, Bombay, 1965.

Marx, K., and End Engels, F. : The First Indian War of Independence 1857-1859, Foreign Languages Publishing House, Moscow, year-?

Masani, R. P. : Britain in India, Bombay, 1960.

Mitra, Kishorichand : Memoirs of Dwarkanath Tagore, Calcutta, 1870.

Mukherjee, S. N. : Calcutta : Myths & History, Calcutta, 1977.

Nehru, Jawaharlal, : The Discovery of India, Asia Publishing House, 1974.

Pal, Bipinchandra : Memories of my life and Times : In the Days of My Youth, Calcutta, 1932.

Rahman, Fazlur, M. : The Bengali Muslims and English Education, Dacca, 1973.

Ramgopal : British Rule in India, Bombay, 1963.

www.pathagar.com

(Rammohun Roy) : The English Works of Raja Rammohun Roy, Panini Office, Allahabad, 1906.

Sen, Amit, : Notes on Bengal Renaissance, Calcutta, 1957.

Sen, P. R. : Western Influence in Bengali Literature, Calcutta, 1966.

Singha, Pradip : Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History, Calcutta, 1975.

Srinivas, M. N. : Social Change in Modern India, United States of America, 1968.

Stokes, Eric, The English Utilitarians and India, Oxford, 1959.

Strachey, Sir John, : India its Administration & Progress, London, 1911.

Wood Well, H. H. : (Edited) The Cambridge Shorter History of India, Cambridge University Press, 1934.

পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য তথ্য-নির্দেশ

অনুশীলন ও পুরোহিত : জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২।

অনুসন্ধান : ফাল্গুন, ১৩০০ ও ভাদ্র, ১৩০১।

নব্যভারত : অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩২৭, আশ্বিন, ১৩৩৮, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৫।

পাণ্ডুলিপি : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য সমিতি, ৩ খণ্ড, ১৩৮০।

বঙ্গ সাহিত্য : চৈত্র, ১৩২৯।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ২য় সংখ্যা, ১৩৭১ ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭৪।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : মাস, ১৭৭৬ শক।

ভারত কোষ : ৫ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৭৩।

www.pathagar.com

ভারত সংস্কারক : জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০।
ভারতী : মাঘ, ১২৯১ ও ৪১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৪।
ভারতী ও বালক : আশ্বিন, ১২৯৪।
ভাষা সাহিত্য পত্র : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮২।
মাসিক বসুমতী : ফাল্গুন, ১৩০০, বৈশাখ, ১৩৩১ ও শ্রাবণ, ১৩৩৬।
রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা : কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৪।
সচিত্র শিশির : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।
সাহিত্য : ১১শ সংখ্যা, ১৩০৬।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ২য় সংখ্যা, ১৩৩৫, অষ্টত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৮।
(The) Amrita Bazar Patrika, Dec. 23, 1893, Janu. 4, 1894.
Bengalee, 21 July, 1866.
(The) Calcutta Review, April-June, 1971.
Census of India (Bengal), 1819, Vol. IV, Part B; 1901, Vol. VI A, Part II and Vol. VI Part I, 1921, Vol. V Part, II.
Hindoo Patriot 19 Mar, 1857, 23AP. 1866 and 1 Ap. 1872.
(The) Indian Daily News Dec. 29, 1896, Janu. 11, 1898.
(The) Indian Mirror Dec. 27, 1893.
(The) Statesman Dec. 25, 1896.

www.pathagar.com

নির্ঘন্ট

অ

অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী ১২৬
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৪২, ২৪৬
অঘোরনাথ বসু চৌধুরী ১১৩
অজিত কুমার ঘোষ ১৭৭,২০১
অজিতকুমার চক্রবর্তী৩৬৪২৩৮,২৪৩,
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ১১৬,১১৭
অনাথনাথ বসু ২৩
অপূর্ব কৃষ্ণ মিত্র ১১৫
অপূর্ব ভারত উদ্ধার ১১৫
অবতার ১২২
অবলা কি প্রবলা ১২৬
অবলা ব্যারাক ১১৪
অভেদী ৯০
অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১৭
অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১১৯
অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য ১০৬
অমৃতলাল বসু ১০৪, ১৩০, ২৬৭-২৭০, ২৭৪, ২৮০, ২৮৫, ২৮৮, ২৯৪, ২৯৬, ৩০০, ৩০৪, ৩০৮, ৩১৫, ৩২১, ৩২৫, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৪-৩৬৬
অমৃতে গরল ১১৮
অযোগ্য পরিণয় ১০৫
অরুণ কুমার মিত্র ২৬৯
অল্প হইল ৯৩
অলীক বাবু ৩৫৯
অশুভ পরিহারক ১০৭
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৩১, ১৩৩, ২৪৩, ৩৫২
অসুরোদ্বাহ ১০৮
অ্যাডাম ১৮
অ্যারিস্টটল ১০১, ৩৬৮
অ্যারিস্টো ফেনিস ২৬৯

আ

আই ডোণ্ট কেয়ার ১১৭
আইন বিভ্রাট ১০৮
আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ প্রহসন ১০৫
আক্কেল সেলামী বা উদ্ভট মিলন ১২৬
আঙ্গিরস সংহিতা ৫৩
আচাভুয়ার বোম্বাচাক ১২৫
আজব কারখানা বা বিলাতী সং ১১৫
আজব জোলা ১১৩
আজীমদ্দী ৩৩৭
আদিরস প্রথা ৫৭
আবদুল লতিফ ২৮
আবার অতি অল্প হইল ৯৩
আবুহেনা মোস্তফা কামাল ৩৪৮,৩৪৯
আমার ঝকমারীর মাশুল ১২৬
আমিতো উন্মাদিনী ১১৮
আমি তোমারই ১২০
আমীর চাঁদ ২
আর কেহ যেন না করে ১১২
আর্চার ১২
আর্য ৪০, ৪১
আর্মেনিয়ান ১০
আলালের ঘরের দুলাল ৮৯, ৯১
আশুতোষ দেব ৪৫

www.pathagar.com

আশুতোষ বসু ১০৬
আশুতোষ ভট্টাচার্য ১০৪,১৩২,২০৩, ২০৪, ২১৪, ২৬৮, ২৮৮, ২৯৪, ৩২৫,৩৫১, ৩৫৪, ৩৬৭
আসরুম ৪৭
আহমদ শরীফ ২, ২৯, ৩৬৭

ই

ইউসুফ আলী ৫
ইণ্ডিয়ান লীগ ৩০
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫
ইয়ং বেঙ্গল ২৯-৩৩, ৪৪, ৪৫, ৯৯, ১৭৫, ১৭৬, ৩৪৮
ইহারই নাম চক্ষুদান ১১৮
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১,৪-১০,১৩, ১৬,২১
ইসমাইল হোসেন সিরাজী ২৪

ঈ

ঈশ্বর গুপ্ত ৩৩, ৪৯, ৯৩, ৯৭ ২৬৮, ৩৪৭, ৩৫০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৯, ৩০, ৪৪, ৪৫,৫৮-৬০,৬২,৬৩,৯৩,১৫৩
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৭৪

উ

উইলবার ফোর্স ১৪
উইলিয়ম কেরী ১১
উইলিয়ম বোল্টস ৭
উড ১৯-২২
উৎকৃষ্ট কাব্যম ৯৫
উদ্বাহ তত্ত্ব ৬৩
উপনিষদ ৪৬
উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল ১২০
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১০৫
উভয় সঙ্কট ১৬৪
উমেশচন্দ্র মিত্র ৩৫৫
উ! মোহন্তের এই কাজ! ১২০

এ

এই এক প্রহসন ১১২
এই কলিকাল ১২৪
এক ঘরে দুই রাঁধুনী পুড়ে মলো ফ্যান গালুনি ১০৬
একাকার ২৭০, ৩১৫, ৩৫৮
একাদশীর পরাণ ১১৮
একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব ১১৪ ৩৫৯
একেই কি বলে সভ্যতা ১৭৪-১৭৯, ১৮৬, ১৮৮, ২৬৭, ৩৫৬, ৩৬২
এনায়েত আলী ২৬
এ মেয়ে পুরুষের বাবা ১১৯
এর উপায় কি ১১৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫৯
এ'রাই আবার বড় লোক ১২১
এস. এন. লাহা ১০৫, ১১৯,
এস. বি. পাল ১২৬

ও

ওঠ ছুঁড়ি তোর বে গামছা পরগে ১০৮
ওয়াহিদুন্নবী ২৮
ওহাবী আন্দোলন ২৬

ক

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৬২
'ক্ষুদিরাম' ৯৫
ক্ষেত্র গুপ্ত ৮৫
ক্ষেত্রমোহন ঘটক ১২৪

www.pathagar.com

কড়ীর মাথায় বুড়োর বিয়ে ১০৪,৩৩৭
কর্তাভজা ৪৩
কন্যাবিক্রয় ১১০
কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি ১২২
কবি গান ৯৬
কবির লড়াই ৫১
কমলাকান্ত ৯৪
কর্মকর্তা ১১৩
করণ প্রথা ৫৬
কর্নওয়ালিস ৬,১৩,২৪
কল্পতরু ৯৫
কলিকাতা কমলালয় ৮৭
কলিকাতা মাদ্রাসা ১৩,২৭,২৮
কলিকালের রসিক মেয়ে ১১৯
কলি অবতার ১১৭
কলি কৌতুক ১২৩
কলির কাপ ১২০
কলির ছেলে প্রহসন ১১৭,১১৮
কলির দশ দশা ১০৬
কলির মেয়ে ছোট বউ ওরফে ঘোর মূর্খ ১১৯
কাজী আবদুল মান্নান ৩৩২
কানাইলাল সেন ১০৬
কাপ্তেন বাবু ১১৩
কামরূপা ১২
কামিনী ১২৪
কামিনী গোপাল চক্রবর্তী ১১৩
কার্জন ২৩
কার্ল মার্কস ২
কালা পানি বা হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা ২৭০,৩০৪,৩৫৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৪
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১২০,১২৩,৩৬০
কালীচন্দ্র রায় ১১১
কালীচরণ মিত্র ১১৩,১২০
কালীপদ ভাদুড়ী ১২০
কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১১৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৩৮
কালীয়দমন ৩৪৭,৩৫০
কালু মিঞা ১১৯
কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫১
কাশীতে হয় ভূমিকম্প নারীদের একি দম্ভ ৩৩২
কাশীনাথ পঞ্চানন ৮৫
কিছু কিছু বুঝি ৩৫৯
কিঞ্চিৎ জলযোগ ৩৫৮
কি মজার কর্তা ১২৩
কি মজার কলের গাড়ী ৩৩৭
কি লাঞ্ছনা ১১২
কিশোরী চাঁদ মিত্র ২১
কীর্তিবিলাস ৩৫০
কুঞ্জবিহারী বসু ১১৯
কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ ২০৩,২৩৭,২৩৮,৩৫৭
কুলসার ৫৭
কুলীনকুল সর্বস্ব ১৩০-১৩৩,১৩৫,১৫৪,৩৪৯,৩৫৫,৩৫৪,৩৬১
কৃষ্ণকুমারী নাটক ১৭৫
কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার ১০৫
কৃষ্ণবিহারী রায় ১০৫
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র ১২১
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৯
কেদারনাথ ঘোষ ১১২
কেদারনাথ মণ্ডল ১২৬
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ১১২
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৪,১৭৫

www.pathagar.com

কোঙর হরিনাথ রায় ৫১
কোণের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে ১০৮
কৌলীন্য কি স্বর্গ দেবে ১০৬
কৌলীন্য প্রথা ৫৪,৫৬,৫৭,৫৯,৬৪, ৯৮,৯৯,১০৪,১৩৫,১৩৭,১৪২, ২২৮,৩৫৫
কৌলীন্য মর্যাদা ৫৮
ক্লাইভ ১,৪,৫

খ

খণ্ড প্রলয় ১২৫
খন্দকার ফজলে রাব্বি ২৫
খেদের গান ৩৩৫
খেলারামের গীত ৩৩৫
খ্রীস্টান মিশনারী ১০,১১, ১৩, ১৫,৪৪,৪৫

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২
গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২২
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ১১৪,৩৫৯
গাধা ও তুমি ১১৬
গিরি গোবর্ধন ১১৪
গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০২, ১০৪, ১৩০, ২০২, ২৪২-২৪৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৫, ২৫৮, ২৬১, ৩৫৭, ৩৬৪-৩৬৬
গিরীশচন্দ্র রায় ৫০
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৩,১৫৪,৩৫৫
গুণের শ্বশুর ১২০
গোপাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১১২
গোপালচন্দ মিত্র ১১৩
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১১
গোপালমণির স্বপ্নকথা ১১৯
গোপীমোহন ৫১
গোবর্দ্ধন বিশ্বাস ১২৪
গোবিন্দচন্দ্র বসাক ২৯
গোবিন্দ মিত্র ২
গোলক ধাঁধাঁ ১২০
গোলাম হোসেন ৩৩৬
গৌরদাস বসাক ১৩১
গৌরমোহন বসাক ১০৭
গৌরীচরণ ব্যানার্জী ৩
গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ৯৩
গৌরী সেন ২
গ্রাম্য বিভ্রাট ২৭০,৩২৫,৩২৬
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ৫২

ঘ

ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে ১১৭
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ১১৭
ঘোড়ার ডিম ১০৭,১১৬

চ

চক্ষু দান ১৬৪,৩৫৫
চক্ষুস্থির ৩৬০
চক্ষুস্থির প্রহসন ১২৩
চড়ক পুজা ৩৫৩
চন্দ্রকান্ত দত্ত ১১৩
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ৩
চন্দ্রশেখর শর্মা ১১৯
চপলা চিত্ত চাপল্য ১০৭
চরিত্রবান কুলীন ১০৬
চাটুজ্যে ও বাড়ুজ্যে ২৭০,২৮৫
চার ইয়ারে তীর্থ যাত্রা ১১১
চার্লস গ্রান্ট ৯

www.pathagar.com

চিরকুমার সভা ৩৫৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৬
চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী ১১৪
চোরের উপর বাটপাড়ি ২৭০
চৈতন্য দেব ৪৩
চৈৎ সিং ৫

ছ

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ১০৯,১১৮
ছোট বৌর গুপ্ত প্রেম ১২৫

জ

জন ব্রাইট ৭
জয়ন্ত গোস্বামী ১০৩
জামাই বারিক২০৩,২২৮,২৩০,৩৫৬,
৩৫৭,৩৬৩
জামাল নামা ৩৩৭
জিনত ৪৭
জি. সি. রায় ১১৬
জীবেন্দ্র সিংহ রায় ৩৩,২৪৪
জে, পেগস ৫৫
জেমস্ মিল ১৬,১৭
জেমস্ রেনেল ৫
জোড়া সাঁকো নাট্যশালা ১৫৪
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ১০৬,৩৫৭,
৩৫৮

জ্ঞ

জ্ঞান দায়িনী ১১২
জ্ঞানধন বিদ্যালংকার ১১১

ট

টপ্পা ৩৪৬
টমাস কোলব্রুক ১৪
টাট্কা টোট্কা ১১৫
টালা অভিনয় ৩৪৩
টেকচাঁদ ঠাকুর ৮৯,৯০,৯৩
টেক্ টেক্ না টেক্না টেক্
একবার তোসি ১১৭
ট্রেভেলিয়ান ১৯

ড

ডাক্তার বাবু ৩৬০
ডাফ ১৯
ডাফরিন ২৩
ডালহৌসী ১৯
ডিরোজিও ৩১,৩৪৮
ডিসমিশ ২৭০,২৮০
ডেভিড ড্রমণ্ড ১২
ডেভিড হেয়ার ৪৬

ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৩,৫০,৬২,৩৫২
তাজ্জব ব্যাপার ২৭০,২৯৪,৩৫৮
তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৭,৫১
তারকেশ্বর ১২০
তারকেশ্বরের নাটক অর্থাৎ
মহন্ত লীলা ১২১
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ২৯
তারাচরণ শিকদার ৩৫০
তিতুমীর ২৬
তিতুরাম দাস ১১৮
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ১২১
তিল তর্পণ ২৭০,২৭৪,২৭৫,৩৫৮
তুই না অবলা ১১৯
তুতিনামা ১২
তুমি যে সর্বনেশে গোবর্দ্ধন ১১৫
তোমার ভালবাসার মুখে আগুন ১১৫
ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ১১৫

www.pathagar.com

দ

দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১
দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১১৪
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৯
দয়াল চাঁদ মিত্র ৫২
দর্পনারায়ণ ঠাকুর ২
দল ভঞ্জন ১১১
দারুল ইসলাম ২৪
দারুল হরব্ ২৪,২৬
দাশরথি রায় ৯৬
দিগম্বর মিত্র ২১,২৩৮
দিবাকান্ত রায় ১১৮
দীনবন্ধু মিত্র ৩০, ১০৪, ১০০, ২০১-২০৪, ২১৩, ২২৮, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬২-৩৬৪, ৩৬৬
দুই সতীনের ঝগড়া ১০৬, ৩৩৩
দুকুল ফর্সা ১২০
দুর্গাদাস দে ১১৪
দুদু মিয়া ২৬
দুর্গাচরণ রায় ১১০
দূতী বিলাস ৮৭
দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ১৭৫
দেবীপদ ভট্টাচার্য ২৪২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮, ৪৪
দেবেন্দ্রনাথ বসু ১১৭, ২৮০
দোজবরে ভাতারের তেজ বরে মাগ ১০৬
দ্বাদশ গোপাল ১১২
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩, ৪, ৫১, ১৫৩
দ্বারকানাথ মিত্র ১১৫

ধ

ধর্মসভা ৪৫
ধর্ম সূত্র ৬৩
ধীরেন্দ্র নাথ পাল ১১৪
ধূর্ত প্রহসন ১২৪

ন

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ১১৫
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৩
নটবর দাস ১১৯
ননদ ভাজের ঝগড়া ৩৩৪
নন্দলাল ঠাকুর ৫২
ননী গোপাল মুখোপাধ্যায় ১০৬
নফরচন্দ্র পাল ১১০
নবকৃষ্ণ ২
নবগোপাল মিত্র ২৮, ১৫৪
নবজাগরণ২৯, ৩১,১৭৮,২৪২, ৩৬৫
নববাবু বিলাস ৮৬, ৮৮
নব রাহা বা যুগ মাহাত্ম্য ১২৪
নবশাখ ৪২
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৩
নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বৌ ১২৬
নয়শো রুপেয়া ১০৯
নরবলি ৪৪, ৩৫৩
নরসিংহ ৫২
নলিনীলাল দাস গুপ্ত ১১৫
নলোপাখ্যান ৩৪৭, ৩৫০
নাগাশ্রমের অভিনয় ১২১
নাদাপেটা হাঁদারাম ১২৫
নান্নীজান ৪৭
নারায়ণ চন্দ্র ১২১
নারায়ণ নটরাজ গুণনিধি ১২২
নারী চাতুরী ১১৯
নারীর ষোল কলা ৩৩৫
নিকী বাইজী ৪৭

www.pathagar.com

নিত্যানন্দ শীল ১১২
নিবারণ চন্দ্র দে ১২০
নিমাই চাঁদ শীল ১২১
নিমাই মুখোপাধ্যায় ৫৮
নীলকর ৭
নীল দর্পণ ২০১, ২৩৭
নীলিমা ইব্রাহিম ২৬৮
নৃসিংহ চন্দ্র ৫১, ৫২
ন্যাশনাল কনফারেন্স ৩০
ন্যাশনাল থিয়েটার ২০২, ২৭৪, ২৮০

প

পঞ্চ রঙ ৩৬৫
পঞ্চানন রায় চৌধুরী ১২৬
পণপ্রথা ৩৫৩
পদীর বেটা পদ্মলোচন ১১৩
পরিণয়োৎসব ১০৮
পর্তুগীজ ১০
পরের ধনে বরের বাপ ১১০
পলাশীর যুদ্ধ ৭, ১০, ৪৫
পশ্চিম প্রহসন ১০৫
পাঁচ কণে ২৪২, ২৬১
পাঁচ পাগলের ঘর ৩৬০
পাঁচালি ৯৬, ৩৪৬
পাশ করা ছেলে ১১০
পাশ করা জামাই ১১০
পাষণ্ড পীড়ন ৯৩
পুজারী বেটা ছুঁচো ১২০
পূর্ণচন্দ্র সরকার ১১৭
প্যারীচরণ সরকার ৩৬২
প্যারীচাঁদ মিত্র ৩০, ৪৬
প্যারীমোহন সেন ১১৮
প্রণয় প্রকাশ নাটক ১২২
প্রণয় বিচ্ছেদ ১২০
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৭৪
প্রফুল্ল কুমার সরকার ৬২
প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায় ১১৪
প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ৩
প্রসন্ন কুমার পাল ১১৭
প্রহসন ১০০, ১০১, ১০৪, ১৩০
প্রাণকৃষ্ণ হালদার ৫০
প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ১১৮
প্রিন্সেপ ১৮
প্রিয়রঞ্জন সেন ১০২
প্রেমের নক্শা বা রগড়ের চাঁচি ১১২
প্রেসিডেন্সি কলেজ ২৭

ফ

ফকিরদাস বাবাজী ১২২
ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্ত কথা ১০৫
ফচকে ছুড়ীর ভালবাসা ১১৯
ফিরিঙ্গি ২, ১৩
ফেলু নারায়ণ শীল ১০৫
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৩
ফ্যানী পার্কস ৪৭, ৫৫

ব

বউ ঠাক্‌রুণ বা সমাজ কলঙ্ক ১১৭
বক্কেশ্বর ১১৭
বক্কেশ্বরের বোকামি ১১৩
বঙ্কিমচন্দ্র ৩, ৫৩, ৪৬, ৯৩-৯৫, ২০১-২০৩, ২১৪, ২২৯, ২৪২, ২৯৬, ৩৬২, ৩৬৩
বকুবিহারী মিত্র ১১৭
বর্গী ২
বংশজ ৫৬-৫৮
বঙ্গদর্শন ৯৩, ৯৪
বঙ্গবিলাস সমজদার ১২২

বঙ্গমাতা ১১০
বঙ্গ রত্ন ১১৭
বড়দিনের বখশিস ২৪৩, ২৫২, ৩৫৭
বড় বৌ বা ডাক্তার ১১৮
বনগায়ে শিয়াল রাজা ৩০৪
বলরামী ৪৩
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭
বহু বিবাহ, ৪৫, ৫৪, ৬১,৮৪,১০৪
২২৮, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৬৬
বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা
বিষয়ক নাটক ১৫২-১৫৫, ৩৫৫
বাইজী ৪৭, ৩৪৭
বাঙ্গাল হরকরা ২১
বাঙ্গালী বাবু প্রহসন ১১৯
বাঙ্গালির মুখে ছাই ১১২
বাঙ্গারামের গল্প ৩০৪
বাপরে কলি ১২৪
বাবু ৪৬-৪৮, ৫০, ২৭০, ৩০৮, ৩০৯
বারইয়ারী পূজা ১৬০
বারানসী সংস্কৃত কলেজ ১৩
বাল্যদ্বাহ নাটক ১০৮
বাল্যবিবাহ ৪৫, ৬১, ৬৩, ৮৪, ১০৪,
৩৪৮, ৩৫৩, ৩৬৬
বাল্যবিবাহের অমৃত ফলে ১০৮
বিচিত্র অন্ন প্রাশন ১১৮
বিজয় গোবিন্দ সিংহ ৫০
বিদ্যাসুন্দর ২৮৩, ৩৪৭, ৩৫০
বিধবা বঙ্গবালা ১১৯
বিধবা বিবাহ ৪৪, ৪৮, ৬০, ৮৪,
৯৮, ১০৪, ২৪৪, ৩৫৩
বিধবা বিবাহ আইন ৬০, ১৬০
বিধবা বিরহ ১০৭
বিধবা বিলাস ১০৮
বিধবার দাঁতে মিশি ১১১
বিনোদ বিহারী বসু ১১৯
বিপিন চন্দ্র পাল ২২৮, ২৪২, ৩৬৩
বিপিন বিহারী গুপ্ত ৫২
বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় ১১২
বিপিন বিহারী দে ১১৮, ১২৬,
বিবাহ বিভ্রাট ২৭০,২৮৮,২৮৯,৩৫৪
বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৭৬, ৩৫০, ৩৬১
বিয়ে পাগলা বুড়ো ২০৩, ২০৪, ২১২
৩৫৬, ৩৬৩
বিরাজ মোহন চৌধুরী ১১৭
বিলাসী যুবা ১১৩
বিষম বিপদ ১০৮
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১২৪, ১২৫
বিহারীলাল নন্দী ১০৮
বীরেশ্বর মল্লিক ৫২
বুঝলে কিনা ১২০
বুড়ো পাগলের বে ১০৫
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ১৭৪-১৭৭,
১৮৮, ৩৬২, ৩৬৩
বুলবুলির লড়াই ৪৬, ৫১, ৫২, ৮৪
৩৪৬
বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ৪১, ৪২
বেগম জান ৪৭
বেঙ্গল থিয়েটার ২৮০
বেঙ্গলী ২০৪
বেচুলাল বেনিয়া ১১৮
বেজায় আওয়াজ ১১৭
বেদ ৪৬, ৫২
বেন্টিঙ্ক ১৭-১৯
বেন্হান ১৬, ১৭
বেলগাছিয়া নাট্যশালা ১৭৪, ১৭৫
বেলায়েত আলী ২৬
বেল্লিক বাজার ২৪৩, ২৪৬ ২৪৭
বেল্লিক বামুন ১২৪

www.pathagar.com

বেশ্যারহস্য ৩৪৭
বেশ্যাশক্তি নিবর্তন নাটক ১১৭
বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা ১২৬
বৈকুণ্ঠ নাথ ৪৭
বৈদ্যনাথ রায় ৫১, ৫২
বৈদ্যনাথ শীল ১৩৩,২৬৮,২৭৫,৩২৫
বৈশ্য ৪১, ৪২, ৫৩
বৈষ্ণব চরণ শেঠ ২
বৌদ্ধ ধর্ম ৪০
বৌবাবু ১১৩
বৌমা ২৭০, ৩২১, ৩৫৮
ব্রজবিলাস ৯৩
ব্রজমাধব শীল ১১০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮, ১৩১
ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় ৫২
ব্রহ্মচর্য ৬০-৬২
ব্রাহ্মণ ৪১, ৪২, ৪৭, ৫৪, ৫৬
ব্রাহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ৪১
ব্রাহ্ম সমাজ ৪৫, ১২১
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৩০

ভ

ভগবান চট্টোপাধ্যায় ৫৮
ভদ্রার্জুন ৩৫০
ভণ্ড তপস্বী ১২১
ভণ্ড দলপতি দণ্ড ১২৩
ভণ্ডবীর ১১৭
ভবানী গোপাল সান্যাল ১৭৬
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫,৮৫-৮৯
৯৩, ৯৭, ৩৪৮
ভরার মেয়ে ৫৮
ভারত উদ্ধার ৯৫
ভালবাসার মুখে ছাই ১১৫
ভুটিয়া মানিক বা
দারজিলিন্যের নকশা ১১৪
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৭
ভ্রূণ হত্যা ৬২
ভুদেব চৌধুরী ২৪৪
ভোট মঙ্গল বা সজীব
পুতুল নাচ ২৪৩-২৪৫
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮, ১০৮
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৯২,১২১,৩৫৯

ম

মক্কেল মামা ১১৯
মতিলাল মল্লিক ৫০
মতিলাল শীল ৪ , ৫১
মদ খাওয়া বড় দায়
জাত থাকার কি উপায় ৯০
মধুসূদন দত্ত ১০৪, ১০০, ১৭৪-১৭৯
২৪৩, ২৬৭, ৫৫৬, ৩৫৭, ৩৬২,
৩৬৪, ৩৬৬
মাইকেল মধুসূদন দত্তের
জীবন চরিত ১৩১
মনুসংহিতা ৫৩
মনুস্মৃতি ৪০, ৪১
মনোরঞ্জন বসু ১২০
মরিসন ১৮
মহাপূজা ২৪৩, ২৫০
মহাবক্স বাইজী ৪৭
মহাভারত ৪০, ৬৩
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৬, ১১১
১১৭, ৩৫৪
মহেশচন্দ্র দাস ১২০
মা এয়েচেন ১১৮
মাগ মুখো ছেলে ১২৬
মাগ সর্বস্ব ১০৬, ৩৫৯
মাতালের জননী বিলাপ ১১১, ৩৬০
মাতালের সভা ১১২

www.pathagar.com

মাধব গিরি ১২০
মাধবচন্দ্র মল্লিক ২৯, ৩০
মামা ভাগ্নীর নাটক ১২০
মার্সম্যান ৯, ১৯
মীরকাশিম ৫
মীরজাফর ১, ৪, ৫
মীর মশাররফ হোসেন ২৫, ১১৮
৩১৯, ৩৪৩, ৩৫৩, ৩৫৯
মুই হ্যাঁদু ১২৪
মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত ৯৪
মুন্সি নামদার ১০৬, ৩৩২-৩৩৫
মুষলং কুলনাশনং ১১৫
মুহম্মদ এনামুল হক ৩৩১
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকর ৮৫
মেকলে ৫, ১৭' ১৮
মেয়ে মনষ্টার মিটিং প্রহসন ১২৫
ম্লেচ্ছ ৪২
মোহনলাল মিত্র ১১৯
মোহন্ত ১১০, ১২১
মোহন্তের এই কি কাজ ১২১
মোহন্তের কি দুর্দশা ১২১
মোহন্তের চক্র ভ্রমণ ১২১
মোহন্তের য্যাসা কি ত্যাসা ১২১
মোহন্তের শেষ কান্না ১২১
মোহিতলাল মজুমদার ২৪৩

য

যতীন্দ্রচন্দ্র শর্মা ১১০
যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ২১, ১৬৭, ২৩৮
যতো নবাবি ১১৪
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১০৭
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০৮
যশোদা নন্দন চট্টোপাধ্যায় ১২০
যাত্রা ১০২, ৩৪৬
যেমন কর্ম তেমন ফল ১৪৬, ১৪৭
যেমন দেবা তেম্নি দেবী ১১২
যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৩১, ১৭৭
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ৩৫০
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ২৮৮
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১২০, ১২১
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১২৩
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০
যৌবনের ঢেউ ১১৫

র

রঘু নন্দন ৬৩
রত্নাবলী ১৭৪, ৩৫০
রতিকান্ত ৩৪৭
রতিকেলি ৩৪৭
রতি বিলাস ৩৪৭
রতি মঞ্জুরী ৩৪৭
রবীন্দ্রনাথ ১৭৮, ৩৫৪
রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১১৮
রমণী রঞ্জন ৩৪৭
রমেশ দত্ত ৫
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩
রস মঞ্জুরী ৩৪৭
রসিক কামিনীর হন্দ মজা ১১৯
রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ২৯, ৩০
রহস্য মুকুর ১১৯
রহস্যের অন্তর্জলী ১১০
রাখাল দাস ভট্টাচার্য ১১৪, ১১৭
১২২, ১২৬
রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার ১০৬
রাজকৃষ্ণ রায় ১১০, ১১২, ১১৫, ৩৬০
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩
রাজনারায়ণ বসু ১১, ১২, ২৮, ১৭৫
রাজবল্লভ ২

www.pathagar.com

রাজা বাহাদুর ২৭০, ৩৩০, ৩৫৮
রাজেন্দ্রনাথ সেন ৩৬০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২১, ১৩১, ১৭৮
২১৪, ৩৫০
রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা
তিন লয়ে কলিকাতা ১১৮
রাতে উপদুড় দিনে চিৎ
ছোট বউর একি রীত ১১৯
রাধাকান্ত দেব ২৮, ৩৩, ৪৫, ২৫৮
রাধানাথ শিকদার ২৯
রাধাবিনোদ হালদার ১০৬, ১০৯,
১১০, ১২৪
রামকমল সেন ৪৫
রামকান্ত বন্দ্য ৫৮
রামকানাই দাস ১০৬
রামগতি ন্যায়রত্ন ১৩২, ১৫৪, ১৭৬
২২৯, ৩৬৩
রামগোপাল ঘোষ ৩, ২৯, ৩০, ২০৮
রামগোপাল মল্লিক ৫১
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮
রামচন্দ্র দত্ত ১১১, ৩৬০
রামতনু লাহিড়ী ২৯
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১০৪, ১৩০,১৩১,
১৫৩, ১৫৪, ১৬৪, ১৭৪, ২৪৩,
৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৫ ৩৫৭. ৩৬৬
রামনারায়ণ মিশ্র ১১
রামমোহন রায় ২, ১৬, ২৯-৩১, ৪৪
৪৭, ৫৫, ৮৫; ৩৪৮
রামরত্ন মল্লিক ৫১
রাম রাম মিশ্র ১১
রামের বিয়ে প্রহসন ১০৫
রায় কালীনাথ ৪৭
রাসবিহারী শর্মা ৫০
রুক্মিণী রঙ্গ ১২৬
রূপচাঁদ পক্ষী ৯৮
রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮
রেভারেন্ড লং ২০৭
রোকা কড়ি চোকা মাল ১১০

ল

লঙ ২১
লক্ষ্মীকান্ত ধর ২
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ১২১
লণ্ড-ভণ্ড ১১৫
ল-বাবু ১১৪
লরেন্স ২১
লর্ড আমহার্স্ট ১৬
লর্ড কার্জন ১০
লর্ড মিন্টো ১৪
লর্ড রিপন ২৪৪
ললিতচন্দ্র মিত্র ৩৬২
লালবিহারী সেন ১১৫
লেবেডেফ ১০২
লোকরহস্য ৯৪
লোভেন্দ্র গবেন্দ্র ১১০

শ

শম্ভুনাথ বিশ্বাস ১০৫
শরৎচন্দ্র দাস ১১৯
শর্মিষ্ঠা ১৭৪
শরীয়ত উল্লাহ ২৬
শশধর তর্কচূড়ামণি ২৪২
শশাঙ্ক মোহন সেন ১৭৭
শারবোর্ণ ১২
শালগ্রাম শিলা ১১
শিক্ষা কমিশন ২২
শিবচন্দ্র দেব ২৯,৩০

www.pathagar.com

শিবচন্দ্র সরকার ৫২
শিবনাথ শাস্ত্রী ৪৯
শিমন্নেল পীর বক্স ১০৭
শিশির কুমার ঘোষ ২১,১০৯
শীতাংসু মৈত্র ২৭
শুভস্য শীঘ্রং ১০৭
শূদ্র ৫৪
শেখ আজিমদ্দী ১০৪
শ্যামলাল চক্রবর্তী ১২৩
শ্যামলাল বসাক ১১৮
শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ১১৫
শ্যামাচরণ ঘোষাল ৩৬০
শ্যামাচরণ শ্রীমানি ১০৮
শ্রীনাথ চৌধুরী ১১৮
শ্রীপতি ভট্টাচার্য ১১২
শ্রীশচন্দ্র রায় ৫০
শ্রোত্রিয় ৫৬-৫৮
শ্লাভ দেশ ৫২

স

সই ১২০
সংবাদ কৌমুদী ৯৩
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ৯৯
সংবাদ প্রভাকর ৩,৮৫,৯৩,৩৫০,৩৬১
সংস্কার প্রহসন ১১৬
সংস্কৃত কলেজ ১৫,১৬
সঙ ৪৬,৫১,১০১,১০২
সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ ১১৮
সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৫৪
সতীদাহ ৪৫,৫৩,৫৪,৫৬,৬০, ৮৪,১৬০,৩৪৮
সদাই ভাল ১১৯
সধবার একাদশী ২০১,২০৩,২১৩, ২১৪,২৩৭,৩৫৪,৩৫৬,৩৬২,৩৬৪
সন্তোষ কুমার অধিকারী ৬২
সপ্তমীতে বিসর্জন ২৪৩,২৫৮
সপত্নী কলহ ১০৬
সর্বশুভঙ্করী ৩
সভ্যতা সোপান ১১৪
সভ্যতার পাণ্ডা ২৪৩,২৫৫
সম্বাদ ভাস্কর ৩৬১
সম্ভোগ রত্নাকর ৩৪৭
সম্মতি সংকট ২৭০,২৯৬
সমাচার চন্দ্রিকা ৪৫,৮৬,৮৮,৯৩
সমাচার দর্পণ ৫৩,৫৫
সমাজ কলঙ্ক ১০৬
সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন ১০৩
সমাজ সংস্করণ ১১৫
সরস্বতী পূজা প্রহসন ১১৭
সরসী লতার গুপ্ত কথা ১১৯
সাধারণী ২৪৬
স্বাধীন জেনানা ১২৬
সাধের বিয়ে ১০৫
সারদাচরণ ঘোষ ১০৮
সিদ্দিক আলী ১১৯
সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ১১৫
সিপাহী বিদ্রোহ ২৬
সিরাজদ্দৌলা ১
সুকুমার সেন ১০২,১০৪,১৩৩, ২৮৮,৩৩২,৩৪৯
সুখময় রায় ২
সুধা না গরল ১১১
সুধামাধব দাস ১১৮
সুপন জান ৪৭
সুরাপান নিবারণী সভা ৩৬২
সুরুচি ধ্বজা ১২২
সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১

www.pathagar.com

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১১৬
সুরেন্দ্রনাথ বসু ১১৩
সুরেশচন্দ্র মৈত্র ৩৬৩
সুশীল কুমার দে ২০১,২০২,২১৪
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ২৬
সোমত্য মাগীর সখ ১১৯
সোমপ্রকাশ ৩,৯৩,৩৫১,৩৬৪
স্যার উইলবার ফোর্স ৯
স্যার জন ষ্ট্র্যাচি ৬,৮
স্যার লাওনেল স্মিথ ১০
স্ক্যান্ডিনেভিয়া ৫২
স্পষ্ট দায়ক ৪৩
স্টার থিয়েটার ২৮৫,২৮৮,২৯৪, ২৯৬,৩০৪,৩১৫,৩২১,৩২৫
স্টেটস্‌ম্যান ৩২১
স্টেনলি ২১,২২

হ

হঠাৎ বাবু ১১২
হরচন্দ্র ঘোষ ৩, ২৯
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১০৫
হরি মাইতি ৬৪
হরিমোহন রায় ৩৫৯
হরিমোহন কর্মকার ১০৮
হরিহর নন্দী ১০৭, ১১৩ ১১৬, ১১৭
হরিশচন্দ্র কবিরত্ন ২৭
হরিশচন্দ্র মিত্র ৩০, ১০৬, ১০৭,১১৭
হরেন্দ্রনাথ মিত্র ১০৮
হাড় জ্বালানী ৩০৬
হাতে হাতে ফল ১২২
হান্টার ২২
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১১
হারাণ শশি দে ১১৯
হাল আমলের সভ্যতা ১১৭
হিঙ্গুল ৪৭
হিতে বিপরীত ১০৬
হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার ২৮
হিন্দু কলেজ ১৩, ২৭-২৯, ৩১, ১৭৮
হিন্দু পাইওনিয়ার ২৮
হিন্দু প্যাট্রিয়ট ২৮, ১৩১, ৩৬১
হিন্দু ফ্রি স্কুল ২৮
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ ২৮
হিন্দু মেলা ২৮,৩০
হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ২৮
হীরালাল ঘোষ ১১০
হুগলী কলেজ ২৮
হুতোম প্যাচার নকশা ৪৮,৯১
হেমন্ত কুমারী ১১৮
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ১০২,২০৩,৩৫৩
হেস্টিংস ৫,৮,২৩,২৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com